অলৌকিক রহস্য।

প্রথম বর্ষ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

প্রকাশক,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী,
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
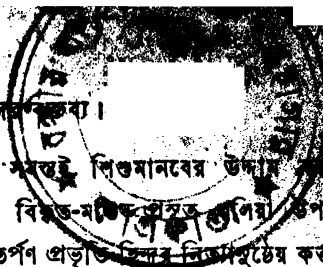
ভূতযোনি, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি সমস্তই শিশুমানবের উদ্দাম কল্পনা-শক্তি বা বায়ু-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির বিকৃত-মস্তিষ্ক-প্রসূত বলিয়া উপহাস করেন; সন্ধ্যা, বন্দনা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য-গুলিকে স্বার্থপর অলস মানবের বিধান বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

এই অননুভূত-পূর্ব্ব নিদারুণ অবস্থা হইতে, আমাদের সনাতন হিন্দু-জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মৌলিক একত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমরা স্ব-গৃহ-ভাণ্ডার-নিহিত অমূল্য রত্নরাজি হারাইতে বসিয়াছিলাম, সেই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানেরই সুর এখন ফিরিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক তত্ত্বসমূহের রহস্যোদ্ঘাটনে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহাদের অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে যে সমস্ত গূঢ়রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

এক্ষণে যাহাতে বঙ্গীয় পাঠকগণ উপরি-উক্ত সমস্ত তত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং তৎসমূহের সাহায্যে আমাদের নষ্টপ্রায় শাস্ত্রীয় জ্ঞানরাশির প্রভায় পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত করিতে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও কৃতকার্য্য হন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই "অলৌকিক রহস্যের" অবতারণা। উপকরণ-সংগ্রহই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য; কারণ উপকরণ-সংগ্রহই বৈজ্ঞানিক-মীমাংসা-প্রণালীর মূল ভিত্তি। এই হেতু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে সমস্ত স্থূল-প্রকৃতির অতীত অলৌকিক রহস্যের অন্ধকার-ভেদ ও তৎ-সংসৃষ্ট ঘটনাবলী সাধারণ লোক-সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, আমরা সেইগুলি বিভিন্ন প্রবন্ধ বা পুস্তকাকারে বঙ্গীয় পাঠকগণের সকাশে ক্রমশঃ

প্রকাশিত করিব। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এখনও জগতে কতশত বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া গিয়া নিয়তির বাস্তব রাজ্য সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি।

আমাদের সংগ্রহ-কার্য্য শুধু যে পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মণ্ডলীর পদাঙ্কানুসরণমাত্র হইবে, তাহা নহে। এদেশে এখনও চেষ্টা করিলে অনেক বিচিত্র ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কেবল আমাদের উদ্যমের অভাব ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অবলম্বন বিষয়ে শৈথিল্য বা উদাসীনতাই তাহার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। তন্ত্রাদি শাস্ত্রোক্ত মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়া এখনও এদেশে দুর্লভ-দর্শন হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সেই সমস্ত তত্ত্বসংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সূত্রে আমরা দেশবাসিমাত্রকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি তাহাদের বা তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়ের গোচরে যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা যথাযথ বিবৃত করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ যেন আমাদের নিকট প্রেরণ করেন আমরা সে সকলও মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিব।

যে সকল বিষয় আমাদের পত্রিকায় আলোচিত হইবে, নিম্নে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিলাম। (১) প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) (২) স্বপ্নদর্শন, (৩) দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance), (৪) পরলোকতত্ত্ব, (৫) পরোক্ষতত্ব, (৬) জীব-শরীর-গত চুম্বকশক্তি (Animal magnetism), (৭) মৃত্যুরহস্য, (৮) বশীকরণ বিদ্যা (Hypnotism) (৯) মারণ, (১০) উচ্চাটন, (১১) স্তম্ভন, (১২) ডাকিনী-বিদ্যা বা ডাইন তত্ত্ব, (১৩) জন্মান্তরীণ ঘটনা, (১৪) অদৃশ্য-সহায় (Invisible

Helper), (১৫) দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী, (১৬) স্বপ্নদর্শন, (১৭) প্রত্যক্ষ ভৌতিক ব্যাপার; ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত ইহাতে (১) আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা, (২) উদ্ভট বা লোক-পরম্পরা-শ্রুত আধ্যাত্মিক উপন্যাস, (৩) সাধু-সন্ন্যাসীর অদ্ভুত বা অলৌকিক জীবনী, (৪) সাধু-সন্ন্যাসীগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনা (Miracles), (৫) সাধারণ মানব-জীবনের অলৌকিক ঘটনা প্রভৃতিরও সমাবেশ থাকিবে।

উপরিউক্ত তত্ত্ব-সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলন করিতে করিতে পাঠকগণ যেমন বিস্ময়রসে অভিভূত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত অদ্ভুত পারলৌকিক তত্ত্ব-সম্বন্ধেও সেইরূপ তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে; এই বলিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ-প্রকাশ করিতে হইবে না যে, এতদিন আমরা জ্ঞান-সমুদ্রের এক অংশ অনাদরে অন্ধ-তামসে রাখিয়া, আমাদের মনকে বারিধির তদংশ-সম্ভূত অমৃতের আস্বাদনে বঞ্চিত করিয়াছি,—ইহা আমাদের নিশ্চয় ধারণা। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই সাময়িক পুস্তিকার প্রচার এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইলেই আমরা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া কৃতার্থ হইব। ইতি—

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ,
সন ১৩১৬ সাল।

সম্পাদক।

ভৌতিক-কাহিনী।

—(*)—

এই জীবনই মানবের শেষ নহে। যেমন লোকে একখানি জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ মানব মৃত্যুর পরে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করেন। এই সূক্ষ্মজগৎ আবার একটি নহে, অনেকগুলি আছে, ভূবর্লোক, স্বর্লোক ইত্যাদি। ভুবর্লোক প্রধানতঃ দুইটি লোকে বিভক্ত—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। মানব প্রথমে প্রেতলোকে যান, পরে পিতৃলোকে উন্নীত হন এবং অবশেষে স্বর্গলোকে গমন করেন। সেখানে পুণ্যের তারতম্যানুসারে অল্পাধিক কাল বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং বিশন্তি"—গীতা ইহাই মানবের সাধারণ নিয়ম। অসাধারণ মানবগণ (যোগী, ভক্ত সাধক ইত্যাদি) সাধন-বলে স্বর্গের উপরে (মহঃ জন প্রভৃতি লোকে গমন করিয়া থাকেন। ইহাই সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে পরলোকের কথা আছে। হিন্দুগণের গল্পে, গানে, ছড়ায় এমন কি চিত্রে পর্য্যন্ত পরলোকে বিশ্বাস স্ফুরিত হইয়াছে। পরলোকের অস্তিত্ব হিন্দুর নিকট স্বতঃসিদ্ধ—স্বাভাবিক। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! কালধর্ম্মবশেই হউক অথবা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবেই হউক, আজ অধিকাংশ হিন্দুসন্তান পরলোকে বিশ্বাস করেন না। আজকাল অনেকেই যুক্তি ও বিচারের অপেক্ষা করেন,—চক্ষুগ্রাহ্য প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সহজে বিশ্বাস করিতে চান না অতএব তাঁহাদের বিলুপ্ত ও জীবনহীন বিশ্বাসকে পুনরায় সজীব, সবল

ও উদ্দীপিত করিবার জন্য, আমরা পরলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহাদের সমীপে ক্রমশঃ উপস্থাপিত করিব। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যেই আছে, সুতরাং ভারতবর্ষেও তাহা বিরল নহে। কিন্তু হিন্দুর পরলোকে সংশয় না থাকায়, তিনি এতাবৎকাল প্রমাণ সংগ্রহ করা বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তথাপি ভূত-প্রেতাদির ঘটনাবৃত্তান্ত ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসমুদায়ের অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসমাজেই প্রচলিত; সুতরাং তন্মধ্যে খাঁটি সত্য কতটুকু এবং কতটুকুই বা কল্পনা-প্রভাবে অতিরঞ্জিত, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ। এইজন্যই আমরা বিদেশীয় ঘটনাবলীর প্রতিই সমধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হইলাম। কয়েক বৎসর অবধি বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনেক শিক্ষিত, বিচারপটু, সূক্ষ্মদর্শী ও বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি এই সকল ঘটনার অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব এই সকল বৃত্তান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

পিতা ও পুত্র।

(১)

(প্রেতাত্মা স্বীয় পুত্রকে কিরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন।)

একটি ইংরাজ-মহিলা (Society for Psychical Researches) নামক সমিতির নিকট ঘটনাটি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

খৃষ্টীয় ১৮৬৭ অব্দে আমার বিবাহ হয়। আমাদের দাম্পত্য-জীবন বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামীর কিছু ভাবান্তর দেখিতে পাইলাম। তিনি সর্ব্বদাই

বিষণ্ণ থাকিতেন,—হাস্য নাই, প্রফুল্লতা নাই, যেন একটা বিষম চিন্তা-জ্বরে সদাই জর্জ্জরিত। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইল, তিনি ক্রমশঃ যেন জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমার বড়ই ভাবনা হইল। কিন্তু তাঁহার চিন্তার কারণ কি এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে কেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তরই পাওয়া যাইত না। "উহা কিছুই নয়, ইহার জন্য ভাবিও না" এই বলিয়া তিনি এক কথায় সব উড়াইয়া দিতেন।

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে খৃষ্টম্যাসের সময় আসিল। আমার এক মাতুল ও মাতুলানী ঐ গ্রামেই বাস করিতেন। তাঁহারা আমাদিগকে পর্ব্বদিনে তাঁহাদের বাটী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যাকালে আমরা আহারাদি সমাপন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিবার উদ্যোগ করিলাম, কারণ পরদিন অতি প্রত্যূষেই আমাদিগকে মাতুলালয়ে গমন করিতে হইবে ইহাই স্থির ছিল। রাত্রি ৯টার মধ্যে আমরা নীচের দরজা জানালা, হুড়কো ও তালা দ্বারা বন্ধ করিয়া উপরের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলাম। শয়ন কক্ষের দরজা জানালাও রীতিমত বন্ধ করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় শয়ন করিবার জন্য আলো নিবাইতে যাইতেছি, এমন সময়ে মনে পড়িল, আমার কন্যাটিকে দুধ খাওয়ান হয় নাই। আমার পনর মাসের এক শিশু ছিল। সে প্রত্যহ রাত্রি ৯॥০ বা ১০ টার সময় একবার কাঁদিত এবং একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি শান্তভাবে নিদ্রা যাইত। সুতরাং স্বামীকে শয়ন করিতে বলিয়া এবং আলোর তেজ একটু কমাইয়া দিয়া আমি নিজ শয্যার উপর বসিয়া শিশুর নিদ্রা-ভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

শয্যায় শয়ন করিলে আমাদের মস্তক যে দিকে থাকে, সেই দিকেই

গৃহের প্রবেশ দ্বার এবং পদতলের দিকে একটি টানা টেবিল ড্রয়ার ছিল। এই ড্রয়ারের উপরেই দীপটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ভোরে যাইবার কিরূপ বন্দোবস্ত করিব, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম এবং স্বামী আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বোধ হয় দুএক মিনিট মাত্র আমি বসিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে চকিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, খাটের পাদদেশে যে রেলিং আছে, তাহার উপর দুই হস্তে ভর দিয়া এক অজ্ঞাত, অভিনব ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জাহাজের খালাসীর মত পরিচ্ছদ এবং মস্তকে এক নূতন ধরণের টুপি! আমার ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ই অধিক হইয়াছিল। সুতরাং স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম "দেখ তো, কে দাঁড়াইয়া আছে।" শুনিবামাত্র স্বামী সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দুএক সেকেণ্ড নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ভাবে মূর্ত্তির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর শয্যার উপর একটু উঠিয়া বসিয়া, তিনি তীব্র স্বরে ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন "আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?" ইহা শুনিয়া মূর্ত্তিটি আস্তে আস্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর অথচ তিরস্কার-সূচক স্বরে স্বামীর নাম দুইবার উচ্চারণ করিল—"উইলি, উইলি"!

স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মুখ মলিন, বিবর্ণ, উদ্বেগপূর্ণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন—যেন মূর্ত্তিটিকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু কি জানি কেন তিনি যেন হঠাৎ ভয়বিহ্বল হইয়া শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মূর্ত্তিটি মৃদুমন্দভাবে দীপের সম্মুখ দিয়া দেয়ালের দিকে যাইতে লাগিল। যখন আলোকের সম্মুখ দিয়া গেল, তখন বিপরীত দেয়ালে তাহার ছায়া পড়িল, স্পষ্ট

দেখিতে পাইলাম। সে যাহা হউক, মূর্ত্তিটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেয়ালের নিকটে আসিল এবং বোধ হইল, যেন তন্মধ্যেই প্রবিষ্ট হইল,—আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন স্বামী দ্রুতপদে দীপাধারটি লইয়া বলিলেন "বাটীর সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখিব, সে কোথায় গেল।" এই বলিয়া তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারটি তালাবদ্ধ ছিল এবং মূর্ত্তি দ্বারের দিকে আদৌ যায় নাই, ইহা স্মরণ হওয়াতে আমি বলিলাম "সে দরজা দিয়া বাহির হয় নাই।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া, স্বামী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি একাকী অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম "ইহা নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মা! কিন্তু কাহার প্রেতাত্মা? উহার মুখটি আমি দেখিতে পাই নাই। আমার ভ্রাতা আর্থার তো নাবিক হইয়াছেন। তবে কি তাঁহারই কোন বিপদ্ আপদ ঘটিয়াছে?" ইতি মধ্যে স্বামী ফিরিয়া আসিলেন এবং আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "কে আসিয়াছিল বল দেখি।" আমি বলিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন "ইনি আমার পিতা।"

"আমার শ্বশুর মহাশয়কে আমি একবারও দেখি নাই। তিনি চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এককালে নাবিকের কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু শেষ বয়সে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এতকালের পর তিনি হঠাৎ অদ্য পরলোক হইতে আসিলেন কেন, তাহা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। উহা অতিশয় গোপনীয় বলিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কয়েক মাস অবধি স্বামী একটি লোকের পরামর্শানুসারে এরূপ এক কার্য্যে লিপ্ত

হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার আশু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। উহাতে যদি তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইতেন, তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত এমন কি জীবনান্তও ঘটিতে পারিত। পিতার তিরস্কার-সূচক সতর্কতাবাক্য তাঁহাকে এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিল। কারণ পরদিন হইতে তিনি উক্ত কার্য্যের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, আমাদের উভয়েরই স্নায়ু ও মস্তিষ্ক বেশ সুস্থ ও সবল এবং ভূত প্রেতাদির অস্তিত্বে কখনও বিশ্বাস বা "কুসংস্কার" ছিল না। ইতি—

৯ই জুন ১৮৮৫। মিসিস্ পি।

উল্লিখিত বৃত্তান্তে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা আবশ্যক। ১ম—চৌদ্দ বৎসর পরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব। ইহা একটু অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরেই বা ২।৪ বৎসরের মধ্যেই প্রেতাত্মাগুলিকে আসিতে শুনা যায়। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গতও বটে; কারণ যতদিন জীব প্রেতলোকে বাস করে, প্রেতত্ব হইতে মুক্ত না হয়, তত দিনই তাহার পৃথিবীতে আসিবার বাসনা প্রবল থাকে; কিন্তু পিতৃলোকে উন্নীত হইলে সে প্রায়ই আসিতে ইচ্ছা করে না। ২য়—প্রেতমূর্ত্তি স্পষ্ট কথা কহিল এবং দেয়ালে তাঁহার ছায়া পড়িল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উহা সম্পূর্ণ রূপে স্থূলত্ব-প্রাপ্ত (completely materialized) হইয়াছিল। ৩য়—প্রেতাত্মা পুত্রের ভাবি বিপদ্ জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, প্রেত-পুরুষগণ ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর সকল সংবাদ অবগত হইতে পারেন এবং কতক পরিমাণে ভবিষ্যৎটাও জানিতে পারেন। অধিকন্তু তাঁহারা প্রিয় আত্মীয় স্বজনের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ বোধ করেন। প্রেতাত্মা যে ভবিষ্যৎ বিপদ্ জানিতে

পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্য "অলৌকিক রহস্যের" দ্বিতীয় সংখ্যায় একটী ঘটনা বিবৃত হইবে।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

প্রেতিনীর সহিত বিবাহ।

১৮০০ শতাব্দীতে ইউরোপ খণ্ডে কাউন্ট-ডি-সেণ্ট জার্ম্মেন নামে জনৈক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠক-মাত্রেই ইহার বিষয় নিশ্চয় কিছু কিছু বিদিত থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই দুজ্ঞের্য় নিগূঢ় জটিলতায় আবৃত। তবে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারা যায় যে, রাজযোগী মহাপুরুষ মাত্রেই তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। তিনি যে কে, কোথা হইতে আসিলেন এবং কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য তমসাচ্ছন্নে সমাবৃত। তিনি তাৎকালিক সমগ্র যুরোপের রাজন্যগণের পরিচিত ছিলেন; এমন কি কুটীর হইতে রাজ-প্রাসাদের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। কতদিন তিনি এই ভূমণ্ডলে আবির্ভূত ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারিতেন না।৽ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই জনরব প্রচারিত হয় যে, ভার্সেলিস নগরে এরূপ এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ আসবাব এবং ধনরত্ন মণিমাণিক্যের প্রাচুর্য্যই তাহার পরিচায়ক। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপ সুঠাম ও সুগঠিত ছিল। ফলে তাঁহার মত সুন্দর পুরুষ অতীব বিরল, তাঁহার সে হরনেত্র দুটি এরূপ তীক্ষ্ণ জ্যোতিপূর্ণ ও মুগ্ধকর ছিল, যে তাহা বর্ণনাতীত। নিজ সময়ে সংঘটিত বহু প্রাচীন কাহিনী ও আশ্চর্য্য ঘটনাবলি, তিনি সময়ে সময়ে বিবৃত করিতেন; এবং দেখিতে পাওয়া যায়,

সেই সমস্ত ঘটনাবলির তিনিই এক জন প্রধান অভিনেতা। মহাত্মা কাউন্ট সেণ্ট্ জারমেন রাজন্যগণ ও সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান মণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই থাকিতেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত থাকিতেন সেই খানেই উৎসাহ প্রফুল্লতা ও আনন্দ অবিরাম বিরাজ করিত। কতই যে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, প্রেতের প্রভৃত কাহিনী এবং নানাবিধ উদ্দীপনাপূর্ণ সুমধুর ও উপাদেয় বিবরণ সকল বিবৃত করিয়া ঐ মহাজন মণ্ডলীকে সর্ব্বদাই "সজীব ও আনন্দপূর্ণ রাখিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফল কথা তাঁহার সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয় ছিল। রাজন্য ও সম্ভ্রান্তগণের ভোজন স্থানে যদিও তিনি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের আহারে কখনই যোগদান করিতেন না,—কেহই কখনও তাঁহাকে আহার করিতে দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ বর্ণিত একটি প্রেতের অলৌকিক কাহিনী আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

"ইউরোপ খণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় কোনও নগরে, (পাছে বংশের গৌরব ও মর্য্যাদা বিনষ্ট হয়, তিনি কখনও দেশ বা ব্যক্তির নাম বলিতেন না) এক সম্ভ্রান্ত যুবক বাস করিতেন। তিনি অতিশয় ধীশক্তি ও বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত থাকিলেও কেবল এক লাম্পট্য দোষে তাঁহার সমস্ত স্বভাবকে নষ্ট করিয়াছিল। লাম্পট্য দোষ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, একদা তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপপত্নীর সংখ্যা এতই অধিক হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের সহবাস তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। আরও বলিয়াছিলেন যে মানবীকে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই, তবে যদ্যপি কোন অলৌকিক জাতীয় রমণীর সহবাস করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনের নিরুৎসাহিতা ও হৃদয়ের অপ্রসন্নতা বিদূরিত হইতে পারে। ইহা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বলিলেন "তুমি উন্মাদ হইয়াছ" উত্তরে যুবক বলেন যে,

"তুমি যাহাই বল না কেন অদ্যই রজনীতে সমাধিস্থানে গমন করিয়া নিশ্চয় কোন মৃত রমণীকে আহ্বান করিব।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু মুখ কুঞ্চন করিয়া বিরক্তি সহকারে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর কাউণ্ট আর—(প্রস্তাবোল্লিখিত সম্ভ্রান্ত-যুবক) নগর প্রান্ত-স্থিত সমাধি ভূমিতে দ্বিপ্রহর রাত্রে উপস্থিত হইলেন। সমাধিস্থল নীরব ও গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। যুবক প্রথমে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রার্পিত-রক্ষা-বৃত্ত (বেড়) দ্বারায় আপনাকে বাঁধিয়া লইলেন। অনন্তর ভীষণ অভিচার দ্বারায় সমাধিস্থলের শান্তিভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিবার কিছুক্ষণ পরে কাউণ্ট বহু-দূর-সমাগত রমণীকণ্ঠ-নিসৃত অতাব সুমধুর গ্রাম্যসঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। ঐ রমণীকণ্ঠ নিসৃত সুস্বর লহরী এতই পবিত্র, সুমধুর এবং সুরলয় সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইল যে, কাউণ্ট উহা শ্রবণে সমাধিক্ষেত্রে আগমনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঐ রমণী গায়িকার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইবামাত্র অদূরে এক অতীব সুন্দর রমণী-যুবতী দেখিতে পাইলেন। সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ সদালাপ হইতে প্রেমালাপ করিতে করিতে সমাধির সন্নিকটে উপনীত হইলেন। অনন্তর কথাবার্ত্তায় কথঞ্চিৎ সাহসী হওয়াতে প্রেম মিলন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যুবতী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল যে "আমি বিবাহিত স্বামী ব্যতীত অন্য কাহার হইতে পারি না।" কাউণ্ট উত্তরে বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" এই বলিয়া নিজ অঙ্গুরীয় রমণীকে প্রদান করিলেন এবং রমণীর অঙ্গুরীয় নিজে গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে যুবতীকে বিবাহের বাক্‌দান করিলেন, এবং যুবতীও স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর কোন অন্তরায় রহিলনা দেখিয়া যুবতী কাউণ্টের সহবাসে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেন। বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আগামী রজনীতে উভয়ে ঐ স্থানে পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইবেন অঙ্গীকার করিয়া নিজ নিজ স্থানের অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু উন্মত্ততা জনিত অনুরাগ পাশবপ্রবৃত্তির চরিতার্থের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর স্মৃতি কাউণ্টের মন হইতে অপসারিত হইল। ফল আগামী রজনীতে অঙ্গীকৃত স্থানে উপস্থিত না হইয়া কাউণ্ট নিজ ভবনে সুখে নিদ্রা যাইলেন। এই রূপে কাউণ্ট এক ঘণ্টাকাল সুখে নিদ্রা গিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার শয়ন গৃহের দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়াগেল। দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দের সহিত কাউণ্টেরও নিদ্রা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গাতে প্রথমে তিনি মানবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনি ক্রমশঃ পোষাকের খস্ খস্ ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল—বোধ হইল কে যেন ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আসিয়া তাঁহার শয্যার মশারি উত্তোলন করিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন কে যেন তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছে। গাত্রে হাত দিয়া দেখিলেন অনুভব করিলেন যে, দেহ রমণীর এবং অতীব কোমল কিন্তু মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায় শীতল এবং দেহ হইতে শব সদৃশ দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে। ভয়ে কাউণ্টের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল—তিনি পলায়ন করিয়া অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল—রমণীর আলি-ঙ্গন ছাড়াইয়া কোন প্রকারে যাইতে পারিলেন না। চীৎকার করি-বার চেষ্টা করিলেন,—তাঁহার স্বর বন্ধ হইল। এই রূপে তাঁহাকে এক ঘণ্টাকাল যন্ত্রণাভোগে অতিবাহিত করিতে হইল। অনন্তর যখন

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে একটা বাজিল, তখন তাঁহার প্রস্তরবৎ-শীতল-সঙ্গীনি তাঁহার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

পরদিন সন্ধ্যা সমাগত। বিগত রজনীর ভীষণ ব্যাপারের ভয়াবহ চিন্তা বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট অদ্য অতি সমারোহের সহিত নিজ প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। নগরস্থ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ও সুন্দরী মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছেন। অট্টালিকা আলোক মালায় আলোকিত—সম্মিলন গৃহের প্রাচীর সমূহ বৃহৎ বৃহৎ দর্পণে বিমণ্ডিত—দ্বার এবং গৃহ প্রাচীর সকল মূল্যবান কারুকার্য্য সমন্বিত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত এবং মনোমুগ্ধকর সুগন্ধযুক্ত পুষ্পপুঞ্জে এবং লতা কুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে। গৃহতল মূল্যবান কার্পেটে আবৃত হইয়াছে এবং তাহার উপায় নানাজাতীয় সুন্দর আসন সমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে। একে একে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও মহিলাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে সুর-তাল-লয় সমন্বিত সুমধুর ও সুন্দর গীত ও নৃত্য আরম্ভ হইল। সকলেই নৃত্যগীতে ব্যাপৃত ও মুগ্ধ। সময় যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কাউণ্টেরও ক্রমে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল—দ্বিপ্রহরের আগমন তিনি অশান্তি ও উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্লক্ষণ পরেই ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে দ্বিপ্রহরের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। ঠিক এই সময়ে জনৈক ইতালী দেশীয় রাজকুমারীর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল,—সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অল্লক্ষণ মধ্যেই রাজকুমারী আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন,—তাঁহার চতুর্দ্দিকে সকলে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমারী যুবতী—দেখিতে অতীব সুন্দর। তাঁহার দেহ বহুমল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং রত্নালঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত। রমণীকে দেখিবামাত্র

কাউণ্টের মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িল, তাঁহার এই পরিবর্ত্তন অন্ত কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কাউণ্ট কিন্তু বুঝিতে পারিলেন যে, এই ছদ্মবেশধারিণী রাজকুমারী তাঁহার সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব রজনীর সমাধি-ভূমির পরিচিত দুঃশীল প্রেত-সহচরী ব্যতীত আর কেহ নহে। মানবীর আকারে ঐ প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধীরে কাউণ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণ অথচ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তিনি যেখানে গমন করেন, ঐ সুতীক্ষ্ণ-স্থির-দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হয়—কাউণ্ট কোন প্রকারে ঐ দৃষ্টির হাত এড়াইতে পারেন না। সকলেই আমোদে উন্মত্ত; কিন্তু কাউণ্টের চিত্ত ভীতি ও অশান্তিতে ব্যাকুল হইতেছিল! অনন্তর যেই ঘড়ীতে একটা বাজিল, অমনি ঐ ইতালীর রাজকুমারী আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিচারক সকল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না—সকলের নিকট শীঘ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন—গাড়ীর ঘোটকদ্বয় সশব্দ পাদবিক্ষেপে ধাবিত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে সেই শব্দ আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

এতক্ষণ পরে কাউণ্ট হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল। বলা বাহুল্য, প্রত্যহ রজনীযোগে এই প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইল এবং জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল—এক্ষণে তিনি কেবল নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। কাউণ্ট সেণ্ট জার্ম্মেণ বলেন যে, যে সময়ে এই যুবা মৃত-প্রায়, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী হইয়াছিলেন। কাউণ্ট সেণ্ট জার্ম্মেণ এই যুবার হৃদয়ে লুক্কায়িত কষ্ট অনুভব করিয়া, তাঁহাকে কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে যুবা তাঁহার কষ্টের কারণ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন,

কিন্তু দুঃসহ জীবনভার-বহন অপেক্ষা উহা প্রকাশ করাতে, উপকার হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া, অবশেষে তিনি নিজের গোপনীয় কষ্টের কারণ কাউণ্ট সেণ্ট জার্ম্মাণের নিকট সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ কাউণ্ট সেণ্ট বলিলেন—"ভগবৎকৃপায় আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাহাই হউক, ভয়নাই ; শীঘ্রই সমস্ত বিপদ হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে, চিন্তিত হইওনা" আর বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমি তোমার নিকট আগমন করিব ; সেই পর্য্যন্ত জাগরিত ও সতর্ক থাকিবে, এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবে।" এই বলিয়া কাউণ্ট সেণ্ট বিদায় লইলেন।

মহাত্মা কাউণ্ট বলেন, ঐ যুবকের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে তিনি এরূপ কাতর ও সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন যে, তাহাতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, যুবক একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি স্নেহের সহিত তাঁহার হাতটি আমার হাতের উপর রাখিলাম—বোধ হইল, যেন, আমার হাত পুড়িয়া যাইতেছে। আমি অতীব সুমধুর বচনে আশ্বাস দিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম এবং আবার ভগবানের নিকট প্রার্থনায় রত থাকিতে বলিলাম। কারণ, স্থূল শরীরের বল অপেক্ষা তাঁহার নৈতিক বলের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী উদ্‌যোগ করিতে গেলাম। রাত্রি এগার ঘটিকার সময় আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে দেখিয়া যুবা কাউণ্ট বিলক্ষণ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন,—তাঁহার হৃদয়ে অনেকটা বলের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! সেই ভীষণ সময় আগত-প্রায়" উত্তরে

আমি বলিলাম, "স্থির হও, ভীত হইবার কারণ নাই, অদ্য রজনীতেই তোমার যাতনার অবসান হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিওনা—নিশ্চিন্ত থাক।" এই কথায় যুবক আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বিপ্রহর বাজিবার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে ঘরের মেজের উপর কাউন্ট সেণ্ট একটি সৌর-ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলেন। অনন্তর উহার উপর সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করিয়া, উহার মধ্যে যুবা কাউন্টকে বসাইলেন এবং যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। এইরূপ করিয়া, কাউন্ট সেণ্ট স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে যেই দ্বিপ্রহর বাজিল, অমনি কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। গৃহ সাতটি বর্ত্তিকা দ্বারায় আলোকিত হইয়াছিল। সাইরস্ নৃপতির রাজত্ব কালে মোসেমের প্রপৌত্র ব্যাবিলন নগরে কাউন্ট সেণ্টকে যে "মোসেমের যষ্টি" উপহার দিয়াছিলেন, তিনি সেই যষ্টি হস্তে লইয়া বসিয়া রহিলেন। গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি মানবী মূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিল; কিন্তু বাস্তবিক উহা অশরীরী (স্থূলদেহ-বর্জ্জিত)। ঐ দেহ হইতে অত্যন্ত কুৎসিত পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছিল, তিনি অতি শীঘ্র সুগন্ধ দ্রব্য জ্বালাইলেন। প্রথমে ঐ প্রেতমূর্ত্তি শয্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, অগ্রসর হইতে হইতে সহসা নিবৃত্ত হইল, এবং পরক্ষণেই সৌর-ত্রিভুজ-স্থিত যুবা কাউণ্টের অভিমুখে আসিয়া ঐ অঙ্কিত ত্রিভুজের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া কাউণ্টের নিকট যাইতে পারিল না। প্রেত গভীর স্বরে বলিল, "উনি আমার স্বামী।" কাউন্ট সেণ্ট উত্তর করিলেন, "বঞ্চনাকারিণি! তুমি শঠতা করিয়াছ, তুমি প্রেত-লোক-নিবাসিনী বলিয়া যুবকের নিকট নিজ পরিচয় দেওনাই।" ঐ মানবরূপিণী প্রেতমূর্ত্তি উত্তর না করিয়া নিস্তব্ধ

রহিল। কাউণ্ট সেণ্ট নিজ হস্তস্থিত ঐ ভীষণ যষ্টি দ্বারা তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন। ভয়ে প্রেত-দেহ বিকম্পিত হইল এবং তাহার ঐ দৃশ্যমান স্থূল দেহ গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কাউণ্ট সেণ্ট বলিয়া উঠিলেন, "যুবক-দত্ত অঙ্গুরীয় শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর।" প্রেতমূর্ত্তি উত্তর করিল, "আমি যেথানে উহা পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে উহা প্রত্যর্পণ করিব, এখানে নহে।" কাউণ্ট সেণ্ট উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে, আমরা উভয়ে সেই স্থানে যাইব; কিন্তু তোমাকে অগ্রগামিনী হইতে হইবে।" প্রেতমূর্ত্তি গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইল।

সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়া, উভয়ে যে ব্যাপার দেখিলেন এবং যে রূপ সংগ্রামে কাউণ্ট সেণ্টকে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। যাহা হউক, ঐ সংগ্রামে কাউণ্ট সেণ্ট জয়ী হইলেন। প্রেতমূর্ত্তির সহিত প্রথম মিলন রাত্রিতে যুবা কাউণ্ট সমাধিমন্দিরের যে স্থলে উভয়ে বসিয়া ছিলেন, কাউণ্ট সেণ্টের উপদেশ মত তিনি সেই স্থানে অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিলেন। প্রেতও কাউণ্টের অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। গভীর রজনীতে তাঁহারা উভয়ে নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রির ঐ ঘটনার পরে কাউণ্ট সেণ্ট এবং যুবা কাউণ্ট নগর প্রবেশ করিয়া এক স্থলে ছাড়াছাড়ি হইলেন। অনন্তর যুবা কাউণ্ট নিজ গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীদিগের মঠের দ্বারে গিয়া করাঘাত করেন—মঠ-রক্ষক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে, তিনি মঠাধিকারীর সমীপে উপনীত হইলেন। অতঃপর সেই স্থানে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া প্রায় ৩৫ বৎসর কাল ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

ভূতের সহিত সাক্ষাৎ।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে প্রথমে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়, এই ঘটনাটি সেই সময়ের। সেই সময়ে গ্রামের প্রায় বার আনা লোক ম্যালেরিয়ার মড়কে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যে বাটীতে পূর্ব্বে ৮।১০ জন বাস করিত, হয়ত সেবাটীতে ২।১ জন মাত্র জীবিত ছিল, এবং কোন কোন বাটী জনশূন্য হইয়াছিল। আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। বাটীর মধ্যে তখন আমিই কর্ত্তা। মাঘ মাস—কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী—ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের বাটীতে ৺রটন্তী পূজা উপলক্ষে—গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় দিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সুতরাং আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বর্দ্ধিষ্ণু লোক। আমার পিতৃব্য সেই বাটীর মেনেজার। ৺পূজা শেষ হওয়ার পর প্রায় অর্দ্ধরাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। আমি বিকালে পিতৃব্য মহাশয়ের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কারণ ঐ অন্ধকারময় রাত্রিকালে একাকী যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, এত বেলা থাকিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার পর, রাত্রি ৮।৯ টার সময় তোমার খুল্লতাত-ভ্রাতার সহিত যাইলেই হইবে। তদনুসারে আমি রাত্রি ৯ টার সময় আমার খুল্লতাত ভ্রাতার সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের বাটীর নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাত্রা করিয়াছিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের বাটী আমাদের বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া দূরে ছিল। আমাদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়াই

সরকারী রাস্তা। সরকারী রাস্তায় বাহির হইয়া, আমার মনের মধ্যে কোন ভয় হয় নাই। কিছু দূর গিয়া রাম কাকাদের বাটী নজর হইয়াছিল। রাম কাকাদের বাটীতে উক্ত মেলেরিয়ার পূর্ব্বে ৮।১০ জন লোক ছিলেন। কিন্তু উক্ত সংক্রামক মেলেরিয়ার মড়কে সে বাড়ীতে আর কেহই জীবিত ছিল না। রাম কাকাদের বাটীর উত্তরেই ভয়ানক বন এবং তাহার উত্তরেই স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। হঠাৎ রাম কাকাদের বাটীর দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ভ্রাতাকে বলিয়াছিলাম—"দাদা, আহা! এই বাটীতে কত লোকই ছিল এবং এক্ষণে কি অবস্থাই ঘটিয়াছে।" তখনও আমার মনে কোন ভয় হয় নাই। দাদা আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। দাদা কহিলেন, "ভায়া ও সকল কথায় „এখন কাজ নাই। তুমি একটি—গান কর।" তাঁহার কথা অনুসারে আমি একটি গান গাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি তখন নূতন গান গাইতে শিখিতে ছিলাম, কিন্তু পল্লীগ্রামে ভাল গান শিখিবার সুবিধা না থাকায়, "বউ কথা কও" নামক গানটি—অভ্যাস ছিল, সুতরাং তাহাই গাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি যেমন উচ্চৈঃস্বরে ঐ গানটি গাইতে ছিলাম, হঠাৎ রামকাকাদের বাটীর ফটকের নিকট-বর্ত্তী সঙ্কীর্ণ-পথে বন মধ্য হইতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ, বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "তুমি বালক, ভদ্রলোকের সন্তান, তোমার এগান গাওয়া উচিত নহে।" আমি বলিলাম, "আমি এগান আর কখন গাইবনা।" এই কথা বলায় সে আমার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বন পথে চলিয়া গেল। আমি সেই দীর্ঘাকার পুরুষটিকে দেখিয়া চিনিলাম সে "ভোয়ে গোয়াল" বা ভৈরব গোয়াল।

ভোয়ে গোয়াল আমাদের একজন জোৎদার। তাহার বাটী আমা-

দেরই গ্রামে। সে আমাদের জমী জোৎ করিত বলিয়া সময়ে সময়ে আমাদের বাটীতে আসিত, এবং ফায় ফরমাস খাটিত এবং কাজ কর্ম্ম করিত। আমরা তাহাকে ভোয়ে জ্যেঠা বলিয়া ডাকিতাম। সে আমাকে বড় ভাল বাসিত।

ভোয়ে জ্যেঠা আমার হাত ছাড়িয়া দিলে, আমার দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভায়া "তুমি উহাকে চিনিতে পারিলে?" আমি বলিলাম, "আমি বেশ চিনিয়াছি; উনি যে ভোয়ে জ্যেঠা, উনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আমি অশ্লীল গান করিতেছিলাম, উনি বোধ করি, বাজার হইতে বাটী যাইতেছিলেন আমাকে অশ্লীল গান করিতে দেখিয়া, আমার উপকারার্থে আমাকে ঐ রূপ গান গাইতে নিষেধ করিয়া গেলেন।" দাদা কহিলেন, "কিন্তু ভোয়ে গোয়ালা যে জীবিত নাই। প্রায় একমাসের অধিক অতীত হইল, তাহার পরলোক হইয়াছে।" আমি সেই কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম ও সাতিশয় ভয়ে ভীত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীর ৺পূজার দালানে,—যেখানে আমার পিতৃব্য মহাশয় ছিলেন, যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া কেহ মুখে জল দিতে লাগিলেন ও কেহ পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে, যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন সকলে আগ্রহ সহকারে এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করিলাম। তাহাতে তাঁহারা সকলে কহিলেন যে, ভোয়ে গোয়ালার যথার্থই, প্রায় এক মাসের অধিক, মৃত্যু হইয়াছে। বোধ করি তাহার প্রেতাত্মা তোমাকে দর্শন দিয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে, যে ভোয়ে গোয়ালার প্রেত শরীর যাহা আমি দেখিয়াছিলাম তাহা উর্দ্ধে প্রায় ৭

হাতের কম হইবেনা। কিন্তু ভোয়ে গোয়ালা জীবিত অবস্থায় উর্দ্ধে প্রায় ৪ হাত ছিল।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

ভুতের ভীষণ প্রতিহিংসা।

অমিয়নাথ বাবু একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র যুবক,—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (এম. এ.) উপাধিধারী। প্রথম যৌবনে তিনি ভূত মানিতেন না; ভূতের কথা উঠিলে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি মধ্যবিত্ত অথচ অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিছুকাল তিনি কলিকাতার কোন একটি সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন।

বহুদিন পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে অমিয়নাথ বাবু বর্দ্ধমান বিভাগের কোন একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরে মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সহরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির একটি প্রসিদ্ধ রেল-ষ্টেসন।

অমিয়নাথ বাবুর বাসার অনতিদূরেই প্রিয়নাথ বাবুর বাসা ছিল। প্রিয়নাথ বাবু, রেল-পুলিষের ইন্‌স্পেক্টর। উভয়ে কিছুদিন এক-স্থানে থাকিতে থাকিতে পরস্পরের মধ্যে নিরতিশয় সৌহার্দ্দ জন্মিয়া-ছিল। সুতরাং অমিয়নাথ বাবু প্রায় প্রত্যহই প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া, মিত্রতা-সুলভ আমোদ প্রমোদে অথবা অধ্যয়নাদি কার্য্যে সময়াতিপাত করিতেন।

প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় একখানি বিলাতী নূতন রকমের উৎকৃষ্ট অদ্ভুত চেয়ার ছিল। এখানি গুটাইলে তদ্দ্বারা চেয়ারের কার্য্য হইত,

কিন্তু ছড়াইলে একখানি উৎকৃষ্ট কোচরূপে পরিণত হইত। এরূপ একাধারে কোচ ও চেয়ার এ দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানি প্রিয়নাথ বাবুর বৈঠকখানার শোভা-বর্দ্ধন করিত। তিনি এখানি নিজে বড় একটা ব্যবহার করিতেন না। কৌতূহল পরবশ হইয়া, নূতন জিনিষ বলিয়া, উহা ক্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইদানীং অমিয়নাথ বাবু সময়ে সময়ে এই চেয়ারে উপবেশন করিতেন।

একদিন কথায় কথায় অমিয়নাথ বাবু প্রিয়নাথ বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়! এই চেয়ার খানি অতি সুন্দর। আমার বড় ইচ্ছা, এইরূপ একখানি চেয়ার ক্রয় করিয়া ব্যবহার করি। আপনি যেখান হইতে এইখানি ক্রয় করিয়াছেন, সেইখান হইতে আর একখানি আমার জন্য আনাইয়া দিতে পারিলে বড় ভাল হয়।"

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন "এখানি এ দেশের প্রস্তুত নহে। এখানি যেরূপে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।"

প্রিয়নাথ বাবুর কথা শুনিয়া অমিয়নাথ বাবু সেই ইতিহাস শুনিবার জন্য উৎসুক হইলেন; সুতরাং প্রিয়নাথ বাবু বলিতে লাগিলেন।—"এই রেলওয়ে লাইনে জনষ্টন নামে একজন গার্ড ছিল। আমার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ছিল। তাহার স্বভাব উদ্ধত ছিল; কিন্তু সে আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিত, আমার সহিত তাহার একটু প্রণয়ও জন্মিয়াছিল। সে একশত টাকা মূল্যে এই কোচখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এ খানি তাহার বড়ই প্রিয় ছিল সে অতীব যত্নসহকারে ইহা ব্যবহার করিত। আমার নিকট সে অনেকবার বলিয়াছিল, এই কোচখানি তাহার নিরতিশয় প্রিয়বস্তু; কেহ ইহার প্রতি কোন প্রকার অযত্নভাব প্রকাশ করিলে, সে তাহাতে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইত। কিছুদিন পরে সে একদা রেল-সংঘর্ষে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়;

এই কৌচ খানিতে তাহাকে শয়ন করাইয়া চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায় নাই। এই কৌচে শয়ন করিয়াই সে দেহত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হয়। অন্যান্য দ্রব্যাদি যথোচিত মূল্যেই বিক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু এই কৌচে শয়ন করিয়া সে দেহত্যাগ করে এবং এখানি তাহার অতি প্রিয় বলিয়া কেহই এখানি লইতে সাহসী হয় নাই। আমি ১০৲ টাকা ডাকিয়াছিলাম আর কেহ না ডাকায় এখানি আমারই হইয়া গেল। আমি কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া এখানি নীলামে ক্রয় করিলাম বটে, কিন্তু ইহা কখনও ব্যবহার করি নাই। সে ইহা যেরূপ যত্নসহকারে সাজাইয়া রাখিত, আমিও তদপেক্ষা অধিকতর যত্নে সাজাইয়া বৈঠকখানার শোভা বৃদ্ধি করিয়াই চরিতার্থ হইতেছি। এখানি ব্যবহার করিতে আমার কখনও প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হয় নাই। আমি যে কোনরূপ ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ করিতেছি, তাহা মনে করিবেন না। ভূত-সম্বন্ধে আপনকার বিশ্বাসও যেরূপ, আমারও সেইরূপ। আমিও ভূত বিশ্বাস করি না। নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন সহজে কেহ ভূতের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইতে পারে না। এই কৌচখানি আমারও অতি প্রিয় সামগ্রী। যদি সুযোগ মত ঐরূপ আর একখানি পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই আপনকার জন্য তাহা ক্রয় করিব।"

অমিয়নাথ বাবু বলিলেন, "আমার ও সব প্রেজুডিস্ নাই। ভূত একটা কথার কথা মাত্র। মৃতব্যক্তি ত আর এ জগতে বর্ত্তমান নাই, তবে কিরূপে এখন তাহা দ্বারা অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে? এখানি আপনি ব্যবহার করেন না কেন? আমি হইলে উত্তমরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করিতাম। এখানি যখন আপনকার প্রিয় বস্তু,

তখন এখানি আমি চাই না। আপনি এইরূপ আর একখানির চেষ্টায় থাকুন; পাইলে আমার জন্য ক্রয় করিবেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার দুই একদিন পরে, একদিন অমিয়নাথ বাবু উক্ত চেয়ারে উপবেশন করিয়া সেক্ষপীর প্রণীত হ্যামলেট গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তখন বেলা অপরাহ্ণ। পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যেন একজন হ্যাটকোট-ধারী ইংরাজ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এইরূপ দেখিয়া প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, "মহাশয়! ব্যাপার কি? আপনি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে এরূপ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন কেন?"

অমিয়নাথ বাবু বলিলেন "কিছুই নহে, হ্যামলেট্ পড়িতে পড়িতে মনের তন্ময়তা বশতঃ বোধ হইল যেন, একজন ইংরাজ আমার আসন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইহা মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য-প্রসূত। পুস্তকখানিতে গাঢ়তর মনঃসংযোগ বশতঃ হয়ত হ্যামলেটে বর্ণিত ভূতই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিব। উহা কিছুই নহে।—কৈ এখন ত আর তাহা দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপেই লোকে ভূত দেখে এবং ভয় পায়।" এই বলিয়া উভয়ে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমিয়নাথ বাবু নিজবাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার দুই চারি দিবস পরে, একদিন অমিয় বাবুর একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর দিবস অপরাহ্ণে বন্ধুকে লইয়া অমিয় বাবু সহরের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া নিরতিশয় ক্লান্তদেহে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহুদূর পর্য্যটন করিয়া এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, ইচ্ছা হইতেছিল শীঘ্রই জলযোগ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ

করেন। কিন্তু সেই দিবস রাত্রিযোগে প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় তাঁহাদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ ছিল। সুতরাং উভয়কেই কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তথায় যাইতে হইল।

সেই দিবস প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় অপর দুই চারিটি ব্যক্তিরও নিমন্ত্রণ ছিল। যে সময় অমিয় বাবু বন্ধু সমভিব্যাহারে প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন, তখন নিমন্ত্রিত অপর কেহ উপস্থিত হন নাই। কথায় কথায় অমিয়নাথ বাবু প্রিয়নাথ বাবুকে বলিলেন যে, "আমার বন্ধু অদ্য বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। একটু সত্বর বিশ্রাম করিতে পাইলে, তিনি শরীর সুস্থ বোধ করিবেন। নতুবা তাঁহার বড়ই কষ্ট হইবে। আপনার নিমন্ত্রণ বলিয়াই তিনি এরূপ ক্লান্ত দেহেও আসিয়াছেন।

প্রিয়নাথ বাবু শুনিয়া বলিলেন, "তবে এক কাজ করুন। আমার অন্য বন্ধুগণ এখনও উপস্থিত হন নাই। এ দিকে আহার্য্য প্রায় সমস্ত প্রস্তুত। আপনারা প্রথমেই কার্য্য শেষ করুন। আর অনর্থক কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।"

অমিয় বাবু। আমার জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমি এখন অপেক্ষা করিয়া থাকিব। আমার এখনও তত ক্ষুধা নাই। আমার বন্ধুকেই প্রথমে খাওয়াইয়া দিলে চলিবে।

বন্ধু। সে কিরূপ বলিতেছেন, আমি কি এতই পেটুক যে, অপেক্ষা করিতে পারিব না, অগ্রেই একা আহার করিব?

যাহা হউক, প্রিয়নাথ বাবুর একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বন্ধুকে তখনই আহার করিতে হইল। তিনি আহারাদি করিয়া, বাসায় প্রত্যাগত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রিয়নাথ বাবুর বাসাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তথাকার সেই অদ্ভুত চেয়ারেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে একত্র মিলিত হইয়া আহার করিতে গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু একাকী সেই চেয়ারে শয়ান থাকিয়া, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীরের ক্লান্তি বশতঃ প্রগাঢ় নিদ্রা-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ভয়ানক চীৎকারে অন্যান্য সকলে ত্রস্তভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন! হইয়া দেখিলেন—বন্ধু মূৰ্চ্ছিত হইয়া চেয়ারের সম্মুখে ভূমিতলে শায়িত! সে সময়ে সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়াছিল। বন্ধুর এই অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া, সকলেই অতিমাত্র ভীত হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, বন্ধু জ্ঞানলাভ করিলেন। তাঁহার মূৰ্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন আমি নিদ্রাগত হইয়াছিলাম, তাহা জানি না। নিদ্রাকালে স্বপ্ন-বশে আমি দেখিলাম, একজন হ্যাটকোটধারী ইংরাজ, আমার পার্শ্বে আসিয়া অতি রুক্ষ স্বরে আমাকে বলিতেছে—'কে তুমি? তুমি আমার চেয়ারে কেন শুইয়া আছ?' আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, আমি জানিনা কাহার চেয়ার; প্রিয়বাবুর বাসায় নিমন্ত্রণে আসাতে তিনি এই চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিয়াছেন, তাই বসিয়াছি। কিন্তু আমার কথা না ফুটিতেই সেই ইংরাজ বলিল, 'আমি সব বুঝিয়াছি। কিন্তু এ চেয়ার আমার, ইহাতে কোন্ সাহসে নিদ্রা যাইতেছ? ইহা পরিত্যাগ কর।' আমি মনে করিলাম এই কথা বলি যে, সে কথা আমায় বলিলে কি হইবে? প্রিয়নাথ বাবুকে বল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেব ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি আর কাহাকেও বলিব না। কেন বলিব? তুমি ইহাতে শুইয়া আছ, তোমাকেই বলিব, তুমি এখনও ইহা ছাড়িলে না! কিন্তু জানিয়া রাখ, আমার নাম জনষ্টন, আমি তোমাকে

অন্নে ছাড়িব না! যদি অদ্য হইতে তিন দিনের মধ্যে তোমার প্রাণ সংহার না করি, তবে আমার নাম জনষ্টন নহে। এই কথা শুনিয়া আমি ভয়াভিভূত হইয়া, চীৎকার করিয়া অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে কি হইয়াছে, আমি জানি না।”

এই কথায় প্রিয়নাথ বাবু ও অমিয় বাবু উভয়ে অবাক্ হইয়া অন্যে শুনিতে না পায় এরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, “আশ্চর্য্য ব্যাপার! জনষ্টনের নাম ইনি কিরূপে জানিলেন।” যাহা হউক পাছে বন্ধু অত্যধিক ভয় পান এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভাই! তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, তুমিও ভূত মান? আচ্ছা দেখি, ভূতে তোমার কি করিতে পারে। একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া এরূপ ভীত ও অধীর হইলে চলিবে কেন?”

অতঃপর অমিয়নাথ বাবু বন্ধুকে সাহস দিতে দিতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রতিগমন করিলেন এবং বলিলেন, “আচ্ছা দেখা যাউক, ভূতে তোমার কি করে। তুমি এই তিন দিন অনুক্ষণ আমার নিকট থাকিবে। রাত্রিকালে আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিব। কোন ভয় নাই। স্বপ্ন দেখিয়াছ মাত্র। ও কথা ভুলিবার চেষ্টা কর। তিন দিনেই তোমাকে দেখাইব যে, ভূত বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই।”

অমিয় বাবু অতি যত্নে সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; রাত্রিকালে বন্ধুকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিতে লাগিলেন!

দুই দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে অমিয়বাবু স্কুলে পড়াইতে গিয়াছেন। স্কুলবাটী-সংলগ্নই তাঁহার বাসা বাটী। বাহ্যশৌচের জন্য অমিয় বাবুর নিকট হইতে বন্ধু বিদায় লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাসায় গিয়াছেন। মলত্যাগ করিয়া পাইখানা হইতে

ঘটী হস্তে বাহির হইয়াই, সম্মুখে বাসার ঝিকে দেখিতে পাইয়া বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঝি! আমার কি হ'ল?" অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ঝি তৎক্ষণাৎ অমিয় বাবুকে সংবাদ দিল তিনি সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া শীঘ্র ডাক্তার আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু হায়! ডাক্তার আসিয়া আর কি করিবেন? বন্ধুর প্রাণবায়ু মূর্চ্ছার সহিতই বহির্গত হইয়াছে!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দাদামশায়ের ঝুলি।

বড়দিনের ছুটি হয়েচে। অনেক দিনের পর ব্যোমকেশ তাহার গ্রাম্যবন্ধুগণের সঙ্গলাভ করিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া দিয়াছে। আজ বড় আনন্দ। প্রথম যৌবনের সে প্রাণভরা সুখ, সে গালভরা সুহাস— হায়, তাহা যদি চিরদিন থাকিত! কিন্তু তাহা ত হইবার যো নাই। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে কিছুই বেশী দিন টিকে না। সে যাহা হউক, এই দীর্ঘবিচ্ছেদের অবসানে সকলে সম্মিলিত হওয়াতে গল্পটি খুব জমিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া বৃদ্ধ তারাচরণ ভট্টাচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তারাচরণ ভট্টাচার্য্যকে গ্রামস্থ সকলেই শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তিনি সকলেরই 'দাদা-ম'শায়'। বিশেষতঃ নব্য-সম্প্রদায়ের সহিত যেন তাঁহার কিছু বেশি মাখামাখি। 'দাদা-ম'শায়'কে দেখিলে তাহাদের যৌবনসুলভ চপলতা স্বতঃই উছলিয়া উঠে, এবং ভট্টাচার্য্যও তাহাদের সেই কোমল প্রীতি উপভোগ করিতে বড়ই সুখানুভব করেন। তিনি

আসিবামাত্রই ব্যোমকেশ ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইল। তিনিও সস্নেহে মস্তকে হরিনামের ঝুলিটি বুলাইয়া দিয়া রহস্যালাপ জুড়িয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য। বলি ভায়া কখন এলে? এমন সখের বড়দিন, কত দেশদেশান্তরের লোক বাড়ী ছেড়ে কলকেতা যাচ্চে আমোদ আহ্লাদ কত্তে, আর তুই যে সে সব ফেলে চোঁ চা বাড়ী এসে হাজির! ব্যাপারটা কি বল দেখি! নাতবৌ বুঝি বাপের বাড়ী থেকে এয়েচে? সে যাহোক, এখন আমাদিগে দু'দশটা সহরের খবর বল। এবার বড়দিনে নূতন দেখবার জিনিষ কি এসেছে বল।

ব্যোমকেশ। দাদা'মশায়ের যত টাক্, সব এই নাতবৌএর ওপর! বলি, দেশে কি আর কিছু টান থাক্‌তে নেই? আপনাদিগে দেখতে কি আর ইচ্ছে হয় না?

ভঃ। বেশ, বেশ; তোর কথায় প্রাণটা খুসী হ'ল। এখন কলকেতার কথা বল। এখন নাকি গড়ের মাঠে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখান হচ্চে?

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায় চিরদিন ঝুলি-ঠক্ ঠক্ করেই কাটালে! কিছুই তো দেখলে না! এমন ম্যাজিক কেউ কখন দ্যাখেনি! অসম্ভব কাণ্ড!

ভঃ। অসম্ভব তো সম্ভব হ'ল কেমন করে?

ব্যোম। তবে আর বল্‌ছি কি দাদাম'শায়? ম্যাজিক! ম্যাজিক! এসব অলৌকিক ঘটনা! যা হতে পারে না, তাই হচ্চে!

ভঃ। দূর্ মূর্খ! তোরা আবার নাকি বিজ্ঞানশাস্ত্রে বি, এস, সি, (B S C) পাশ করিচিস! তোদের কালেজের বিজ্ঞানের মুখে ছাই! ওরে, জগতে যা কিছু ঘটনা ঘটে সবগুলোই নিয়মাধীন। ম্যাজিক বা

আজগুবি বলে জিনিষ নাই। যাকে তোরা ম্যাজিক বলিস, তাও কতকগুলা সাধারণের অজ্ঞাত জাগতিক শক্তির খেলা মাত্র। তোদের কেমন একটা রোগ—যেটা তোদের বুদ্ধিতে আসে না, সেইটাকেই তোরা বুজরুকি সাব্যস্ত করে বসিস্। ওই ভূতপ্রেত, ও একটা কথার কথা মাত্র; ওই পরকাল, অদৃষ্ট, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা, সূক্ষ্মদৃষ্টি—সব গাঁজাখোরের গঞ্জিকাধূমসংস্কৃত উষ্ণমস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত। কেন হে ভায়া—তোমার কালেজের বিজ্ঞান ওখানে কূল কিনারা পায় না বলে? তোরা কি ঠাউরেছিস্, যত কিছু জাগতিক তত্ত্ব তোদের ওই ক'জন মাতব্বর বৈজ্ঞানিকেরই একচেটে?

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায়, দেখ্‌চি তোমার সঙ্গে নেহাতই একটা গণ্ডগোল বাধলো। যেটা চোখে দেখ্‌চি সেটা অবিশ্বাস করি কি করে? কিন্তু তা বলে কি, তোমার মন্ত্রতন্ত্র, জলপড়া, ধূলোপড়া, ভূতপ্রেত মাথামুণ্ডু সব মানতে হবে নাকি? আর ও সবের মধ্যে কি বিজ্ঞানই বা থাকতে পারে?

ভট্টাচার্য্য। ভায়া, যদি আগে হইতেই সাব্যস্ত করে ফেল যে, ওগুলো সব জুয়াচুরী, তা হলে আর কোন কথাই থাকে না; কিন্তু যদি দয়া করে কর্ণপাত করো, তা হলে না হয় তোমার এই সেকেলে বুড়ো দাদাম'শায় তোমার এই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-সঙ্কুল মাথার মধ্যে দুটা এদেশী বিজ্ঞানের কথা প্রবেশ করাবার চেষ্টা দেখ্‌তে পারে।

ব্যোমকেশ। বাহবা, দাদাম'শায়, তোমার ঝুলিতে যে আবার বিজ্ঞানও আছে, তা এতদিন জানা ছিল না! বলি, দাদাম'শায় একটা কথা বলি, রাগ করো না। তোমাদের সেকালের ঋষিরা আবার বিজ্ঞানের কি ধার ধারতেন? হাঁ, বরং এ কথা বল্‌লে মান্‌তে পারি যে, দার্শনিক কচকচিতে তাঁদের সমতুল্য এখনও দুর্লভ। বিজ্ঞানটা

তাঁদের জানা ছিল, একথাটা বল্লে একটা দারুণ অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের দৌড়টা 'পঞ্চভূতেই মালুম' পাওয়া গিয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। তোদের ভূতের প্রতি যেরূপ বিরাগ দেখ্‌চি, তাতে আমার ইচ্ছে হচ্চে, আগে তোকে সেই কথাটাই বোঝাই। কেমন ?

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায়, আজ বড়ই শ্রান্ত হয়েছি, তোমার ও প্রেততত্ত্ব বা ভূতের বোঝা মাথায় নেবার শক্তি আজ আর আমাতে নাই। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে, কাল বৈকালে তোমার "প্রেততত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে দেওয়া যাবে। আজ টান্‌টা কিছু অন্যদিকে রয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। বেশ কথা, তাই হবে। আজ এখন "মানভঞ্জন" পালা গাইতে যা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

"পুনরাগমন।"

(১)

হুগলী জেলায় দামোদর নদতীরের একটি গ্রামে আমার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। যাজন ক্রিয়ায় আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পিতার কতকগুলি ধনী কায়স্থ যজমান ছিল। তাহাদেরই পাঁচটা ক্রিয়াকলাপে পৌরোহিত্য করিয়া, এবং তাহাদেরই দত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে, আমার পিতৃপিতামহগণ একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন।

আমার পিতারও বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া আসিতেছিল। সহসা তাঁহার উপার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটিল। আমাদিগের যজমানদিগের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহারা একে একে নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা চাকুরী উপলক্ষে, কেহ বা কলিকাতায়, কেহ বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পরিবার লইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের বড় বড় বাড়ী একরূপ জনশূন্য হইয়াই পড়িয়া রহিল। যাঁহারা মাঝে মাঝে পূজার ছুটিতে দেশে আসিতেন, তাঁহারা পানভোজনাদির উপকরণই সঙ্গে লইয়া আসিতেন; পূজার উপকরণ আনিবার অবকাশ পাইতেন না। ইংরাজী শিক্ষা তখন শনৈঃ শনৈঃ আমাদিগের সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে-ছিল। হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ দেখিতে দেখিতে একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। এ দিকে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের কল্যাণে আমাদের উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্র সকল জলাভূমিতে পরিণত হইল। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক উপায়ে দেশ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইত, রেলের বাঁধের জন্য তাহা আর হইতে পাইল না। আমার পিতা বৃহৎ পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গত্যন্তরাভাবে তিনিও যজমান দিগের দেখাদেখি অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

পিতা সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা আসিবার অল্পদিন পরেই, কলিকাতার পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার একটা চাকুরীও জুটিল। তিনি কোন এক গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলে পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন।

(২)

এখন এই পর্য্যন্ত; অতঃপর আমি আমাদের বাড়ীর সম্বন্ধে আর দুই- এক কথা বলিব। তারপর আমার আখ্যায়িকা আরম্ভ করিব

যে উদ্দেশ্যে আমি এই গল্পের অবতারণা করিতেছি, সে উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝাইতে হইলে, আমাদিগের হিন্দুর গৃহের পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার একটু তুলনা না করিলে চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অনুকরণে বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যেরূপ সামাজিক অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অন্য কোন দেশে যে এরূপ ঘটিয়াছে, এরূপ শুনা যায় না। অবশ্য তাহা ভাল কি মন্দ, পরিবর্ত্তনে আমরা লাভবান হইয়াছি কিনা, অথবা হিসাব নিকাশে আমরা কতক মূলধন হারাইয়াছি, কি না সেটা পাঠক পাঠিকার বিবেচ্য।

আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার। আমার প্রপিতামহ রামজীবন তর্কালঙ্কার প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। প্রপিতামহের দুই পুত্র, রামনিধি ও রমানাথ। আমার পিতা রাধানাথ রামনিধির একমাত্র পুত্র। রমানাথ পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, আমার পিতা অপেক্ষাও বয়সে ছোট। প্রপিতামহের মৃত্যুর পর, পিতামহ এই ছোট ভাইটিকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, আমার পিতামহীর কাছে পুত্রের অপেক্ষাও তাঁহার আদর অধিক ছিল। প্রপিতামহী মৃত্যুকালে পুত্রবধূর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যান। সেইজন্য বাড়ীর ভিতরে তাঁহার অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র ছিল। পড়ায় অমনোযোগী হইলে, আমার পিতা পিতামহের কাছে অনেকবার তিরস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু খুল্লপিতামহকে একটি দিনের জন্যও রূঢ়-বাক্য শুনিতে হয় নাই। ফলে পড়াশুনাটা তাঁহার ভাল হয় নাই।

পিতা বয়সে বড় হইলেও, খুল্লপিতামহের বিবাহ আগে হইয়াছিল। পিতামহ মনে করিয়াছিলেন, রমানাথের বিবাহ আগে দিলে, তাঁহার পুত্র রাধানাথের পুত্র অপেক্ষা বয়সে বড় হইবে। রাধানাথ রমানাথের অপেক্ষা বড়, লোকের কাছে এ পরিচয় দিতে তিনি লজ্জা বোধ করি-

তেন। আবার রাধানাথের পুত্র তার খুল্লতাত অপেক্ষা বড় না হয়, এই জন্য খুল্লপিতামহের বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তিনি পিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ, আমার জন্মের এক বৎসর পরে, আমার মায়ের আদরের অংশভাগী করিবার জন্য, খুল্লপিতামহী খুড়া গোপালকৃষ্ণকে আমার মায়ের কোলে নিক্ষেপ করিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। তখনও পিতামহ পিতামহী বর্ত্তমান ছিলেন। শুনিয়াছি, খুল্লপিতামহীর বিয়োগে বাড়ীর সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহী প্রকাশ্যে কোনও শোক প্রকাশ না করিয়া এই সদ্যোজাত শিশুটিকে আমার জননীর কোলে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আমার দেবর রমানাথকে যেমন বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তুমি যদি তদপেক্ষা অধিক স্নেহে তোমার এই দেবরটীকে মানুষ করিতে পার, তবেই বুঝিব, তুমি সদ্ব্রাহ্মণের কন্যা।"

মা আমার গুরুর আজ্ঞা ভক্তিসহকারে পালন করিয়াছিলেন। খুড়া গোপাল আমার মায়ের সমস্ত আদর বুঝি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। প্রথমেই সে মায়ের স্তন্যপানের অধিকার আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার ভুক্তাবশিষ্ট যদি কিছু থাকিত, মায়ের দয়া হইলে, কোন কোন দিন তাহা পাইতাম এইমাত্র। পিঠাপিঠি হইলে দুই ভায়ে যেমন বড় বনিবনাও থাকে না, আমাদেরও মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল। আমি গোপালের অপেক্ষা অধিক বলশালী ছিলাম, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, মাতা আমাকেই তিরস্কার করিতেন। আমার আর ভ্রাতা হয় নাই, গোপাল ও আমি দুইটিকে পাইয়াই মা আমার বহুপুত্রবতী হইয়াছিলেন।

(৩)

খুল্লপিতামহ আর বিবাহ করিলেন না। তিনি সংসারের সমস্ত

চিন্তা আমার পিতার স্কন্ধে দিয়া গৃহদেবতা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পিতামহ ও পিতামহীর কাল হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বেই তাহা একরূপ বলিয়াছি। একদিকে যেমন আয় কমিল, অন্যদিকে তেমনি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেল। দেশে থাকিলে আর সংসার চলে না। অনন্যোপায় হইয়া পিতা কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় বৎসর খানেক চাকুরী করিয়া, পিতা আমাদিগকেও কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। আমি তখন নয় বৎসরের, গোপাল আট বৎসরের। গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইলেই আমি ও গোপাল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব, স্থির হইল। চক্ষুলজ্জাতেই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, পিতা প্রথমে মাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন না। আমাদিগকে বিশেষতঃ গোপালকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর বোধে, মাতা প্রথমে আপত্তি করেন। কিন্তু সে আপত্তি শুনিতে হইলে, আমাদিগকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়। শুধু সংস্কৃত পড়িলে এখন আর কাহারও পেট চলিবে না। ইংরাজী এখন অর্থকরী বিদ্যা। তাহার কতকটা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, দারিদ্র্য ঘুচিবে না। দেশে ইংরাজী শিক্ষার উপায় নাই। আর পিতা না থাকিলে, আমাদিগকে সংস্কৃতই বা পড়াইবে কে? অনেক যুক্তি তর্ক দেখাইয়া পিতা মাতাকে সম্মত করাইলেন। খুল্লপিতামহ সংসারের কোন কথাতেই থাকিতেন না। তাঁহার মত গ্রহণ করা না করা উভয়ই তুল্য বোধে, পিতা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কলিকাতা যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার উল্লাস বাড়ীতে লাগিল। সহরের নামেই আমার মনে এমনি একটা চিত্তাকর্ষক ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা

দিন দিন আমাকে উত্তরোত্তর অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া, স্কুলে আমার স্থান হইবে, ইহাও আমার পক্ষে একটা প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সকলের অপেক্ষা আমার আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে, গোপালকৃষ্ণ মায়ের কাছছাড়া হইয়া একটু জব্দ হইবে।

আমি যেমন কলিকাতা যাত্রার দিন নিকটে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছিলাম, গোপাল তেমনি বিমর্ষ হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন দ্বীপান্তরে যাইতেছে। যাত্রার পূর্ব্বদিবসে গোপাল কান্না জুড়িয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী পিতাকে বলিলেন—"এবারে শুধু গোপীনাথকে লইয়া যাও, গোপাল থাক্।" পিতা বলিলেন— "গোপীনাথ আর গোপালের বয়সের কত প্রভেদ? তবে গোপীনাথ যদি আমার কাছে থাকিতে পারে, গোপাল থাকিতে পারিবে না?"

মাতা বলিলেন—"সকলেরই কি স্বভাব এক হইতে হইবে? ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? গোপীনাথ কলিকাতা যাইবার নামে আহ্লাদ করিতেছে, আর ও কাঁদিতেছে।"

পিতা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন— "নিজের সন্তানের উপর মমতাহীন হইয়া পরের সন্তানে এত মমতা দেখাইও না।"

কথা শুনিবামাত্র মায়ের চক্ষে জল আসিল। তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। অথবা পিতার কথায় মর্ম্মে আঘাত পাইয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"গোপীনাথ বিদ্বান্ হইবে, আর তোমার অন্যায় স্নেহের জন্য গোপাল মূর্খ হইবে। তাহাহইলে লোকসমাজে যে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না!"

আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। গোপাল মায়ের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমার খুল্লপিতামহ আমাদিগের কলিকাতা যাওয়ার সম্বন্ধে এতদিন কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। সে দিন পিতামাতার কথোপকথন বোধ হয় অন্তরাল হইতে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন। তিনি একটা ফুলের সাজী হাতে পিতার সমীপে আসিয়া বলিলেন,—"রাধানাথ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপালকে অন্যত্র লইয়া গেলে কি তার উপকার হইবে?"

পিতা এবারে বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ হইলেন। গোপাল বিদ্বান্ হইলে লাভ কার? সংসারানভিজ্ঞ পিতামহ পিতার এ নিঃস্বার্থতার মর্ম্ম বুঝিলেন না। পিতা বলিলেন—"তুমি যেমন মূর্খ হইয়া [illegible], পুত্রকেও সেই রূপ মূর্খ রাখিতে চাও?" বেশ, তোমার পুত্র [illegible]র কাছেই রাখ। খুল্লপিতামহ একথায় কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না! ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তাহা হইলে গোপালের মাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"

পিতাও সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিয়া বলিলেন—"কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। গোপাল যখন কিছুতেই তার মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে উহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

এ মীমাংসায় আমার মনে কিন্তু সুখ হইল না। পরন্তু পিতামহের কথায় আমার মনে ক্রোধ হইল। আমার মা আমার মা না হইয়া ছোট দাদা মহাশয়ের চক্ষে গোপালের মা হইল! দাদা মহাশয় না হয় বলিলেন, কিন্তু পিতা তাঁহার এ মিথ্যা কথায় কিরূপে সায় দিলেন। খুল্লপিতামহকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। কেননা, পিতার কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কার খাইতাম, কিন্তু দাদার মুখে একটি দিনের

জন্মও রূঢ়বাক্য শুনি নাই। শুধু সেইদিনের কথা ... ক্রোধ জন্মিল। সেই দিনেই তাঁহার ফুলের সাজি ... তাঁহার তিলক—সকলেরই উপর আমার ঘৃণা জন্মিল ... পরদিন গোপালকে, আমাকে ও মাকে লইয়া পিতা কলিকাতায় শুভযাত্রা করিলেন। একমাত্র ছোট ঠাকুরদা দামোদরের সেবা করিতে ঘরে রহিলেন।

প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীরা যাত্রাকালে দেখা করিতে আসিল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। ছোটঠাকুরদাও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখেও তেমন স্ফূর্ত্তির চিহ্ন দেখিলাম না।

হায়! তখন কি বুঝিয়াছিলাম, আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে বৈতরণীর ব্যবধান পড়িতেছে?

(৪)

কলিকাতায় আসিবার তিন চারি বৎসরের ভিতরেই আমাদিগের অপূর্ব্ব অবস্থান্তর ঘটিল। দেখিতে দেখিতে পিতার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতার কোনও ধনী কায়স্থ জমীদারের গৃহে তিনি সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ধনীদের গৃহে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বারোয়ারী পূজায় তিনি বড় বড় বিদায় পাইতে লাগিলেন। সবার উপর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বের অন্নাভাব-ভীত দেশান্তরিত ব্রাহ্মণ এখন অনেক আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়স্থল হইলেন। আমাদের গ্রামের অনেকগুলি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলি-কাতায় আসিয়া আমাদের চোরবাগানের বাসা বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। পিতা তাহাদিগের আহার দিতেন, ও সময়ে সময়ে পুস্তকাদি কিনিবার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। আমার মা তাহাদের

[illegible]তি স্নেহের [illegible] দেখিতেন এবং পাছে তাহাদের সেবার ক্রটি হয়, এই জন্য নিজে [illegible] তাহাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। আমরাও তাহাদিগকে ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতাম। আমরা ধীরে ধীরে তাহাদের অপেক্ষা সামাজিক অবস্থায় যে উন্নত হইতেছি, তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। উচ্চপদস্থ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণেতর জাতি কলিকাতার সমাজে যে আসনে বসিবার যোগ্য, অবস্থাহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকারের কৌলীন্য-গর্ব্বভূষিত হইলেও সে আসন হইতে কত দূরে বসিবার যোগ্য, সেটা তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ মীমাংসিত হয় নাই। কাজেই দরিদ্র দেশবাসীগুলিকে আমাদেরই সমান মর্য্যাদাপন্ন বোধে, নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সঙ্গে মেশামিশি করিতাম। কিন্তু এ অবস্থা বড় বেশি দিন রহিল না। পিতার প্রসার সহরে দেখিতে দেখিতে এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, সহরের নানাস্থান হইতে যে কোন ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সামাজিক নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। পিতা একা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া, আমরা প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেকের জন্য এক একটি ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে গোপাল ও আমার এক ভৃত্যেই চলিত। ক্রমে উভয়ের এক সময়ে সেবার অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া, মাতাঠাকুরাণী উভয়ের সেবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন গোপালের উপর ঈর্ষ্যাটা আমি যে কলিকাতাতেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, এটা বোধ হয় পাঠককে বুঝাইতে হইবেনা।

গোপাল ও আমি ভৃত্য সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। কোন কোন সময়ে আমার আত্মীয়দের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতাম। এইরূপ দুই চারিবার যাইতে যাইতে তাহাদের সঙ্গে আমাদিগের পার্থক্য অনুভব করিতে লাগিলাম।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আমরা যে ভাবে সমাদৃত হইতাম, তাঁহারা সেরূপ হইত না। প্রথম প্রথম চক্ষু-লজ্জায় আমরা সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই সমাজ আমাদের এই চেষ্টার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে, তাহাদের সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

কুলভাঙ্গা নদীর তীরে বসিয়া অধিকদিন তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা চলে না—অল্প দিনের মধ্যেই স্রোতে গা ভাসাইতে হয়। পিতারও তাহাই হইল। তাঁহাকেও এই নব সামাজিক-ভাব-স্রোতে গা ভাসাইতে হইল!

এক মাতা ঠাকুরাণী ছাড়া অল্প বিস্তর সকলেরই কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেশে আহ্নিকাদি কার্য্যে পিতার তিন ঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইত। পূজাশেষ করিয়া আহার করিতে প্রতিদিনই দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া যাইত। এখানেত সেরূপ করিলে চলিবে না! সাড়ে দশটার ভিতরে আহার শেষ করিতেই হইবে। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম পিতা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন ও সেই সময়েই স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া পূজায় বসিতেন। মাতাঠাকুরাণীও প্রত্যূষে উঠিয়া, তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। ক্রমে পুস্তকাদি রচনার পরিশ্রমে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। পিতা আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারিতেন না। নয়টার মধ্যেই তাঁহাকে সকল কাজ সারিতে হইত। তাহার উপর, আজ গলায় সর্দ্দি, কাল বুকে ব্যথা, পরশু পেটের অসুখ, এইরূপ নানা ব্যাধি পিতার দেহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ডাক্তার প্রথম প্রথম তাঁহাকে প্রভাতে উঠিতে নিষেধ করিলেন, তারপর প্রাতঃকালে একটু উষ্ণ চা পান করিবার আদেশ দিলেন। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীর রক্ষা না করিলে কোন ধর্ম্ম কার্য্যই হইতে পারে না। কাজেই আপাততঃ

আহ্নিকের সময় কমিয়া পনেরো মিনিটে পরিণত হইল। সংস্কৃত শিক্ষক, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ বড় লোকের বাড়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন, কাজেই কোশাকুশীর সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। শরীরের অসুখের কথা, সুতরাং মাতাঠাকুরাণী পূজাদির জন্য পিতাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। গোপাল ও আমার উপনয়ন দেশেই হইয়াছিল। খুল্লপিতামহ আমাদিগকে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্তই শিখাইয়াছিলেন। আমাদিগকেও অল্পে অল্পে তাহা ত্যাগ করিতে হইল। প্রাতঃকালে মাষ্টার আমাদের পড়াইতেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর, স্নানাহারেরই সময় থাকিত না, তা আহ্নিক করিব কখন্? আমাদিগের মঙ্গলের জন্য মাতাঠাকুরাণীই কেবল পূজা লইয়া রহিলেন। গোপাল আহারে বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠাকুর ঘরে যাইয়া একবার চোখ বুজিয়া আসিত।

পিতা অল্পে অল্পে পরিচ্ছদেরও একটা মনোমত পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। প্রথমে তাঁহার মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডিত ছিল। কি একটা অসুখের উপলক্ষে তিনি একবার মাথাটা মুড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সেই যে সমশীর্ষ কেশ রাশিতে তাঁহার মস্তক মণ্ডিত হইল, পুরোভাগে মুণ্ডিত করিয়া আর তিনি তাহাকে শ্রীহীন করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বের আপৃষ্ঠলম্বী শিখা ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। পরিধানে শাদাধুতি, গায়ে রামপিরাণ, তাহার উপরে মোটা চাদর। তিনি কেবল তালতলার চটির পরিবর্ত্তন করেন নাই। তবে শীতাধিক্য হইলে, কিংবা শরীর অসুস্থ হইলে সময়ে সময়ে পায়ে মোজা পরিতেন।

আমাদেরও বেশভূষার সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তন হইল। এক ক্ষুদ্র

পল্লীর পূজারি ব্রাহ্মণের পুত্র, আমরা পূর্ব্বাবস্থা গোপনের জন্য দেহকে যতপ্রকারে আবরিত করিবার, তাহা করিয়াছিলাম। মূর্খ দেশবাসী সময়ে সময়ে আমাদের বাসায় আসিয়া যখন আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের সেই অশ্রাব্য গ্রাম্য উপাধিতে সম্বোধন করিত—অর্থাৎ গোপীবাবু অথবা গোপালবাবু না বলিয়া ভট্চাজ বলিত, তখন আমাদের আন্তরিক ক্রোধের সীমা থাকিত না। তাহাদের অসভ্য-জনোচিত সম্বোধনের অত্যাচার হইতে নিস্তার দিবার জন্য পিতা ইস্কুলে আমাদের নামের শেষে চ্যাটার্জী উপাধি যোগ করিয়া দেওয়াইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমালয়ের পত্রাবলী।

১ম পত্র।

আমার বোধ হইল, যেন মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতে ধীরে ধীরে আসিতেছে। পূর্ব্বে রোগের ভীষণ যন্ত্রণায়, এবং জ্বরের তীব্র কম্পনে আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। সে সময়ের কথা কিছুই আমার মনে নাই। তাহার পর মহানিদ্রা হইতে আমি যেন অল্প অল্প জাগরিত হইতে লাগিলাম। জাগরণ! সে কি জাগরণ! আমি কি দেখিলাম! আমার সমস্ত জীবনীশক্তি যেন আমার দেহকে ছাড়িয়াছে। আমার হাত, আমার পা, তাহারা আর যেন আমার নয়; আমার শত চেষ্টাতেও তাহারা আর নড়িল না। জিহ্বা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর আমার শুষ্কমুখ-গহ্বরে কুলাইতেছে না, তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আমার ভাষা,—আমার নিজের ভাষা, আমার কর্ণে এক নূতন স্বরে ধ্বনিত হইল। যাহারা আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল—হায় তারা ভাবিয়াছিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—"এইবার যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইল।" সত্যই কি তাহাই! হায়! আমি যে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা মানব কল্পনায়ও আনিতে পারে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমি মরিতেছি। মৃত্যু ধীরে ধীরে আমায় আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম। পূর্ব্বে মরণের চিন্তা আসিলেই আমি ভয়ে জড়সড় হইতাম, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে, মরণ যে কি ভয়ানক, তাহা অনুভব করিতে পারি নাই! ভয় এবং সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা, বাসনার লীলাভূমি জগৎ ত্যাগ করিতে হইতেছে, এই যন্ত্রণা, উভয়ে শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আমাকে কাতর করিয়া ফেলিল।

ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা ও দেবতায় বিশ্বাস, তাহা এখন কোথায়? এক সময়ে আমি পুরাণাদি পাঠ করিয়াছি, ভগবানকেও ডাকিয়াছি. কিন্তু, তাহা অনেক পূর্ব্বের কথা। বৃথা আমি সেই পূর্ব্বভাব মনে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। (ক) আমি এখন নিরাশা-তিমিরে আবৃত। একটিও আশার ক্ষীণরশ্মি যদি হায় সে সময়ে আসিত? নিমজ্জমান

(ক) যেমন তৈল-মিশ্রিত জল যতক্ষণ সঞ্চালিত হয়, ততক্ষণ উভয়ে মিশিয়াই থাকে, কিন্তু স্থির হইলেই তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে; সেইরূপ আমাদিগের জীবনে যে ভাবটি প্রবল, জীবিত অবস্থায় তাহা কতকটা চাপা থাকিলেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে সেই ভাবটি মানবমাত্রেই জাগিয়া উঠে। এই ভাবটি আমাদিগের পরজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। ভগবান গীতায় ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" গীতা, ৮—৬।

(যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়)। সং—

লোক প্রাণের দায়ে তৃণখণ্ডও আশ্রয় করিতে যায়—কিন্তু আমার তাহাও মিলিল না। সব শূন্য! এই শূন্যতা বোধই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

আবার এদিকে অতীত জীবনের যে সমস্ত কাহিনী—আমার একান্ত ইচ্ছা আমার স্মরণে না আসে,—তাহারা আমার সম্মুখে একে একে আসিতে লাগিল। সমস্ত জীবনে আমি সৎকর্ম্ম অতি অল্পই করিয়াছি। কেবল স্বার্থময় জীবন লইয়া বাসনা চরিতার্থতা করাই আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। এই চিন্তা জলন্ত তুষানলের মত আমায় জীবন্ত পোড়াইতে আরম্ভ করিল। সত্যই আমি জীবদ্দশায় মৃত্যুর পথেই চলিয়া আসিয়াছি; জীবনের পথ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি। প্রবৃত্তির পথে যাওয়ায় বিষময় ফলের আস্বাদ আরম্ভ হইয়াছে। একটি পাপকার্য্যের পর আর একটি পাপকার্য্যের স্মৃতি আসিতে লাগিল। আমি তাড়াইতে যাই, আরও পরিষ্কার ভাবে আসিতে লাগিল। এখন আর অনুতাপের সময় নাই। অনুতাপ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাও আমার সে সময়ে মনে আসিল না। (খ)

এখনও আমার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই। যাহা থাকিলে মানব জীবনকে সুখময় করে, আমার তাহা সমস্তই ছিল। এই অল্প বয়সে, এই সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি ছাড়িয়া আমায় মরিতে হইবে! আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা অসম্ভব, আমি কিছুতেই মরিতে পারিব না। কিন্তু মৃত্যু একেবারে আমার সন্নিধানে! আমার দেহের ভিতর মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে! আমার ঘরের মধ্যস্থ ক্ষীণ দীপালোক—

(খ) মৃত্যুর প্রাক্কালে মুমূর্ষু ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী "বায়স্কোপের" চিত্রের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে মানসচক্ষের সমক্ষে পর্য্যায়ক্রমে ভাসিয়া যায়।　　সং—

আত্মীয়দিগের বিমর্ষ বদন, সবই 'আমার মৃত্যু আসিতেছে' এই সত্য জ্ঞাপন করিতেছে। কি ভয়ানক কাল! প্রত্যেক নয়ন উৎকণ্ঠার সহিত আমার বদনের উপর ন্যস্ত; প্রত্যেক কর্ণ আমায় শেষ নিশ্বাস-ধ্বনি শুনিতে যেন: প্রস্তুত। আমার মনে হইল, সকলে বুঝি আমায় জীবন্ত পোড়াইতে যাইতেছে। আমি যেন দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম।

মরণকালের আমার ভীষণযন্ত্রণা আর অধিক আমি বর্ণনা করিব না। তাহা বলা বৃথা। কোনও জীবিত লোক আমার সে সময়ের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না। সে যে কি কষ্ট, ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। ইহা অনেককেই ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু হায় কেহই তাহা জীবদ্দশায় ভাবে না। আমার শেষ মুহূর্ত্ত আসিল। একবার আমার চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধদিকে ঢলিয়া পড়িল; একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, একবার কণ্ঠে ঘড় ঘড় ধ্বনি, একবার সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, তাহার পর সব ফুরাইয়া গেল।

ক্রমশঃ

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

অলৌকিক রহস্য।

২য় সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

ভৌতিক-কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২) ভ্রাতা ও ভগিনী।

ঘটনাটি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থ সেণ্ট জোসেফ নামক নগরে ঘটিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারী তারিখে বোষ্টন নগর হইতে এক সাহেব পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান সমিতিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"মহাশয়,

আপনাদের সমিতির একান্ত অনুরোধে আমার জীবনের এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিতেছি। দুএকটি বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া এ ঘটনা ইতি পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; কারণ ইহা এরূপ অস্বাভাবিক যে সাধারণে শুনিলে বিশ্বাস তো করিবেই না, অধিকন্তু আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবিয়া হয়ত উপহাস করিবে। এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, যৎকালে ঘটনাটি ঘটে, তখন আমার শরীর ও মন যেরূপ সুস্থ ছিল, বোধ হয় আমার সমগ্র জীবনে আর কখনও সেরূপ থাকে নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমার ভগিনী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মারা পড়ে। তখন তাহার বয়স আঠার বৎসর মাত্র ছিল। আমি তাহাকে বড় ভাল বাসিতাম, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইলাম। এই ঘটনার দুএক বৎসর পরে আমি ব্যবসায় বাণিজ্যার্থ নানা দেশে ঘুরিতে লাগিলাম। আমি Order supply বা আদেশ মত জিনিষ সরবরাহ কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জোসেফ নগরে যখন আমি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখনই বক্তব্য ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

একদিন মধ্যাহ্নে অনেকগুলি অর্ডার পাইয়া মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইল। ভাবিতে লাগিলাম, আজ আমার অনেক টাকা লাভ হইবে এবং পিতা মাতা এই সংবাদ পাইয়া কতই আনন্দিত ও সুখী হইবেন। সে যাহা হউক, তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া, আমি অর্ডারগুলি সরবরাহ করিবার জন্য পত্র লিখিতে বসিলাম। তখন এই অর্ডারগুলির চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই আমার মনে স্থান পায় নাই। এক হস্তে চুরুট ধরিয়া টানিতেছিলাম এবং অপর হস্তে ব্যস্তভাবে লিখিতেছিলাম। এই অবস্থায় আমার বোধ হইল, কে যেন টেবিলের উপর একটি বাহু রাখিয়া আমার বাম দিকে বসিয়া আছে। চাহিয়া দেখি আমার বড় আদরের মৃত ভগিনী! অবাক্ হইয়া আমি এক সেকেণ্ড তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। হারাধন পাইলে লোকের যেরূপ একটা অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, আমার ঠিক সেইরূপ হইল। আমি আহ্লাদে একবারে লাফাইয়া উঠিলাম এবং তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। কিন্তু হায়, যেমন আমি ঐরূপ করিলাম, তৎক্ষণাৎ মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন আমার চৈতন্য হইল।

আমি চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম "একি! এটা প্রকৃত,

না স্বপ্ন? আমি জাগরিত কি নিদ্রিত?" বস্তুতঃই আমার মনে এই সংশয় হইতে লাগিল। কিন্তু দুই সেকেণ্ড পূর্ব্বে যে চুরুট টানিতেছিলাম, তাহার অগ্নি এখনও নিবে নাই, যে চিঠিখানি লিখিতেছিলাম তাহার কালি এখনও কাঁচা আছে—ইহা দেখিতে পাইলাম। তখন সন্দেহ দূর হইল, নিশ্চিত বুঝিলাম আমার ভগিনীর প্রেতাত্মাই আসিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে নয় বৎসর মরিয়াছে, অথচ চেহারার তো একতিলও পরিবর্ত্তন হয় নাই! হাত, পা, মুখ, চোক, দৃষ্টি, চুল এমন কি পোষাক পরিচ্ছদটি পর্য্যন্ত ঠিক পূর্ব্বের মত! কেবল একটি মাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তাহার নাসিকার দক্ষিণ ভাগে একটা কাটা বা ছড়ার দাগ দেখিতে পাইলাম। ইহা পূর্ব্বে দেখি নাই। কোথা হইতে আসিল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে যাহা হউক, এই ঘটনার পরেই বাটী যাইবার জন্ত আমার চিত্ত এরূপ অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, পরের ট্রেনেই আমি বাটীতে চলিয়া আসিলাম। আসিয়াই পিতা মাতার নিকট ঘটনাটির যথাযথ বিবরণ দিলাম। পিতা চিরকালই এ সকল বিষয়ে অবিশ্বাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। মাতার কতকটা বিশ্বাস হইল। অতঃপর নাসিকার দাগটির কথা উল্লেখ করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দক্ষিণ নাসিকাতে কাটা দাগ কোথা হইতে আসিল?" পিতা তো কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহা শুনিবামাত্র মাতার যে ভাবান্তর দেখিলাম, তাহা আমি জন্মেও ভুলিব না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার সুস্থতা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, ব্যাপারটা কি?" তিনি বলিলেন "আমিই এই দাগের কারণ। আহা

বাছার কচি মুখে এখনও দাগ্‌টি রহিয়াছে? ঐ দাগের বিষয় আর কেহই জানে না, আমিই কেবল জানি। মৃত্যুর পর যখন বাছাকে কবর স্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন উহার গলে ফুলের মালা দিতে গিয়া আমিই হঠাৎ উহার নাসিকাতে আঘাত করিয়া ফেলি। তার পর তাড়াতাড়ি পাউডার দিয়া দাগ্‌টি এরূপে ঢাকিয়া দিয়াছিলাম, যে আর কেহই দেখিতে পায় নাই।" এই বলিয়া মাতা বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দশ বার দিন পরেই মাতা হঠাৎ পীড়িতা হইলেন এবং দু এক দিনের মধ্যে এই ইহধাম ত্যাগ করিলেন। কন্যার সহিত শীঘ্র স্বর্গে মিলিত হইবেন ইহা ভাবিয়া তিনি মৃত্যুর সময় বড়ই শান্তি পাইয়াছিলেন। ইতি—

বর্ণিত বৃত্তান্তে কয়েকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথমতঃ ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিলক্ষণ ভালবাসা ছিল। প্রায়ই শুনা যায় যে, যাহার প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা থাকে, প্রেতাত্মা স্বভাবতঃ তাহার দিকেই আকৃষ্ট হয়। সন্তানের মঙ্গল সাধনার্থ প্রেত মাতা আবির্ভূতা হইয়াছেন এরূপ ঘটনা বিস্তর শুনা যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রেতাত্মা পৃথিবীতে আসেন না। স্থূলদেহ ধারণ করিতে তাঁহাকে বহু ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং অনর্থক যে তিনি এরূপ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। এখন প্রশ্ন এই যে ভগিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল? পনর দিনের মধ্যেই মাতার মৃত্যু হইল ইহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মাতার এই আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভ্রাতা যদি আনন্দে ঐরূপ অভিভূত না হইয়া একটু স্থির ধীর ভাবে থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ইঙ্গিতে বা বাক্য দ্বারা উহা জ্ঞাপন করিতেন। সে যাহা হউক, কথা কহিবার সুবিধা না পাইলেও তিনি মাতার সহিত ভ্রাতার শেষ সাক্ষাৎ ঘটাইবার জন্য

ভ্রাতার মনের উপর এরূপ শক্তি বিস্তার করিলেন যে, তিনি সহস্র কাজ ফেলিয়া তদ্দণ্ডেই গৃহে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

প্রেতাত্মা আসন্ন বিপদের সংবাদ দিতে আসেন, এরূপ ঘটনা দেখা যায় বটে, কিন্তু খুব অধিক নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরলোকগত আত্মীয়গণ আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন অথবা সাহস দিতেছেন এরূপ ঘটনা খুব প্রচুর। বোধ হয়, পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদের কোন মুমূর্ষু আত্মীয় কোন মৃত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন বা তাহার প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। অবশ্য ডাক্তারেরা এগুলিকে রোগীর delirium বা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন স্থলে এগুলি প্রলাপ হইলেও, সর্ব্বস্থলেই যে প্রলাপ, তাহা বোধ হয় না। মনে করুন, রামের এক আত্মীয় বহুকাল মরিয়াছেন, কিন্তু রাম তাহা জানেন না। এখন রামের মৃত্যুর সময় রাম যদি উক্ত আত্মীয়ের নাম ধরিয়া বলেন "এসেছ, ভাই, এস। আমিও যাচ্চি। একটু বস। ইত্যাদি, তাহা হইলে এটা কি কেবল প্রলাপ বলিয়াই বোধ হয়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

———

"পুনরাগমন।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

দেখিতে দেখিতে আমাদের কলিকাতাবাসের সাতবৎসর অতীত হইয়া গেল। কলিকাতায় আনিয়াই পিতা আমাদের উভয়কেই হিন্দু-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা কাহারও ছিল না বলিয়া আমরা উভয়েই সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। এখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি।

এই বৎসরই আমাদের পিতা ও পুত্রের সর্ব্বপ্রধান দুর্ভাগ্যের বৎসর। কেননা, আমাদের মনুষ্যত্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই বৎসরেই তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

কলিকাতায় আসিবার পর, প্রথম তিন বৎসর, পূজার ছুটি উপলক্ষে আমরা একবার করিয়া দেশে যাইতাম। এই তিন বৎসরে পিতা জন্মভূমির মায়া ও খুল্লপিতামহের বন্ধুত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তখন খুড়া ও ভাইপোর পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে উভয়েরই আনন্দ উছলিয়া উঠিত। চণ্ডীমণ্ডপে মুখামুখি বসিয়া দুই-জনের কত কথাই হইত। আমাদের যাইবার পূর্ব্বে ছোট্‌ঠাকুরদা ঘর দোর পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। এবং সহর হইতে পাড়াগাঁয়ে গিয়া পাছে আমাদের কষ্ট হয়, এইজন্য নিজে আমাদের পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিতেন। সত্যকথা বলিতে কি, যে কয়দিন দেশে থাকিতাম, সেই কয়দিনের মধ্যেই আমরা সকলেই কিছু না কিছু মোটা হইয়া আসিতাম।

মায়ের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি এই কয়দিন নিজে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দামোদরের ভোগের ব্যবস্থা করিতেন এবং কাছে বসাইয়া, সেই প্রসাদান্নে ছোট্‌ঠাকুরদাকে তৃপ্ত করিয়া নিজেও তৃপ্ত হইতেন। পিতা মাকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু মা ছোট্‌ঠাকুরদার সম্মুখে—হস্তে শঙ্খ—পূর্ব্বের সেই দরিদ্রার বেশেই উপস্থিত হইতেন। একদিন পিতা কথাপ্রসঙ্গে খুল্লপিতামহকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া, তিনি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! শুনিলাম রাধানাথ তোমাকে অলঙ্কার দিয়াছেন। তবে তুমি দানার বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত হও কেন?"

মা উত্তর করিলেন—"সেখানে বিদেশে, অলঙ্কার না পরিলে, স্বামীর মর্য্যাদা থাকে না বলিয়া উঁহার মনস্তুষ্টির জন্য পরি। এখানে আমার শ্বাশুড়ী, খুড়শ্বাশুড়ী হাতে শুধু শাঁখা পরিয়া আয়তিরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এখানে কোন সাহসে গহনা পরিব?"

"সেকি মা লক্ষ্মী! তোমার গুরুজন তোমাকে প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহারা পুণ্যলোকে বসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তোমাকে অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে তাঁহারা সন্তুষ্টই হইবেন, আমিও সুখী হইব।"

খুল্লপিতামহের অনুরোধে মা অলঙ্কার পরিয়াছিলেন।

চতুর্থ বৎসরে দেশে ম্যালেরিয়া হইল। সুতরাং তিন বৎসর আমাদের আর দেশে যাওয়া হইল না। সপ্তম বৎসরে মায়ের একান্ত অনুরোধে শুধু দিন তিনেকের জন্য আমরা দেশে গিয়াছিলাম। শরীর অসুস্থ বলিয়া পিতা যাইতে পারিলেন না। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার অসুখ বৃদ্ধির সংবাদ পৌঁছিল। মা তিন দিনের বেশি থাকিতে পাইলেন না।

এই তিন দিনেই ছোট্ ঠাকুরদা আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে গিয়া, পবিত্র জাহ্নবীজলে আমরা হিঁদুয়ানী বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। আমরা শৌচান্তে বস্ত্র পরিত্যাগ করি না, জুতা পায়েই জল খাই—এইরূপ ম্লেচ্ছোচিত ব্যবহার দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। আমি ত গায়ত্রী পর্য্যন্ত পেটে পুরিয়াছিলাম। গোপাল আহারের পূর্ব্বে অন্ন ব্যঞ্জনের সম্মুখে আঙ্গুলে মলিন পৈতাগাছটা জড়াইয়া চক্ষুমুদিয়া মৎস্যাদির মধুর আঘ্রাণ হৃদ্‌গত করিয়া লইত।

আমাদের অবস্থা দেখিয়া ছোট্ ঠাকুরদা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। মাকে বলিলেন,—"মা! তোমার স্বামীরও কি এই রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে?"

মাতাঠাকুরাণী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি সমস্তই বুঝিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"মা, ভবানী! তোর বিজয়ার বিসর্জ্জনের পর আবার আগমনী আসে; মা, এ ধর্ম্মের বিজয়ার পর কি আর আগমনী হইবে না?"

মা বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলেই হইবে।"

পিতা অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ বলিয়া, মাতা খুড়শ্বশুরকে পদোচিত সম্ভ্রম দেখাইতে লজ্জাবোধ করিতেন। আজ তিনি সর্ব্বপ্রথম তাহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইলেন। মায়ের মাথায় হাত দিয়া ছোট্ ঠাকুরদা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন—"তুমি সতী, যখন সংসারের হৃদয়মধ্যে তুমি অবস্থান করিতেছ, তখন দিন ফিরিবে বই কি।"

আমি তখন আহারে বসিয়াছিলাম। একবার মনে করিলাম বলি, —ঈশ্বর নিরাকার। তোমার ও একটা পাথরের ডেলা পূজিয়া কি হইবে? কিন্তু তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিতে সাহস হইল

না। পাগলটা কি বলিতেছে বলিয়া, চক্ষুমুদিয়া অন্ন উদরস্থ করিতে লাগিলাম।

পরদিন গ্রামত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলাম।

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া, দেখিলাম, পিতার গা হাত পা মাথা সমস্তই ঢাকা। শুধু মুখখানি বাহির হইয়া আছে। সেই অবস্থাতে তিনি দরদালানে পাদচারণ করিতেছেন। পিতার রোগটা যে কি, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তারে বলিয়াছে, বাবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। বড়ই দুরূহ ব্যাধি। প্রথম হইতে তাহার প্রতিকার না করিলে, তাহা হইতে কি ভীষণ অনর্থ যে উপস্থিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাতাঠাকুরাণী চিন্তিতা হইলেন। ছোট্ ঠাকুরদা বলিয়া দিয়াছিলেন, পৌঁছিবামাত্র পিতার অসুখের সংবাদ দিতে।

আমি সংবাদ দিলাম। পত্রে পিতার শারীরিক অবস্থা, রোগের লক্ষণ, ডাক্তারের অভিমত—সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া, লোক পাঠাইলাম। গুটিতিনেক বড়ি ও একখানি পত্র লইয়া ভৃত্য বেচু পরদিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। পিতা তখন, ডাক্তারের উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের সমবেদনার ব্যূহমধ্যে বসিয়াছিলেন। সুতরাং বেচু মায়ের কাছে পত্রখানা লইয়া আসিল। মা আমাকে দিয়া পত্র পড়াইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, শুধু আদার রস অনুপান দিয়া একটা বড়ি সেবনেই রোগের উপশম হইবে। একটাতে যদি সম্পূর্ণ উপকার না হয়, দুইটা সেবন করিলে অসুখ থাকিবে না।

ডাক্তার ও লোকজন চলিয়া গেলে, আমি পিতাকে ছোট্ ঠাকুরদার পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলাম। ইত্যবসরে মা, পত্রের ব্যবস্থামত

একটি পাথর বাটীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার পদপ্রান্তে রক্ষা করিলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি?"

মা বলিলেন—"খুড়শ্বশুর এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

পিতা পদাঘাতে ঔষধের বাটী দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেরূপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিবর্ণ হইয়া যায়, মায়েরও সেই অবস্থা হইল। বিস্মিতনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কি করিলে?"

পিতা বলিলেন—"ঠিক করিয়াছি। অসুখ দেখিয়া বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসকগণেরও ভয় হইয়াছে, আর তিনি না দেখিয়াই সেখান হইতে রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন! একবার দেখিয়া যাইবার অবকাশ হইল না!

মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও পিতার আচরণে প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেলাম, তারপর মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলাম, কার্য্য অন্যায় হয় নাই। যাঁহার অন্নে পিতাপুত্রের জীবন নির্ব্বাহ চলিতেছে, অকৃতজ্ঞ ছোটঠাকুরদা তাঁহার উৎকট ব্যাধির কথা শুনিয়া একবার দেখিতেও আসিতে পারিল না।

গোপাল পিতার শয্যার একপার্শ্বে বসিয়াছিল, এই ব্যাপার দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। যতক্ষণ বসিয়াছিল, সে আর কাহারও পানে চাহিতে পারিল না।

মা আর কোনও কথা কহিলেন না। নীরবে যতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরবাটীর ভগ্নাংশগুলাকে কুড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। গোপালও ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া হেঁটমুণ্ডে সে স্থান ত্যাগ করিল। আমি বলিলাম—"গোপালের বড়ই অভিমান হইয়াছে"।

পিতা রুক্ষতার সহিতই বলিলেন—"তবেত আমার বড়ই ক্ষতি হইল।

আমি। এখনি মায়ের কাছে গিয়া কাঁদিবে।

পিতা। উপায় নাই। ও অত্যাচার আমাদের সহিতেই হইবে। তোমার পিতামহীই এই কণ্টকের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন।

আমি। খুড়োর ছেলেকে আপনি ছেলের চেয়ে অধিক আদরে প্রতিপালন করিতেছেন, একথা এখানে যে শুনে, সেই একেবারে অবাক হইয়া যায়।

পিতা। তবে আর নেমক হারাম কাকে বলে? সেদিন সহরে এক ধনীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। লোকটি ব্যবসায়ে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইয়াছে। তাহার পুত্রেরা চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া রাস্তায় বাহির হয়। সেদিন দেখিলাম, তাহাদের এক খুড়তুতো ভাই এক ছিলাম তামাকের জন্য খানসামার মুখ নাড়া খাইতেছে। সহরে পরনির্ভরতার কথা শুনিলে লোকে নাসিকা সঙ্কুচিত করে।

খুল্লপিতামহ-প্রেরিত ঔষধের কল্যাণে আজ সর্ব্ব প্রথম পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

(৭)

গোপালের উপর আমার ঈর্ষা করিবার আর এক কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা হিন্দুস্কুলের একক্লাসেই ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পড়াশুনায় আমাদের শ্রেণীতে আমার সমকক্ষ বালক ছিল না। আমি প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। গোপাল অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত। আমার মেধার পরিচয় পাইয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

বাড়ীতে উভয়কেই একজন প্রাইভেট মাষ্টারে পড়াইতেন। আমাকে কোন কথা বুঝাইবামাত্র আমি অনায়াসে বুঝিয়া লইতাম। কিন্তু গোপালকে বুঝাইতে তাঁহার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। কোন কোন দিন তাহার ভাগ্যে প্রহার ঘটিত। মার খাইলেই আমি মায়ের কাছে গিয়া সেই শুভসংবাদ প্রদান করিতাম। মা আবার পিতার কাছে অনুযোগ করিতেন—গোপালকে প্রহার করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন—"মার খাইলে কি বুদ্ধি বাড়িবে ?"

মায়ের অনুযোগে অস্থির হইয়া পিতা এক একদিন মাষ্টারকে বলিতেন,—"ওর বাপের যা বিদ্যা, ওর বিদ্যা তার চেয়ে আর কত বেশী হইবে ? ও আপনি যা পারে করুক। উহাকে আর পীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।" সুতরাং পারুক আর নাই পারুক, মাষ্টার তার পড়াশুনায় অনেকটা শিথিল-যত্ন হইলেন। তার ফলে স্কুলে শিক্ষকের কাছে তাহাকে প্রায় প্রতিদিনই বকুনি খাইতে হইত। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার সময় তাহাকে অনেক কাঁদাকাটী করিতে হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর পরীক্ষার ফলে আমি প্রথম পারিতোষিক লইয়া আসিতাম, এবং সোল্লাসে মাকে দেখাইতাম। গোপাল ম্লানমুখে আমার পার্শ্বে চোরটির মত দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি চলিয়া গেলে মার কাছে কাঁদিত। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কাছে কাঁদিলে কি হইবে ! আমিত আর বুদ্ধি দিতে পারিব না ; ঘরেত বুদ্ধিদাতা দামোদর আছেন। তোর বাপত তাঁর নিত্য সেবা করিতেছেন। তাঁহার কাছে কাঁদ্। তাঁর দয়া হইলে তোর বুদ্ধি হইতে কতক্ষণ ?"

চতুর্থশ্রেণীতে উঠিয়া গোপাল এককোণে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মাষ্টারও নিশ্চিন্ত হইলেন, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। বিশেষতঃ বইএর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এক মাষ্টারে আর দুজনের পড়া

হইয়া উঠে না। পিতা মায়ের ভয়ে স্বতন্ত্র মাষ্টারের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। মা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই। গোপাল এবারে আপনি পড়িয়া কি করে দেখ।" পিতা দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

কোন উত্তর পাইবেন না জানিয়া, ক্লাসের মাষ্টার গোপালকে কোনও প্রশ্ন করিতেন না। গোপাল চুপটি করিয়া বেঞ্চের একটি পাশে বসিয়া থাকিত। তবে বুদ্ধিতে গোপাল যাহাই হউক, মাষ্টার মহাশয়েরা তাহার নম্রতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে চতুর্থ শিক্ষক আমাদের ক্লাসে বলিয়াছিলেন, গোপালের বুদ্ধি যদি তাহার নম্রতার অনুরূপ হইত, তাহা হইলে সমস্ত স্কুলের মধ্যে কোন ছেলেই তার সমকক্ষ হইত না।

যথাসময়ে চতুর্থশ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইল। পরীক্ষার ফল—কি বলিব? একটা বিস্ময়ের বন্যা ছুটিয়া গেল! শিক্ষক, ছাত্র, আমার পিতা, প্রাইভেট টিউটর, যিনিই এই পরীক্ষার ফল শুনিলেন, তিনিই অবাক হইলেন। গোপাল এবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে!

আমার মর্ম্মবেদনার আর সীমা রহিল না। প্রথমে মনে করিলাম, গোপাল হয়ত কাহারও চুরি করিয়া লিখিয়াছে; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাহার পর ভাবিলাম, হয়ত সে কোনও উপায়ে প্রশ্নপত্র হস্তগত করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের উপর দোষ দিতে হয়।

পিতার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝা গেল, আমার পরাভবে তাঁহারও মনোবেদনা কম হয় নাই। তিনি নিজে স্কুলে যাইয়া গোপনে এবিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন; এবং শিক্ষায় অমনোযোগিতার দোষারোপ করিয়া প্রাইভেট টিউটারটিকে বিদায় দিয়া নূতন মাষ্টার বাহাল করিলেন।

পরীক্ষার সংবাদে মা কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। উল্লাস, কিংবা বিষাদ কিছুই দেখাইলেন না। তিনি যেন নীরবে আমার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিলেন।

এবারে দ্বিগুণ পরিশ্রমে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলাম। গোপাল পূর্ব্বমত একটি কোণ জুড়িয়া নীরবে পড়িতে লাগিল। আমি পড়িতাম ও তাহারদিকে লক্ষ্য রাখিতাম। আমি গোপনে তাহার কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। গোপাল যতক্ষণ পড়ে, তত অল্প সময়ের মধ্যে কাহারও পড়া তইরি হওয়া সুকঠিন। তবে কি গোপাল সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রে উঠিয়া পড়ে। আমি মাঝে মাঝে অনিদ্রার অছিলায়, রাত্রে উঠিয়া তদারক করিতাম। কিন্তু গোপাল একদিনের জন্যও ধরা পড়িল না।

স্কুলেও গোপাল একটি কোণ আশ্রয় করিয়া বসিত। এবং কোনও কথা কহিত না। মাষ্টার ক্লাসে আমাদের সকলকেই প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু গোপালকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন না।

তৃতীয়শ্রেণীর পরীক্ষায় গোপাল আবার প্রথম স্থান অধিকার করিল। শুধু তাই নয়, তাহার সহিত আমার নম্বরের এতই তফাৎ হইল যে, গোপালের তুলনায় আমি একরূপ নগণ্যই হইয়া গেলাম। আর তার বুদ্ধির অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাদের প্রধান শিক্ষক একদিন পিতার সমক্ষে তাহার ধীশক্তির অজস্র প্রশংসা করিলেন। আমার আতঙ্ক হইল।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি। কিন্তু আমার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে। পাঠে অনাস্থা আরম্ভ হইয়াছে।

মা যে গোপালের উন্নতিতে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে পিতার মনোভাব কি, তাহা এ পর্য্যন্ত ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। দেশের যে কয়জন বালক আমাদের বাড়ীতে

থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর যে কাহারও আমার দুঃখে সহানুভূতি নাই, তাহা আমি আগে হইতেই জানিতাম। কারণ, আমি তাহাদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করিতে চাহিতাম না। 'তাহারা পরভাগ্যোপজীবী' এই জ্ঞানে বিজ্ঞের চালে দূর হইতে তাহাদিগকে দয়া দেখাইতাম, এইমাত্র। শুধু স্বকার্য্য সাধনের জন্য নিরুপায়ে তাহারা অবজ্ঞা সহ্য করিত। কেবল সরকারদের বাড়ীর শ্যাম আমার প্রিয়পাত্র ছিল। সে নিজের অবস্থা বিশেষ বুঝিয়াছিল। এইজন্য আমার সমান হইতে চাহিত না। শ্যাম আমার মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিত, ও সকল সময়েই আনুগত্য দেখাইত। ক্রমে ক্রমে সে আমার প্রিয় সহচর হইয়া উঠিল। আমার মনের কথা একমাত্র তাহারই কাছে প্রকাশ করিতাম। গোপাল তাহাদের সঙ্গে মেশামেশি করিত বলিয়া শ্যাম বলিত—"গোপাল না মিশিবে কেন? মায়ের অনুগ্রহ যতদিন আছে, ততদিনই গোপাল বড়। সে অনুগ্রহ গেলেই গোপালও যে, উহারাও সে।"

শ্যাম যখন তখন এইরূপ ঠিক কথা কহিত। এইজন্যই আমি শ্যামকে ভাল বাসিতাম। "মায়ের অনুগ্রহ যতদিন থাকিবে!" হায়! এ অনুগ্রহ কতদিন থাকিবে। মা জীবিত থাকিতে কি এ অনুগ্রহ যাইবে? আমি তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হইয়াও তৎকর্ত্তৃক সপত্নী পুত্রের ন্যায় আচরিত হইতেছি! এখন পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলেও চিত্তে কতকটা শান্তি আসে।

এক প্রাইভেট টিউটরের পরিবর্ত্তন ছাড়া এ যাবৎ পিতার বাহ্য অসন্তোষের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। ইদানীং পিতাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম। কিন্তু তাহাতে অসন্তোষের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই নাই।

সহসা বিধাতা সেই দিন আমার চক্ষে সেই শুভচিত্র উন্মুক্ত করিয়া-দিলেন। পিতামাতার গৃহে এতদিন বান্ধব-হীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। এতকাল পরে প্রাণে একটু শান্তি পাইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখন এক প্রকার নূতন সম্বিত্তি আসিয়াছে। সর্ব্বদেহে মৃত্যু আচ্ছন্ন করিয়াছে। দেহ এখন প্রস্তর-মূর্ত্তির মত জড়তাময় ও কঠিন; কিন্তু আমি যেন মুক্ত। পূর্ব্বের চৈতন্য ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে ছিল; কিন্তু এখন যেন আমি এক মূর্চ্ছান্তে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। আমি এখন কোথায়? কুজ্ঝটিকা ও রজনীর মধ্যবর্ত্তী আমি যেন জীবনহীন মহাশূন্যে ঝুলিতেছি। কিন্তু, সেই স্থানকে ঠিক অন্ধকারময় বলিতে পারা যায় না; যদিও তথায় একটিও আলোকরশ্মি নাই, আমি সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। আমি তথায় শীতে অস্থির হইয়া পড়িলাম। সেটা যেন অন্তরের শৈত্য। আমার হৃদয় গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, দন্তে দন্তে লাগিয়া কড়মড় করিতে লাগিল। সেই স্থান আবার দুর্গন্ধময় বাষ্পে পরিপূর্ণ; আমার শুক্কারোদ্গমের উপক্রম হইল। দুর্গন্ধে ও শৈত্যে অস্থির হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম "আমি, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? আমি কি নরকে যাইতেছি।" যাহা পুরাণাদিতে

পড়িয়াছি, আমার সেই কথা মনে আসিল। কিন্তু, তাহা হইলে অগ্নিকুণ্ড কোথায়, অগ্নিকুণ্ডের নিকট যাইলে আমিও শীতের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম। হায়! সে সময়ে জানিতাম না "অগ্নিকুণ্ড কি!" তখন কে জানিত যে, ভীষণ আগ্নেয় কুণ্ড লক্ লক্ জিহ্বা দ্বারা আমাকে শীঘ্রই ঘেরিয়া ফেলিবে।

আমার মনে হইতেছিল আমি আবরণ-লেশ-শূন্য নগ্ন। কিন্তু তাহাতে আমার লজ্জা আসিতেছিল না। যে আমি পূর্ব্বে জগতে লীলা করিয়া আসিয়াছি, এখনও আমার সেই আমিত্ব-বোধ রহিয়া গিয়াছে। যদিও আমার এখন বাস্তবিক হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদি কিছুই নাই; যদিও আমার পূর্ব্বের স্থূল দেহ নাই, কেবল তাহার ছায়া মাত্র আছে, তথাপি আমার মনে হইতেছিল—পূর্ব্বের চক্ষু দিয়াই আমি দেখিতেছি, পূর্ব্বের নাসিকায় ঘ্রাণবোধ করিতেছি; আমার পূর্ব্বের মত দেহ কাঁপিতেছে, দন্তপাটি শীতে কড়্মড়্ করিতেছে।

কিন্তু, পূর্ব্বের সাহস আর আমার নাই। আমি জানি, জীবিত তোমরা, নিজ কাপুরুষতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হও; কিন্তু, আমি সে সময়ে এতদূর নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে, "আমি কাপুরুষ" এ কথা বলিতেও আমার কোন লজ্জা বোধ হইতেছিল না। হতভাগা আমি, যখন এইরূপ তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, তখন আমার আত্মীয়েরা মহা ধূমধামের সহিত আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল। যাযকেরা ও পুরোহিত, মনোমত অর্থ পাইয়া "ধন্য ধন্য" বলিতেছিল এবং আমার যে সদ্গতি হইয়াছে তাহা লোক-সমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছিল।

আমি, কিন্তু, দ্রুতগতিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিতেছিলাম। অবশেষে আমার চরণ যেন একটা কঠিন ভূমি স্পর্শ করিল। ইহা কি মৃত্তিকা?

না ঠিক মৃত্তিকা নয় ; ইহা স্পঞ্জের মত নরম, কিন্তু, দুর্গন্ধ-পরিপূর্ণ। ইহার উপরে কুয়াসা ও কাক-জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া আমি যেন মনোগতিতে উড়িয়া যাইতে লাগিলাম। এইরূপে কত সহস্র ক্রোশ যে অতিক্রম করিলাম, তাহা আমার জ্ঞান নাই। অবশেষে আমার বোধ হইল যে অতিদূরে একটী ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে। আমি যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে সেই ক্ষীণালোকের দিকে ধাবিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে সেই ঘন কুয়াসার নিবিড়তা কমিয়া আসিতে লাগিল ; আমি দূরে নানারূপ অস্পষ্ট আকৃতি দেখিতে লাগিলাম ;—ছোট বড় সৌধমালার, প্রাসাদের, দুর্গের ইত্যাদি কত রূপ কত চিত্র আমার নয়নসমীপে ভাসিয়া উঠিল। যথার্থই সেখানে প্রাসাদাদি বিদ্যমান ছিল, কিংবা সে গুলি আমার কল্পনাপ্রসূত, তাহা আমি বলিতে পারিনা, তবে আমি জানি যে, অতি দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে আমি একবার পূর্ব্বোক্ত একটী ছায়া-দুর্গ-ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। কিছু দূর যাইয়া মনুষ্যাকারধারী, ছায়া-শরীর সকল আমার নয়নগোচর হইল,—প্রথমে দুই একটা, তাহার পর দলে দলে আমার চারিধারে ঘুরিতেছে, দেখিলাম। এক দল আসিয়া আমায় বেষ্টন করিল। তাহারাও আমার মত নরকযাত্রী। আমি ভয়ে, তাহাদিগের নিকট হইতে পলাইলাম ; আবার আর এক দল আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ফেলিল। এইরূপে আমিও যত পলাই, নূতন দল আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমারও ছায়া-মূর্ত্তি, অতএব তাহারা আমাকে কিছুতেই বাধা দিতে সক্ষম হইল না। তাহা-দিগের বিকট অমানুষিক ক্রন্দনধ্বনি আমাকে ভয়ে ও যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

সুখের বিষয়, আমার মত নব-যাত্রী আরও আসিতেছিল, এবং

আমায় ত্যাগ করিয়া তাহারা দলে দলে তাহাদিগের নিকট ছুটিল। আমিও তাহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য একস্থানে অপেক্ষা করিলাম। প্রকৃতিস্থ! আমার আবার বুদ্ধি প্রত্যানয়নের চেষ্টা! নিরাশার অগাধ সলিলে নিমগ্ন, আমি দুঃখে ও হতাশে অবসন্ন হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। দৈহিক সুখ ও বাসনার তৃপ্তির জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীতে যে বিষ-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগের কাল উপস্থিত। নরকের পথ অতি যত্নে আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছি, ইহা আমার যথার্জ্জিত পুরস্কার। এই চিন্তা মনে আমার একটু তৃপ্তি দিয়াছিল। নরকেও দেখি এক প্রকার তৃপ্তি আছে।

আমার নিজের উপর এই সময়ে একটা আত্যন্তিক ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। ইহাতে যেন কেহ না মনে করেন, আমার নিজের প্রতি যে তীব্র আসক্তি ছিল তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে;—ইহা পূর্ব্বের মত অটুট আছে। এত আত্মপ্রীতি সত্ত্বেও, আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, আমি নিজেকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া দিই। অতিশয় স্বার্থপর লোক যেরূপ আত্মানুরাগের জন্যই আত্মহত্যা করিতে যায়, আমারও সে সময়ের ভাব অনেকটা সেইরূপ ছিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি নিজ সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছি। আমার এই ঘৃণিত অবস্থার নিমিত্ত আমা-কেই অভিসম্পাত দিতেছিলাম; কিন্তু প্রকৃত অনুতপ্ত হইতে পারি নাই। অনেক চেষ্টায়ও অনুতাপ আসিতেছিল না। অনুতপ্তেরও যে সুখ আসে তাহা আমার কোথায়! কেবল যে আত্মগ্লানি করিতেছিলাম, তাহা নহে; আমার নিজের অবস্থার উপর একটু সহানুভূতিও হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি যদ্যপি একটু কাঁদিতে পারি,—কাঁদিতে পারিলে হয়ত আমার দুঃখের কিছু লাঘব হইত। দুই ফোঁটা নয়ন-

বারি হায় আমার তাহা ও নাই। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলায় সে সুখ আমি কি তাহাতে বঞ্চিত! এই চিন্তা মনে আসিতেই আমার যেন অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল।

আমি হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলাম, আমার পার্শ্বেই এক মানব-কণ্ঠের অমানুষী স্বর, এক যুবতী এবং তাহার বক্ষে এক দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড।

সে স্নেহার্দ্রভাবে বলিতেছে "সেটা বৃথা চেষ্টা! আমি অনেক বার চেষ্টা করিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি। এখানে জল কোথাও নাই, এমন কি নয়ন-বারির উপযোগী এক ফোঁটাও নাই।" তাহার ভাষা অপেক্ষা তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহার স্নেহের ভাব প্রকাশ করিতেছিল। সে যাহা হউক, আমি ত জলের অভাব অন্তরের মধ্যে বোধ করিতেছিলাম, চক্ষে এক বিন্দুও জল আনিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া মনে মনে দুঃখ করিতেছিলাম—তবে এই যুবতী তাহা জানিলা কি করিয়া, আমি কথায় তাহা ত ভাষায় প্রকাশ করি নাই! এখানে কি মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়!

যে প্রকারেই জানিতে পারুক, রমণী সত্য কথা বলিয়াছে। জীর্ণদশায় এমন অনেকদিন গিয়াছে যখন আমি দুঃখে কাঁদিতে পারিতাম, পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ইচ্ছা করিয়া তখন আমি করি নাই। কিন্তু, এখন আমি আগ্রহসহকারে নয়নাশ্রুর কামনা করিতেছি, কিন্তু তাহা শত চেষ্টাতেও আসিতেছে না।

যুবতী আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। সে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বাল-বিধবা (এই পরিচয় আমি পরে পাইয়াছিলাম)। যে শোকপূর্ণ স্নেহের সহিত তাহার অঙ্কস্থ শিশুর দিকে সে সৌৎসুক্যে তাকাইয়া ছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া সে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল। তাহার নয়ন আমার দিকে, কিন্তু তাহার মন সেই শিশুর উপর ন্যস্ত।

সে বলিল "তোমার কি মনে হয়, শিশুটি কি জীবিত নাই? বল, সে মরে নাই, বল সে ঘুমাইতেছে, যদিও সে নড়িতেছে না, যদিও তাহাকে কাঁদাইতে পারিতেছি না।"

সত্য কথা বলিতে গেলে, সেই অপোগণ্ডকে দেখিয়া অবধি, তাহার মৃত্যু-সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; কিন্তু যুবতীকে কষ্ট দিতে আমার প্রাণ সরিল না। আমি বলিলাম না, শিশু জীবিত আছে। অনেক সময়ে শিশুরা ঐরূপ স্থির ভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যায়।" আমার নিজের স্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম কথা।

সেই শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে যুবতী উত্তর করিল, "আ তাহাই বল,—শিশু ঘুমাইতেছে! সকলে কি না বলে, আমি আমার নিজ ভ্রূণকে হত্যা করিয়াছি, আমার আপন সন্তান! সকলে মূর্খ, তাহাই এই কথা বলে: জননী, তাহার নিজ সন্তানকে হত্যা করিবে! তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকে নিজ হস্তে নাশ করিবে! একথা কি জননী কখনও চিন্তা করিতেও পারে?"

এই কথা বলিতে বলিতে সে তনয়ের বদন চুম্বন করিতে লাগিল, উন্মাদের মত তাহাকে নিজ অঙ্কে সস্নেহে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল যে, সে মহা চেষ্টায়ও তাহার তনয় যে জীবিত আছে এই বিশ্বাস হৃদয় পোষণ করিতে পারিতেছে না; তাহাই বার বার তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাই আগ্রহে তাহাকে একবার কাঁদাইতে চেষ্টা করিতেছে।

আমি তাহার তীব্র যন্ত্রণা দেখিয়া সে স্থান হইতে দ্রুত পলায়ন

করিলাম। তাহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়া আমার নিজের দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব হইল! কিন্তু তাহা অতি ক্ষণিক। আমার নিজের ভারাক্রান্ত যন্ত্রণায় আমি ছুটিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

একটি আধুনিক ঘটনা।

এবৎসর বসন্তরোগের কি ভয়ানক প্রকোপ, সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু এই রোগে আক্রান্ত হন। ভগবৎ-কৃপায় তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আমার সমীপে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহাই সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম। যে সময়ে তিনি উক্ত রোগাক্রান্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না; এমন কি তাহার স্থূল দেহ নিস্পন্দভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তিনি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া কলিকাতায় কোন প্রসিদ্ধ নাট্য-শালায় গিয়া তাঁহার বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ সেইস্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার আগমনে কেহই তাঁহার অভ্যর্থনা বা সমাদর করিলেন না। তিনি সেই নাট্যশালার এক প্রসিদ্ধ নায়ক (actor); তিনি তজ্জন্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "তোমরা আমার এই নিদারুণ রোগাবস্থাতে আমার আসা সত্ত্বেও আমাকে কেহ দৃক্‌পাত করিলে না" (তাঁহার বন্ধুগণ প্রকৃতই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তিনি প্রত্যেককেই দেখিয়াছিলেন)।

এই বলিয়া তিনি অন্য এক বন্ধুর বাসায় গমন করিলেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সে বাসায় কখনও যান নাই।—তথায় গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বন্ধু নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, অগত্যা তিনি পুনরায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। নিজ গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার নিজ স্থূল দেহটি বসন্ত রোগে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া পতিত হইয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে তাঁহার জননী ও স্ত্রী উভয়েই অবসন্নভাবে অর্দ্ধ নিদ্রা অবস্থায় শায়িতা। রাত্রি অধিক। কয়েক দিবস সারা দিন রাত্রি তাঁহারা দুশ্চিন্তাতে, অনশনে ও অনিদ্রায় জড়ীভূতা ছিলেন। তিনি নিজ দেহ দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন। তখন কোন এক শক্তি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সেই দেহ-মধ্যে লইয়া গেল, তিনি চকিতের ন্যায় সেই নিজ স্থূল দেহে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার দেহে ঈষৎ জ্ঞান সঞ্চার হইল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গুলি এত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার প্রাণটি যেন দেহ হইতে এক নিমেষের জন্য বহির্গত হইয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। সেই অতি অল্প সময় টুকুর মধ্যে যদি তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মাতা জাগরিত থাকিতেন, তাহা হইলে তদ্দর্শনে বাটীতে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড পড়িয়া যাইত এবং বোধ হয়, রোগীর পক্ষে ক্ষতিও হইতে পারিত; সৌভাগ্য বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

এই ঘটনাটি তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে, আপনি সে সময় কোন স্থানে কি অবস্থায় ছিলেন?" তিনি কেবল মাত্র "শূন্যে" এই উত্তর ভিন্ন আর বিশেষ কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না বা স্মরণ নাই বলিয়া জানাইলেন। সে যাহা হউক, প্রায় এক মাস পূর্ব্বে (তখন তিনি বেশ সুস্থ হইয়াছেন) তিনি পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটির নিকট গিয়া উক্ত ঘটনাটির গল্প করিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার

বন্ধুটি বলিলেন, হাঁ! আমি এক রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় তোমাকে তোমার সেই অসুস্থাবস্থাতেই আমার গৃহে দেখিয়াছিলাম, এবং এই অবস্থাতে কিরূপে এখানে আসিলে, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, তৎপরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্ন বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু এই দুঃস্বপ্ন দর্শনাবধি পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে মনটা কয়েকদিন বড় ব্যাকুল ছিল। যাহা হউক, মার অনুগ্রহে তুমি রক্ষা পাইয়াছ। এই বলিয়া বন্ধু সেই অতীত রাত্রির তারিখটি স্মরণ করিতে যাইলেন কিন্তু স্মরণ হইল না। তাঁহার Diary ছিল না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যমদূত।

সূক্ষ্মশরীরী জীব থাকিতে পারে, ইহা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যাঁহারা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উহাদের অস্তিত্ব এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। এমন এক সময় ছিল, যখন সূক্ষ্মশরীরী জীব বা ভূত, প্রেত, আমিও বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু গত বিশবৎসর যাবৎ এ সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, উহাদের অস্তিত্ব তোমার আমার অস্তিত্বের মত প্রত্যক্ষ।

এইসম্বন্ধে দুই একটী বাস্তব ঘটনা যাহা আমার ও অন্যান্য কয়েকজন দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একবার ওলাউঠার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই বৎসর কলিকাতায় এমন বাটী প্রায় ছিল না, যে বাটীতে অন্ততঃপক্ষে একজনেরও এই পীড়া হয় নাই। আমার এক আত্মীয়ের বাটীতে ৪টী ব্যক্তি উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হন। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া উক্ত স্থানে অবস্থান ও রোগিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একদিন বৈকালে একটী রোগীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। কাজেই সেই ঘরে লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইল—আমাকেও রোগীর নিকট থাকিতে হইয়াছিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম—উক্ত বাটীর প্রথম তলে একটী বিকটাকার লোক, দ্বিতলস্থ রোগীর ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরে বারান্দায় আসিয়া আমিও তাহাই দেখিলাম, এই বাটীর দ্বারবান ও লোকজনদিগকে আমি বিলক্ষণ রূপে চিনিতাম। দেখিলাম এ ব্যক্তি—তাহাদের মধ্যে কেহই নহে।

ভিতর বাটীর প্রাঙ্গণে, যে স্থানে উক্ত মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, সে স্থানে যাইতে হইলে ভিতর বাটীর উপরতলায় আসিবার যে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া যাইতে হইবে কিংবা বহির্বাটী হইতেও একটি দ্বার দিয়া আসিতে পারা যায়; জানিলাম যে, উক্ত দ্বার ভিতর বাটীর দিক্ হইতে বন্ধ আছে। সুতরাং তদ্দ্বারা সে সময় বহির্বাটী হইতে আসিবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

আমরা তখনই ভিতর বাটীস্থিত সিঁড়ি দিয়া উক্ত প্রাঙ্গণে গিয়া মূর্ত্তিটি ধরিবার উদ্দেশে গমন করিলাম; কিন্তু নীচে পৌঁছিয়া আর সেই স্থানে সেই মূর্ত্তিটি খুঁজিয়া পাইলাম না। চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। বহির্বাটীতে যাইবার দ্বার ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ;

সুতরাং সে দ্বার দিয়া কাহারও আসিবার বা পলাইবার উপায় ছিল না।

যখন আমরা উক্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, ঠিক সেই সময় উপর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল—আমাদের পূর্ব্বোক্ত রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দৃশ্যটি কি আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে একই সময়ে এবং একই স্থানে এতগুলি ব্যক্তির ঠিক একই রকম দৃষ্টিবিভ্রম কি সম্ভবপর?

এ প্রকার আরও বহু ঘটনা দেখিয়াছি। ছয়মাস পূর্ব্বে কোন স্থানে একটি রুগ্ন ব্যক্তির গৃহে অবস্থানকালীন ঠিক উক্তরূপ একটী ঘটনা আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে রোগীর ঘরের একটী জানালার নিকট একটি মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু জানালার পার্শ্বে তৎক্ষণেই গিয়াও সে মূর্ত্তির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই অথবা কি প্রকারে কোথা দিয়া সে মূর্ত্তি চলিয়া গেল, তাহাও অবধারণা করিতে পারি নাই। কেবল আমি বলিয়া নহে, বাটীর যে সকল লোক রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহারাও অন্য এক রাত্রিতে রোগীর পার্শ্বে অপর একজন লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা আমি আরও কয়েক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু যে যে স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলেই বুঝিয়াছি যে, রোগীর আয়ু শেষ হইয়াছে। কারণ, দেখিয়াছি, কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীলঃ—

"ফকীর ব্রহ্মা কা রেখ-পর মেঁখ মারতাহৈ।"

—:গঃ—

অনেক দিনের কথা, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা।

একদা একজন কুম্ভকার ঘুঁটে কুড়াইয়া আনিতেছিল। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধ পথিককে দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন সে ঘুঁটের ঝাঁকাটী নাবাইয়া বৃদ্ধের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল এবং গল-লগ্ন-বাসে করযোড়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিল, "ঠাকুর! তুমি আমাদের য়িহুদীয় ধর্ম্মের নেতা, পয়গম্বর (ঈশ্বর প্রেরিত) হজরৎ মুসা। জগতের মঙ্গলের জন্য তূর পর্ব্বতে (আরবস্থ সিনাই পর্ব্বতে) তোমাকে প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। তুমি যাহা বল, ভগবান্ তাহাই শুনেন, তোমার অনুরোধ তিনি পালন করেন। কারণ, তিনি তোমাকে মনুষ্য-হিতার্থে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি আজ আমার প্রতি সদয় হও। আমি তোমার অনুগামী। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার অন্য কোন কষ্ট নাই,—খাইবার, পরিবার যথেষ্ট আছে; কেবল মাত্র একটী অভাব—একটী দুঃখ এই যে, আমি নির্ব্বংশ। নিঃসন্তানের যে কি দুঃখ, তাহা কে না জানে? আমি একটী হিজড়া (ক্লীব বা নপুংসক) সন্তান পাইলে ও যথেষ্ট সুখী হইতাম। তাই বলি দেব! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও,—কৃপা কর। আমি জানি, আমি যাহা চাই, তাহা তোমার দ্বারাই পূরণ হইতে পারে। তুমি তূর পর্ব্বতে যাইয়া, ভগবৎসন্নিধানে আমার আবেদন হাজির কর, যাহাতে আমি একটী পুত্র-সন্তান পাই। নাথ! ইহাই আমার একমাত্র ভিক্ষা।"

গরিবের সহজ ও স্বাভাবিক বিনয়পূর্ণবাক্যে মহাত্মা মুসার (Moses) কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি

কুম্ভকারের কর ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাহার প্রার্থনা সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্‌কে জানাইবেন, তৎপর অন্য কথা। তাহাতে ভগবানের যে আদেশ হইবে, তাহা তিনি পরদিবস কুলাল-ভবনে বর্ণন করিবেন। মুসার কথা শুনিয়া কুম্ভকার সন্তুষ্ট হইল; তাঁহাকে শত-বার ধন্যবাদ দিল এবং প্রণাম করিয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইল।

সময়ে মহাত্মা মুসা সেই সংবাদ লইয়া কুম্ভকার-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহা শুনিবার জন্য সকলেই কুমার পল্লীর দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে। হজরৎ মুসা তখন তাহাদিগকে তূরের সংবাদ বুঝাইয়া বলিতেছেন, “সৃষ্ট জগতে কর্ম্মই প্রধান। কর্ম্মমাত্রের হিসাব থাকে। এই কর্ম্মের বীজ সংকল্প। যখন যে কোন সংকল্প চিত্তাকাশে উদিত হয়, তখনই তাহা মহাকাশে অঙ্কিত ও মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই অঙ্কিত সংকল্পকে ব্রহ্মা কা রেখ অর্থাৎ ব্রহ্মার কর্ম্মরেখা অথবা গুপ্তচিত্র কিংবা অদৃষ্ট-লিপি কহে। সংকল্প দৃঢ় হইলেই কর্ম্ম কৃত হয় এবং সেই কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই জন্মের পর জন্ম ও সুখদুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। ইহাই বিধি। ভগবানই এই বিধানের বিধাতা। তিনি বলিয়াছেন যে, কুম্ভকারের অদৃষ্ট-লিপিতে তাহার কর্ম্ম ফলানুসারে পুত্র-লাভ লিখিত নাই। সেই জন্য তিনি তাহা দিতে পারেন না। ইহাই তূরের দৈববাণী।”

মহাত্মা মুসার কথা শুনিয়া লোকে বুঝিল যে, সুখ-দুঃখাদি ঈশ্বরাধীন নহে, তাহা সৃষ্ট মানবের নিজ নিজ কর্ম্মাধীন। কুকর্ম্ম করিয়া মনুষ্যের নিকট গোপন করা যাইতে পারে, রাজারও চক্ষুতে ধূলি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা চিত্রগুপ্তের নিকট কাহারও কোন বুদ্ধিকৌশলে সত্য ঘটনাকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে না। অতএব আপনার নিকট

আপনি খাঁটী থাকিয়া কর্ম্মের উপর নির্ভর করাই উচিত, সৎকর্ম্ম সম্পাদনই সকলের বিহিত। এইরূপ কথা কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে লোকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের কথিত কুম্ভকারও নিশ্চিন্ত হইল।

উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে কুম্ভকার-পল্লীতে সন্ধ্যাকালে একজন দিগম্বর যুবক হস্তে একটী হাঁড়ী লইয়া বলিতেছে "ভাইরে যা বল্ দাল হাম সব কুছ্ পায়া হৈ। সেরেফ দো চার গোঁইঠা হোনেসে হো জায়েগা। হম্‌কো যো কই যই গোঁইঠা দেগা, হম্ উস্‌কো তইঠো লড়্‌কা দেগা।" অর্থাৎ হে ভাই সকল! চাউল ও ডাইল আ ম কিছু পাইয়াছি। কেবল মাত্র দুই চারি খানি ঘুঁটে হইলেই আমার হইবে, আমাকে যে কেহ যে কয়খানি ঘুঁটে দিবে, আমি তাহাকে সেই কয়টী পুত্র দিব। ফকীরের এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত কুম্ভকার-পত্নী আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং স্বামী-সমীপে যাইয়া ফকীরের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কি এখন ঐ লোকটীকে দুই চারিখানি ঘুঁটে দিয়া পুত্র ভিক্ষা করিব?" ভার্য্যার অসঙ্গত কথা শুনিয়া কুম্ভকার কুপিত হইয়া উত্তর দিল "তুই মহা পাপিষ্ঠা। পয়গম্বরের বাক্যে ও দৈববাণীতে তোর বিশ্বাস নাই! তুই আমার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্তা নস্। ঐ যে একজন পাগল, যাহার অঙ্গে একমাত্র কৌপীনও নাই, যে একখানি ঘুঁটেও পায় না, সে আবার পুত্র-দান করিবে! হাঃ হাঃ! তোকে আর কি বলিব? তুই দূর হ'।"

কুম্ভকার-পত্নী বিনাবাক্যে অম্লানবদনে চলিয়া গেল এবং অন্যদিক্ দিয়া ফকীরকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া ঘুঁটে দিতে লাগিল। কুম্ভকার-বনিতা বলিল "এই একখানি ঘুঁটে দিলাম।" সাধু বলিলেন "তুমি এক পুত্রের অধিকারিণী হইলে।" কুম্ভকার-জায়া বলিল, "এই দ্বিতীয় ঘুঁটে গ্রহণ

করুন।" সাধু বলিলেন "তুমি পুত্র-দ্বয় পাইবে।" এইরূপে কুম্ভকারের স্ত্রী পাঁচখানি ঘুঁটে দিলে, ফকীর বলিলেন "মা! আর চাই না। তোমারও অনেক হইল, আর কেন?" কুম্ভকার-পত্নী ভাবিতেছে যে, পুত্র ত পাঁচটী পাইলাম। এইবার একটা কন্যা হইলেই হয়। কিন্তু এদিকে তখন ফকীরটী কোথা? তিনি তখন রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছেন।

কুম্ভকার-গৃহিণী সেই রাত্রিতেই গর্ভবতী হইল। বৎসরান্তে পাঁচটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। ইহা দেখিয়া সকলে অবাক্! যাহা মুসা করিতে পারেন নাই, যাহা বিধির বিধানে নাই, তাহা একজন পাগলা নিঃসম্বল ফকীর দ্বারা সাধিত হইল! কুম্ভকার ও কুম্ভকার-পত্নী এখন আর বাঁঝাবাঁঝি নহে, জনন-শক্তিহীন নহে! ঘোর রহস্য! বিষম কথা!

এই কথা ক্রমে মুসার কর্ণে পৌছিল। তিনি তখন তূর পর্ব্বতে যাইয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। তিনি কাঁদিতেছেন ও কহিতেছেন "ভগবন্! তুমিই আমাকে তোমার প্রেরিত নামে সম্মানিত করিয়াছ এবং তুমিই আজ আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া সংসারে অপমানিত করিলে। তাহাতেও কোন দুঃখ নাই। কিন্তু নাথ! ইহাতে যে তোমার কথা থাকে না, তোমার নামে ও ইল্‌হামে (প্রত্যাদেশে) অপবাদ ঘটিল! ইহা যে কি হইল, কেমন করিয়া হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না।"

অমনি তৎক্ষণাৎ আকাশ-বাণী হইল "তাহা বুঝা বড় কঠিন। সহজে বুঝিতে পারিবেও না। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাও, সমুদ্রের তীরে একটী তীর্থস্থান আছে। সেখানে একটী মহতী মেলা হয়। সেই মেলাতে যাহা কিছু অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে পাইবে, এখানে

আসিয়া তাহা আমাকে বলিবে। তাহা হইলেই তোমার সকল সংশয় দূর হইবে।" ভগবৎ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুসা তীর্থ-যাত্রা করিলেন।

গন্তব্যস্থানে যাইয়া মহাত্মা মুসা মেলার মধ্যে এক চৌমাথায় একটী আশ্চর্য্য লোমহর্ষণকর দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। একটী মনুষ্য, তাহার এক হস্তে তরাজু বাটখারা অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা এবং অপর হস্তে একখানি ছুরিকা। সে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতেছে "অয় বন্দে খোদাকে! অগর তুম্ লোগো মেঁ কোই অল্লাহ কা প্যারে হোয় তো হম্‌কো উস্ মালিককে নাম পর অপনে কলেজেকা গোস্ত এক সের ওজন করিকে দে দো। ইস্‌কা বদ্‌লা তোম খোদাসে পাওগে।" অর্থাৎ হে মানবগণ! যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ভগবানের প্রিয় পাত্র থাক, তাহা হইলে আমাকে সেই ভগবানের নামে নিজের বক্ষঃস্থলের মাংস একসের ওজন করিয়া দেও। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি ভগবান্‌কে পুরস্কার স্বরূপ পাইবে। কি ভয়ানক কথা! ভগবানের নামে বুকের মাংস একসের কে দিবে? কেহ দিতে চাহে না, দিতে পারিলও না। কেহ বলিতে লাগিল "ও লোকটী পাগল" কেহ বলিল "ও লোকটী দেওয়ানা।" হজরৎ মুসা ভাবিতেছেন যে, ইহা একটী অদ্ভুত কাণ্ড বটে। দেখা যাউক, ইহার শেষ কি হয়।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তথাপি পাগলের আবেদন কেহ শুনিল না, গ্রাহ্য করিল না। অতঃপর দিগম্বর একটী যুবক নিজ কক্ষে একটী মৃণ্ময়-পাত্র (হাঁড়ী) লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই পাগলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমার ছুরীখানি আমায় দেও। একসের মাংস কি চাহিতেছ, আমার সর্ব্বাঙ্গ সেই ভগবানের নামে অর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি যত মাংস চাহ, ওজন করিয়া লও। এই

কথা বলিতে বলিতে দিগম্বর ছুরীখানি নিজের বুকে বসাইল! দেখিতে দেখিতে মানুষটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

তখন মুসা তূর পর্ব্বতে পুনরাগমন করিয়া সমাধিস্থ হইলে, শুনিতে পাইলেন—ভগবান্ কহিতেছেন "মুসা! মেলাতে দেখিয়াছ—সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে যে মহাপুরুষ—যে একমাত্র মহাপুরুষ আমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই কুম্ভকারপত্নীকে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, আমি তাহাকে কি না দিতে পারি? জীবমাত্রেই কর্ম্মাধীন বটে, কিন্তু যিনি আমার প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছেন, নিজের আমিত্ব হারাইয়াছেন, তিনিও কি কর্ম্মাধীন? পদার্থমাত্রেই দাগ লাগে—আকাশেও কি দাগ লাগিবে? ব্যোমাকার নির্ম্মল নিরঞ্জনরূপ মহাত্মা কি কর্ম্মের অধীন? কণামাত্র অগ্নি যেমন তূলরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে, তদ্রূপ কণামাত্রও প্রেমাগ্নি জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে। যাঁহারা প্রেমিক-প্রধান, তাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত—ত্রিগুণাতীত। প্রকৃতি তাঁহাদের আজ্ঞাকরী দাসী। ত্রিভুবনে তাঁহাদের অসাধ্য কোন কিছুই নাই। সেই জন্যই প্রবাদ আছে:—"ফকীর ব্রহ্মা কা রেখ-পর মেঁখ মারতা হৈ।" অর্থাৎ ফকীর ব্রহ্মার লিপির উপর পেরেক মারেন—অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করেন।

রিন্দ শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র।

উপদেবতার আবেশ ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী কোন গ্রামে * বামদেব নামে এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স তখন প্রায় নব্বুই বৎসর। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাজকতা কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র তখন বিদ্যমান। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের তিনটী পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং বামদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌত্র-বধূর মুখ-দর্শন করিয়াছিলেন। পৌত্র শ্যামাচরণ কবিরাজী শিক্ষা উপলক্ষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের ছাত্র হয়েন। পৌত্র-বধূর বয়স তখন প্রায় ১৬ বৎসর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময় তখন খুব ভাল। সংসার তখন জাজ্বল্যমান। এই আখ্যায়িকা, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র-বধূ সম্বন্ধীয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক পুত্র গুরুচরণ ডাক্তার আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "ভাই! আমাদের বাটীতে আজ দুই দিবস হইতে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইতেছি। মনে করিয়াছিলাম, যে কাহাকেও প্রকাশ করিব না। কিন্তু প্রত্যহই এইরূপ ঘটনা হইতেছে। সুতরাং তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি আমার একজন পরম বন্ধু, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, অতএব তুমি একবার আমাদের বাটীতে চল। আমাদের বৌমার এক

* যাঁহার সম্বন্ধে এই ঘটনাটী সত্য ঘটিয়াছিল, তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমরা গ্রামের এবং ব্যক্তিগণের নাম গুপ্ত রাখিলাম।   অঃ রঃ সঃ

অত্যাশ্চর্য্য ভাব হইয়াছে। আমরা তাহার কিছুই কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা।"

আমি এই কথা শুনিবামাত্র দ্রুতপদে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলাম। দেখিলাম তাঁহার পুত্রবধূ এক অত্যাশ্চর্য্য ভাবে একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক আসনে বামদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য পুষ্প-পাত্র প্রভৃতি পূজার উপকরণ সকল আশে পাশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার পৌত্রবধূ ঠাকুরাণী বলিতেছেন, "দেখুন আপনারা যে ভাবে পূজা করেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্টা নহি। আমি কেবল গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র দ্বারা শুদ্ধ ভাবে পূজা গ্রহণ করিতে ভালবাসি।"

আমি এই ভাব দেখিয়া শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনার পুত্রবধূর একি ভাব? আর আপনারা কেনইবা ইহার পূজা করিতেছেন?" তিনি কহিলেন, "আমার পুত্রবধূ বৈকালে স্নানের পর যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন আমি দেখিলাম যে, একটী বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আলো তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি কালী। তোমার পুত্রবধূর শরীরে প্রবেশ করিয়াছি। তোমরা অতি শীঘ্র ধূপ, ধুনা, ফুল, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য লইয়া আইস এবং আমার পূজা কর। আমার পূজা করিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে।" আমি সেই কথা শুনিয়া আমার পিতাঠাকুর মহাশয়কে সমুদয় জ্ঞাত করাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ফুল প্রভৃতির উদ্যোগ করিবার আদেশ দিয়া, আমার পুত্রবধূকে এক আলপোনা দেওয়া পিঁড়ির উপর বসাইলেন এবং নিজে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন আমি

বলিলাম "আমার বিশ্বাস হয়না, যে উহাতে ৺কালীমাতার আবির্ভাব হইয়াছে। তবে আমি বিশ্বাস করিতে পারি, যদি উনি আমার এ সময়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।" আমি এই কথা বলিতে না বলিতে উক্ত বালিকা তখনি বলিয়া উঠিলেন "আমি তোমার মনের ভাব সকলি অবগত আছি। তুমি সম্প্রতি একটী বাগান খরিদ করিয়াছ, তাহা তুমি ভোগ করিতে পারিবে কি না এই প্রশ্ন এক্ষণে তোমার মনে উদয় হইয়াছে। আমি বলিতেছি, বাগান তুমি নিরাপদে ভোগ করিবে।" আমি এই কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে স্থির করিলাম, বাস্তবিকই ইহাতে কোন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। নতুবা এই ষোড়শ বর্ষীয়া কুলবধূ কিরূপে আমার মনের ভাব জানিতে পারিলেন।

"আমার পার্শ্বে আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তিনিও তাঁহার মনের ভাব জিজ্ঞাসা করায় বধূ যাহা উত্তর দিলেন, তাহাও মিলিল। সেই ভদ্রলোকও দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। যাহা হউক সে দিন রাত্রিতে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে বধূমাতা বলিলেন "আমার শক্তি এক্ষণে চলিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়াই, নিজে বধূর ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঐ পিঁড়ি হইতে উঠিয়া গেলেন এবং আমরাও ঐ ভাবের কারণ চিন্তা করিতে করিতে অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।"

আমার বন্ধুর নিকট উপরিউক্ত ঘটনার বিষয় শুনিয়া সে দিবস বাটী প্রত্যাগত হইলাম। তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে উক্ত বধূর পুনরায় ঐরূপ ভাব হইলে আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি বলিলাম, "কিছু আশ্চর্য্য দেখান, নতুবা আমরা আপনার শক্তির বিষয় বিশ্বাস করিব না।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা দেখ।" এই বলিতে

বলিতে হঠাৎ ঘরের কড়ির নিম্নভাগ হইতে এক বস্তা নূতন থান-কাপড় ও গামছা ইত্যাদি পড়িতে লাগিল। আমি একখানি গামছা তুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে সিকি, দুয়ানি, সুপারি ও কড়ি ইত্যাদি পাইলাম।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে পুনরায় তাঁহাদের বাটীতে গিয়া শুনিলাম যে বৈকালে পুত্রবধূর পুনরায় সেই ভাব উদয় হইয়াছিল। সেই সময় তিনি ডাক্তার মহাশয়কে কলেরা রোগের ও চক্ষের ছানি রোগের ঔষধ জন্য জল পড়িয়া দিয়াছেন। তদনুসারে ডাক্তার মহাশয় একটি কলেরা রোগীকে সেই জল পড়া খাওইয়া দিয়াছেন ও সংবাদ পাইয়াছেন, যে সেই রোগীটী অনেক ভাল আছে।

আমি তাঁহাদের বহির্বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় পুনরায় তাঁহার ঐ ভাবের আবির্ভাব হইল। কিছুক্ষণ পরে, আমি একগ্লাস খাবার জল চাহিলাম। শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আমাকে এক গ্লাস খাবার জল আনিয়া দিলেন। জল যেমন পান করিতে গেলাম, দেখিলাম, সেই জল হইতে অতি মনোহর আতরের অপেক্ষাও সুগন্ধ বাহির হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরূপ সুগন্ধ যুক্ত জল আনিয়া দিবার কারণ কি ? সে কহিল, আমাদের বৌ কলসী হইতে এই জল এই মাত্র আপনার জন্য আনিয়া দিলেন। আমি বলিলাম "তোমাদের কলসীতে কি এই প্রকার আতর দেওয়া জল সর্ব্বদা থাকে নাকি ?" সে কহিল "কলসীটী সামান্য কলসী। তাহাতে আতর দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের বৌ ঠাকুরাণীর এক্ষণে শক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সুতরাং এইরূপ হইয়াছে।" তখন আমি জল পান করিয়া শীঘ্র তাঁহাদের বাটীর ভিতর গিয়া উক্ত বধূঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি জলে আতর দিয়া আমাকে পাঠাইয়া

ছিলেন। "তিনি বলিলেন, না।" এই স্থানে আমার বলিয়া রাখা উচিত যে, এই ভট্টাচার্য্য পরিবারের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা আছে। পরিবারস্থ সকলেই আমাকে পরিবারের মধ্যগত একজন ভাবিয়া অবাধে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি বলিলাম "আপনি আমার সমক্ষে সকল জলে এইরূপ সদ্‌গন্ধ করিয়া দিতে পারেন।" তিনি সম্মত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বাহিরের গোবর গোলা একটী বার-কলসী লইয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি একবার দর্শন করিবামাত্র সেই জল হইতে অতি অপূর্ব্ব সদ্‌গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

ক্রমে এই সংবাদ কলিকাতায় শ্যামাচরণের নিকট পৌঁছিল। সে এই সংবাদে চিন্তিত হইয়া তাহার শ্বশুর-বাটীর কোন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে আসিল। যখন তাহারা বহির্বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে মাত্র অথচ যখন তাহার স্ত্রী কিছুই জানেন না যে, তাঁহার স্বামী বহির্বাটীতে আসিয়াছে, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল। "আপনি বলিতে পারেন, বহির্বাটীতে কে কে বসিয়া আছে? বধূমাতা যে সকল লোকের নাম করিয়াছিলেন, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বামীর নাম ও তাঁহার বাপের বাটীর বন্ধুর নামও করিয়াছিলেন।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস এইরূপ ঘটনা প্রত্যহই দুই তিন বার করিয়া ঘটিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর লোকেরা ধূপধুনা, গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র ইত্যাদির জোগাড় করিতে বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্যামাচরণের স্ত্রী বলিতে লাগিলেন "আমার এ বাটীতে পূজা হইতেছে না; সুতরাং আর আমি এখানে থাকিব না। শীঘ্র অন্যত্র গমন করিব।"

একদিন গুরুচরণ ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বিষয়ে কি উপদেশ দেও।" আমরা এইরূপ প্রত্যহ পূজার আয়োজন করিয়া ঐ দেবতার উপাসনা করিব কি না? "আমি আদিয়রে মহামাননীয় কর্ণেল অলকট্ সাহেবকে এই বিষয় জানাইয়া উপদেশ চাহিলাম। তিনি উপদেশ দিলেন, "ইহা উপদেবতার আবেশ মাত্র। ইহা রাখিবার কোন ফল নাই। তোমরা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা এই উপদেবতার আবেশ নিবারণ করিতে পার।" তদনুসারে আমরা তিনজনে একদা গভীর রাত্রিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করি। পরদিন প্রত্যূষে শ্যামাচরণের স্ত্রী বলিলেন, "তোমরা কল্য রাত্রে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি এখান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করি। অতএব আগামী শনিবার দিবস গ্রাম্য ৺ সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর মন্দিরে আমাকে লইয়া চল। আমি ৺কালীমাতার রীতিমত পূজা করিয়া সেই স্থানে তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইব।" তদনুসারে আমরা তাঁহাকে ৺ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে লইয়া যাই ও সেইখানে পূজা করিবার পর হইতে পুত্রবধূর সেই ভাবের শান্তি হইয়াছিল।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সকলে একত্রিত হইলে ব্যোমকেশ অতিশয় আগ্রহ সহকারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল "কই দাদা ম'শায়, আপনার ঝুলিতে ভূতপ্রেত কি আছে,

ছুএকটা ছাড়ুন ! কিন্তু, সত্য বলতে কি, আমার কেমন কেমন ঠেক্‌চে ; এই ভরসন্ধ্যা বেলা ; শেষটা কি সত্যি সত্যি পেয়ে বস্‌বে নাকি ?

ভট্টাচার্য্য। তোদের মহিমা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না। তর্কের সময় সকলে এক একটি দ্বিতীয় চার্ব্বাক্‌ ; কিন্তু এ দিকে ভয়-টুকুতো বিলক্ষণ আছে দেখতে পাই !

ব্যোমকেশ। সেটা আপনাদেরই কৃপায় ! ছেলেবেলা থেকে কেবল ঐ জুজু, ঐ ভয়, ঐ ভূত, করে এসেচেন। শুধু এক পুরুষ ধরে নয়, পুরুষানুক্রমে যদি ঐ স্রোত চলে এসে থাকে, তা হলে ভূত না থাক্‌লেও ভূতের ভয় যে মজ্জাগত হয়ে থাক্‌বে সে আর বিচিত্র কি ! তাই তো বলি দেশটার মাথা আপনারা বেশ ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে রেখেচেন। কতকগুলা ছাই পাঁশ, মাথা মুণ্ডুর প্রশ্রয় দিয়ে দেশে কেবল একপাল কাপুরুষের সৃষ্টি হয়েচে !

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা সে কথা পরে হবে। এখন আমাকে বল দেখি ভূত জিনিষটা যে একবারেই কাল্পনিক সেটা কি করে সিদ্ধান্ত হইল !

ব্যোমকেশ। এতো সোজা কথা ! যা কেহ কখনো দেখতে পায় না, সেটা কাল্পনিক ভিন্ন আর কি বল্‌বো ! 'ভূত' যে আছে, সে প্রমাণটা বরং আপনাকেই দেখাতে হবে।

ভট্টাচার্য্য। ভাল, তাই হৌক। প্রমাণ তিন প্রকার অর্থাৎ কোন পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ করতে হইলে, তার জন্য তিন শ্রেণীর উপায় আছে। প্রথমতঃ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার অনুভূতি বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ। ইহার নাম 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ। যেমন অমুক ফুলটা রাঙা, ইহার প্রমাণ আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ; চক্ষু এখানে রূপের জ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছে সেইরূপে গোলাপের সুমিষ্ট গন্ধ আছে, এখানে নাসিকা গন্ধের জ্ঞান

উৎপন্ন করিতেছে। এই অন্যান্য ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সম্বন্ধেও এই প্রকার। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। যাহা প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেশ ও কাল এই উভয় দ্বারা বাধিত, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি এক সময়ে সর্ব্ব দেশে কিংবা সর্ব্বকালে কার্য্যকরী হয় না। যেমন এখানে বসিয়া আমরা আমেরিকায় কি ঘটিতেছে তাহা দেখিতে পাই না, কিংবা কাল যাহা ঘটিয়াছে বা দুই মাস পরে যাহা ঘটিবে আজ তাহার অনুভূতি হয় না। এই জন্য অধিকাংশ স্থলেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" যেখানে ধূম আছে, সেইখানেই বহ্নি আছে; পর্ব্বতে ধূম দেখিতেছি, অতএব সিদ্ধ হইল যে পর্ব্বতের মধ্যেও বহ্নি আছে। এখানে পর্ব্বতের মধ্যে যে বহ্নি রহিয়াছে তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হ'লেও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ধূম-জ্ঞান হ'তে বহ্নির অনুমান হচ্চে। এই রকমে যে উপায় দ্বারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন ক'রে আমরা অতীত, অনাগত বা দূরবর্ত্তী বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি তাহার নাম 'অনুমান'। প্রমাণের যে তৃতীয় প্রকারভেদ আছে তাহার নাম 'শব্দ' বা আপ্তবাক্য। ইহার অর্থ হচ্চে শাস্ত্র বা সিদ্ধপুরুষগণের বাক্য; অর্থাৎ শাস্ত্র বা মহাপুরুষগণ যে যে বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন সে গুলি সত্য বলে জ্ঞান করতে হবে।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় এতক্ষণ বেশ বুঝিছিলাম, কিন্তু এইবার যেন গোলযোগ ঠেক্‌চে। তোমার প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে কাহারও ঝগড়া নেই। কিন্তু ওই যাকে আপ্তবাক্য না শাস্ত্র কি বল্লেন ওইটেই কেমন আমাদের জঠরে পরিপাক হয় না। এই বিংশ শতাব্দীতে যদি

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও ভূত বানাইতে চান, তবে আর আপনার এই সন্ধ্যেবেলায় পণ্ডশ্রম করে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আপনাদের সেকেলে দাশু-রায়ের পাঁচালীর দু'টো ছড়া কাটুন মন্দ লাগবে না।

ভট্টাচার্য্য। তোর যে সেকেলে কিছু একটাও ভাল লাগে ইহা আশ্চার্য্যের বিষয় বটে। সে যা হোক "শাস্ত্র" নামটা উদ্গিরণ করতে না করতেই তোরা দামড়া বাছুরের মত লাফাস কেন বল দেখি? তোরা যাদের কেতাব দু'একখানা পড়ে এক একজন বিদ্যাদিগ্‌গজ ও মহা-বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠিচিস্ সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সেকেলে পচা শাস্ত্র গুলো, ততটা বুঝুক আর নাই বুঝুক, যত্ন করে পড়বার চেষ্টা করে। আর তোরা সব সে গুলোর নাম শুনেই একেবারে খাপ্পা! একেই বলে বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়!

ব্যোমকেশ। তা দাদা ম'শায় গালই দিন আর ভালই বলুন, আপনাদের ওই আজগুবি কথার ঝুড়ি শাস্ত্র গুলো অবাধে গলাধঃকরণ করতে পার্‌বো না। ও শাস্ত্রে ফাস্ত্রে বিশ্বাস করা আমার কর্ম্ম নয়।

ভট্টাচার্য্য। রামচন্দ্র! আমিও কি তোকেও মহাপাতকের কায কর্‌তে বলতে পারি! তুই শিউরে উঠিস্ কেন? আমি তোকে শুধু শাস্ত্র প্রমাণবলে ভূতের কথা বোঝাতে সাহসী হই নি। তবে তোর যদি সুমতি হয় তা হ'লে এর পরে তখন শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আপততঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা আমরা "প্রেততত্ত্ব বুঝিতে কতদূর অগ্রসর হতে পারি দেখা যাক্।

ব্যোমকেশ। সে কথা ভাল। কিন্তু ভূতের সম্বন্ধে তো আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই।

ভট্টাচার্য্য। কেমন করিয়া জানিলে ? বরং এরূপ বলিতে পার ভূত কখনও তোমার নিজের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সিদ্ধ কর্‌তে হবে যে ভূত কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না ? যে জিনিস সাধারণতঃ স্থূল দৃষ্টির বিষয়ী ভূত নয়, অবস্থাবিশেষে তাহাও দেখিতে পাওয়া যেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটা সহজেই বুঝা যায়। একটা কাঁসার গেলাস বরফ দিয়া পূর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ রেখে দাও। একটু পরেই দেখতে পাবে উহার উপরের গায়ে জলবিন্দুতে ভরে গেছে, ঠিক যেন গেলাসটা ঘেমে উঠেছে। এ জলকণা গুলা কোথা হতে এল ? তোদের বিজ্ঞান শাস্ত্রেইত বলে যে ওগুলা গেলাসের চারিপাশের বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে বাস্পাকারে ছিল ; গেলাসের খুব ঠাণ্ডা গায়ের সংস্পর্শে এসে জমে গিয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এই যে, জড়পদার্থ যখন সূক্ষ্মভাবে থাকে তখন তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন রকমে যখন সে সূক্ষ্মভাব ছেড়ে স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে তখন আবার তাকে দেখা যায়। এখন কথাটা ভূতের সম্বন্ধে খাটিয়ে দ্যাখ্। ভূতের শরীর যে পদার্থে তৈয়ারী, তাহা বায়ু হতেও সূক্ষ্ম, সেই জন্য সাধারণতঃ ভূতযোনি মানুষের স্থূলদৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ মানুষের দৃষ্টিশক্তির সম্প্রসারণ হয়, কিংবা যে পদার্থ দ্বারা প্রেত ভূতের দেহ রচিত তাহা ঘণীভূত হয় তখন মানুষে ভূত দেখিতে পায়। এখন তোকে জিজ্ঞাসা করি ভূত বলে এক শ্রেণীর জীব আছে যাহা সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচর এরূপ একটা কথা বল্লে কি নেহাতই বিজ্ঞানের উপর অত্যাচার করা হয় ?

ব্যোমকেশ। না হয় মানিলাম যে এরূপ শরীরধারী জীব থাকা একবারে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু মানুষ মরে এরূপ শরীর লাভ করে

তাহার সম্বন্ধে যুক্তি কি ? বুঝিতে পারি বটে যে মানুষ যখন মরে তখন আত্মা চলে যায়, দেহটা পড়ে থাকে। তা যদি হয়, তবে আবার একটা সূক্ষ্মদেহ কোথা হতে আসচে।

ভট্টাচার্য্য। ভায়া শরীর তো আর একটি নয়, অনেকগুলি। তোমরা জেনে রেখেচ শরীর ও আত্মা এই দুয়ে মানুষ। কথাটা মোটা-মোটি হিসাবে সত্য হলেও মানবের স্বরূপ কি তা ঠিক ওকথা থেকে বুঝা যায় না। অথচ মানবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হলেও প্রেততত্ত্ব ভাল করে আলোচনা করা যায় না। আচ্ছা আজ রাত্রিও হয়েচে, আর বিষয়টাও কিছু জটিল, দু'চার দিনের কমে শেষ হবে না, অতএব পরে ইহার বিস্তৃত পরীক্ষা করা হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

—:*:—

অদৃশ্য সহায়।

(১)

অলৌকিক রূপে রোগের শান্তি।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী কলিকাতাস্থ কোন সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সংসারে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নাম প্রকাশে তাঁহার পরিবারবর্গের আপত্তি থাকাতে তাহা প্রকাশ করা গেল না। যদি বিশেষ কোন কারণে অনুসন্ধিৎসু কেহ উক্ত নাম জানিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে মাত্র তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি।

কলিকাতা-বাসী উপরি উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এক ভ্রাতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন প্রধান নগরের মুন্সেফ ছিলেন। মুন্সেফ বাবু একজন সাধু-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার প্রকৃতিরও একটু বিশেষত্ব ছিল, সে বাল্যকাল হইতেই অন্য কাহারও সহিত বড় কথা কহিতে ভাল বাসিত না, বা সম-বয়স্কা বালিকাদের সহিত খেলাও করিত না। তাহার আট নয় বৎসর বয়সের সময় হইতে দেখা যাইত যে, সে যেন কাহারও সহিত আপন মনে মধ্যে মধ্যে কথা কয়; কিন্তু যাহার সহিত সে কথা কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এই বালিকাটীর সহিত কলিকাতার একজন পরিচিত চিত্রকরের (Painter) বিবাহ হইয়াছিল। বর্ণিতব্য ঘটনাটী তাহার বিবাহের পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

মুন্সেফ বাবুর একটী জামাতা, আমাদের কথিত বালিকাটীর ভগিনী-পতি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন স্থানে বন-বিভাগে (Forest Department) কার্য্য করিতেন। তিনি একদিন ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং একবারে চলচ্ছক্তি রহিত হয়েন। মুন্সেফ বাবু নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনাইয়া রীতিমত চিকিৎসা করান। শ্বশুর মহাশয় বিলক্ষণ ব্যয় করিতে ক্রটী করিলেন না; কিন্তু কিছুতেই জামাতার পা সারিল না; তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, এই সময় উক্ত কনিষ্ঠা কন্যার বয়স প্রায় ৯।১০ বৎসর হইয়াছিল।

জামাতার অসুখের জন্য বাটীশুদ্ধ লোক বড়ই উৎকণ্ঠিত, কিরূপে রোগীর রোগের উপশম হইবে, ভাবিয়া আকুল। রাত্রিকালে রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইত, সুতরাং রোগীর সহিত বাটীর সকলকে রাত্রি-জাগরণ করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন গত হইল। এক

দিন ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি, রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করিলে রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিব না। কল্যই অঙ্গ-চ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" সেই দিন রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গিয়াছে, স্ত্রী তখন একাকী শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। বাটীর অপর লোক তখন অন্যান্য গৃহে নিদ্রিত। রোগীর গৃহে আলো জ্বলিতেছে। এমন সময় রোগী ও তাঁহার স্ত্রী অকস্মাৎ দেখিতে পাইল, সেই গৃহের এক কোণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষীণ একটী শ্বেত আলোক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া গৃহ ব্যাপ্ত হইতেছে। ক্রমে সেই আলোক সমস্ত গৃহে অতি উজ্জ্বল রূপে উদ্ভাসিত হইল।

সেই সঙ্গে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক মহা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মুন্সেফ বাবুর কনিষ্ঠা কন্যাকে সম্মুখে করিয়া গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান। তখন বোধ হইল, মহাপুরুষের অঙ্গ-বহির্গত জ্যোতিতেই গৃহ আলোকময় হইয়াছে। মহাপুরুষের শরীরের চারি ধারে অণ্ডাকৃতি একটী আলোক-পুঞ্জ ছিল এবং তাহার চারিদিকে জ্যোতিচ্ছটা বাহির হইতেছিল। এই মহাপুরুষের উপস্থিতিতেই রোগী অনেকটা আরাম বোধ করিলেন।

অনবরত জাগরণ-শীলা রোগ-সুশ্রূষায় ক্লান্তা তাঁহার স্ত্রীও সেই সময় অনেকটা শ্রান্তি দূর হইবার মত সুস্থতা লাভ করিলেন। কিন্তু উভয়েই তখন অতীব বিস্ময়-রসে অভিভূত হইলেন, মনে করিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনী কিরূপে এবং কেনই বা তখন হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কি আশ্চর্য্য! এ যে কি রহস্য রোগীর স্ত্রী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রোগী তখন শ্যালিকাকে লক্ষ্য করিয়া সাহসের সহিত বলিলেন "কেন তুমি অকস্মাৎ এখানে আসিয়াছ আর কেমন করিয়াই বা আসিলে?" কন্যাটীর অঙ্গ হইতে তখন আলোক ছটা বহির্গত হইতেছে।

তাহার বদনমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। বালিকা ভগিনীপতিকে ঝাড়ান (Mesmeric pass) দিয়া বলিল "তোমার রোগ সারিয়াছে, তুমি উঠিয়া বস'।" রোগী তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। সে সময় রোগীর পূর্ব্বের ন্যায় যন্ত্রণা ছিল না। পরেই মূর্ত্তিদ্বয় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন "অদ্য যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় অঙ্গচ্ছেদের আবশ্যক হইবে না, সম্ভবতঃ রোগী স্বাভাবিক ভাবেই আরোগ্যলাভ করিবে।"

পরদিন রাত্রিতেও পুনর্ব্বার সেইরূপ ঘটনা ঘটিল। রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শান্তি বোধ করিলেন, বারংবার অনুরোধে অদ্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় দিবসও সেইরূপে বালিকাটি আসিয়া রোগীকে বলিল "আমার কথায় বিশ্বাস কর। তুমি আজ চেষ্টা করিলেই চলিয়া আসিতে পারিবে। শয্যা ত্যাগ করিয়া এস। যদি কোনরূপ কষ্ট হয়, আমি সাহায্য করিব। কোন ভয় নাই। তোমার রোগ দূর হইয়াছে।" বালিকার এইরূপ জোরের কথা শুনিয়া রোগী আজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল, কোন কষ্ট বোধ করিল না। তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভক্তি-বিজড়িত স্বরে বালিকার নিকট যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, অমনি মূর্ত্তিদ্বয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইহার পর আর সে মূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। কিন্তু রোগী ক্রমে অল্প দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বালিকাকে উপরি উক্ত ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিন দিনেই সে সময়ে সে পার্শ্বের গৃহে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিল।

(২)

আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা।

বিগত ইংরাজী ১৮৯৫ সালে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া যে সকল দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসংসৃষ্ট নিম্নলিখিত ঘটনাটী অলৌকিক বলিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সকলেই জানেন যে, উক্ত ভূমিকম্পে অনেক জমীদারের অনেকগুলি উচ্চপ্রাসাদ বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ ভূমিকম্পে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জমীদারের দ্বিতল গৃহ ভূমিসাৎ হয়। তৎকালে বাটীর সকলেই প্রায় সময় থাকিতে বাহিরে আসিতে পারিয়াছিলেন, কেবল উক্ত জমীদার মহাশয়ের একটী নব বিবাহিতা পুত্রবধূ দ্বিতল গৃহ হইতে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে না করিতেই তথাকার সিঁড়ি একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, বালিকা বধূ অনন্যোপায় হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। কাতর স্বরে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "ওগো! তোমরা যে কেহ থাক, আমাকে লইয়া যাও। আমি পড়িয়া মরিব তোমরা কি দেখিতে চাও? আমার আর কি কেহ নাই?" বালিকার আর্ত্তনাদ শুনিবে কে? বালিকার নিকটে কেহ নাই, নীচে সকলে গোলমাল করিতেছে, কে কাহার সন্ধান লয়? বালিকা কিন্তু প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় বধূটি এইবার পলক মধ্যে একবারে নিরাপদে হঠাৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল তখন নিরাপদ ছিল বলিয়া অনেকে সেইস্থানে ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক করিতেছিল এবং অত্যন্ত গোলমাল হইতেছিল। হঠাৎ একব্যক্তি বধূকে তথায় আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এমন সময়ে

কিরূপে এখানে আসিলে? কে তোমায় রাখিয়া গেল, কিছুত বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যে ঘরে ছিলে, তাহার সম্মুখের সিঁড়ি ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "এই কথা বলিতে বলিতেই বালিকা যে ঘরে ছিল, সেই ঘরটী পড়িয়া গেল। বধূ বলিতে লাগিল "আমিত বুঝিতে পারিলাম না। আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। কেমন করিয়া কি ভাবে আমি এখানে আসিলাম, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিনা। আমি ভয়ে যখন ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম, তখন বোধ হইল যে একজন রক্তবর্ণ কৌষিক বসন-পরিহিতা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী রমণী অতি সাবধানে ক্রোড়ে করিয়া আমাকে এইখানে নামাইয়া দিয়া চকিতের ন্যায় কোথায় যে অন্তর্হিতা হইলেন, তাহা দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার ভয় একবারে দূর হইয়াছিল, আর মনে কেমন একপ্রকার আনন্দ পাইয়াছিলাম। তাঁহার অঙ্গ জ্যোতিপূর্ণ ও সুগন্ধময়।"

এই ঘটনার কথা তৎক্ষণাৎ বধূমাতার শ্বশুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি নিজ বাটীর সকল স্থান ও সমস্ত গ্রামটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু সেরূপ রক্ত-বস্ত্র-পরিহিতা কোন স্ত্রীলোক পাওয়া গেল না।

এই ঘটনাটী যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের আপত্তি হইবে ভাবিয়া তাঁহাদেরও নাম ধাম আমাদিগকে গোপনভাবে রাখিতে হইল।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।

অলৌকিক রহস্য।

৩য় সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [আষাঢ়, ১৩১৬।

ভৌতিক কাহিনী।

(৩) প্রেতের নৃত্য ও গীত।

জুলিয়া নামে এক ইংরাজ রমণী বেশ নাচগান করিতে পারিতেন! এক প্রবীণা রমণীর সহিত তাঁহার খুব ভালবাসা ছিল। দুজনে কয়েক-দিন একত্র বাস করিয়া বেশ আনন্দ পাইয়াছিলেন। ইহার পর প্রবীণা কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তিনি ৬।৭ বৎসর জুলিয়ার কোন সংবাদই রাখেন নাই এবং দুজনে সাক্ষাৎও হয় নাই।

এই সময়ে প্রবীণার সাংঘাতিক পীড়া হইল। জীবনের কোন আশা নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবার জন্য একজন সলিসিটার আনাইলেন। তাঁহার দু একটি আত্মীয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল,—কোনরূপ মোহ বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা আইসে নাই। তিনি বিষয়সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা কি কোন গান শুনিতে পাইতেছেন?" সকলেই উত্তর করিলেন, "না"। তিনি বলিতে লাগিলেন "আহা! কি সুমিষ্ট গান! আমি আজ ইহা আরও দু এক বার শুনিয়াছি। নিশ্চয় দেবতাগণ আমাকে স্বর্গে আহ্বান করিতে-

ছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটি স্বর আমার পরিচিত বলিয়াই বোধ হইতেছে, ইহা যেন আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় শুনিয়াছি ঠিক মনে হইতেছে না। আ! এই যে! দেখুন, দেখুন! চিনিতে পারিতেছেন কি? আমার প্রিয়তম জুলিয়া! ঐ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। ঐ দেখুন হাত দুটি তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে! যাঃ ঐ চলিয়া গেল!" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা কহিতে লাগিলেন। পর দিবসই তিনি ইহধাম ত্যাগ করি-লেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ঐ কথাগুলিকে মুমূর্ষুর প্রলাপ বলিয়া স্থির করিলেন।

একটি আত্মীয়ের মনে সন্দেহ হওয়াতে, তিনি জুলিয়ার সংবাদ লইবার জন্য কয়েক দিন পরে তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলেন। সেখানে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। শুনিলেন প্রবীণার মৃত্যুর এগার (১১) দিন পূর্ব্বে জুলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গান গাহিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃ-কালে জুলিয়া মারা পড়েন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যাকালে প্রবীণার মৃত্যু হয়।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

"পুনরাগমন"

—:*:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

কলিকাতায় ফিরিবার তিন দিন পরেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিল। পিতার কাছে তার পিতৃপ্রদত্ত ঔষধের দুরবস্থা দেখিয়া গোপাল মায়ের কাছে কি আবদার করে জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইল। কিন্তু আমাকে দেখিলে পাছে গোপালকে মা কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করেন, অথবা মায়ের প্রশ্নে গোপাল্ কোনও উত্তর না দেয়, এই জন্য শ্যামকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলাম। তখনও পর্য্যন্ত শ্যামের আচরণে মা ও গোপালের সন্দেহের কোনও কারণ ছিলনা।

বাড়ীর ভিতরে যাইয়াই শ্যাম ফিরিয়া আসিল। আমি তার এত সত্বর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে বুঝিলাম গোপাল স্বল্পক্ষণের জন্য ভিতরে গিয়াছিল। তাহার পর সে বাহিরে আসিয়াছে, গোপালকে ভিতরে পাঠাইবার জন্য সে মাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

তবে গোপাল কোথায়? শ্যাম তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বাড়ীর কোনও স্থানে তাহার সন্ধান পাইল না। বিদ্যার্থীযুবকেরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে পাঠাভ্যাস করিতেছিল, তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। কালবিলম্ব না করিয়া শ্যামচাঁদ প্রতিবেশীদের বাটীতে সন্ধান লইতে গেল, গোপালকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

পিতা গোপালের গৃহত্যাগের কথা জানিতে পারিলেন। শ্যাম-চাঁদই অযাচিত ভাবে, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এই কথা শুনাইয়া দিল। তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম গোপালের গৃহত্যাগে সে একটু আনন্দ উপভোগের বস্তু পাইয়াছে। কিন্তু এমন কৌশলে আত্ম গোপন করিয়া সে এই আনন্দ ভোগের অভিনয় করিতে লাগিল যে, আমি ভিন্ন আর কেহই তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিল না।

অতি বিষণ্ণ ভাবে সে পিতার কাছে গোপালের গৃহত্যাগ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল—"গোপালকে আপনি কি তিরস্কার করিয়াছেন?

পিতা উত্তর করিলেন—"কই না!"

"তবে গোপাল কি অভিমানে দেশত্যাগী হইল!"

"দেশত্যাগী হইল কি?"

"আমি চোরবাগানের অলিগলি খুঁজিয়া আসিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। লোকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইলাম, কেহ সন্ধান দিতে পারিল না।"

কথা শুনিয়া পিতা অনেকক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। বলা বাহুল্য আমিও শ্যামের সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমীপে গিয়াছিলাম। পিতাকে অনেকক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—"অন্যমনস্কতার দরুণ পা লাগিয়া পাথর বাটীটা পড়িয়া গিয়াছে। সে জন্য যদি গোপালকে গৃহত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এতদিন বাংলা মুলুক ত্যাগ করিতে হইত। এ যাবৎ আমিইত আপনার কাছে তিরস্কার খাইয়া আসিতেছি।"

শ্যাম। মা গোপালের জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়াছেন।

পিতা। আমি শীঘ্রই তাহার চাঞ্চল্যের অবসান করিতেছি। পরিণাম না ভাবিয়া আমি গৃহে কণ্টকতরু রোপণের সম্মতি দিয়া-

ছিলাম। এখনি যখন এই, আর বেশিদিন এখানে রাখিলে অশান্তির বৃদ্ধি হইবে।

শ্যাম এই কথাতে যেন বড়ই ব্যথিত হইল। মুখে যতটা বিষাদ মাখান সম্ভব সমস্ত মাখিয়া, কথায় যথাসম্ভব করুণরস মিশ্রিত করিয়া বলিল—"ও কথা বলিবেন না। আপনারা ব্রাহ্মণদম্পতী করুণাময় করুণাময়ী। নিজের ছেলেকে বুক হইতে ফেলিয়া, সেই শূন্যবক্ষে পরের ছেলেকে তুলিয়া লইয়াছেন।"

পিতা। অকৃতজ্ঞ হতভাগারা তাহা বুঝিল কই?

শ্যাম। তা না বুঝুক, আপনারা কিন্তু যা ছিলেন তাই আছেন। এখনি গোপালকে দেখিলে সব ভুলিয়া যাইবেন। এখন যদি গোপালকে না খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের উপর আপনাদের ক্রোধ হইবে। অনুমতি করুন, আমি সারা সহরে তার সন্ধান করিয়া আসি।

পিতা। কিছু করিতে হইবে না। পেটের জ্বালাই তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে।

সুতরাং উদরের জ্বালার উপর গোপালের প্রত্যাগমনের ভার দিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম।

আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল,তবু গোপাল আসিল না। গোপালের গৃহত্যাগ ক্রমে মায়ের কর্ণগোচর হইল। মা কিন্তু একথা শুনিয়া কাঁদিলেন না। বিশেষ বিষাদের লক্ষণও দেখাইলেন না। পিতা কিন্তু ভীত হইলেন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদের সকলকেই গোপালের অন্বেষণের আদেশ করিলেন। গোপাল না ফিরিলে আমাদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা ছিলনা। গোপালকে ক্ষুধার্ত্ত ও নিরুদ্দিষ্ট রাখিয়া কে ক্রুদ্ধা জননীর সম্মুখে আহার করিতে বসিবে? আমরা সকলে মিলিয়া অন্বেষণের একটা বিরাট

আয়োজন করিতেছি। এমন সময় গোপাল ফিরিয়া আসিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। মায়ের ভয়ে কেহ গোপালকে তখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পিতা আবার শয্যা আশ্রয় করিলেন। আমরাও আহার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম লইলাম।

(৯)

শ্যামচাঁদ ভায়ার কল্যাণে গোপালের পলায়ন সংবাদ পূর্ব্ব রাত্রেই পাড়ার মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবেশিগণের আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ রূপ 'মজা' উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই বাহির দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রভাত না হইতেই তাঁহারা একে একে আসিয়া পিতার বহির্ব্বাটীস্থ শয়নকক্ষ অবরোধ করিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া অসুস্থ পিতাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তর্কনিধি মহাশয়! গোপাল নাকি কাল রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে" ?

পিতা বলিলেন—"গিয়াছিল, আবার আসিয়াছে"।

একজন গোপালের এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা আদ্যোপান্ত ঘটনা সমস্তই প্রকাশ করিলেন। কেবল বাটীটা পদাঘাতে ফেলিয়া দিবার পরিবর্ত্তে অন্যমনস্কে পা লাগিয়া পড়িয়া যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

পিতার কথার ভাবে সকলেই বুঝিলেন, বাটীটার এই অকস্মাৎ পতনে পিতার ঔষধের প্রতি অবজ্ঞা হইয়াছে মনে করিয়া গোপাল অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

তখন বিজ্ঞজনোচিত বাগ্জালে অসুস্থ পিতার অশান্ত প্রাণ ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায় আবৃত্ত হইয়া পড়িল। কেহ পিতাকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। কেহ জগৎটা অকৃতজ্ঞতায় পূর্ণ দেখিয়া

হতাশায় তাকিয়ায় দেহ রক্ষা করিলেন। কেহবা গোপাল ও গোপালের পিতাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বুঝিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়টাকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সমবেদনায়, পিতার গৌরব কথায়, উপদেশে, রহস্যে, ব্যঙ্গে বৈঠকখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মাতা অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি এই সমমর্ম্মীগুলি যাহাতে শুনিতে পান,এইরূপে ঈষদুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ঝী বাহিরে গিয়া বলিয়া আয়ত, কাল আমার সঙ্গে কথা কহিতে বুকে খিল ধরিতেছিল, আর আজ এতগুলা লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া তিনি কথা কহিতেছেন'!

মাষ্টারের মধুরকণ্ঠ কর্ণগোচর হইবামাত্র কলকোলাহল পূর্ণ ক্লাস যেমন মুহূর্ত্তেই নীরব হইয়া যায়,মায়ের কথা শুনিয়াই সেই প্রাতঃকালের সভা সেইরূপ নীরব হইয়াগেল। কোলাহলের ভারে পীড়িত হইয়া পিতার সেই বিলাতি নামধেয় রোগটা এতক্ষণ দেহের কোন অজ্ঞাত দেশে আত্মগোপন করিয়াছিল। নীরবতার অবকাশে সে আবার মাথা-তুলিল। পিতা তাহার তাড়নে আবার মৃদু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নির্ম্মম প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া একে একে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে গোপাল উপর হইতে নীচে নামিল। সেদিন গোপালের মুখে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিলাম।

শ্রীমান বলিয়া লোকের কাছে আমার খ্যাতি ছিল। দর্পণের প্রতিবিম্ব ও তাহাদের সত্যতার সাক্ষী দিত। কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, গোপাল আমা অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়দর্শন। কিন্তু সেদিন তাহাকে যেমন সুন্দর দেখিলাম, এমনটী আর কখনও দেখি নাই। স্বর্গীয় জ্যোতির কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম। তাইকি মুখে মাখিয়া গোপাল আজ

আমার সম্মুখে দাঁড়াইল! আজ আমাকে পর্য্যন্ত সে যেন মুগ্ধ করিল। পূর্ব্ব রাত্রের পলায়নের কথা লইয়া তাহাকে একটু মিষ্টরহস্য করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু গোপালের মুখ দেখিয়া মুখ ফুটাইতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু গোপালকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল কোথায় যাওয়া হইয়াছিল গোপালকৃষ্ণ ?"

গোপাল বলিল—"গঙ্গাতীরে।"

পিতা। কেন, অভিমানে ঝাঁপদিতে নাকি ?

গোপাল কোনও উত্তর করিল না।

পিতা আবার বলিলেন—"পরের কাছে মিছামিছি অপদস্থ করিয়া জ্ঞাতিত্ব সাধিতেছ কেন ?"

গোপাল এবারেও উত্তর করিল না। সহানুভূতির ভাব লইয়া আমি গোপালকে বলিলাম—"পিতার উপর অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া তুমি বুদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই।"

গোপাল এইবারে বলিল—"কিসের অভিমান ? অভিমানে গৃহত্যাগ করিব কেন ?"

উত্তর শুনিয়া পিতা দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"তবে কি আমার জীবদ্দশায় পিণ্ড দিতে জাহ্নবী তটে গিয়াছিলে ?" মাতা অন্তরাল হইতে বুঝি শুনিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কেন তোমরা উভয়ে মিলিয়া বালককে উৎপীড়িত করিতেছ। আজ তোমরা অপেক্ষা কর, কাল প্রাতঃকালে আমি যাহার সামগ্রী তাহার কাছে পাঠাইতেছি। তোমরা তোমাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিও। গোপাল আর তোমাদের ভোগে বাধা দিতে আসিবে না।"

গোপালের উপর যে যৎকিঞ্চিৎ মমতার উদ্রেক হইতেছিল, মায়ের এই শ্লেষ বাক্যে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। আমি আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম—"সেখানে পাঠাইলে এমন চর্ব্ব্যচোষ্য চালাইবে কে?"

পিতা কিন্তু আমার এ দুর্ব্ব্যবহারের প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি বলিলেন—"ও কি কর গোপীনাথ! গুরুজনের অসম্মান—ইস্কুলে তুমি কি এইরূপ নীতি শিক্ষা করিতেছ?"

মা বলিলেন—"তোমরাই কি গোপালকে অন্ন দিতেছ?"

পিতার শাসনবাক্যে আমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলাম। ব্যবহারটা আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া আর কোনও উত্তর করিলাম না। কিন্তু গোপালের অন্নসংস্থান কিরূপে হইতেছে জানিবার জন্য আমার প্রশ্ন করিবার ব্যগ্রতা জন্মিয়া গেল। পিতা যেন মন বুঝিয়া সেই ঔৎসুক্য নিবারণ করিলেন। মাতাকে বলিলেন—"বালকের সম্মুখে এইরূপ নির্ব্বোধের মত কথা কহিয়া তাহার মাথা খাইও না। অমনি অমনি ত বালক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে দরিদ্র পিতার অন্নসংস্থানের উপায় হইবে বলিয়া আমি তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি। গোপীনাথের সঙ্গে সমান ভাবে শিক্ষা দিতেছি। তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিনই তাহার মর্য্যাদা। যেরূপ কাল আসিতেছে, তাহাতে আমাদের অবর্ত্তমানে, পরগৃহে উহার সেরূপ মর্য্যাদা থাকিবে কি? আমার মাতার আদরে বালকের পিতার পরকাল নষ্ট হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ আদর দেখাইয়া উহার পরকাল নষ্ট করিও না।"

মাতা এ কথায় কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। আমি মনে মনে বড়ই খুসী হইলাম। এখন গোপাল নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারি-

লেই আমি যেন নিশ্চিন্ত হই। অবশ্য তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহারের অভিলাষ আমার মনে উদিত হয় নাই। সে আমার সহিত মায়ের স্নেহের অধিকার লইয়া সমকক্ষতা না করিলে, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইতাম না।

গোপাল এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। পিতার কথা শুনিয়া যখন মাতা নিরুত্তর, আমিও নীরব, তখন স্থানের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে গোপাল উত্তর করিল—"এ গৃহে আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছে, ইহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তা হ'লে এবারে আর বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতাম না।"

পিতা। অবস্থার পরিবর্ত্তন তুমিই ত ঘটাইলে গোপালকৃষ্ণ! কাল তুমি অভিমানে গঙ্গায় ঝাঁপদিতে গিয়াছিলে। ভগবান আমাকে নিরপরাধ জানিয়া কি জানি কেমন করিয়া তোমার মতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। নহিলে লোকের চক্ষে আমাকে কিরূপ অপদস্থ হইতে হইত, তাহা ভাবিতেই আমার শরীর শিহরিতেছে।

গোপাল। আমিত বলিলাম, আমি আত্মহত্যা করিতে যাই নাই।

পিতা। কি করিতে গিয়াছিলে, সে তুমিই জান। আমি কিন্তু তোমাকে এখানে রাখিতে আর সাহস করিনা। এতদিনের আন্তরিক যত্ন ও পুত্র স্নেহে প্রতিপালন যদি আমার একদিনের সামান্য ত্রুটীতে পণ্ড হইয়া গেল, তখন এখানে তোমার অবস্থান কাহারও পক্ষে মঙ্গল জনক হইবে না।

গোপাল। আমিও এখানে থাকিব না।

একথা শুনিয়া মাতার অবস্থা কিরূপ হয় জানিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মা সকলের অলক্ষ্যে কখন সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন! অনুমানেই মায়ের মনের ভাব যেন

উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম, গোপালের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাও তাঁহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়াছে। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, আরও না জানি কি কঠোর আঘাত সহিতে হইবে ভাবিয়া, মাতা আগে হইতেই চলিয়া গিয়াছেন। মায়ের মর্ম্মবেদনা আমি যেন কতকটা অনুভব করিলাম। সেই জন্য গোপালের উপর আবার আমার মমতা আসিল। আমি তাহার হইয়া পিতাকে বলিলাম—"এবারে গোপালকে ক্ষমা করুন।"

পিতা উত্তর করিলেন—"ভাল, তুমি যখন বলিতেছ, তখন এবারের মত ক্ষমা করিলাম।" গোপালকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু, গোপাল! এখন হইতে নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলিও। তা যদি না কর, তাহা হইলে তোমারই ক্ষতি জানিবে। তোমার পৈত্রিক যাহা আছে, তাহাতে বাবুয়ানা ত দূরের কথা, দুবেলা দু মুঠা অন্ন মেলাও দুর্ঘট।"

গোপাল। আমার থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও, বোধ হয় পিতা আমাকে এখানে রাখিবেন না।

পিতা। তুমি কি পিতাকে এরই মধ্যে সংবাদ দিয়াছ?

গোপাল। আমি সংবাদ দিই নাই।

পিতা। তুমি দাও নাই, তবে কি ভূতে দিয়া আসিল?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বুঝিব! পিতা কিন্তু আমাকে লইতে আসিতেছেন। বোধ হয় আজই আসিবেন। যিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, আমি তাঁর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন দেখিতে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমরা পিতাপুত্রে উভয়েই বিস্মিত—কিয়ৎক্ষণ যে যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম ইহার মধ্যে গোপাল কেমন করিয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিল!

গোপাল বলিতে লাগিল—"আমি আত্মহত্যা করিতে যাই নাই। পিতার অনাগমনে আপনার ন্যায় আমিও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। সেই অসন্তোষের কথা আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করি। মা কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন না। পরন্তু গুরুজনের নিন্দায় পাপ করিয়াছি বলিয়া তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন,—আর বলিলেন, 'পাপক্ষালনের জন্য এখনি তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আইস।"

পিতা। সেই জন্য গঙ্গায় ঝাঁপদিতে গিয়াছিলে ?

গোপাল পিতার ব্যঙ্গকথার কোনও উত্তর করিল না। সে আপনার মনে বলিতে লাগিল—"গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে এক সাধুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতিপ্রকাশ করিলেন, এবং আমার সেখানে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করি এবং আপনার রোগের ঔষধ প্রার্থনা করি। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন—'কেন তোমার দাদা মহাশয় ত ঔষধ পাইয়াছিলেন। তিনি তাহা পদাঘাতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চিকিৎ-সককে নানা কথা কহিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষে রোগটাকে বড় করিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক রোগ সামান্য। দুই পাঁচ দিনেই সারিয়া যাইবে।' যদিও তাঁহার একথায় আমি তুষ্ট হইলাম না, তথাপি আপনার বাটিটা নিক্ষেপের কথা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।"

আমরা গোপালের এই বিচিত্র গল্প শুনিতে লাগিলাম।

গোপাল বলিতে লাগিল—"প্রথমে মনে করিলাম। একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না। বাড়ীতে আসিয়া কেহ

কোনও কথা কহিল না দেখিয়া মনে করিলাম, আমার সম্বন্ধে কোনও গোলমাল হয় নাই। সুতরাং আত্মদোষ ক্ষালনের তখন কোনও প্রয়োজন হয় নাই। এখন বলিবার জন্য কি জানি কেন আমার প্রবৃত্তি হইতেছে। রাত্রে ঘুমাইতে যাইতেছি, এমন সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী আমার রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে কি জানি কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে ঘরটা আলোকিত হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর স্নেহপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া সে ভয় অল্পে অল্পে দূর হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে আমার শয্যা সমীপে আসিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার গর্ভধারিণী। তোমার বর্ত্তমান মায়ের কোলে তোমাকে সমর্পণ করিয়াই আমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছি।' আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। শত চেষ্টাতেও আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—'কাল তোমার পিতা তোমাকে লইতে আসিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেশে চলিয়া যাও।' আমি মাকে ছাড়িয়া যাইবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তাই শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'না ছাড়িলে তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।'' বলিতে বলিতে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।"

গোপাল আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। সে স্নিগ্ধদৃষ্টিতেও আমার সর্ব্বশরীরে কেমন একটা উত্তাপের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। শিহরিয়া আমি চক্ষু মুদিলাম।

ক্রুদ্ধ পিতার তীব্র ভাষার নির্ম্মম তরঙ্গ আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল। "হতভাগ্য! এরূপ চতুরতা কতদিন শিখিলে? তুমি

কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে করিয়াছ যে, তোমার এই অহিফেনসেবীর উপকথায় আমি বিশ্বাস করিব।”

গোপাল। আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম।

পিতা। দ্বিতীয় বার এরূপ কথা শুনিলে, বোধ হয় তোমাকে পাগলা গারদে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাতা বাড়ীর ভিতর হইতে গোপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, পিতাও তিরস্কার কার্য্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু কোমলদৃষ্টিতে গোপাল আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ তুলিল, তাহা সহসা নিবৃত্ত হইল না। মনে হইল, যেন কোন সূক্ষ্মদর্শী বিচারকের সম্মুখে আমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, আর গোপালের সহিত পূর্ব্বভাবে ফিরিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য, সেই দিন অপরাহ্নেই গোপালের পিতা আসিলেন। মাতার কাছে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ত্রুটী রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

একখানি পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অলৌকিক রহস্য সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

কোন একটী ভৌতিক চক্রের বিবরণ।

আমাদিগের গৃহের অনতিদূরে প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের একটী ভৌতিক চক্রের বৈঠক (seance) বসে। সেখানে একদিন আমি ও আমার গুরু ভাই যোগানন্দ উপস্থিত হই এবং সেই বৈঠকে যোগদান করি।

আলোক অর্দ্ধনির্ব্বাপিত হইলে পর, আমরা স্থিরভাবে বসিয়া আছি, এমন সময় নানা উপদ্রব আরম্ভ হইল। যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাষ্ঠাসন এরূপ প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছিল, যে উপবেশনকারীরা প্রায় আসনচ্যুত হইয়াছিলেন। আমরা দুইজন কিন্তু স্থির ছিলাম, অদৃশ্যশক্তি যেন আমাদিগের উপর কোনও অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছিল না। হঠাৎ সেই গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা কাতরধ্বনি আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে যেন তীব্র যন্ত্রণায় সাশ্রুদীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; ভয়ে আত্মহারা হইয়া কে যেন অস্ফুটভাষায় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। শীঘ্রই সেই রোরুদ্যমানা প্রেত-রমণী স্থূলীভূত (materialized) হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইল এবং তাহার ভীতি-উৎপাদনকারী এক ভীষণ মূর্ত্তিও সেই সঙ্গে দেখা দিল। আমরা দেখিলাম, সেই ভীতা রোরুদ্যমানা মূর্ত্তি এক রমণীর, আর যে মূর্ত্তি তাহার ভীতি উৎপাদন করিতে করিতে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল, তাহা একটা বীভৎস জানোয়ারের। তাহার কি বিকট মূর্ত্তি! সেই ভীষণ প্রকাণ্ড অপার্থিব জীব-মূর্ত্তির কতক আকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বনমানুষের মত। নর রুধিরপায়ী ব্যাঘ্র যদ্যপি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইত এবং তাহার মুখের সর্ব্বত্র যদ্যপি ধূম্রবর্ণের কুঞ্চিত দীর্ঘ রোমরাজির দ্বারা আবৃত থাকিত, তাহা হইলে তাহা কতকটা এই জানোয়ারের বদনের সাদৃশ্য হইতে পারিত। তাহার উপর আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটা রক্তবর্ণ চক্ষু তাহার কঠোর নিষ্ঠুরতার ভাব প্রকাশ করিতেছিল। পাঠক অনুমান করুন, সেইখানে সেই সময়ে যে প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ উপবিষ্ট ছিল, তাহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। তাহারা সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল। সেই আগন্তুক প্রেত-রমণী একজন প্রেত-তত্ত্ববাদীর

পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তোমরা আমায় রক্ষা কর, তোমরা আমায় রক্ষা কর।" রমণী যতই ভীতা হইতেছিল, যতই অধিক কাঁদিতেছিল, সেই ভীষণ জানোয়ারটা ততই যেন অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছিল। একটা বৈদ্যুতিক গণ্ডির বেষ্টনে সেই ভীতা রমণী রক্ষিতা হইল, সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা তাহাকে ত্যাগ করিয়া, প্রেত-চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ আবিষ্ট ব্যক্তিকে (medium) আক্রমণ করিল। সে মহাক্রোধভরে তাহার আসন দূরে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। আমার গুরুভাই যদ্যপি তাহাকে আত্ম-শক্তির দ্বারা রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সে আরও বিপদে পড়িত। যাহা হউক, আমি সেই সময় সেই ঘরের আলোকটী পূর্ণভাবে জ্বালিয়া দিলাম। দেখিলাম, সেই রমণী ও সেই ভীষণমূর্ত্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, আমি প্রেতলোকে গিয়াছি। তখনও সেই ভীষণ আকৃতি জানোয়ার সেই ভীতা রমণীকে অনুসরণ করিতেছে; রমণীও কাঁদিতে কাঁদিতে ত্রস্তভাবে পলাইতেছে। আমার গুরুভাই যোগানন্দকেও সেখানে দেখিলাম। তখন, তাঁহার কি সুন্দর অত্যুজ্জ্বল শান্তমূর্ত্তি। তাহার পর আবার কি দেখিলাম, সেই শান্তমূর্ত্তির ভিতর হইতে যেন আর এক উজ্জ্বলমূর্ত্তি বাহির হইয়া তীব্রবেগে সেই ভীষণ অলৌকিক জন্তুটার দিকে ধাবিত হইল এবং শীঘ্রই তাহার উপর নিপতিত হইল। রবিকরসংস্পর্শে যেরূপ তুষার বিগলিত হয়, দেখিতে দেখিতে সেই দুইটি মূর্ত্তিই যেন গলিয়া গেল। রমণীও শান্ত হইল এবং আমার গুরুভাইকে প্রণামপূর্ব্বক অন্যদিকে প্রস্থান করিল। আমারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, আমি

গুরুভাইয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন তাঁহার বাহিরের একটী ঘরে উপবিষ্ট আছেন ও আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমায় দেখিয়াই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিতে ত তোমার নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই?" আমি সে কথার উত্তর না দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালিকার প্রেত-তত্ত্ববিদ্‌গণের বৈঠকের সেই ভীষণ ব্যাপারের অর্থ কি? রমণী কোথা হইতে আসিল? সেই ভীষণ জানোয়ারটাই বা কি?" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন তুমি ত রজনীতে সব দেখিয়াছ? যখন সেই ভীষণ জন্তুটা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, তুমিও ত সে সময় উপস্থিত ছিলে, তবে প্রশ্ন করিতেছ কেন?" এই কথা শুনিয়াই আমি মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম!—আমি ত গতনিশার স্বপ্নকাহিনী গুরুভাইকে পূর্ব্বে জানাই নাই,—তবে তিনি তাহা কি করিয়া বুঝিলেন! তবে কি আমার স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা অলীক নয়? তবে কি তাহা আমার উত্তেজিত মস্তিষ্কের ফলে সংসাধিত হয় নাই? আমি উত্তর করিলাম, "আপনি ত অহিংসা-ধর্ম্ম জীবনের সার করিয়াছেন, তবে কেন সেই ভীষণ জন্তুটার বধসাধন করিলেন? ইহাতে ত আপনার জীবনের ব্রত ভঙ্গ হইল।"

তিনি একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এই রমণীর জীবদ্দশার ইতিহাস বলিতেছি, তাহা শুনিয়া তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে। ওই রমণী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন; কিন্তু তাহার স্বভাব অতিশয় ঘৃণিত ছিল। সে কৌশলে কত যুবকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাহার হাবভাবে, কত যুবক মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরা রমণী কাহারও প্রেমের প্রতিদান করে নাই। সে তাঁহাদিগের প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আসিয়াছে। মূর্খ যুবকেরা তাহার অনুগ্রহ-পিপাসু হইয়া তাহাকে সামান্য ক্রীতদাসের মত সেবা করিয়া

আসিয়াছে; সে কিন্তু প্রথমে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের মর্ম্মপীড়ায় তাহার সুখ বোধ হইত। তাহার এই নির্দ্দয় প্রাণহীনতায় অনেকের জীবন মরুময় করিয়াছিল, এমন কি দুই একজন আত্মঘাতী হইয়াছিল। তজ্জন্যই মৃত্যুর পর রমণীর এবম্প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা! অপরের প্রাণের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া, মরণের পর তাহার শান্তি ছিলনা। অনেককে কাঁদাইয়াছিল বলিয়া তাহাকে এইরূপ কাঁদিতে হইল। আর সেই যে ভীষণ অলৌকিক জানোয়ারটাকে দেখিয়াছিলে, বাস্তবিক তাহা কোন জীব নহে। ওই হতাশ প্রেমিকগণের ভীষণ ক্রোধ, মর্ম্মান্তিক ঘৃণা, প্রতিহিংসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত সম্মিলিত হইয়া সেই ভীষণ নরঘাতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পাশবিক নিষ্ঠুর বাসনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা ভয়ঙ্কর পশুর আকার পরিগ্রহণ করিয়াছিল। *

[* মানবের মানসে উদিত ভাব সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করিয়া কোন একটী অপদেবতার (Elemental) সহিত মিলিত হইয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটী প্রাণীরূপে পরিণত হয়। চিন্তা সৎ হইলে তৎসৃষ্ট মূর্ত্তি সৎক্রিয়াশীল শক্তিমান্ বন্ধুরূপে এবং অসৎ চিন্তার দ্বারা প্রসূত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শত্রুরূপে প্রেতলোকে বিচরণ করে। মহাশূন্যে আমরা অহরহঃ প্রতিমুহূর্ত্তে এইরূপ কতশত প্রাণীর সৃজন করিতেছি; আমাদিগের প্রত্যেক অভিপ্রায়, প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক আবেগ এবং প্রত্যেক আশক্তি হইতে এক একটী মূর্ত্তি প্রসূত হইতে থাকে। হিন্দু ইহাকে কৃত্যা বা যোগ্য দেবতা এবং বৌদ্ধেরা, ইহাকে স্কন্দ বলেন। সাধকের সাধন-পথে তাহার বা সমধর্ম্মী অপরের চিন্তা মূর্ত্তি বাধা দেয়। তজ্জন্যই সাধক মাঝে মাঝে ভয় পায় ও সাধন-ভ্রষ্ট হয়। তাহার মনে কামবীজ থাকিলে তাহা সুন্দরী অপ্সরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধককে প্রলুব্ধ করে। তাই একজন সাধক উপদেশ করিয়াছেন "মনকে অমল ও পবিত্র না করিয়া যোগ-ক্রিয়া আরম্ভ করা অতিশয় বিপদজনক"—অঃ রঃ সং]

"বিজ্ঞান-বিদেরা যেমন এক সুরতরঙ্গের সাহায্যে অপর সুরতরঙ্গ-সৃষ্ট মূর্ত্তিকে নষ্ট করে, আমিও সেইরূপ পবিত্র-প্রেম-চিন্তা-সৃষ্ট মূর্ত্তির দ্বারা সেই ভীষণ মূর্ত্তির নাশ সাধন করিয়াছিলাম। ভগবৎ-প্রেমের বিমল তরঙ্গে ক্রোধ-দ্বেষ-সৃষ্ট মূর্ত্তি গলিয়া গিয়াছিল। ভাই, ইহাতে কি আমার প্রাণীবধ করা হইল?"

আমি যোগানন্দকে বলিলাম "আমি দেখিতেছি, ভৌতিক চক্রে যোগদান করায় বিশেষ ফল আছে। আপনি যদ্যপি তথায় না যাইতেন, তাহা হইলে রমণীর উদ্ধার হইত না। তবে আপনি ভৌতিক চক্রে যোগদান করিতে নিষেধ করেন কেন?"

ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ ফল আছে, তবে ভারতবর্ষে নয়। যাহাদিগের পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস নাই, তাহাদিগের ইহাতে উপকার হয়। সেই উদ্দেশ্যেই প্রেত-তত্ত্ব পুরাকালে মেক্সিকো (mexico) প্রদেশে ইহা এক ঋষিসঙ্ঘ দ্বারা প্রথমে প্রচারিত হয়। সেখান হইতে বর্ত্তমানকালে তাহা ইউরোপ ও বর্ত্তমান আমেরিকায় আসিয়াছে। কিন্তু, প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার উপকারিতা হইতে অপকারিতা অনেক অধিক। মানবকে ইহা কুসংস্কার-দুষ্ট করে; দুর্ব্বল মানব যে-কোন একটা প্রেতের আবেশকে মৃত আত্মীয় অথবা খ্যাতনামা ব্যক্তি ও ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মাগণের আবেশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং মহাভ্রমে পতিত হয়। যাহারা মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়াশক্ত, স্বার্থপর ও পাপী। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রেতচক্রের সাহায্যে মিথ্যা ও কাল্পনিক বিবরণ দিয়া মানবের কৌতূহল বৃদ্ধি করে ও ভ্রান্ত লোক-দিগকে অশাস্ত্রীয় প্রবাদ শিক্ষা দেয়। এই শ্রেণীর প্রেতদিগের দ্বারাই, 'মানবের জন্মান্তর হয় না' এই মিথ্যা শিক্ষা প্রেত-তত্ত্ববিদেরা

প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি মহর্ষি-শিক্ষিত ভারতবর্ষেও অধুনা এই শিক্ষা প্রচারিত হইতে বসিয়াছে।”

আমার গুরুভাই প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার অপকারিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, আবশ্যক যদ্যপি হয়, আমি বারান্তরে প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার বোধ হয়, আপনাদিগের অলৌকিক রহস্যের লেখক “শ্রীযুক্ত মলয়ানিল শর্ম্মা” যেরূপ সরঞ্জমে তাঁহার দাদামহাশয়ের ঝুলিটি বাহির করিয়াছেন, তাহাতে আমার এ বিষয়ে আলোচনার আবশ্যক হইবে না। ঝুলিটিতে প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত কথাই বোধ হয় আছে। আপনারা যগুপি মানবের কৌতূহল চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে অলৌকিক রহস্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই। আর যগুপি, প্রেত-তত্ত্ব আলোচনায় মানব যে বিষম ভ্রমে নিপতিত হইতেছে, সেই ভ্রমদূর করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগের শ্রম সার্থক হউক।

শ্রীযোগানন্দের গুরুভাই।

ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(২)

গত বৈশাখ সংখ্যায় পাঠক মহোদয়গণ “ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা” শীর্ষক বৃত্তান্তে অমিয়নাথ বাবুর পরিচয় অবগত আছেন। প্রথম যৌবনে তাদৃশ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যে অধুনাতন সবিশেষ-অনুসন্ধান-পরাঙ্মুখ যুবকদের ন্যায় ভৌতিক-ব্যাপারে বিশ্বাস করিবেন না, একথা বলাই

বাহুল্য। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, তিনি দেবতা মানিতেন না—এমন কি জগদীশ্বরের সত্ত্বায় তাঁহার বিশ্বাস একান্ত শিথিল ছিল। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় আর সে অমিয়নাথ বাবু ছিলেন না—তখন তিনি অলৌকিক কোন ব্যাপার শ্রবণে একেবারে অবিশ্বাস করিতেন না। ভৌতিক-ব্যাপারে তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গোঁড়া হিন্দু হইয়া উঠিয়াছিলেন—এমন কি রক্তবর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরখণ্ড পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেও প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যে কয়েকটি ঘটনায় ভৌতিক-ব্যাপারে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, বৈশাখ মাসের "অলৌকিক রহস্যে" 'ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা' তন্মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা। তৎকালে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য জীবিত ছিলেন এবং উভয় ভ্রাতায় প্রাণপণে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিলেন।

অমিয়নাথ বাবুর প্রপিতামহের দুই পুত্র; একটি অমিয়নাথ বাবুর পিতামহ। অমিয়নাথ বাবুর পিতামহেরও দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ অমিয় বাবুর পিতা। কনিষ্ঠ নিঃসন্তান, পরন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতি অসামান্য ভক্তিমান্। সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেন। প্রথমে সকলেই এক পরিবারভুক্ত ছিলেন। পরে অমিয়নাথ বাবুর পিতামহ ও খুল্লপিতামহ অতি সামান্য কারণে বিচ্ছিন্ন হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই খুল্লপিতামহের পুত্রটি পরলোক গমন করেন এবং নানাবিধ ব্যবসায়ে রাতারাতি বড়মানুষ হইতে গিয়া খুল্লপিতামহ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অমিয়নাথ বাবুর পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই মানুষের মত মানুষ। তাঁহারা দুই ভ্রাতায় সংসারের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গ্রাম মধ্যে—শুধু গ্রাম মধ্যে কেন—সেই অঞ্চলে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্যমান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুর বারমাসে তেরপর্ব্ব বিলক্ষণ নিষ্ঠাসহকারে

—যথোচিত সমারোহে সম্পাদন করিতেন। ইহাতে পিতৃব্যের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রধূমিত ও ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উদার-হৃদয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় পিতৃব্যের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা মাসিক ৮৲ আট টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া অপুত্রক পিতৃব্য ও তৎপত্নীর অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃব্য মহাশয় অসূয়াবশে নিয়ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেন এবং প্রত্যহ নিত্যপূজান্তে অন্নদাতা ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অমঙ্গল কামনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। প্রাণপণ পরিশ্রমে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তৎপত্নীও সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর এই মহৎকার্য্যে প্রচুর সাহায্য করিতেন। ফলতঃ স্বামীর "গাঁথুনীর" তিনি "সিমেণ্ট"। কিন্তু ইহাতেও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা একই ভাবে পিতৃব্য ও তৎপত্নীর পরিচর্য্যা করিতেন; তাঁহাদের সন্তোষসাধনার্থ অনেক চেষ্টা করিতেন; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

কালক্রমে গুণধর পিতৃব্য কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। রোগটি ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় যথাসম্ভব চিকিৎসার সুব্যবস্থা, সেবা শুশ্রূষা,ঔষধ সেবনাদি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বৃদ্ধ পিতৃব্যকে বাঁচাইতে পারিলেন না। এক অতিজঘন্য দুর্দ্দিনে ঘনান্ধকারাবৃত রজনীতে বৃদ্ধ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সেদিন ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের সীমা ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি অবশ্যই যথাসম্ভব সৌষ্ঠব সহকারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অমিয় বাবুর পিতৃব্য)

বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় গমন করেন। তথায় তিনি কয়েকটি লাভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। একদা সায়ংকালে তিনি একাকী বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন, জানালায় একটি প্রকাণ্ড মুখ! দেহ নাই—কেবলই একটি মুখ!! মুখটি দেখিবামাত্র তাঁহার বিস্ময় ও আতঙ্কের সীমা রহিল না। মুখখানি আর কাহারও নহে—তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃব্যের!! মুখ হইতে নিরতিশয় কঠোর স্বরে কেবল এইমাত্র বাক্য নির্গত হইল—"উন্নতি করিতে আসিয়াছ? অচ্ছা, উন্নতি কর; দেখি কতটা কি করিয়া তুলিতে পার।" এই বলিয়াই মুখটি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। অমিয় বাবুর পিতৃব্য নির্ভীক ও বলিষ্ঠ পুরুষ—তথাপি এই ব্যাপারে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। একটিমাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্য গৃহান্তরে ছিল; সে তাঁহার পতনশব্দ শুনিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং পরম যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। এই দিন হইতে প্রত্যহ তিনি একাকী থাকিলেই ঐ পিতৃব্য-মুখ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইত এবং কঠোরস্বরে ঐ কয়টিমাত্র কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইত। কিন্তু যখন তিনি অন্য কাহারও সঙ্গে থাকিতেন, তখন কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতেন না। অতঃপর তিনি অগত্যা একজন বলিষ্ঠ শিখকে শরীর-রক্ষারূপে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি দিবারাত্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত থাকিত। যখন সে পাকাদি কার্য্যে প্রভুর নিকট থাকিতে পারিত না, তখন পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইত।

এইরূপ ব্যবস্থায় অমিয় বাবুর পিতৃব্য স্বকীয় পিতৃব্যের বদনদর্শন ও কঠোর ভর্ৎসনা শ্রবণ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে পরে কোন ফল দর্শে নাই। তিনি পিতৃব্যের হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। যখন তিনি পায়খানায় যাইতেন, সেই সময়ে তথায় ঐ ভীষণ ভ্রুকুটি-করাল বদনখানি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিত। এইরূপে মাসাধিককাল অতিবাহিত হইলে, তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে; চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারিলেন না। অতঃপর হতাশচিত্তে তিনি অগ্রজ ভ্রাতাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তিনিও প্রাণোপম কনিষ্ঠের অস্বাস্থ্য সংবাদ অবগত হইবামাত্র সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং কনিষ্ঠের মুখে সমুদায় ব্যাপার অবগত হইয়া অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। একদা কনিষ্ঠ কহিলেন, "দাদা, বোধ হয় আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। পিতৃব্যের করালকবলে আমাকে অতি শীঘ্রই প্রবেশ করিতে হইবে। আমি অনুক্ষণ দেহমধ্যে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব দুর্বিবহ যাতনা ভোগ করিতেছি। চিকিৎসকগণকে এই যাতনার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত করাইয়াছি; কিন্তু তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না—রোগটি যে কি, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।—এদিকে প্রত্যহই খুড়া মহাশয়ের ভীষণ মুখ দেখিতেছি—মূহুর্ত্ত-মাত্র আমাকে একাকী পাইলেই তিনি আমায় দর্শন দিয়া ঐরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন।" এ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জ্যেষ্ঠ একেবারে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন—অতঃপর তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরম যত্নে ভ্রাতার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আর কিসে তিনি পিতৃব্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য অনেক উপায় করিতে লাগিলেন—কত যাগ যজ্ঞ হইল—কত ভৌতিক-চিকিৎসক আসিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই

কনিষ্ঠ শয্যাশায়ী হইলেন। এখন প্রতিনিয়ত পিতৃব্যের ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রোপরি আবির্ভূত হইতে লাগিল। কি যে এক দুঃসহ যাতনায় তিনি মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, তাহার মূল নির্ণীত হইল না। যাতনার কোনরূপ প্রতীকার চিকিৎসার ক্ষমতাতীত বোধ হইল। অল্প দিনের মধ্যেই জ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে তদ্গতজীবন কনিষ্ঠের প্রাণবায়ু কোথায় অনন্তে বিলীন হইয়া গেল।

প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠ সহোদরের ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ জীবন্মৃত-প্রায় রহিলেন। তিনি চিত্তের স্বাভাবিক দৃঢ়তাবশে কথঞ্চিৎ শোক-সংবরণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং বৈষয়িক কার্য্যে অধিকতর ব্যাপৃত থাকিয়া ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর একমাত্র পিতৃব্যপত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনার্থ ৪৲ টাকাই যথেষ্ট মনে করিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মাসিক ৪৲ টাকা করিয়াই দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু গুণবতী পিতৃব্যপত্নী স্বাভাবিক অসূয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। অমিয়নাথের পিতা এ পর্য্যন্ত পুত্রবৎ তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তিনিই বৃদ্ধার শেষজীবনের প্রধান অবলম্বন, তথাপি বৃদ্ধাও অবিচলিত ভাবে প্রতিনিয়ত তাঁহার অমঙ্গল-চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, তাঁহার কিছু না কিছু অনিষ্টসাধন না করিয়া বৃদ্ধা জলগ্রহণ করিতেন না। প্রতি বৎসর অমিয়নাথের পিতা পরম সমারোহে দীপান্বিতা পূজা করিতেন। তিনি নিজে পূজায় ব্রতী থাকিতেন। এবার দীপান্বিতা পূজার প্রায় একমাস পূৰ্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা পিতৃব্য-পত্নীর একটু একটু জ্বর দেখা দিল। পীড়াটি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে পূজার পূৰ্ব্বদিন বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছিল। পাছে

পূজার দিন—পূজাকালে পিতৃব্যপত্নীর মৃত্যুনিবন্ধন অশৌচে পূজার ও ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্যের নিতান্ত অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অমিয়নাথের পিতা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী তাঁহারই একটি বাটীতে বৃদ্ধা ইদানীং বাস করিতেন। বৃদ্ধার মুখদোষে এবং দুঃশীলতায় গ্রামের সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিত। কেবল অমিয়নাথের পিতার মুখাপেক্ষী ২।১ জন স্ত্রীলোক বৃদ্ধার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্তরের আকর্ষণের অভাবে সেবা শুশ্রূষাকার্য্য যতটুকু হইতে পারে—তাহাই হইতেছিল। বৃদ্ধা ঐ দীপান্বিতা অমাবস্যার রজনীতে—নিশীথকালে—দেহত্যাগ করিল। তৎকালে তাহার কাছে কেহই ছিল না; সকলে পূজাদর্শনে গিয়াছিল। সুতরাং বৃদ্ধার মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে অমিয়নাথের পিতার নিকট পৌঁছিল না। তিনি পূজাকার্য্যে একাগ্রচিত্ত ছিলেন—এবং পূজান্তে ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন—পিতৃব্যপত্নী এসময়ে তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল। পরদিন বেলা ৯টা ১০টার সময় এই সংবাদ অমিয়নাথের পিতার কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃব্যপত্নীর মৃতদেহের সংকারের ব্যবস্থা করিলেন এবং যথাশাস্ত্র তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন।

মাসাধিককাল পরে একদা অমিয়নাথের পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন। কার্য্য সম্পাদন করিতে দিবাভাগ অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে তথা হইতে অতি দ্রুতপদসঞ্চারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেহে অতুল সামর্থ্য—হস্তে সুদীর্ঘ পক্কবংশ-নির্ম্মিত যষ্টি। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। এদিকে পৌর্ণমাসী রজনী—আকাশ নির্ম্মল—সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। কৌমুদী-

বিমণ্ডিতা প্রকৃতি দেবী শুভ্র কৌষেয় বস্ত্রে কলেবর আচ্ছাদন করিয়া হাস্যচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন। অমিয়নাথের পিতা প্রকৃতির তথাবিধ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মুগ্ধ—অন্যমনস্ক। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি নিজ গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রকাননের নিকট উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কাহারো কঠোর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণ গোচর হওয়ায় তাঁহার অন্যমনস্ক ভাব দূর হইল। যে দিক হইতে শব্দটি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন—সুদীর্ঘকায়া রমণী মূর্ত্তি—বিকট পৈশাচিক হাস্যে আম্রকানন মুখরিত করিয়া দণ্ডায়মানা। মূর্ত্তিটি অপর কাহারও নহে—তাঁহারই পিতৃব্য-পত্নীর!! দেখিবামাত্র তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বিরক্তি সহকারে কহিলেন "আবার কেন?" মূর্ত্তিটি পুনরায় বিকট হাস্য সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আবার কেন? শুনিবে? কর্ত্তার হাতে তোমার ভাই—আর আমার হাতে তুমি! কেমন বুঝেছ ত?" এই কথা শ্রবণ মাত্র মহা ক্রোধে—"আঃ পাপীয়সি—আজও তোমাদের জঘন্য হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল না—এখনো সাধ মিটিল না" এই বলিয়া তিনি করস্থিত সেই সুদীর্ঘ যষ্টি মহাবেগে ঐ মূর্ত্তির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মূর্ত্তিটি পুনরায় সেই পৈশাচিক বিকট হাস্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তিনিও যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া বিচলিত চিত্তে গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার পর মধ্যে মধ্যে ঐ রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইত এবং ঐ একই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইত। দুই এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার দেহের ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। তিনি পুত্র অমিয়নাথকে সত্বর বাটি আসিতে পত্র লিখিলেন। অমিয়নাথ পিতার পত্র প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা কহিলেন,—"বৎস, তোমার পিতৃব্যের মৃত্যুর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত

আছ—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। আমি খুড়ীমাতার হাতে পড়িয়াছি। তিনি আমাকে না লইয়া ছাড়িবেন না। তুমি বিষয় আশয় সমস্ত বুঝিয়া লও।” এই বলিয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে থাকিতে আদেশ করিলেন। অমিয়নাথ চাকরী ত্যাগ করিয়া পিতার চরণতলে দিবারাত্র উপস্থিত থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। চিকিৎসাদির কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যেই পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অমিয়নাথ এই তিনটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভৌতিক-ব্যাপারে আস্থা স্থাপনে বাধ্য হন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভূতের চণ্ডিপাঠ।

বৈশাখ মাস। অত্যন্ত গ্রীষ্ম। শনিবার দুইটার সময় আফিসের ছুটি হইলে যখন রাস্তায় আসিয়া ট্রাম গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রবল বায়ুতে সর্ব্বশরীর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ মেসের বাসায় থাকিয়া দুই দিনের জন্য আজ বাটী যাইব। রৌদ্রের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাম গাড়ীতে উঠিলাম এবং যথা সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া ২-৩০ মিনিটের গাড়ীতে সাড়ে তিনটার সময় নিজগ্রামে পৌঁছিলাম।

টিকিট দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই গোবিন্দ খুড়া একখানি দোকানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন “এই যে প্রিয়নাথ এয়েচ, আমি আরো ভাবিতেছিলাম। আজ হেমের বিবাহ; তোমাকে যাইতে হইবে। তোমার কাপড় চোপড় সব বাড়ী হইতে আনিয়াছি।

তোমাদের চাকর আমাদের সঙ্গে যাইতেছে। তাহার নিকট তোমার আফিসের কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দাও।” স্বয়ং হেমও আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল “যাবেনা ভাই! না গেলে তোমার সঙ্গে আর কথনও কথা কহিব না।” হেম আমার খুল্লতাত-পুত্র। তাহার পিতামহ ও আমার পিতামহ দুই সহোদর ছিলেন। সমবয়স্ক, সহপাঠী ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হেমের অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কাজেই যাইতে হইল। আমার সমবয়স্ক আরো ৪।৫টি বন্ধু আসিয়াছিল।

যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে আমরা সকলে বর লইয়া এক কামরায় উঠিয়া পরস্পর হাস্য পরিহাস করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। বিবাহ কলিকাতার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বারুইপুরের নিকট কোনও পল্লী-গ্রামে হইবে। কন্যাকর্ত্তার বাটী পৌছিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। বিবাহের লগ্ন রাত্রি ১১টার পরে। অতএব কন্যাকর্ত্তার অনু-রোধে পৌছিবার কিঞ্চিৎ পরেই বরযাত্রীদের আহারাদির স্থান হইল। আহারাদি শেষ হইলে অনেক বরযাত্রী বাটী ফিরিলেন। কেবল আমরা ১০।১৫ জন যাহারা বরের পরম আত্মীয় তাহারাই রহিলাম।

বরযাত্রীদের বিদায় করিয়া যাঁহারা শয়ন করিতে চাহিলেন, তাহা-দের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিবাহ আরম্ভ হইল। বিবাহ সভায় বরকর্ত্তার সহিত আমরা ৪।৫ জন বরের বন্ধু উপস্থিত হইলাম। বিবাহ শেষ হইতে রাত্রি ১টা বাজিল। তাহার পর আহার করিয়া আমরা যখন শয়ন করিলাম, তখন প্রায় রাত্রি দেড়টা।

বরযাত্রীদের শয়নের যেখানে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সেখানে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। কাজেই কন্যাকর্ত্তার বাটীর নিকট অন্য এক বাটীতে আমাদের শয্যা হইল।

ঐ বাটীর সদরে দরজা-বসান একটী ছোট পূজার দালান ও তাহার লাগাও একটী বৈঠকখানা। বৈঠকখানার দরজা সদাই তালা-বন্ধ থাকে। প্রাঙ্গণ আবর্জ্জনা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় বাটীতে কেহ বাস করে না। বস্তুত দুইটী বিধবা স্ত্রীলোক ব্যতীত বাটীতে আর কেহই থাকে না। তাঁহারাও সর্ব্বদা অন্দরমহলে থাকেন। সদর বাটীতে আসিবার তাঁহাদের বড় আবশ্যকতা হয় না। শুনিলাম, বাটীর কর্ত্তা বিদেশে চাকরী করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করেন। পূজার দালানে বিছানা করিয়া আমরা ৩।১ জন সমবয়স্ক বন্ধু, দুইজন চাকর ও নাপিত শয়ন করিলাম। তখন প্রায় রাত্রি আন্দাজ আড়াইটা হইবে।

শয়ন মাত্রেই সকলে নিদ্রিত হইল, কেবল আমার আর বিপিনের নিদ্রা আসিল না। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া আছি। চারিদিক নিস্তব্ধ। মৃদুমন্দ বায়ু নিকটস্থ বৃক্ষ শ্রেণীতে লাগিয়া সন্ সন্ শব্দ হইতেছে। একাদশীর চন্দ্র সবে মাত্র অদৃশ্য হইয়া ধরাতলে অন্ধকার বিস্তার করিয়াছে, এমন সময়ে নিকটস্থ বৈঠকখানায় হঠাৎ খড়মের শব্দ হইল। বোধ হইল, যেন কেহ খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতেছে! ২।১ মিনিট স্থির হইয়া শুনিলাম। ঠিক বৈঠকখানার ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে। তখন বিপিন কহিল—

"শুনিতে পাইয়াছ? কি বল দেখি?"

আমি। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বৈঠকখানায় কি কেহ আসিয়াছে? কিন্তু কেমন করিয়াই বা আসিবে সদর দরজা বন্ধ। অন্দরমহল দিয়া আসিতে হইলে দালানের উপর দিয়া যাইতে হইবে। কারণ, উঠান জঙ্গলে পূর্ণ। সেখানে রাত্রে কেহ যাইতে সাহস করিবে না।

বিপিন। তাইত, আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মীনারায়ণকে আলো জ্বালিতে বলিলাম—সে বলিল "ভয় কি? ও কিছুই নয়। রাম রাম রাম বল, ব'লে চুপ করে ঘুমাও।"

আমরা হাসিয়া বলিলাম "লক্ষ্মীনারায়ণ! তুমি যখন কাছে রহিয়াছ, তখন আমাদের ভয় কি? তবে এরূপ অবস্থায় অন্ধকারে থাকাও ভাল নয়। মন্দ লোকও ত আসিতে পারে?"

আর অধিক আপত্তি না করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ লণ্ঠন জ্বালিল। ইতি-মধ্যে খড়মের শব্দ মধ্যে মধ্যে হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইতেছে। লণ্ঠনটি লইয়া আমরা বৈঠকখানার বারাণ্ডায় গেলাম; গিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানায় তালা বন্ধ। দরজার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল দুই বৎসর তালা খোলা হয় নাই। সদর দরজাও আমরা যেমন বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেইরূপই রহিয়াছে। বৈঠকখানার ভিতর যতদূর আলো যাইতে লাগিল, ভাল করিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমরা যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ বন্ধ হইয়াছিল। কিছু দেখিতে না পাইয়া আমরা আসিয়া বসিলাম। লক্ষ্মীনারায়ণকে তামাক সাজিতে বলিয়া দুই তিন মিনিট বসিয়া আছি। পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল। এবার খড়মের শব্দ নয়,—কেশোকুশীর। পুনরায় আলো লইয়া উঠিলাম। এবার কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল "তাঁহারা উপদেবতা (বলিয়া উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিল) পূজা করিতেছেন। পূজার ব্যাঘাত করিলে তাঁহাদের অভিসম্পাতে পড়িতে হইবে"। কিন্তু যখন দেখিল যে, আমরা তাহার আপত্তি শুনিলাম না, তখন কাজেই আমাদের সঙ্গে চলিল। এবারও কিছু দেখিতে পাইলাম না। কাজেই তাম্রকুটে মনোনিবেশ করিলাম।

ইতিমধ্যে অন্যান্য বন্ধুত্রয় হুঁকার শব্দে উঠিয়া বসিল। সকলে মিলিয়া উপস্থিত বিষয়ে আন্দোলন করিতেছি—পুনরায় কোশাকুশীর শব্দ ও তৎসঙ্গে সুমিষ্টস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। যেন কেহ চণ্ডিপাঠ করিতেছে। আমরা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া কথা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। ১০।১৫ মিনিট স্থির ভাবে শুনিলাম। পরে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। বৈঠকখানার তালা অতি পুরাতন, খুলিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

তালা খুলিবার সময় মন্ত্রোচ্চারণ ও কোশাকুশীর শব্দ একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। কেবল বিরক্ত হইলে লোকে যেরূপ "উঁঃ" "উঁঃ" শব্দ করে, সেইরূপ শব্দ ঘরের ভিতর হইতে শোনা যাইতে লাগিল। তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আমরা অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিত্যক্ত হুঁকা গ্রহণ করিয়া তামাক খাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় দালান হইতে বৈঠকখানায় যাইবার দরজায় বিপিনের দৃষ্টি পড়িল।

"ওরে বাবারে ; ও কি ?" বলিয়া বিপিন চীৎকার করিয়া উঠিল। আমাদের সকলের দৃষ্টি কাজেকাজেই সেই দিকে পড়িল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বশরীর কম্পিত ও বাক্য-রোধ হইল। দেখিলাম, এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও রুদ্রাক্ষ লম্বমান। নামাবলীর উত্তরীয়। এক দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতেছে। একটু স্থির হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে ?" কোনও উত্তর নাই। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তথাপি নিরুত্তর। ইতি মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ করপুটে প্রণত হইয়া বার বার বলিতে লাগিল "বাবা ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" প্রায় ৫ মিনিটের পরে বোধ হইল যেন

মনুষ্যমূর্ত্তি দেয়ালের সহিত মিশিয়া গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিয়া ঘড়ি দেখিলাম,৪টা বাজিয়া গিয়াছে; তখন আর এবিষয় চেষ্টা করা বৃথা বিবেচনায়, বাকী রাত্রি টুকু গল্প সল্প করিয়া কাটাইলাম। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দুই একটি প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া, বরের সহিত বন্ধুগণের নিকট আসিলাম। তাহারা তখন গ্রামস্থ কয়েকটি যুবকের সহিত ঐ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন। ঐ গ্রামবাসী একটি শিক্ষিত যুবক বলিতেছেন—"আমরা অনেক অনুসন্ধান—অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। কাজেই ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইয়াছে।" আর একটি কলিকাতাবাসী যুবক বলিলেন, ভূত কখনও বিশ্বাস করি না। আর যতক্ষণ চক্ষে না দেখিব—ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করিব না। ভূত যে চণ্ডী পাঠ করে, ইহা আশ্চর্য্য ও অসম্ভব, এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সেইখানে কন্যাকর্ত্তার গুরুদেব বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতে ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকৃতি ঋষির ন্যায়; দেখিলে ভক্তি হয়। তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "বাপু এই বিশ্ব সংসারে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা বুঝিতে পারি, বা সমালোচনা করি, এমন বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের নাই। কোন বিষয় বুঝিতে পারিলাম না ব'লে, কাহাকেও অবিশ্বাস করা উচিত নয়। এই ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ঘটনা আমি চাক্ষুষ দেখিয়াছি যাহা শুনিলে তোমরা বিশ্বাস ত করিবেই না, অধিকন্তু আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবে।"

আমাদের ঐ ঘটনা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইল। উহা বলিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন—"এখন-

কার সময় নয়, তোমরা ত বৈকালে যাইবে? আহারাদির পর বলিব। আহারাদির পর তিনি যে গল্প বলিলেন পর সংখ্যায় তাহা বিবৃত করিব।”

উপস্থিত ঘটনার আমরা আবার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এখন শুনিতেছি সেই বৈঠকখানা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। গৃহ-কর্ত্তাও পেন্‌সন্ লইয়া সপরিবারে বাটী আসিয়া বাস করিতেছেন, এখন আর কোনও গোল নাই।

শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৯১ পৃষ্ঠার পরে)

বেলা অবসান হইয়াছে। ভগবান মরীচিমালী পশ্চিমগগনে অস্তাচলচূড়া আরোহণ করিয়াছেন। সোণার কিরণে দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষলতা শ্রেণী, মাঠ, বাট, ঘাট সমস্ত যেন কি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। দিবসের ক্লান্তিদূর করিয়া ফুর ফুরে দখিনা বাতাস বহিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এক এক করিয়া বয়স্যগণ সকলে মিলিত হইয়া রহস্য মধ্যে প্রবৃত্ত হইল। ব্যোমকেশ আজ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। যেন কি একটা কঠিন সমস্যা তাহার মাথায় ঘুরিতেছে, তাই সঙ্গিগণের প্রগল্‌ভ বাক্‌চাতুরীর মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। এমন সময় ধীরপাদবিক্ষেপে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য। বলি ভায়ার ভাবটা যে আজ কেমন কেমন ঠেক্‌চে। মুখখানা ওরূপ গম্ভীর কেন? নাতবৌএর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হয়েচে না কি?

ব্যোমকেশ। না দাদা ম'শায়, কাল থেকে আপনার কথাগুলো

আমায় একটু ভাবিয়ে তুলেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, বাস্তবিকই তো আমার নিজের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আত্মা ও শরীর ব'লে দু'টো কথা মুখস্থ ক'রে রেখেছি মাত্র, কই ভিতরের মর্ম্মতো কিছু গ্রহণ করতে পারি নি!

ভট্টাচার্য্য। ভায়া, ভিতরের মর্ম্ম বুঝতে হলে ভিতরে ঢুক্‌তে হবে, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করবার জন্য সাধনা করতে হবে, তা হলে যিনি বাহিরে বহু হয়ে বিরাজ কচ্চেন, ভিতরে তাঁকে একরূপে সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দেখবে, তখন আসল কথা বুঝবে।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় এতটা একবারে মাথায় প্রবেশ করবে না। আপনি যেরূপ বাড়াবাড়ি করে তুলচেন, তাতে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হচ্চে। হচ্চিল ভূতের কথা, ক্রমশঃ সূক্ষ্মশরীর এল, শেষে এখন সব ধরে টান দিচ্চেন। আমি অত গোলমালের মধ্যে নেই।

ভট্টাচার্য্য। ও রে, ও কাণ টানলেই মাথা আসে। তোকে তো আমি পূর্ব্বেই বলেচি, যে মানবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হ'লে, প্রেততত্ত্ব ভাল ক'রে আলোচনা করা যায় না। কথাটা যখন উঠেছে; একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর। বলি অভিব্যক্তি জিনিষটা বুঝিস্ কি?

ব্যোমকেশ। খুব বুঝি! যাকে আমরা—Evolution বলি? তাইতো Spencer এর মতে Evolution হচ্চে a continuous passing from the homogeneous to the heterogenous under the influence of the environment—

ভট্টাচার্য্য। ভাল মোর দাদারে, যেন খই ফুটলো! বলি অত বাগাড়ম্বর ছেড়ে দিয়ে সোজা সুজি বাঙ্গলা ভাষায় বল না জিনিষটা কি? সবাই তো আর তোমার মত Darwin, Spencer এর আদ্য শ্রাদ্ধ করে নি!

ব্যোমকেশ। ঘাট—হয়েচে দাদা ম'শায়, এই নাকে খৎ দিলাম, আর যদি ইংরাজী বলি। এখন কি বলতে হবে বলুন?

ভট্টাচার্য্য। কোন একটা উদাহরণ দিয়ে ওই তোর Evolution এর ব্যাপারটা ভাল করে বুঝাবার চেষ্টা কর দেখি।

ব্যোমকেশ। ধরুন না কেন এই গাছটা কি করে হ'ল? ঐ বীজ থেকে তো? প্রথমে বীজ ছিল, তার পর সেই বীজ থেকে বৃক্ষের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ হয়েচে।

ভট্টাচার্য্য। কি করে হ'ল?

ব্যোমকেশ। কেন, বীজটা মাটিতে পোঁতা হলে, ক্ষিতি, জল, বায়ু, উত্তাপ ইত্যাদি বিভিন্ন জাগতিক শক্তি ওর উপর ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। যেম্নি প্রোথিত বীজের উপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া সুরু হলো, অম্নি বীজের মধ্যে নিহিত শক্তিতে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হ'লো। এই সংঘর্ষের ফলে নিদ্রিত বীজশক্তি মূর্চ্ছাবস্থা বা অপ্রকটভাব পরিত্যাগ করে অঙ্কুররূপে বাহিরে এসে ক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত হ'ল।

ভট্টাচার্য্য। বেশ, বেশ—সোজা কথায় বল্‌না কেন, বীজের মধ্যে একটা শক্তি ঘুমিয়ে ছিল। বাহিরের শক্তির তাড়নায় সেটা জেগে উঠে বাহিরে এসে বৃক্ষাকারে দেখা দিলে। এরি নাম হ'ল অভিব্যক্তি বা পরিণাম। এখন এই জগৎটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখ্‌বে সর্ব্বত্রই এই পরিণামক্রিয়া বা অভিব্যক্তির ব্যাপার চলেছে। এই অভিব্যক্তি শুধু বাহিরের স্থূলজগতেই সীমাবদ্ধ নয়; মানবাত্মার মধ্যেও ইহা পরিদৃশ্যমান। বীজ যেরূপ মৃত্তিকাতে প্রোথিত থেকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হয়ে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়,—মানবাত্মা রূপ বীজ সেইরূপ এই সংসারক্ষেত্রে থেকে ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্ম স্বারূপ্য লাভ করে। এবং মৃত্তিকার ক্রোড় ও জলবায়ু উত্তপাদির সংস্পর্শ ভিন্ন

যেরূপ বীজ-মধ্যস্থ বৃক্ষের অভিব্যক্তি হয় না, সেইরূপ প্রকৃতির ক্রোড় ভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে নিহিত ব্রহ্মশক্তির ও উদ্বোধন হয় না। তাই জীব প্রথমাবস্থায় সংসার ভোগ করবার জন্য আসে, এবং মাতৃস্তন্যের ন্যায় প্রকৃতি নিহিত ব্রহ্মরস পান ক'রে দিন দিন পুষ্টিলাভ করে। ইহারই নাম প্রবৃত্তিমার্গ। এই প্রবৃত্তিমার্গী জীব ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নস্থ লোকত্রয় আশ্রয় করে থাকে, আর জন্মের পর জন্ম এই তিনটি লোক আস্বাদন করতে থাকে। এই লোকত্রয়ের নাম ভূঃ ভুবঃ এবং স্বর্, অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক। যতদিন পর্য্যন্ত এই লোকত্রয়ের রসাস্বাদন রূপ বাসনার ক্ষয় না হয় ততদিন বার বার জন্মপরিগ্রহ করতে হয় এবং মর্‌তে হয়। এই হ'ল সংসার চক্র, যার আবর্ত্তনে পড়ে আমরা দিবারাত্র ঘুরপাক খাচ্চি। এ পর্য্যন্ত কথাটা বুঝিলি কি ?

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়, গোলযোগ বড়ই বেড়ে গেল দেখ্‌চি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওসব মেলা কি বল্লেন কিছুই বুঝলাম না। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।

ভট্টাচার্য্য। মন দিয়ে শোন্। যাকে তোরা Nature বলিস সে টা কি উপাদানে তৈয়ারী বল্ দেখি ? আর তার বিস্তৃতিই বা কত দূর ?

ব্যোমকেশ। কেন, Nature বা প্রকৃতি ত জড়পদার্থ, আর ইহার উপাদান তো জড়ের পরমাণু সমূহ।

ভট্টাচার্য্য। এই পরমাণু সমূহ সমস্তই কি এক প্রকৃতি বিশিষ্ট ?

ব্যোমকেশ। তা কেন ? কেহ বা কঠিন, কেহ বা দ্রব কেহ বা বায়বীয় অবস্থাপন্ন।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে বুঝা গেল ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের মতে জড়-পদার্থ কাঠিন্য, তারল্য ও বাষ্পাকৃতি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন এবং এই তিন প্রকারের অতীত আর কোন অবস্থা জড়ের বা প্রকৃতির নাই। কেমন ?

বোমকেশ। হাঁ, তা ছাড়া বিজ্ঞান ঈথর বা আকাশ বলে আর একটা অদৃশ্য অচিন্ত্য ও অপরিমেয় পদার্থ স্বীকার করে, সেই ঈথর পদার্থকে আপনার হিসাবে জড়ের চতুর্থ অবস্থা বলা যেতে পারে।

ভট্টাচার্য্য। ভাল কথা, তা হ'লে তোমাদের মতে ঈথার এ এলেই জড় জগতের প্রান্তসীমায় এসে পৌছান গেল। এই খানেই matter বা জড়ের শেষ? কেমন?

বোমকেশ। তাই—আপনাদের বিজ্ঞানে কি আরও কিছু বলে না কি? কিন্তু এটা মনে রাখবেন বিনা প্রমাণে কোন কথা গ্রাহ্য হবে না।

ভট্টাচার্য্য। অত ব্যস্ত হ'ন্ কেন? তোরা যে ঈথার মানিস্ সেটা কোন্ প্রমাণের বলে? এই মাত্র তো শুনলাম যে সেটা অদৃশ্য, অচিন্ত্য ও অপরিমেয়?

বোমকেশ। দাদাম'শায় এই বার ঠেকিয়েচেন। বিজ্ঞানের রাজ্যে সত্য আবিষ্কারের একটা পদ্ধতি এই যে, কোন একটা বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারণ করতে হলে সময়ে সময়ে কোন একটা অভিনব বা অজ্ঞাত পদার্থের কল্পনা করতে হয়, এবং কথনও কথনও সেই পদার্থটা কিরূপ শক্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্ট সেটাও অনুমান বা কল্পনা করে নিতে হয়। পরে যখন গণিতশাস্ত্রের নিয়মগুলি সেই পদার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য দেখা যায় এবং তাহার সাহায্যে এমন অনেক নূতন বিষয় জান্তে পারা যায় যেগুলা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, আর তার অস্তিত্ব স্বীকার করে-নিলে নূতনতর কোন গোলযোগের মধ্যে না—পড়তে হয়, তখন বৈজ্ঞা-নিকেরা সেই কাল্পনিক পদার্থটাকে—সত্য বলে গ্রহণ করেন। ঈথর সম্বন্ধে ঠিক এই কথা গুলি খাটে। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এখন ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েচেন।

ভট্টাচার্য্য। ভায়া, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এই প্রকাণ্ড হাতী গুলো

অনায়াসে—গলাধঃকরণ করেচ, যত অরুচি কেবল দেশী মুনি ঋষিদের বিজ্ঞানের বেলায়। তখনই কেবল চোখে না দেখলে কুছ্ নেহি মান্‌তা হ্যায়!

ব্যোমকেশ। আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না। আপনাদের শাস্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীটার মোটেই কোন সংবাদ পাওয়া যায় না যে! ইউরোপীয় পণ্ডিত দশটা দেখে শুনে তার উপর যুক্তিতর্ক খাটিয়ে তবে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করেন। দিনরাত Laboratory তে পরিশ্রম কচ্চেন, কত পরীক্ষা কচ্চেন,তবে একটা আধটা সত্য নির্দ্ধারিত হচ্চে। মুনি ঋষিরা ল্যাবরেটরির্ কোন ধার ধারতেন বলে তো শুনিনি।

ভট্টাচার্য্য। শুনবি কি করে বল্, সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই। কাল-ধর্ম্মে সবই লুকিয়ে গিয়েছে। এখন তোরা পলাশীর হতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সুরু করিস্, আর তার আগে দেখিস্ শুধুই ধোঁয়া। তোদের দোষ কি বল্, দেশে যেমন শিক্ষা প্রচলিত হয়েচে, তোরা তো তাই শিখ্‌বি। আজ তোরা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ল্যাবরেটারিতে পরিশ্রম করা দেখে অবাক্ হয়ে গেছিস্! তাঁদের উদ্যম ও সত্যনিষ্ঠা শতমুখে প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং তোরা আজ কাল যেরূপ 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্ত্তি মাত্র লক্ষ্য করে বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশ করিস, তাতে যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের সত্যানুরাগ ও জ্ঞানলাভেচ্ছার বিষয় চিন্তা করতে শিখ্‌লে তোদের অশেষ কল্যাণ হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুলে যাস্‌নে যে ওর শতগুণ উদ্যম, সহস্রগুণ সত্যানুরাগ একদিন এই ভারতভূমিতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা দেখিয়ে গিয়েছেন। সত্যলাভের জন্য তাঁরা বনে, পর্ব্বত-গুহায়, জনহীন প্রান্তরে, অর্দ্ধাশনে, অনশনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ

তোরা কথায় কথায় পাশ্চত্য পরীক্ষা সিদ্ধ প্রণালীর (experimental method) উল্লেখ করে আমাদের শাস্ত্রীয় সত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিস, কিন্তু তোরা জানিস না যে ঋষিরা এমন একটা জিনিষের বিষয় উল্লেখ করে যান নাই, যেটা তাঁদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। রসায়ন, জ্যোতিষ শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা যা কিছু আবিষ্কার করে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত উন্নতি করেও এখনও তার নিকট পৌঁছিতে পারে নি।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় এখনকার মত ল্যাবরেটারী যে তখন বা কোন কালে এদেশে ছিল, এ দাবী আজ পর্য্যন্ত কেহই করেন নি। তবে কি ক'রে তাঁরা এই সব সত্য আবিষ্কার করতেন, তা আমিতো ভেবে ঠিকই পাই না। কাজে কাজেই মনে কেমন সন্দেহ হয়। এ সম্বন্ধে আপনার বলবার কি আছে?

ভট্টাচার্য্য। বেশ করে কথাটা বোঝ্। প্রমাণতত্ত্ব বুঝাবার সময় তোকে বলেছি প্রত্যক্ষই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একথা আজ শুধু যে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বল্‌চেন তা নয়, আমাদের দেশেও এই মত চিরদিন সমাদৃত। তুই যদি বলিস্, তবে শাস্ত্রগুলো কি, আর বরাবরই এদেশে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হয় কেন? তার উত্তরে এই যে, শাস্ত্র-নিহিত তত্ত্বগুলি ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য, তাই শাস্ত্রের এত আদর। কল্পনা এখানে আদর পায় না, এমন কি তুই যেরূপ বৈজ্ঞানিক কল্পনার কথা বল্‌লি, তাও না। ঋষিরা জাগতিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ কত্তেন, তাই আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র শুধু চিন্তামাত্রের ফল নয়। তবে বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রণালীর সহিত তাঁদের অনুসৃত প্রণালীর একটা মূলগত পার্থক্য ছিল। ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ জান্‌তে চেষ্টা করে। ঋষিরা তা করতেন না। তাঁরা ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা জানতেন যে, মানুষের

মধ্যে এমন সব শক্তি নিহিত আছে, যেগুলার স্ফুরণ হ'লে মানুষ অনায়াসে জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে। যে বিদ্যা প্রভাবে তাঁরা এরূপ করতে সমর্থ হতেন, তার নাম যোগবিদ্যা। যোগ কথাটা উচ্চারণ করলেই তোরা একটা কিছু আজগুবি ঠাউরে বসিস্। মনে করিস যে, ও একটা গঞ্জিকাধূম সংস্কৃত মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। অতি যত্নের সহিত ইহার অনুষ্ঠান করতে হয়। আর সে জন্য যেরূপ কঠোরতা, আত্মসংযম, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দরকার, তার তুলনায় তোদের ল্যাবরেটারির পরিশ্রম কিছুই নয়। এখনও এ বিদ্যা এ দেশ হ'তে লোপ হয় নি। এই যে ছাইভস্ম মাখা, ল্যাংটা, চিম্‌টাহাতে মানুষগুলা ঘুরে বেড়ায় দেখেতে পাস্, এদের ভিতর এমন এক এক জন এমন মহাশক্তিশালী পুরুষ আছেন, যাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে, তোদের অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান। কিন্তু যাক ও সব কথা—আমরা কথায় কথায় মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসে পড়েছি। কথাটা হচ্ছিল জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে—

ব্যোমকেশ। দাদামশায় মাপ করুন। রাত্রি অনেকটা হয়ে পড়েচে, এখন আবার নূতন করে জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলে আমার অবস্থাটা বড়ই বেগতিক গোছের হয়ে পড়ে। অতএব অনুগ্রহ করে এখন ছুটি দিন, কাল আবার দেখা যাবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

যমালয়ের পত্রাবলি।

১ম পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দূর,-দূর—কতদূর আমার এখন মনে নাই, সেই ক্ষীণ আলোক রশ্মি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি ছুটিতে লাগিলাম। আমার দুই পার্শ্বে ঘন কুয়াসা তাহার মধ্যদিয়া আমি যেন বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখিতে লাগিলাম। আবার কোথাও বা লোকসমাগম পূর্ণ জনপদ আমার দৃষ্টি গোচর হইল। আমি কত কি মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার পরিচয় আর কি দিব? তোমাদের জগৎ যেন ছায়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার সঙ্গে ছুটিতে ছিল। আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনেক সময়েই বিস্ময়ে, ভয়ে ও দুঃখে আত্মহারা হইতেছিলাম। আমি ছুটিতেছি, কত কি দেখিতেছি, দুঃখে কাতর হইতেছি, অথচ আমার মনে হইতে ছিল, যেন আমি নাই। নিজ অস্তিত্বের অভাব বোধটা কে জানে কেন আমার চিত্তকে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া বসিতে ছিল। যতই যাইতে লাগিলাম, আমার সে স্থানের বা সে অবস্থার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছিল; কিন্তু সে কি অভিজ্ঞতা? তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার কোনও ফল নাই। তবে একটা ঘটনা উল্লেখ করিব; তাহা হইতেই সেই বীভৎস অবস্থাটা যে কিরূপ, তাহা তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

পথের ধারে, একখানি স্বচ্ছ ছায়া গৃহ; সেই গৃহের দ্বারাই যেন আকৃষ্ট হইয়া আমি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম; সেটা একটা শৌণ্ডিকালয় (শুঁড়িখানা) জীবদ্দশায় আমার পানাসক্তি ছিল; কিন্তু কখনও শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করি নাই। সেখানে প্রবেশ করিতে আমার অতিশয় ঘৃণা বোধ হইত। লোক-লজ্জায় আমি কখনও তাহার

ভিতর যাই নাই। যাহা হউক, এখানে দেখিলাম, ভিতরে ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত কতজন আমোদ প্রমোদ করিতেছে,—কেহ মদ্যপান করিতেছে, কেহ দ্যূত-ক্রীড়া করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতের উৎস ছুটাইতেছে ও অশ্লীলভাষায় পরস্পরকে অভিবাদন করিতেছে। সেই বিকট প্রকৃতির লোকদিগের বীভৎস স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাসের কথা কি আর বর্ণনা করিব! তাহাদিগের মধ্যে ঐকজন,-চেহারায় তাহাকে গৃহস্বামী বলিয়া মনে হইয়াছিল,—আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। ভিতরে প্রলোভনজনক অগ্নি, তাহার উপর উত্তপ্তজল হইতে উষ্ণ ধূম নির্গত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে চা-পানপাত্র সজ্জিত রহিয়াছে; এদিকে আমি শীতে কাঁপিতেছি। সুতরাং আমি কিছু না বলিয়া একেবারে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমার এখন লজ্জাবোধ ছিল না; আমি শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করিলাম না।

"তোমার কি চক্ষু নাই, প্রবেশ দ্বার দেখিতে পাইতেছ না? ও খান দিয়া আসিলে কেন?" গৃহস্বামী রূঢ়ভাবে আমাকে বাধাদিয়া অতি কর্কশ ভাষায় আমাকে সম্বোধন করিল।

আমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া উত্তর করিলাম, "আমি শীতে কাঁপিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সে পুনরায় কঠোর ভাষায় আমাকে বলিল, "তুমি কোন্ সাহসে এইরূপ নগ্নাবস্থায় এখানে আসিলে? দেখিতেছ না, এখানে যাহারা রহিয়াছে তাহারা সকলেই সুসজ্জিত? উত্তম পরিচ্ছদ না থাকিলে আমি কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিই না।"

তাহার তীব্রভাষা আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়াছিল। জীবদ্দশায় আমি সর্ব্বদাই সুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত থাকিতাম। বসন ভূষণের প্রতি আমার একটা আত্যন্তিক অনুরাগ ছিল। আমার সেই পূর্ব্বের কথা মনে আসিতে লাগিল। কত অর্থহীন ভদ্রলোক পরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান

করে নাই, এই অপরাধে তাহাদিগকে আমার সমীপে আসিতে দিই নাই। এইরূপ কত লোককে আমার বন্ধুতায় অযোগ্য মনে করিয়া আমি ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। আর সেই আমি আমার নগ্নাবস্থার জন্য সামান্য শৌণ্ডিকের দ্বারা লাঞ্ছিত। এই কথা মনে উদিত হওয়াতে আমার নিজের উপর ধিক্কার দিতেছিলাম। এদিকে কিন্তু আমার পূর্ব্বের অবস্থা ও পূর্ব্বের পরিচ্ছদের কথা মনে আসিতেই দেখি, আমার চরণে বিলাতি বার্ণিশের জুতা পরিধানে ডেভিড্ লিচেদে (David Leeche) কৃত আমার প্রিয় পাজামা, সেই পূর্ব্বের ওয়েষ্ট কোট (waist-coat) কোট (coat) গলাবরণ ও বিচিত্র গলাবন্ধনী (color এবং neck-tie) শিরোপরে টুপি ও হস্তে আমার সেই পূর্ব্বের প্রিয় ছড়ি। কিন্তু এত সাজ সজ্জায়ও আমার নগ্নতা দূর হইল না। আমি মনে করিতেছিলাম, আমি যে নগ্ন, সেই নগ্নই রহিয়াছি। যে বস্ত্রাভাবে পূর্ব্বে শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখনও সেইরূপ কাঁপিতে লাগিলাম।

তখন আমি অগ্নি-কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলাম এবং শীত-কম্পিত হস্ত তাহার উপর রক্ষা করিলাম। কিন্তু বৃথা আশা! সে অনলে কোনও উত্তাপ নাই। যেন চিত্রিত অগ্নি, চিত্রিত অগ্নিশিখা চারিদিকে বিস্তার করিতেছে। আমার শীত নিবারণ হইল না।

হতাশ হইয়া সে স্থান হইতে ফিরিলাম। সেই শৌণ্ডিকালয়স্থিত মদ্য-উপাসকেরা তাহাদিগের বীভৎস আমোদ ক্ষণিকের জন্য বন্ধকরিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আমার যন্ত্রণা দেখিয়া তাহারা হঠাৎ উচ্চহাস্যে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহার উচ্ছিষ্ট চা-পাত্র আমার মুখের নিকট ধরিল। আমার বোধ হইল, যেন তাহা হইতে সুগন্ধযুক্ত উত্তপ্ত বাষ্প উদ্গীরিত হইতেছে। আমি সাগ্রহে সেই পাত্র গ্রহণ করিলাম। মহানন্দে তাহা পাণ করিতে গিয়া দেখি, পূর্ণ এক পাত্র চা কিন্তু তাহার এক বিন্দুও আমার অধরোষ্ঠ

স্পর্শ করিল না। অনেক চেষ্টা করিলাম, পাত্রের চা কিছুতেই আমার গলাধঃকরণ হইল না। ইহাও কি বিচিত্র!

তাহার পর মদ্য, আমার সেখানকার শেষ আকর্ষণীয় সামগ্রী। আমি তাহার সফেন রক্তাভ সুন্দর মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া এক মদ্যপের কম্পিত হস্ত হইতে সবলে ছিনাইয়া লইলাম। কিন্তু হায় এবারেও সেই পূর্ব্বের দশা। সেই উজ্জ্বল তরল মদিরা আমার অধর-সংস্পর্শে অন্তর্হিত হইল। আমি সজোরে বাটীটি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। হতাশ ও মনবেদনায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া আমি তথায় বসিয়া পড়িলাম।

আমার অন্তরের বিভীষিকা ও হুতাশ ভাব নিশ্চিতই বহিরঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই গৃহস্থ সকলেই আমায় অবস্থায় অত্যন্ত সুখ পাইতেছিল। তাহারা উচ্চহাস্যে আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। পরের আশা ভঙ্গেই তাহাদিগের যেন সুখ। তাহাদিগের বীভৎস হাস্য কৌতুকে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। আমি কিন্তু ধীরভাবে সব সহ্য করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের উৎসব কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল। আমি এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে ধীরে ধীরে আমার চিত্তের স্থৈর্য্য আসিল। আমি সেই অনুদার রুক্ষ গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তাহারি মত কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম "এই গৃহখানি কিসের?

সে উত্তর দিল, "এখানি আমার গৃহ।"

আমি বলিলাম তাহা ত জানি। সে কথা বলে তোমার কষ্ট পেতে হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি এই বাড়ি খানির ব্যাপার কি। ইহার ভিতরের আসবাব পত্রেরই বা ব্যাপার কি?

যে উত্তর করিল, "মূর্খ! তুমি তাহা জাননা যে, কি করিয়া এ শুঁড়িখানা এখানে আসিল? বেস্ এইরূপ একখানা গৃহ হউক, এইরূপ

ভাবিতেই এই গৃহের আবির্ভাব হইল। আমি একজন শৌণ্ডিক ছিলাম, এবং এখানেও সেই শৌণ্ডিকের কার্য্য করিতেছি।"

এখন অনেকটা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিয়া উঠিলাম, "তবে কি সমস্তই কাল্পনিক ?"

তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল, "সমস্তই কাল্পনিক। আমরা যেন সকলে যাদুকরের রাজত্বে। এরূপ ইন্দ্রজাল পৃথিবীতে নাই। যখনই একটা ভাব মনে আসে, তখনই তাহা পাওয়া যায়। বাহবা, এ বড় মজার স্থান !" এই বলিয়া সেই লোকটা উচ্চহাস্য করিয়া তাহার হস্তস্থিত পাশা নিক্ষেপ করিল। সে হাস্য করিল বটে,কিন্তু তাহার আকৃতিতে বেশ প্রতিপন্ন হইল যে লোকটার মনে আদৌ সুখ বা তৃপ্তি নাই। তাহার বদনে কাষ্ঠ হাসি, মনে অতৃপ্ত বাসনার তীব্র যন্ত্রণা।

আমি এখন সমস্ত বুঝিলাম। সেই গৃহটী কাল্পনিক, সে অগ্নিতে দাহিকাশক্তি নাই, আলোক শিখার উত্তাপ নাই। সেই তাস অক্ষ,নস্য,চা পিয়ালা সমস্তই ইন্দ্রজাল। সবই কুহক কিন্তু একটা জিনিষ প্রকৃত ; তাহাদিগের তীব্র বাসনা, সেটা প্রকৃত, তাহাদিগের বাসনার অচরিতার্থতায় যে বিষম যন্ত্রণাবোধ তাহাও প্রকৃত। তাহারা পৃথিবীতে যাহা করিয়া আসিয়াছে, এখানে তাহারই পুনরভিনয় হইতেছে ; তাহাতেই শৌণ্ডিকের এই গৃহ কল্পনা ; তাহাতেই এই সমস্তলোক অক্ষক্রীড়া করিতেছে, মদ্যপান করিতেছে ও ইতর ভাষায় বীভৎস ভাবে পরস্পরকে অভিবাদন করিতেছে, মুখে আনন্দের উচ্চ উচ্ছ্বাস মর্ম্মে নিরাশায় তীব্র যন্ত্রণা।

আমি নিজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। এত সাজ-সজ্জায় আমার গাত্র আবৃত হইয়া আছে, তথাচ আমি যে নগ্ন রহিয়াছি, এ ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ; এত বসনে আচ্ছাদিত থাকিলেও, পূর্ব্বে যেমন শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখনও তাহাই হইতেছে। সমস্তই

বাসনাময়ী চিন্তার মায়া, সবই ভোজবাজি! "মিথ্যা মায়া দূর হও!" বলিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। বৃথা চেষ্টা। পৃথিবীতে মহা-আয়াসে যে আত্মকারাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইতে কই পারিলাম? মনের তীব্র বেদনায় অধীর হইয়া, আমি উন্মত্তের মত দন্ত দিয়া আমার পরিচ্ছদ খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলাম। আমি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পবনের বেগে আবার ছুটিতে লাগিলাম। হৃদয়ে নিরাশার ও যন্ত্রণার তুষানল, পশ্চাতে আমার সেই শৌণ্ডিকালয়ের সঙ্গিগণের বীভৎস উচ্চহাস্য; আমি আবার সেই অনন্ত-বিস্তৃত কুয়াসা-আবরিত ভীষণ ভোগক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অতি দ্রুতগতিতে অস্থিরভাবে ছুটিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

অদৃশ্য-সহায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কলিকাতাস্থ কোন একজন বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরের বাটীতে সত্যনারায়ণ-পূজা উপলক্ষে তাঁহার ত্রিতল বাটীর সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর বাঁশ বাঁধিয়া তাহার উপর ভারি বৃহৎ পাল খাটাইতে হইয়াছিল। কর্ম্ম কাজ শেষ হইলে, একদিন সেই পাল বাঁশের উপর হইতে নামাইয়া নিম্নে ফেলিয়া দিবার জন্য আলিন্দার উপর রাখা হইয়াছিল। উক্ত আলিন্দার যেখানে পাল ছিল, তাহার ঠিক নিম্নে বাটীর প্রাঙ্গণে গৃহস্বামীর ১০।১১ বৎসরের এক পুত্র খেলা করিতেছিল। হঠাৎ সেই অত্যন্ত ভারি পালখানি স্থানচ্যুত হইয়া আলিন্দা হইতে নীচে প্রাঙ্গণে পড়িয়া যায়। স্থানভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইবামাত্র ছাদের উপরকার একব্যক্তি হঠাৎ দেখিতে পান, কিন্তু তাহা টানিয়া পতন হইতে রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঠানে যে কেহ আছ সরিয়া যাও।" তাঁহার চীৎকারে প্রাঙ্গণস্থ ব্যক্তিগণ

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খোঁকা বাবু সরিয়া যাও—খোকা বাবু সরিয়া যাও!" বালক ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল, কিন্তু ভয় পাইল না বা তৎস্থান হইতে সরিয়া অন্যত্র গেল না। দেখিতে দেখিতে পালখানি বালকের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অন্তরে পড়িয়া গেল। নিমেষের মধ্যে এতগুলি ঘটনা হইয়া গেল, আমাদিগকে বর্ণনা করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময়ক্ষেপ করিতে হইল। যাহা হউক, সকলে নিঃসন্দেহে পাল-পতনের যে স্থান অনুমান করিয়াছিল, পাল তাহা হইতে দূরে পড়িয়া গেল, দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাল-পতনের পরেই বালকের পিতা রোষভরে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সকলে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, তুই এখান হইতে সরিয়া গেলি না কেন? এখনই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল আর কি!" পুত্র পিতাকে বলিল, "আমার সরিবার দরকার কি ছিল? আমি দেখিলাম, কাকা ত উপর হইতে ত্রিপল সরাইয়া দিতেছিলেন। আমি চাপা পড়িতাম কিরূপে?" পিতা বলিলেন, "তোর কাকা কি এখন বাটীতে আছে যে, সরাইয়া দিয়াছে?" বালক বলিল, "হাঁ গো, আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি—উপরে কাকা পাল দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাইত আমি এখান হইতে সরি নাই।" পুত্রের কথায় পিতা বাটীর মধ্যে 'কাকা'র সন্ধান লইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না, কাকা তখন সে বাটীতে ছিলেন না। * শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

* এই ঘটনাটী অতি সামান্য বা ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে। ইহা আজগুবি নহে, বাস্তবিক সত্য ঘটনা। ইহার মূলে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা না জানিয়াই আমরা এইরূপ অসংখ্য ঘটনা, যাহা অনবরত আমাদের মধ্যে ঘটিতেছে, সকলকে একবারে উড়াইয়া দিই। এইরূপ ঘটনার একটী পারম্পরিক ধারা আছে। যাঁহাদের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এই অসম্বদ্ধ ঘটনাকে সম্বদ্ধ করিতে পারেন। এই সকল কঠিন, গূঢ়তত্ত্ব আমাদের দাদাম'শায় তাঁহার "ঝুলিতে" ক্রমে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিবেন। তৎপূর্ব্বে পাঠকগণ, এই সকল ঘটনা সামান্য হইলেও উপেক্ষা না করিয়া মনে মনে ইহার বিষয় কিছু কিছু চিন্তা করুন। অঃ রঃ সঃ।

অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [শ্রাবণ, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

একখানি পত্র।

ও শ্রীহরিঃ—

নারু
পোঃ বরটীয়া,
জিঃ ঢাকা।
১৫।২।১৬ বাং

"অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক

মান্যবরেষু।

মহাশয়,

একটি দরকারী বিষয় জানিতে চাই। আশা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জনে বাধিত করিবেন। আমি আপনাদের অলৌকিক রহস্যের একজন গ্রাহক। আপনাদের অলৌকিক রহস্যে "যমালয়ের পত্রাবলী"-নামীয় যে একটি প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা কি বাস্তব ঘটনা? না কল্পনা প্রসূত? যদি সত্য ঘটনা হয়, তবে কি প্রকারে এই সকল পত্রাবলী যমালয় হইতে আপনাদের হস্তগত হইল, অনুগ্রহ প্রকাশে লিখিয়া বাধিত করিবেন। ঘটনাটি কিরূপ? সত্য না কল্পনা-প্রসূত? যত সত্বর পারেন, লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে, লোকের নিকট বর্ণনা করিয়া অনেক ফল পাইব আশা করি। তাই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রশ্নটির সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। আশা করি, অন্যথা হইবে না। ইতি।

বশংবদ—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার। গ্রাহক নং ১০৪০।

জনৈক গ্রাহকের নিকট হইতে আমরা উপরিউক্ত পত্র পাইয়াছি। এই প্রশ্ন অন্যান্য গ্রাহকেরাও করিয়াছেন ; কেবল সেই জন্য উহার উত্তর, তাঁহাকে না দিয়া সাধারণে জ্ঞাপনার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'Letters from Hell' (নরক হইতে পত্রাবলি)

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্ক দেশে, একজন সূক্ষ্মদর্শী সাধক এই পুস্তক খানি রচনা করেন। প্রচার হইবামাত্রই মানবের চিন্তারাজ্যে এই পুস্তক যুগান্তর আনয়ন করে এবং ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় তাহা শীঘ্রই অনূদিত হয়। ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত সেই পুস্তকের নাম "Letters from Hell"। এই শেষোক্ত পুস্তক অবলম্বনে "যমালয়ের পত্রাবলি" লেখা হইতেছে। পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, সাধারণ সাধক, সূক্ষ্মদর্শী হইয়াও, অনেক সময় ভ্রমে পতিত হন। এই পুস্তকের আদি প্রচারকও স্থানে স্থানে ভ্রান্তিদুষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক যথাসাধ্য সেই সমস্ত ভ্রম অল্পাধিক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি উন্নত সাধক আছেন, যাঁহারা যোগ-বলে পরলোক প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদিগকে occultists বলে। তাঁহারা সকলেই ইচ্ছামত স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিতে সমর্থ। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা পরলোক-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। "ক" নামধেয় একব্যক্তি পর-লোক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, "গ," "চ," "জ" "ধ," নামধেয় এই সম্প্রদায় ভুক্ত অপর অপর সাধকও তথায় উপস্থিত এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত আছেন।

"ক" হয় ত ভারতবর্ষে আছেন, "চ" বিলাতে বাস করিতেছেন, "জ" মার্কিন দেশে এবং "ধ" জাপানে। তাঁহারা সকলেই আপন আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে যখন সেইগুলি পরীক্ষিত হইল, তখন দেখা গেল যে, তাঁহাদিগের সকলের বিবরণই একরূপ এবং তাঁহারা সকলেই সূক্ষ্মলোকে অপরের সহিত যে একত্র তত্ত্বানুসন্ধান এবং তথায় যে পরস্পরে ভাবের আদানপ্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহাদিগের সূক্ষ্মলোকে গমন ও তথায় দৃশ্য দর্শন করা অলীক ও স্বপ্নাবস্থার ক্রীড়া নহে; যাহার বিবরণ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; তাহার পর শাস্ত্রের কি শিক্ষা ও পূর্ব্বতন ঋষি ও জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সেই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া তাঁহারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইরূপে তাঁহারা মীমাংসা করেন বলিয়াই আমরা তাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রথা বলিয়াছি। যমালয়ের পত্রে ডেনমার্কের সূক্ষ্মদর্শী সাধক নরককে "অন্ধতম পুরী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বানুসন্ধীরাও ঠিক তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্রও ঠিক তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসর-শাস্ত্রের বিবরণেও তাহাই আছে। *

ঋষি-সংস্কৃত ভারতবর্ষে, আজকাল আর্য্য-হৃদয়ে, অনার্য্যসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। কশ্যপ, শাণ্ডিল্য বা ভরদ্বাজ-বংশধর বলিয়া আমরা পরিচয়

---

* What manner of place is this unto which I have come ? It hath no water, it hath no air ; it is deep, unfathomable ; it is black as the blackest night, and men wander helplessly about therein ; in it a man may not live in quietness of heart."—Egyptian papyrus of the Scribe Ani.

দিই; কিন্তু ম্লেচ্ছের আচারে আপনাকে গৌরববান্ মনে করিয়া থাকি। আমরা শাস্ত্র মানি না, পরলোক বিশ্বাস করি না, আমরা নিত্য তর্পণ বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা দেখিতে পাই না।

এই ত গেল পবিত্র ভারতবর্ষের কথা। আবার ওদিকে ইউরোপের সাধারণ মানবের হৃদয়ে যে স্বল্প ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল, তাহাও একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) জড়বিজ্ঞান; তাঁহাদিগের দৃষ্টি কেবল ইহলোকের সুখ-সমৃদ্ধিতে। পরলোক ও দেবতাদি (Angels and Archangels), ওগুলা তাঁহাদিগের মতে বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার। এক দিকে এখানে ঘোর তামসিকতা, অপরদিকে কঠিন জড়বাদিতা ও নাস্তিকতা,—সমস্তই কালের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষেও আর একবার ঠিক এই ভাব আসিয়াছিল। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-পুত্র বেণ রাজা, বেদানুগত ধর্ম্মের নিন্দাকারী জিনের উপদেশে ঘোর পাতকী হইয়াছিলেন। জিন উপদেশ দিয়াছিলেন, "যজন, যাজন, বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা, তপ, দান, স্বধা, হব্য, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পিতৃতর্পণ এসকল কিছুই নয়।" বেণ তাঁহার দ্বারা পাপাচারে প্রণোদিত হইয়া পাপভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বেদধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলেন। রাজার এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন হওয়াতে সমুদয় লোক পাপপূর্ণ হইল। তখন যোগানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ও দান একেবারে বিলুপ্ত হইল। রাজার আচার ভ্রষ্ট হওয়াতে, প্রজাও ধর্ম্ম-প্রাণ হারাইল। জগৎ এইরূপ মহাপাপে বিধ্বস্ত হইতে বসিল। তখন পবিত্র ঋষিগণ বেণের শরীর মন্থন করিয়া তাঁহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন।

এখনকার কালধর্ম্ম অন্যরূপ। যুক্তি ও তর্কের গণ্ডির ভিতরে না আনিতে পারিলে, মানব কোনও তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহাদিগের বিজ্ঞান-আগারের পরীক্ষাই সত্য আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

তাই তাহাদিগেরই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধকেরা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই অস্ত্রে তাঁহাদিগেরই জড়বাদ-দুর্গ ভেদ করিতেছেন। কোন সমুদ্র-যাত্রী আসিয়া বলিল যে সাগর মধ্যস্থ এক দ্বীপে এই সমস্ত রত্ন মিলে। তুমি সমুদ্র অতিক্রম করিতে যে আয়াস করিতে হয়, তাহা না করিয়া, সমুদ্রের এই পারে অবস্থান করিয়া, যদ্যপি বল ওই সমস্ত মিথ্যা, ওগুলি কল্পনা-প্রসূত, তাহা হইলে, সেটা তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। পরলোক আছে, কি করিলে পরলোক-সম্বন্ধে মানবের অভিজ্ঞতা হইতে পারে, তাহার পথেরও নির্দ্দেশ আছে। তোমার ইচ্ছা থাকে ত তুমি তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার। সুপ্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ"—সুষুম্না নাড়ীকে দ্বার করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে, সমস্ত ভুবনের অবরোধ হয়। এইরূপ সাধনায় সমর্থ হইলে, সমস্ত ভুবনের জ্ঞানের সহিত নরক লোকেরও জ্ঞান জন্মে। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃপ্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহারৌরবকালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ, যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুর্দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে। অবীচিস্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে পৃথিবী হইতে নিম্নে ছয়টি মহানরক স্থান আছে; ইহারা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারের আশ্রয়, ইহাদের নামান্তর যথা,—মহাকাল, অম্বরীশ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্রা; যেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল, তীব্র যাতনা অনুভব করিতে করিতে অতিকষ্টে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে। মানব ইচ্ছা করিলেই সাধন-বলে, সেই সমস্ত স্থান প্রত্যক্ষ করিতে পারে; পরের মুখের কথা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে হয় না।

কিন্তু যাহারা ঋষিবাক্যে প্রত্যয়ও করিবে না এবং নিজেরাও সাধনা করিবে না, সেই সমস্ত তামসিক লোকদিগের কোনও উপায় নাই। আমরা তাহাদিগকে কিছুই বলিতে চাই না। তাহাদিগকে জন্মজন্ম, ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। মানব সাধন-বলে পরলোক-বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে—একথায় যেন কেহ মনে না করেন যে, সাধনার উদ্দেশ্যই পরলোক প্রত্যক্ষ করা। এখনও যে সংসারবিরত যোগিগণ নিভৃত পর্ব্বতগুহায় বা তপোবনে ঘোর তপস্যানিরত আছেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহে; সাধন—ভগবানের প্রেম আস্বাদন করিতে। কেহ যদ্যপি পদব্রজে কোন তীর্থ যাত্রা করে, তাহা হইলে, তাহার পদতল ধূলিসমাচ্ছন্ন হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য তীর্থে ভগবানের প্রতিমাদর্শন। ধূলি অবলেপ তাহার গৌণ কর্ম্ম। সিদ্ধির বেলাও ঠিক তাহাই। সাধনা আত্মানুভূতির নিমিত্ত, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী গৌণ শক্তি। উপনিষদ্ ঠিক এই কথাই বলে—

"সংভূতিংচ বিনাশংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুতে॥"

ইংরাজিতে অনুবাদিত নরকের পত্রাবলির (Letters from hell) প্রকাশক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dr. George Mac. Donald এই পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে "এই পুস্তক-পাঠে নরকের তীব্র যন্ত্রণার চিত্রে অন্ততঃ দুজনার মনেও ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। যদ্যপি একজনও মানব পরকালের ভয়ে অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত সৎপথে আপনার জীবন চালিত করে, তাহা হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইয়াছে, বিবেচনা করিব।" আমরাও তাহাই বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা অলৌকিক রহস্যে "যমালয়ের পত্রাবলির" স্থান দিয়াছি। কায়-মনঃ ও বাক্যের দ্বারা শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; এবং সেই

কার্য্যগতি অনুসারে মানবের উত্তম ও অধম গতি হয়। যে সমস্ত কর্ম্ম করিলে মানবের নরক-যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবিনী, সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে সময় থাকিতে বিরত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে "যমালয়ের পত্রাবলীর, নরক-ভোগীর মত বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যুর প্রাক্কাল হইতেই তাহার কি যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, একবার দেখুন। "অতীত জীবনের সমস্ত কাহিনী আমার সম্মুখে একে একে আসিতে লাগিল। সমস্ত জীবনে আমি সৎকর্ম্ম অতি অল্পই করিয়াছি। কেবল স্বার্থময় জীবন লইয়া বাসনা চরিতার্থ করা আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। এই চিন্তা জ্বলন্ত তুষানলের মত আমায় জীবন্ত পোড়াইতে আরম্ভ করিল।" এইত যন্ত্রণার আরম্ভ, দাহনের সমস্তই অবশিষ্ট আছে। মানব, সাবধান! এখনও সময় আছে, ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হইও না। শাস্ত্র ও ঋষিরা যে ধর্ম্মের দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই আলোকে জীবনযাত্রা আরম্ভ কর, তুমি তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।

গয়া
২৯ মে ১৯০৯।

মাননীয় "অলৌকিক-রহস্যের" সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকা দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এইরূপ পত্রিকা আমাদের বড়ই প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। ভগবানের দয়ায় পত্রিকার আয়তন আরও বৃদ্ধি হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। তাহার জন্য আপনারা যদি পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকে আপত্তি না করিতে পারেন, কারণ সকলের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে শিশির বাবুর Hindu spiritual Magazineএর বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা, অথচ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সে বস্তু উপভোগ করিতে পারেন না। আপনাদের পত্রিকা-

খানি কেবল ১৷৷৹ টাকা অথচ আমরা উভয় দল পাঠ করিয়া সুখী। পত্রিকাখানি এতই মনোরঞ্জন হইয়াছে যে, পত্রিকা আসিলে বাড়ীর সকলে টানাটানি করিতে আরম্ভ করেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনাদের পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া শোকসন্তপ্ত নরনারীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করুক।

মহাশয় এই জড় বিজ্ঞানের যুগে, আমরা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইয়া গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। আপনাদের পত্রিকা খানি অনেকের আঁধার পথে প্রদীপ হইবে। এই সব বিষয় যত আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল।*

নিম্নে আমার জীবনে যে সব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি লিখিলাম। প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি।

বশংবদ—

শ্রী————গ্রাহক নং ১০২১।

স্বপ্নে দর্শন

বা

"মায়ের দয়া"।

মানব-জীবনে অহরহঃ দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। অদৃশ্য ভাবে দেবতা ও ঋষি তুল্য ব্যক্তিরা তাঁহাদের হস্ত মানব-সাহায্যার্থে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন ও সময় হইলে তাঁহারা কখন কখন মানবেন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন (২য় সংখ্যায় "অদৃশ্য সহায়" ঘটনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও মানব নিজ নিজ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশে নিজের পথ নিজে হারাইয়া ফেলে। নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি ইহার একটি উদাহরণ।

শৈশব হইতে যেন কাহারও স্নেহের আহ্বান মধ্যে মধ্যে আমার শ্রুতিবিবর স্পর্শ করিত। স্বপ্নে, অর্দ্ধ জাগরণে, অথবা কোন নির্জ্জন স্থানে যেন কাহারও স্নেহাশীর্ব্বাদ আমার প্রাণে শান্তির হিল্লোল আনিয়া দিত। কখন কখন কাহার অস্ফুট পদধ্বনি, কাহার ছায়া

আমার কর্ণ ও নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। সে ছায়া এক মাতৃ-মূর্ত্তির। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মাঝে মাঝে সেই মায়াময়ীকে মা বলিয়া ডাকিতাম। বাল্যের বহুদিন এই ভাবে কাটিয়াছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া, সে ভাব আর অনুভব করি নাই। তখন চঞ্চল মন সংসারের পিচ্ছিলপথে চলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সে মধুর ভাব গ্রহণে আমার অবসর ছিল না।

এইরূপে একদিন আমি এক অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৮৯৬ সালের নবেম্বর। আমি তখন বাঁকিপুরের এক মেসে থাকিয়া বি, এ ক্লাসে পড়িতেছিলাম। অদম্য বাসনার আকর্ষণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমি একদিন বালিশে মাথা রাখিয়া, উপুড় হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন আমার দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছি ও কে যেন আমায় উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতেছে। তখন আমার বিছানায় আমার একটি বন্ধু শয়ন করিয়াছিলেন; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হাত মুখ ধুইতে নীচে চলিয়া গিয়াছিল। সেই উর্দ্ধগত অবস্থায় আমি দেখিলাম যে, আমার দেহ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, পার্শ্বে বন্ধু নিদ্রা যাইতেছেন, নিম্নতলের উঠানে আমার কনিষ্ঠভ্রাতা ও বাসার অন্যান্য বন্ধুবর্গ স্ব স্ব প্রাতঃকালীন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আরও উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পার্শ্বস্থ অন্যান্য বাটীর ছাদ গাছপালা প্রভৃতি পাটনা কলেজ গঙ্গা ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। সে অবস্থায় আমার মনের অবস্থা ভয়শূন্য, শান্ত, স্থির—অথচ উৎসুক। মনে হইতে লাগিল, কোথায় যাইতেছি। কেন

যাইতেছি? যত উর্দ্ধে উঠিতেছিলাম, ততই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণ হইতেছিল, এমন কি সৌরমণ্ডলস্থিত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া যে অত্যদ্ভুত নৃত্য করিতেছিল, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইল। সে এক মহান্ দৃশ্য। না দেখিলে উপলব্ধি হয় না, বুঝান অসম্ভব। তাহার পর কত গ্রহ মণ্ডল, সৌরজগৎ, বিভিন্নমূর্ত্তি সম্পন্ন দেহিগণ ও অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ সব শোভা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সেই নীল মহাকাশে আমি ও আমার পথপ্রদর্শক-মাত্র, অপর আর কেহ নাই বা কিছু নাই। আমার সূক্ষ্ম শরীর আমি উপলব্ধি করিতেছিলাম; কিন্তু যিনি আমাকে লইয়া যাইতে-ছিলেন, তিনি তখনও অদৃশ্য অথচ তাঁহার সান্নিধ্য ও আমার বামস্কন্ধে তাঁহার কোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছিলাম।

দূরে—অতি দূরে—অগ্নির ন্যায় এক লোহিত-জ্যোতিঃ-সমুদ্র, কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম। যখন তাহার নিকটে যাইলাম, তখন বুঝিলাম উহা স্নিগ্ধ ও পবিত্র-গুণসম্পন্ন। আমার সূক্ষ্ম দেহে ঐ অগ্নি-লহরের কোন উষ্ণতা বোধ হয় নাই, কিন্তু যখন তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইলাম, তখন শরীর মন হইতে কি যেন গুরুভার নামিয়া গেল বুঝিলাম। সেই সমুদ্র পার হইয়া এক ধূম্রময় প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। সে যেন কিরূপ অবসাদের দেশ। তাহার পর এক দেশে পৌঁছিলাম যথায় সমস্ত স্থান স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণময়। ক্রমে সেই কিরণময় প্রদেশের এক মনোহর উপবনে—সহচরীবেষ্টিতা সিংহাসনোপবিষ্টা, দীপ্তিশালিনী লোহিতবসনা উজ্জ্বলভূষণা এক মাতৃ-মূর্ত্তির পদতলে নীত হইলাম। * * *

আমার স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল, মহৎ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য

বুঝিলাম। কঠিন কোমল তাড়না খাইলাম। আমি ফিরিয়া আসিতে একান্ত অনিচ্ছুক, দেখিয়া মা বলিলেন,—"বাবা! তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। কর্ম্ম শেষ না হইলে, কেমন করিয়া আনিব? তবে এই ঘটনা যাহাতে অহরহঃ তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিব। দেখিও আবার যেন ভুল না হয়।" হায় মা! কি কোমলে কঠিন তুমি!! তাহার পর চক্ষের জল লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, আমার বালিস চক্ষের জলে সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, কেবল দুই মিনিট মাত্র সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহার পর এই জীবনে কতবার পড়িয়াছি ও উঠিয়াছি; কিন্তু সে কথা, সে ঘটনা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু কর্ম্মফল পূর্ব্বজন্মের সংস্কার কি ছাড়িয়াছে? হায়! কতই ঘুরিতেছি আরও কতই ঘুরিব!!

শ্রীঃ ———

অপঘাত মৃত্যুতে প্রেতত্ব।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক-রহস্য" সম্পাদক

মহোদয়েষু

মহাশয়,

আপনি নানা স্থান হইতে অলৌকিক ঘটনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের হিতের জন্য আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করিতেছেন শুনিয়া

আমি আমার এক বন্ধুর বাটীতে সম্প্রতি যে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই যথাযথ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি। যদি প্রয়োজন হয়, ইহা আপনার পত্রিকাতে মুদ্রিত করিতে পারেন এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে ঘটনাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারেন।

৺ কালীঘাটের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে পুটুরী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষালের বাস। অক্ষয় বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং একটি আফিসে কর্ম্ম করেন। তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ পরিচয় আছে। বর্ণিত ঘটনাটি তাঁহার বাটীতেই ঘটে। ঘটনার ২।৩ দিন পরেই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

রামদাসী নাম্নী তাঁহার এক আত্মীয়া বহুকাল তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছেন, ইনি এখন তাঁহার পরিবার মধ্যেই গণ্য। বিগত ১৭ই কিংবা ১৮ই বৈশাখ (তারিখটি আমার ঠিক স্মরণ নাই) বৈকালে রামদাসী অক্ষয় বাবুর গরুটিকে বাগানে চরাইতে লইয়া যান। বাগানটি অক্ষয় বাবুর বাটীর সন্নিকটেই অবস্থিত। তিনি স্বয়ং জমী খরিদ করিয়া এই বাগানটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইহা বন জঙ্গল-পূর্ণ একটা পতিত জমী ছিল, কতকাল পতিত ছিল অথবা ইহাতে কেহ কখনও বাস করিয়াছিলেন কিনা, অক্ষয় বাবু কিংবা তাঁহার পরি-বারবর্গের মধ্যে কেহই জানিতেন না। প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কিছু মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি বাগানের একস্থান খনন করাইয়া আবশ্যকমত মাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খনন-কালে ঐ স্থান

হইতে দুইটি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটির দুই হাতে দুই গাছি শাঁখা ছিল—ইহা দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহা কোন স্ত্রীলোকের কঙ্কাল। সে যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ বিষয় তাঁহারা কেহ কখনও চিন্তা করেন নাই, বস্তুতঃ ইহা তাঁহারা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

যে স্থানটি খনন করা হয়, সেই স্থানটির একটি বিশেষত্ব ছিল। উহার উপর কিংবা নিকট, গরু, বাছুর, ছাগ, মেষ অথবা অন্য কোন জন্তু কদাপি যাইত না। উহা সর্ব্বদা শ্যামল নব দুর্ব্বাদলে আবৃত রহিয়াছে, অথচ গরু বাছুর উহার নিকটেই ঘেঁসে না। ইহা অক্ষয় বাবু বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। অবশেষে মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি এই স্থানটিই খনন করিয়া, যখন দুইটি কঙ্কাল পাইলেন, তখন ভাবিলেন,এই কারণেই বোধ হয়, গরু বাছুর পলায়; সুতরাং এ দুটোকে দূরে ফেলিয়া দিলে গোলযোগ মিটিবে। কিন্তু গোলযোগ তাহাতেও মিটিল না,—গরু বাছুর পূর্ব্ববৎ পলাইয়া যায়, বলপূর্ব্বক দড়ি ধরিয়া সেই দিকে টানিলে, তাহারা কিছুতেই আইসে না; কখনও দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়, কখনও বা শুইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, রামদাসী আজ গরুটিকে প্রথমে সেই দিকেই লইয়া গেলেন—তাঁহার ইচ্ছা গরুটি ঐ কোমল নধর ঘাসগুলি খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু গরুটি সে দিকে না গিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে জল পান করিতে নামিল। রামদাসী দড়ি ধরিয়া পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গরুর জল খাওয়া হইল, কিন্তু গরু উঠিয়া আসিতে চায় না। একি! রামদাসী রাগ করিয়া জোরে দড়ি টানিতে লাগিলেন। গরু যেন একটি জড়পদার্থের ন্যায় অসাড়—অচল ভাবে—ঘাড়

তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং রামদাসীও ঠিক সেই সময়ে একটা বিকট শব্দ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন!

তাঁহার শব্দে চারিদিক হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাটীতে আনিল। তিনি অচেতন অবস্থায় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার ভেদ বমি আরম্ভ হইল। বাটীর সকলেই বড়ই ব্যস্ত, ভীত, উৎকণ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে অক্ষয় বাবু আফিস হইতে প্রত্যাগত হইলেন। রামদাসীর কলেরা হইয়াছে শুনিয়া তিনি ডাক্তার আনিবার উদ্যোগ করিয়া রামদাসীকে একবার দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, রামদাসী তখন প্রলাপ বলিতেছে। অক্ষয় বাবু ভাবিলেন, রামদাসীর বিকার হইয়াছে। কিন্তু কলেরা হইতে না হইতেই একেবারে তাহা বিকারে পরিণত হইবে—তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় রামদাসী বলিতে লাগিলেন "তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার দুধ খাইবার ইচ্ছা হইল, আর তুই দড়ি ধরিয়া গরুটাকে টানিতে লাগিলি!! তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। ইত্যাদি" ইহা শুনিয়া অক্ষয় বাবু ভাবিতে লাগিলেন "ইহা তো প্রলাপ নহে। নিশ্চয়ই উহাকে কোন প্রেতযোনি আশ্রয় করিয়াছে।"

ইহা স্থির করিয়া, তিনি ডাক্তারের পরিবর্ত্তে একটি ওঝা আনাইতে পাঠাইলেন। গ্রামের সন্নিকটেই ভদ্রেশ্বর নামে এক ওঝা বাস করে। এ ব্যক্তি জাতিতে কাওরা। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে ভূত প্রেতদিগকে করায়ত্ত করিতে পারে বলিয়া, তাহার একটা খ্যাতি আছে। যাহা হউক এই ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রোগী বিষম চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সে যখন মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল, রামদাসীর বিক্রম দেখে কে? কখনও ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া

ওঝাকে গালি দেয়, কখনও বা কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার পদানত হয়। অবশেষে ওঝা বলিল "তুই কে? কেনই বা ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিস্?"

রামদাসী বলিতে লাগিল "আমি এক কুমুরের (কুম্ভকারের) মেয়ে। প্রায় একশো বছর হইল মজিলপুর গ্রামে আমার বাস ছিল। ঐ গ্রামের চক্রবর্ত্তী মহাশয় (চক্রবর্ত্তীর নাম বলিল না) আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করে। দুজনে পলাইয়া আসিয়া এই গ্রামে দুটি ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকি। কিছুকাল বেশ সুখে কাটিয়া যায়। অবশেষে আমার আত্মীয়েরা সন্ধান পাইয়া এক গভীর রজনীতে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং দুজনকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। আমাদের রান্না ঘরের যেথানে উনান ছিল, সেইখানে একটা বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া মৃতদেহ দুইটি পুতিয়া রাখিয়া প্রস্থান করে। তদবধি আমরা ঐ স্থানেই বাস করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কঙ্কাল দুইটা স্থানান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ স্থান আমরা ত্যাগ করি নাই, উহা আমাদের বড়ই প্রিয়। আজ বৈকালে দুধ খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় গরুটাকে পুকুরধারে লইয়া গিয়া দুধ খাইতেছিলাম। কিন্তু এই মাগী ক্রমাগত গরুটাকে টানাটানি করায় রাগে উহার ঘাড়ে চাপিয়াছি।"

"ওঝা বলিল "তবে কি তোর দুধ খাওয়া হয় নাই?"

"হাঁ, দুধ আমি সব খাইয়াছি। আজ আর গরুর দুধ হবে না।"

"তবে বামুনের মেয়েরে আর কষ্ট দিস্ কেন? ছাড়িয়া যা! শাভ্র যা!"

হাঁ, আমি যাইব, যাইতেছি, এই চলিলাম—এই বলিয়া রামদাসী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং ক্ষণেক পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন।

অক্ষয় বাবু প্রথমে গরুটাকে পরীক্ষা করিলেন। দুগ্ধ-দোহনের

সবিশেষ চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে রাত্রিতে এক ফোঁটা দুধও পাওয়া গেল না। পরদিন হইতে যথানিয়মে দুধ পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিবেশীদিগকে এবং গ্রামের বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি প্রায় হতাশ হইয়া ঐ গ্রামের এক অতিবৃদ্ধ কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কোন চক্রবর্ত্তী বাস করিত, জানেন কি? এই বৃদ্ধের বয়স আশি (বা অধিক) হইবে। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কোন চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ জমিতে (অক্ষয় বাবুর বাগানটি দেখাইয়া) এক চক্রবর্ত্তী কিছুকাল বাস করিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল অথবা তাহার কি হইল কেহই জানে না। ওটা চক্রবর্ত্তীর ভিটা বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।"

অক্ষয় বাবুর মুখে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনিবার পর একদিন আমি স্বয়ং ভদ্রেশ্বর ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি নিরক্ষর ও অন্ত্যজ। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা বলিল তাহা অক্ষয় বাবুর বৃত্তান্তের প্রায় অনুরূপ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অপঘাত হইলেও একশত বৎসরেও কি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয় না? প্রেতত্বের ঊর্দ্ধসীমা (maximum limit) কিছু নাই কি? ইতি*

বরিশা, ২৪ পঃ
২৬ বৈশাখ. ১৩১৬

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

* এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ উহার উত্তর দিতে অভিলাষ করেন, তবে যথাযোগ্য বোধ করিলে আমরা আনন্দের সহিত তাহা পত্রস্থ করিব। অঃ রঃ সঃ।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(১০)

ছোট ঠাকুরদার আগমনে কিছু নাটকীয় বৈচিত্র ছিল।

আমি দেখিলাম, প্রাতঃকাল হইতেই গোপাল কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার এত প্রিয় মাও তাহাকে আজ আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

প্রথমে ভাবিলাম, পিতার তীব্রবাক্যে আহত বালক আর আমাদের ঘরে থাকিয়া সুখ পাইতেছে না। তাই বোধ হয় শান্তিলাভের আশায় সে মাঝে মাঝে বাহিরে আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলার প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মা আমাদের আদেশ পাঠাইলেন। চাকর তৈল লইয়া আমাকেই স্নান করাইতে আসিল। আমি তাহাকে গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"আমি তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বিলম্ব আছে বলিয়া, আমার সঙ্গে আসিতে চাহিলেন না।"

আমি। বলিলি না কেন, মা তাড়া দিতেছেন।

ভৃত্য। তাও বলিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে গোপালবাবু জল মুখে দেন নাই বলিয়া, মা তাঁহাকে বারংবার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। একথা শুনিয়াও তিনি আসিলেন না।

মনে করিলাম. নিজেই যাইয়া গোপালকে ডাকিয়া আনি। গোপালের সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিবার পর, কি জানি কেন গোপালের প্রতি আমার একটা মমতা আসিল। কিন্তু বিচার

বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম, এ মমতা অন্য কিছুই নয়, মনের একটা দুর্ব্বলতা। গোপালের সঙ্গে পিতার যে কথা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছি, গোপাল আজ গৃহত্যাগ করিতে পারিলে, কালিকার জন্য অপেক্ষা করিবে না। তাই বিচ্ছেদের পূর্ব্বক্ষণে, স্মরণমাত্রেই মন আপনাআপনি কেমন দুর্ব্বল হইয়াছে। একটা গৃহপালিত পশুর অভাবেই যখন মনে কষ্টের উদয় হয়, তখন একজন আশৈশব সঙ্গীর অভাব স্মরণে মনের চাঞ্চল্য আসায় বিচিত্রতা কি! মনকে বুঝাইয়া স্থির করিলাম; গোপাল না আসে না আসুক, আমিত স্নান করি। চাকরকে বলিলাম,—"তবে আমাকেই তেল মাখাইয়া দে।"

স্নান করিতে যাইয়া দেখি, শ্যাম গোপালকে ধরিয়া আনিতেছে। তাহাকে আমার কাছে আনিয়াই শ্যাম বলিল—"নাও খুড়ো! স্নান কর। অসুস্থ দাদা কি বলিতে কি বলিয়াছেন। রোগে তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক নাই। তাঁহার কথায় কি রাগ করিতে আছে? মা বাড়ীর ভিতরে ব্যস্ত হইতেছেন।"

গোপাল একথার কোনও উত্তর না করিয়া আমার নিকটেই উপবিষ্ট হইল, এবং তৈল পাত্র লইয়া নিজেই মাখিতে বসিয়া গেল। তাই দেখিয়া ভৃত্যটা তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়া গোপালকে তেল মাখাইতে চলিল। গোপাল কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম—"গোপাল! আমি বুঝিতেছি, তুমি কাজ ভাল করিতেছ না।"

গোপাল। আমার বুদ্ধিতে আমি ঠিকই কাজ করিতেছি। ভাই! ইহার পরে তেল জোটাই ভার হইবে, ত মাখাইবে কে?"

আমি। পিতাই কি এতই অপরাধী গোপালকৃষ্ণ? আর যদিই

তাঁর অপরাধ হইয়া থাকে, তা হইলে কি তৎপ্রতি তোমার এরূপ আচরণ দেখান উচিত?

গোপাল। তোমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। আমি ত ভাই মনে কিছুই করি নাই।

আমি। কিন্তু আচরণে যে তা দেখিতেছি না।

গোপাল। তোমরা আমার আচরণ বুঝিতে পারিতেছ না।

শ্যাম বলিয়া উঠিল—"তা খুড়োর আচরণ বুঝা, আমাদের মত বোকার ক্ষমতা ত নয়, স্বয়ং শিব ঠাকুর বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমি ত খুড়ো, সাত জন্ম সিদ্ধি খাইয়া বুদ্ধি বাড়াইলেও বুঝিতে পারিব না।"

গোপাল হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি যে ভাই বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

শ্যাম পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল—যা' বুঝিতেছি তাই কি ঠিক?

গোপাল মাথা চুলকাইয়া ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"তা হ'লে দেখিতেছি, খুড়ো আমাকে চিনিয়াছে।"

আমি কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"তবে কি একেবারেই আমাদের মায়া কাটাইতেছ?"

গোপাল। তা পারিব কি?

আমি। আরকি এখানে আসিতে হইবে না?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বলিব। সেটা পিতার অভিপ্রায়ের উপরই নির্ভর করিবে।

আমি। কবে যাওয়া হইতেছে?

গোপাল। পিতা আজ আসিলেই বুঝিতে পারিব।

আমি। আমিও দেখিতেছি, তোমার মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে।

গোপাল কোনও উত্তর করিল না। আমিও আর কোন কথা কহিলাম না। স্নানান্তে আমরা আহার করিতে চলিলাম।

(১১)

বৈকালে ডাক্তার আসিলেন। আসিয়াই পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—“তর্কনিধি মহাশয়! আজ কেমন আছেন?”

পিতা। বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার আর প্রশ্ন না করিয়া, শব্দমানাদি-যন্ত্র সাহায্যে সেই দুরন্ত রোগটার গোপন-স্থান অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন। অন্বেষণের আবেগে তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। মনে হইল যেন, সেই দুরারোগ্য দুর্ব্বোধ্য রোগ দেহের কোন পঞ্জর-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়াছে। অনেকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন—“আজ আপনাকে কিছু অতিরিক্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে।”

পিতা ক্ষীণতর স্বরে বলিলেন—“আজ কিছুই গলাধঃকৃত করিতে পারি নাই।”

ডাক্তার। তা না করিলে শুধু ঔষধে কোনও ফল হইবে না। উপযুক্ত আহার না করিলে দেহ টিকিবে না।

পিতা। সাগু ও বার্লি—ও গোমূত্র আমি আর মুখে করিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার। ভাল, ব্রথের ব্যবস্থা করিয়া দিই না কেন। মুখরোচকও হইবে, অথচ শরীরের বেশ পুষ্টিসাধন হইবে।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“গোপীনাথ! টেরিটি বাজার হইতে গোটা দুই পায়রা আনাও।”

পিতা যেন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—“না—না—এখানে ওসব কিছু হইবে না।”

ডাক্তার। বেশ, তবে আনাইয়া, যত শীঘ্র পার, আমার ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দাও।

পিতা। ডাক্তার বাবু! ও সকলে আর কাজ নাই।

ডাক্তার। আপনি পণ্ডিত হইয়া একি কথা বলিতেছেন। "শরীর মাদ্যং"—এ "আদ্যং"টা না করিলে যে আপনার প্রত্যবায় হইবে। শরীরকে দুর্ব্বল পাইলেই রোগ আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। আপনি আর পাঁচ জনের জন্য দেহ রক্ষা করিতেছেন। আপনার প্রাণ থাকিলে, কত লোক নীতি ও ধর্ম্মে পণ্ডিত হইবে, তার সংখ্যা কি? আপনি আর দ্বিধা করিবেন না। আমার কম্পাউণ্ডার ব্রাহ্মণ। আমি তাহাকে দিয়াই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।

পিতা নিরুত্তর রহিলেন। সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া ডাক্তার বলিলেন— "ভাল, আপনাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না। আমিই সে সমস্ত জোগাড় করিয়া আপনার কাছে বোতলে পূরিয়া পাঠাইতেছি। পিতার দেহরক্ষার জন্য ডাক্তার বাবুর ব্যাকুলতা দেখিয়া আমাদিগকেও ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার দর্শনীটি দিতে হইল। যাইবার সময়, তিনি বেচুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, পিতা আমাকে বলিলেন—"কি গোপীনাথ! পায়রার ঝোলটা খাইব?"

আমি। ঝোল, আপনাকে কে এ কথা বলিল? ব্রথ—ব্রথ— জৈবরস দৌর্ব্বল্য ব্যাধির মহৌষধ। বোতলে পুরিয়া, ছিপি আঁটিয়া, লেবেল মারিয়া আসিতেছে।

পিতা। কি যে হতভাগা রোগ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি। এইবারে রোগকে সরিতেই হইবে।

পিতা। দেখো যেন তোমার গর্ভধারিণী না জানিতে পারে।

আমি। আপনি ও আমি জানিলাম, আবার কে জানিবে!

পিতা। সে হতভাগাটার কাছেও একথা প্রকাশ করিও না। সে জানিতে পারিলেও যাইবার সময় একটা অনর্থ বাধাইয়া যাইবে।

আমি। সে আর এ দিকে আসিতেছে না।

পিতা। হতভাগাটা করিতেছে কি ?

আমি। সে বাহির দরজায় বসিয়া তার বাপের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে।

পিতা। তাহার মাথা করিতেছে। কি অকৃতজ্ঞ দেখিলে ? সারা-দিনের মধ্যে আর একবারও আমাকে দেখিতে আসিতে পারিল না!

আমি বলিলাম—"তাহার মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া স্নানান্তে যে যে কথা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক পিতার কাছে বলিলাম।

পিতা শুনিয়া বলিলেন,—"মস্তিষ্ক বিকার তাহার ঘটিয়াছে, না তোমার! সে আমার কাছে তখন কি বলিল, বুঝিয়াছ কি? 'না ছাড়িলে তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের, এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।' শোকের ও মৃত্যুর কারণ না হয় সে যে কোন প্রকারে হইতে পারে। কেননা তোমার গর্ভধারিণীর গোপালের প্রতি যেরূপ মমতা, তাহাতে গোপালের কোনও ভাল মন্দ হইলে, তাঁহারও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু 'অপবাদের কারণ হইবে'—ইহার অর্থ কি ? বরং গোপাল এখানে না থাকিলে, দেশে ও এখানে প্রতিবেশীদের কাছে, তাঁহার নিন্দা হইবার সম্ভাবনা।"

আমি। আপনি কি কিছু বুঝিয়াছেন ?

পিতা। আমি অনেক চেষ্টাতে এই মাত্রই বুঝিয়াছি যে, গোপালের অনুমান এখানে তাহার জীবনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন—

"তাহার বোধ হইয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বুদ্ধির বিকাশে আমরা পিতা পুত্রে ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। এখন তুমি কি ও হতভাগাকে এখানে আর থাকিতে অনুরোধ কর?"

আমি। বাপের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তবে কি তার ভান মাত্র?

পিতা। তুমিও যেমন মূর্খ। এত ইংরাজী বই পড়িলে, তথাপি তোমার জ্ঞান হইল না! প্রত্যক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই সময়ে সময়ে মিথ্যা হইয়া যায়, তা স্বপ্ন একটা অলীকচিন্তা—সে কখন কি সত্য হইতে পারে! পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র না থাকিলে, আমিত তাহার আসিবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

বহির্ভাগে শব্দ হইল—"রাধানাথ!" তড়িতাহতের মত পিতা শয্যায় পতিত হইলেন। আমিও যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। অথচ কি মিষ্টস্বর! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পিতার পদ প্রান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় গোপালকে অগ্রে করিয়া ছোট ঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই দীনবেশধারী ব্রাহ্মণের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আর আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ আমার কেমন কঠিন হইয়া পড়িল। কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসায় কি যে উত্তর দিলাম, তাহাও আমার স্মরণে আসিতেছে না। আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া মাতাকে সংবাদ দিবার অছিলায় সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

(১২)

নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিয়া নিজের ঘরের শয্যায় শুইয়া আছি, এমন সময় শ্যাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—"শীঘ্র আসুন, কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে নীচে ডাকিতেছেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছোট ঠাকুরদা ?"

শ্যাম। মা তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছেন।

আমি। দুজনে কি কি, কথা হইল, শুনিয়াছ কি ?

শ্যাম। সময়ে আসিতে পারি নাই বলিয়া, সব শুনিতে পাই নাই। তবে কতক কতক শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি, খুড়ো ভাইপোয় আজ হইতে কাটান ছাড়ান হইয়া গেল।

কি কথা হইয়াছিল শুনিবার জন্ম আমার আগ্রহ সত্ত্বেও শ্যাম আমাকে তৃপ্ত করিল না। বলিল "অবকাশ মত বলিব। এখন ছোট ঠাকুরদা ফিরিতে না ফিরিতে কর্ত্তা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসুন। বেচু রথ্ আনিতে গিয়াছে, আমি তাহাকে সাবধান করিতে চলিলাম।"

শ্যামের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি পিতার সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম পিতা আমার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন! গৃহে প্রবেশ মাত্রই তিনি বলিলেন—"তোমার গর্ভধারিণীর জন্যই দেখিতেছি সব নষ্ট হইল। নির্ঝঞ্ঝাটে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল। দামোদরের সেবার লোকাভাব বলিয়া রমানাথ তাহার পুত্রকে লইতে আসিয়াছে। পৃথক্ হইবার এমন সুবিধা—তোমার গর্ভধারিণী বুঝি হইতে দিল না। সে গোপালকে রাখিবার জন্য তোমার দাদার পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিতেছে।

আমি। মা কি গোপালকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন ?

পিতা। না পারেন, তোমার অদৃষ্ট।

গোপাল এখানে থাকিলে আমার অদৃষ্টের কি হানি হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"থাকিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হইবে ?"

পিতা। এক অনিষ্ট তোমার পাঠের ক্ষতি! তুমি আর শত চেষ্টাতেও গোপালকে হারাইতে পারিবে না। গোপনে সন্ধান লইয়াছি, গোপাল প্রতি উত্তর-পত্রে একটা করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখে নাই। তবু সে এবারেও প্রথম হইয়াছে। তুমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়াও তার সমান হইতে পার নাই।

শুনিবামাত্র সুপ্ত ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"তা হইলে উপায়? মায়ের অতি আগ্রহে যদি দাদা গোপালকে রাখিয়া যান?

পিতা। তাইত বলিতেছি, তোমার অদৃষ্ট।

আমি। এবারে আমি প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি কিছুতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিব না। মাষ্টারের পক্ষপাত না থাকিলে, কখনই এরূপ হইতে পারে না।

পিতা। আমিও ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যে কারণেই হউক, পর বৎসর এরূপ হইলে তোমার ভবিষ্যতে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। দুশ্চিন্তায় তোমার বুদ্ধি হানি ঘটিতে পারে।

আমি। এবার দ্বিতীয় হইলে, আর আমি ও ইস্কুলে পড়িবই না।

পিতা। এ ক্ষতিও তত ধরি না। দ্বিতীয় ক্ষতি—এবং সেটা বিশেষ ক্ষতি, গোপালকে এখানে রাখিলে যা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি ও ভবিষ্যতে করিব, তাহার অর্দ্ধেক গোপালকে দিতে হইবে।

আমি। কেন? এত আর গোপালের পিতার উপার্জ্জন নয়?

পিতা। তা হইলে কি হইবে! একান্নবর্ত্তী পরিবার—একজনের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে গোপালের পিতার সমান অধিকার। গোপাল যদি এখানে না থাকিত, তা হইলে একান্নবর্ত্তিত্ব থাকিত না। কিছু কিছু মাসে মাসে দয়া করিয়া দিলেই লেঠা চুকিয়া যাইত। শরীরের

ভাল মন্দ কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। বয়স হইয়াছে। মাঝে মাঝে নানা বিজাতীয় ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে। যদি মারা যাই, তাহা হইলে গোপাল চুল চিরিয়া বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা লইবে।

আমি। গোপাল ত আজ পর্য্যন্ত একত্র আছে। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার কি হইবে?

পিতা। আমি যে কি উপার্জ্জন করিয়াছি, তা কে জানে? স্ত্রী-পুত্রই জানেনা। পরের ঘরে বাসা করিয়া আছি। যা উপার্জ্জন করিতেছি, তা যে সব সংসার খরচেই যাইতেছে না, তাহা আমি ভিন্ন আর কে বলিতে পারে! আমার জীবদ্দশায় অর্থ হানির কোনও ভয় নাই। তবে আমি মরিলে সম্পত্তির কথা গোপন না থাকাই সম্ভব। সম্ভব কেন—কোম্পানীর রাজত্ব—আমি মরিলে, আদালতের গোচর হইবেই।

এত দিন পরে আমার প্রতি পিতার মমতা পূর্ণরূপে অনুভব করিলাম। বুঝিলাম, গোপালকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আমা অপেক্ষাও পিতার আগ্রহ অধিক। কিন্তু পিতা কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, জানিবার জন্য মনে বড়ই কৌতূহল হইল।

পিতা যেন মন বুঝিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া, কেহ কোথায় আছে কিনা—দেখিয়া, অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"গোপীনাথ! এ যাবৎ কিছু কম তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছি।"

শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। সম্পত্তির একটা মোহিনী ছবি তড়িদ্বিকাশের মত যেন আমার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"আরও দুই চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারিব। এই সমস্ত সম্পত্তিই

তোমার। এখন বল দেখি, গোপালকে তুমি আর এখানে রাখিতে চাও ?”

আমি। হাজার দশবারো টাকা দিয়া উহাদের বিদায় করুন না কেন! তা’হলে বোধ হয় ছোট ঠাকুরদা আহ্লাদের সহিত গোপালকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন।

পিতা। বল কি মূর্খ! আমার এত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ, আমি একটা নিষ্ক্রিয় অলসকে দিয়া যাইব ? উপার্জ্জন করিতে যাইয়া অত্যাধিক পরিশ্রমে আমি এই বয়সেই শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলিলাম, আর সে দামোদরের নামে দুই বেলা ক্ষীর মাখমে দেহ পুষ্ট করিয়া, বসিয়া বসিয়া, সেই উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিবে ?

আমি। ইহার উপরে যদি তাঁহার কিছু কৃতজ্ঞতা থাকিত! আপনার অসুখের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আপনাকে দেখিতে আসা তাঁর সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল?

পিতা। তার কৃতজ্ঞতায় আমার কিছু আসে যায় না। আমি দুঃখীকে দয়া করিতে পারি, অলসতার প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমি। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। তাহাতে আমার বলিবার কি আছে!

পিতা। তা হইলে যেমন করিয়া পার, তোমার গর্ভধারিণীকে এই দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর। গোপাল যাহাতে তাহার পিতার অনুগমন করে, তাহার উপায় কর।

আমি। আমি কি উপায় করিব।

পিতা। কি করিবে সব আমাকে বলিতে হইবে! তবেই তুমি বিষয় রক্ষা করিয়াছ।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বলিলাম—"আমিত কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পিতা এই কথায় একটু সক্রোধে বলিলেন—"তোমার দাদা তাহার পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, লইয়া যাইবার নানা কারণ দেখাইতেছে—তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সম্মুখে যাইয়া দাদার পক্ষ সমর্থন কর।

কার্য্যের কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া অনিচ্ছায় গৃহ-ত্যাগ করিতে যাইতেছি, এমন সময় ছোট ঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমালয়ের পত্রাবলি।

১ম পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে অধীরভাবে আমি কতক্ষণ যে ঘুরিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে যেমন কাল বিভাগ আছে, নরকে সেইরূপ নাই। বহুক্ষণ, অল্পক্ষণ ইত্যাদিরূপ মনে হইলেও সেখানে সব জিনিষই যেমন কাল্পনিক, সময় জ্ঞানটাও তদ্রূপ। পূর্ব্বের মত সেই দূরস্থিত আলোক লক্ষ্য করিয়া আমি চঞ্চল চরণে ছুটিতে লাগিলাম। এতদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সে আলোক যে দূরে সেই দূরেই রহিয়া গেল। বরঞ্চ, আমার বোধ হইল, তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে।

প্রথমে, তাহা আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু, শীঘ্রই আমি স্থির নিশ্চয় হইলাম যে, ইহাতে আমার চক্ষুর কোনও অপরাধ নাই; বস্তুতঃ আলোক ক্ষীণতর হইতেছে। তীব্র, উজ্জ্বল আলোক ক্রমে অস্ফুট যেন ছায়ালোকে পরিণত হইল। তাহা যেন প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভাহীন দীপ্তিতে সেই স্থানকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে স্থানটা অনতিবিলম্বে আলোক লেখা বর্জ্জিত অচ্ছেদ্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িবে।

মানবের কল্পনাতীত, আমার যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আসিতেছে একথা জীবিত তোমাদিগের বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু প্রকৃতই, পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক যন্ত্রণা আমায় ঘিরিতেছে, বুঝিলাম। অপরের তীব্র যন্ত্রণা দেখিয়া আমি নিজের জন্য ঘোর উৎকণ্ঠা পরিপূর্ণ হইলাম; তাহাদিগের হৃদয়বিদারক ভীষণ কার্য্যকলাপ দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল না, আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সঙ্কুচিত করিলাম। তোমরা ভাব যে, নরকে পরের দুঃখে ও চিন্তায় আত্মবিস্মৃতি আসে, অপরের যন্ত্রণা ভাবিতে ভাবিতে আপনার তীব্র দুঃখ মানব ক্ষণিকের তরেও ভুলিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না; যে তীব্র গরল সেখানে প্রাণকে জর্জরিত করে, অপরের চিন্তায় তাহা উপশমিত হয় না। হে মর্ত্ত্যবাসী, পৃথিবীতে তোমাদিগের শত শত দুঃখ ও মর্ম্মবেদনার কারণ সত্ত্বেও তোমরা সুখী, তোমাদিগের যেমন ধারণা শক্তি তোমরা সেইরূপ বিচার কর। সেখানে চিত্তপ্রসাদের লেশমাত্রও নাই, পরের দুঃখে, আপনার যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার কোনও উপায় নাই। মর্ত্ত্যে, মনকে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করণে যে এক প্রকার শান্তি আসে, মরণের পর এখানে আসিলে, তাহা আর হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,আমি আপন দেহকে সঙ্কুচিত করিলাম। মানব এখানে, কতখানি যে আপনার দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারে, কঠিন শরীরধারী তোমাদিগকে তাহা কিরূপে বুঝাইব। বিবরমধ্যস্থিত ভেকের মত গুটি সুটি মারিয়া, ভূমি আলিঙ্গন করিয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। পার্শ্বে কি জানি কাহার কাতর দীর্ঘ নিশ্বাস আমার আত্মচিন্তা ভাঙ্গিয়া দিল, আমি ভয়ে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার গাঢ়তর হওয়ায় আমি অতি কষ্টে বুঝিলাম, আমারই মত আর একজন লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার বীভৎস আকার, বদন বিকৃত, গলদেশে রজ্জুবন্ধন; মাঝে মাঝে সে আতঙ্কে চারিধার নিরীক্ষণ করিতেছে এবং চকিত-ভাবে সেই রজ্জুর দুই প্রান্তদেশ লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; কখন বা অঙ্গুলিদ্বারা রজ্জুবন্ধন শিথিল করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভীতচকিত মূর্ত্তির নয়নদ্বয় আবার আমার উপর স্থির হইল; তাহার নেত্র যেন প্রকোষ্ঠদেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে; তাহার মনে যেন কত কি প্রশ্ন জাগিতেছে, ভাবে হৃদয় স্ফীত হই-তেছে, দমিত ভাষা অধরোষ্ঠকে কাঁপাইতেছে, কিন্তু কি যেন বিভীষিকায়, বাক্যস্ফুরণ করিতে সে যেন সাহস পাইতেছে না। আমি ভাবিলাম, আমারই প্রথম সম্ভাষণ করা উচিত।

দূরাগত সেই অতিক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকরশ্মির দিকে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া আমি বলিলাম, "আলোক ক্রমশঃই ক্ষীণতর হই-তেছে; শীঘ্রই হয় ত আমরা গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িব।"

সেই বিকৃত আকৃতি উত্তর করিল, "হঁা, শীঘ্রই রজনী হইবে।" তাহার ভাষা, সে কি ভাষা? তাহা অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ মাত্র।

"কতক্ষণ এইরূপ থাকিবে?"

"তাহা কি করিয়া বুঝিব? ইহা দুই এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইতে পারে, শত শত বৎসরও ব্যাপী হইতে পারে। এখানে আমরা কালের মাপ বড় বুঝিতে পারি না, তবে এই মাত্র জানি যে, এই যন্ত্রণাদায়ক নিশা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী, এই ভয়ঙ্করী রজনীর যেন শেষ নাই।"

"তবে এটা নিশ্চিত যে আবার দিবা আসিবে?"

"হাঁ, আবার দিবা আসিবে, মর্ত্ত্যে আমরা যাহাকে ক্ষীণালোকিত কাক-জ্যোৎস্না বলি, তাহাকে যদ্যপি তুমি দিবালোক বল, তাহা হইলে আবার দিবালোক ফিরিবে। আমার মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ দিবা নয়। সে যাহাই হউক, আমি দেখিতেছি তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ আমি নবাভ্যাগত, আমার সবে মাত্র মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তাহাও ত অল্প দিন বলিয়া মনে হইতেছে না।"

"স্বাভাবিক মৃত্যু?"

আমি উত্তর করিলাম, *"নিশ্চিত! তা'ছাড়া আবার কি?"*

"তা' ছাড়া আবার কি"—আমার এই কথায় সে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহার বিকট বদন বীভৎসভঙ্গীতে আমার দিকে একবার ফিরাইয়া সে করুণভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, আমার কথায় উত্তর দিতে তাহার কোনও ভাষা সরিল না।

আমিও আর তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিলাম না। এই অপ্রীতিকর কথাবার্ত্তা আমার একেবারে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"আত্মঘাতীর কি ভীষণ যন্ত্রণা! আমার কোথাও শান্তি নাই; আমি কেবল পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি, সকলেই আমাকে

উদ্বন্ধনে মারিতে চায়! তবে, তোমাকে দেখিয়া আমার তত ভয় হইতেছে না; তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ; তুমি নিজেই আত্মা-বস্থায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছ, তুমি আর আমার কি অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে। আচ্ছা, আমার ত নিজের প্রাণ আমি স্বেচ্ছায় হনন করিয়াছি, লোকাপবাদ ও সংসারিক যন্ত্রণাভারের হস্ত হইতে মুক্ত হইব, এই আশায় গভীর নিশীথে নির্জ্জন গুপ্ত গৃহে উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছি! তবে আবার মরণের এত ভয় কেন? প্রাণ ত গিয়াছে, তবে কাহার সংরক্ষণে আমার এত চেষ্টা? তাহা জানি না। আমি বুঝি আমার এই আয়াস, এই উদ্যম, এতটা ভয়, সবই কাল্পনিক। যাহা আমার নাই, তাহা কি করিয়া অপরে হরণ করিবে? কি জানি, তবু কেন, প্রাণে এই ভয় জাগিলেই আমি নির্ব্বোধের মত পলায়ন করি; মনে হয়, আমি যেন শত প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি; মনে হয়, যেন এই স্থান কেবল ফাঁসুড়িয়ার দ্বারাই পরিপূরিত, আর আমি তাহাদিগের হস্তে সম্পূর্ণ অসহায়। দেখিতেছ না, আমি এই রজ্জুর প্রান্তদ্বয় সাবধানে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি; সর্ব্বক্ষণ ভয়, পাছে এই নিষ্ঠুর ঘাতকেরা তাহার সন্ধান পায় ও সজোরে গলদেশে ফাঁসটা টানিয়া দেয়। হায়! কেন আমি আত্মঘাতী হইলাম! কেন সামান্য দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশায়, মানব-কল্পনাতীত এই যন্ত্রণার সাগরে আমি স্বেচ্ছায় ঝম্ফ প্রদান করিলাম! তখন ভাবিয়াছিলাম মৃত্যু! সে এক প্রকার শান্তিময়ী অনন্তকালব্যাপিনী নিদ্রা! এখন দেখিতেছি, যাহা নিদ্রা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কি ভীষণ স্বপ্ন-জাগরণ!"

শোকের আবেগে তাহার ভাষা কণ্ঠে আবদ্ধ হইয়া গেল, হৃদয়

যন্ত্রণাভারে স্ফীত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের বিকট বিক্লব তাহার মনের শোচনীয় ভাব ব্যক্ত করিয়া দিল।

সে কিয়ৎক্ষণ আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। কি জানি, কেন আমি তাহার দিকে আমার হস্ত একবার সঞ্চালন করিলাম; ইহাতে যে কোনও আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহা নয়। সে কিন্তু মনে করিল যে, আমি তাহার গললগ্ন রজ্জুখণ্ডকে আকর্ষণ করিতে যাইতেছি; তাহার সমস্ত অঙ্গ আশঙ্কায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তোমরা দেখিয়াছ, মেঘকোলে সৌদামিনী কিরূপ ক্রীড়া করে; সে তাহার অপেক্ষা দ্রুততর, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আমি দেখিতে পাইলাম না। আমিও ভয়ে (পাছে সে আবার ফিরিয়া আসে:) সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। এখানে ত অপরের চিন্তায় আত্মবিস্মৃতি নাই, আবার নিজের দুঃখভার লইয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া আত্ম-চিন্তায় যে শান্তি তাহারও আশা নাই।

আমি এক গহ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত হইতে না হইতে দেখি সেখানেও এক আত্মঘাতী আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই নিজ যন্ত্রণা-কাহিনী আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কর্ণবিবরে ঢালিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এইরূপে যেখানেই যাই সেইখানেই নয় অপঘাত মৃতের বীভৎস ব্যবহার, নয় আত্মঘাতীর মর্ম্মান্তিক যাতনা। কেহ উজ্জ্বল ফলক-বিশিষ্ট ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বসন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেছে ও মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করি-তেছে; বক্ষ হইতে কাল্পনিক রুধিরস্রাব কিছুতেই পুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। কেহ বা শূন্যে চারিধারে ঘাতকের তরবারী নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও শান্তি নাই। কেহ বা কাল্পনিক অগ্নির দাহন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অস্থির। যাহার জলনিমজ্জন-হেতু অপমৃত্যু হইয়াছে, সে চতুর্দ্দিকে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল বারিধি কল্পনা

করিয়া, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে যেখানেই যাই, সেইখানেই ঘোর যন্ত্রণা, মর্ম্মান্তিক পীড়া, আত্মপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা ও নিরাশায় আর্ত্তনাদ। আমি ভয়ে, যন্ত্রণায়, নিরাশায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিলাম। সে যে কি কষ্ট, তাহা ভাষায় বলিবার কাহারও শক্তি নাই; তাহা যে না ভোগ করিতেছে, সে কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

কিন্তু, একটা দৃশ্য দেখিয়া সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমি ক্ষণিকের তরে বিস্ময়ে পরিপূরিত হইলাম। আমি জন কতক লোক দেখিলাম, তাহারা এই ভীষণ স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। কোনও রূপ যন্ত্রণা যেন তাহাদিগের প্রশান্ত চিত্তে কোনও তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। তাহাদিগের কাহারও বহির্স্সঙ্গা নাই; এত যে পাতকীদিগের আর্ত্তনাদ বা অপমৃতের বীভৎস অভিনয়, কিছুই তাহারা জানিতে পারিতেছে না, অথচ তাহারাও সেইস্থানে আসীন। বরঞ্চ তাহাদিগের বদনের বিমল কান্তি দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা কি মনোরম সুখ-স্বপ্নে নিমগ্ন। তাহারা সেখানে নিথরভাবে বসিয়া আছে, অথচ তাহাদিগের সম্বিত আর কোন পবিত্র শান্তিক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে। আমি তখন এই রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু এখন জানিয়াছি তাহারা কাহারা। তাহারা পরার্থে, ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য, আত্ম বলিদান দিয়াছেন। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া যতদিন কালপূর্ণ না হয়, ততদিন এইস্থানে বাস করিতে হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বার্থ চিন্তা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা এই স্থানের ভীষণ যন্ত্রণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। সে যাহাই হউক, তাহারা আমার ঘোর যন্ত্রণার কোনও সহানুভূতি করিল না, আমিও তাহাদিগের মনের অবস্থা কিছুই বুঝিলাম না, তাহাতে আমার মনে এক প্রকার বিরক্তি অধিকার করিল। সেই বিরক্তি হইতে নূতন

এক প্রকার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আমি অস্থির হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। জ্ঞানহীন, উন্মাদের মত, কতদূর যে যাইলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। এক গহ্বরের মধ্যে জড়সড় হইয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। প্রথমপত্র সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(১৩৭ পৃষ্ঠার পরে)

গত রাত্রির কথাবার্ত্তায় ব্যোমকেশ যেন কি একটা নূতন আলোকের আভাস পাইয়াছিল। ঋষিদিগের সত্যানুরাগ, জ্ঞানলিপ্সা, সংযম ও যোগাভ্যাস এই সমস্ত বিষয় যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন তপোবনালঙ্কৃত, সামগানমুখরিতা, পবিত্র যজ্ঞধূমপূত, স্নিগ্ধ শ্যামছায়া-বিভূষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-লীলাভূমি—যথায় প্রকৃতিদেবী আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহার প্রিয়পুত্রগণকে চিরদিন লালন করিতেন, যথায় বিলাস লালসাশূন্য সর্ব্বভূতহিতকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ-রসে ডুবিয়া থাকিতেন, ক্ষত্রিয় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া প্রজাপালন করিতেন, বৈশ্য লোক-রক্ষার্থ ধনার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতেন, এবং শূদ্র অপরাপর সকলের সেবা করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিত—সেই মহামহিমা-মণ্ডিত প্রাচীন আর্য্যভূমির একখানি স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলেখ্য তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ভাবের নেশা তাহাকে যেন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল; এবং কতক্ষণে সে পুনরায় সে পুণ্যকাহিনী শুনিয়া চরিতার্থ হইবে সেই আশায় সোৎসুক হৃদয়ে সায়াহ্নে বন্ধু সম্মিলন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, এবং সকলে পুনরায় একত্রিত হইয়া

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে ঘেরিয়া বসিল। ব্যোমকেশ ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল—"দাদা ম'শায়, যে নব্য বিদ্যার গর্ব্বে স্ফীত হয়ে, এতদিন আপনাদিগকে অনাদর করে এসেছি, আপনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চখে যেন সে বিদ্যারজ্যোতিঃ সকালবেলার চাঁদের মত ম্লান হয়ে যাচ্চে। বাস্তবিকই আমরা নিজেদের কোন সংবাদই রাখি না এবং রাখতে পছন্দও করি না। সাহেবি বিদ্যাশিক্ষা ক'রে একবারে সাহেব সাজ্‌তে গিয়ে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত দাঁড় কাকের ন্যায় শুধুই হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ি। আমি আপনার শরণাগত হচ্চি, যাতে আমার যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্য্য। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন। এই বৃদ্ধ বয়সে যদি তোদের মধ্যে যথার্থ স্বদেশানুরাগ জেগে উঠতে দেখি, তা'হলে সুখে মর্‌তে পার্‌বো। তোর মনটা দেখ্‌ছি একটু ভিজেছে, তাই একটা কথা বলি ভাল ক'রে শোন। শুধু করকচ নুন আর গুড়ে রসগোল্লা খেলেই স্বদেশী হওয়া হবে না। স্বদেশকে, স্বদেশী-ধর্ম্মকে, স্বদেশী-জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভাল ক'রে চিন্‌তে শেখ, স্বদেশের সনাতন অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও তদনুসঙ্গী নানাশ্রেণীর জ্ঞানরাজী লাভ করে যথার্থ স্বদেশী হও, এবং জগতের সাম্‌নে এক নবোজ্জ্বল আদর্শ খাড়া ক'রে মানব জাতির কল্যাণসাধন কর এবং আপনারাও ধন্য হও।

ব্যোমকেশ। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেইরূপই মতিগতি হয়। এখন আমাদের পূর্ব্ব কথা সুরু হোক্।

ভট্টাচার্য্য। আমরা এপর্য্যন্ত যে আলোচনা করেছি, তার একটা পুনরাবৃত্তি করা যাক্। আমাদের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কথাবর্ত্তায় আমি বলেছি প্রবৃত্তিমার্গী জীব ভূর্ ভুবঃ এবং স্ব এই লোকত্রয় আশ্রয় ক'রে থাকে, এবং এই লোকত্রয় কি, এই কথাটা ভাল ক'রে বোঝাবার জন্য আমরা জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কচ্ছিলাম। তাই না?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ। আমরা ইথারকে জড়ের চতুর্থ অবস্থা ব'লে নির্দ্ধারণ কচ্ছিলাম। এই খানেই ত জড়রাজ্যের শেষসীমা বলিয়া আমরা জানি। অন্ততঃ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ইহার অতিরিক্ত কিছু বলে না।

ভট্টাচার্য্য। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এখনও শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিককুল যেরূপ ভাবে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্চেন, তাহা আশাপ্রদ বটে। তাঁদের রসায়ন-শাস্ত্রোল্লিখিত চতুঃষষ্টি বা পঞ্চষষ্টি সংখ্যক মৌলিক-পদার্থ আর বোধ হয় অধিকদিন টিকবেন না। তাঁরা যে প্রোটাইলের কথা আজকাল বল্‌চেন সেটা শুনেচিস কি?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ; Sir William Crookes বলেন এক-প্রকার সমজাতীয় (homogeneous) মৌলিক পদার্থ হ'তেই রসায়ন শাস্ত্র যাদিগে মূলভূত (elements) বলে, সে সমস্ত গুলির উৎপত্তি হয়েছে। এই পদার্থটির তিনি নামকরণ করেছেন 'প্রোটাইল' (Protyle)। তাঁর মতে এই প্রোটাইল হচ্চে জড় জগতের মূল উপাদান। কিন্তু এ মত এখনও সকলে গ্রহণ করেন নি।

ভট্টাচার্য্য। তা না করুন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গতি এখন ঐ দিকে। এখন কথাটা একটু ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর। ঐ যে প্রোটাইল, যাকে জড়ের প্রান্তসীমা বলা হচ্চে, উহা বাস্তবিক তাহা নয়। আমাদের আর্য্যবিজ্ঞানের মতে উহা ভূর্লোকের শেষসীমা, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানে আমরা যাকে জড়পদার্থ বলে জানি, যা দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, মাটি, ইত্যাদি তৈয়ারী হয়েচে, তারি শেষ অবস্থা। কিন্তু এ ছাড়াও জড়ের বা প্রকৃতির আরও সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে। ঋষিদিগের বিজ্ঞান মতে জড়পদার্থ ক্রমেই সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ যে প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ব, তাহার সাত প্রকার অবস্থা আছে। সর্ব্বত্রই সেই এক প্রকৃতির বিকার, অতএব মূলতঃ

সবই এক, কিন্তু পরিণামের বিভিন্নতা বা বৈষম্য জন্য অবস্থার বিশেষ পার্থক্য জন্মে গেছে। একটা উদাহরণ দিই। একখণ্ড বরফ এবং অদৃশ্য জলীয় বাষ্প যে একই মূল উপাদানে তৈয়ারী এটা অশিক্ষিতের নিকট কিরূপ বোধ হয়? এ দু'টা জিনিষের মধ্যে কত পার্থক্য? যেন দুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ, কিন্তু বস্তুতঃ মূলে দু'য়েরই এক উপাদান। সেইরূপ মূলপ্রকৃতির পরিণামবৈষম্য জন্য যে সাত অবস্থার কথা বল্‌লাম, সে গুলিও ওই প্রকার পরস্পরের বিসদৃশ; একটা অবস্থা বা স্তর হ'তে আর একটি অবস্থা বা স্তরে উপস্থিত হ'লে মনে হবে, যেন একটা নূতন জগতে এলাম। সে জগতের নিয়ম প্রণালী, দৃশ্য, অধিবাসী, প্রাণী সমূহ সবই অন্য প্রকারের। সেই এক একটি স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে এক একটি লোক। এইরূপ সাতটি লোক আছে, যথা, ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, জন, মহ, তপ ও সত্য। ভূর্লোক অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে অবস্থার সহিত আমাদের সাধারণ পরিচয় রয়েছে, এ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি করে সত্যলোকে পৌছিলে তবে জড়ের বা প্রকৃতির শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। কথাটা পরিষ্কার হ'ল কি?

ব্যোমকেশ। আপনি যা বলচেন্ তা বুঝচি বটে, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জড়প্রকৃতি রচিত এই লোক সকলের অস্তিত্বের প্রমাণ কি আছে?

ভট্টাচার্য্য। প্রত্যক্ষই সমস্তের প্রমাণ, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। যোগাভ্যাস দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের স্ফূরণ হ'লে ক্রমে এই সমস্ত সূক্ষ্মলোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কেমন করে সেই সমস্ত শক্তির স্ফূরণ হয় সে সব কথা যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহে অতিশয় পরিস্ফুট ভাবে লেখা আছে। এখনও সাধনশীল ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সেই সমস্ত প্রণালীমতে জীবনগতি চালিত করিয়া বহুবিধ যোগৈশ্বর্য্যলাভ

করেন এবং ক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। শুনেছি নাকি পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এখন অনেকে আমাদের যোগপ্রণালী অবলম্বন কচ্চেন এবং তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে অনেক নূতন ব্যাপার তাঁদের অধিগত হচ্চে।

ব্যোমকেশ। হাঁ আজকাল clairovyance, telepathy, mental healing ইত্যাদি অনেক নূতন নূতন কথা উঠ্‌ছে বটে; কিন্তু এখনও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর নিকট এই সমস্ত ব্যাপারের নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

ভট্টাচার্য্য। ক্রমেই হবে, কোন তত্ত্বই একদিনে আপনার আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পারে না। ওই যে clairovyance ইত্যাদি যা কিছু বল্‌লে ও সমস্তই যোগপ্রক্রিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। ক্রমে আমরা ও সবের আলোচনা কর্‌বো। ভূর্ভুব ইত্যাদি লোকসমূহ যোগিগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, চেষ্টা কর্‌লে তুইও সেরূপ প্রত্যক্ষের পথে পাদবিক্ষেপ কর্ত্তে পারিস্। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞান এখনও এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ কর্ত্তে পারে নি বলে, যদি ওগুলোকে একেবারে অলীক বিবেচনা ক'রে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন বিষয়ে উপেক্ষা করিস্, তা হলে শুধু শুধু প্রমাণ প্রমাণ ক'রে চীৎকার করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কথা থাক্। এখন যদি ভূর্ভুবঃস্বঃ এই লোকত্রয়ের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের পূর্ব্বকথার আলোচনা আবার সুরু করা যাক্।

ব্যোমকেশ। দাঁড়ান দাদামশায়, একবার আসল কথাটার পুনরাবৃত্তি করে নিই। আপনি বলেছেন, প্রেততত্ত্ব বুঝ্‌তে গেলে মানবের স্বরূপ ও গতির জ্ঞান কিঞ্চিৎ হওয়া দরকার। আর বলেছেন, মানবাত্মারূপ বীজ প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রের ক্রোড়ে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে কালে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করে। প্রথমাবস্থায় জীব

প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, কারণ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন শক্তির প্রাথমিক বিকাশ হয় না। এই প্রবৃত্তিমার্গী জীব বার বার জন্ম পরিগ্রহণ করে এবং ভূঃ ভুবঃ এবং স্বর্ এই তিনটি লোক আশ্রয় ক'রে থাকে। তার পরে বলুন।

ভট্টাচার্য্য। কথাটা এখন একটু শক্ত হয়ে আসচে, অতএব মন দিয়ে শোন্। জীবাত্মার এই বিভিন্ন লোকবাসের জন্য বিভিন্ন উপাধি বা শরীর আছে। এ কথার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েচে। আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে পাশ্চাত্য দিগের এক অদ্ভুত ধারণা আছে দেখতে পাই, আর তোরাও অনায়াসে সেইটাকে গলাধঃ-করণ করিস্। সেটা হচ্ছে এই, আত্মা দেহধারণ করে পৃথিবীতে বাস করে, পরে মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করে চলে যায়। তাঁরা যেন বলতে চান যে দেহ বলে যা কিছু তার সঙ্গে আত্মার একটা চিরবিচ্ছেদ সংঘটন হয়। জড়পদার্থনির্ম্মিত দেহটা পড়ে থাকে, আর যেটা চলে যায় সেটা খাঁটি আত্মা, সম্পূর্ণরূপে শরীরসম্বন্ধরহিত। কিন্তু তারা এটা একবার চিন্তা ক'রে দেখেন না যে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধি সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকাশিত হতে পারে না। তা যদি সম্ভব হত, অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধ ভিন্ন যদি আত্মার প্রকাশ হ'তে পারতো, তা হ'লে আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবার সময় একটা দেহ ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভূর্লোকে যদি একটা শরীরের আবশ্যকতা থাকে, তা হলে ভুবর্ল্লোক ও স্বর্গলোকেও শরীরের বা উপাধির দরকার আছে, কারণ মূলগত উদ্দেশ্য একই, আত্মার প্রকাশ। সে উদ্দেশ্যটা সকল সময়েই বর্ত্তমান, তা আত্মা যে লোকেই থাকুন। সেই জন্য ভূর্লোকে বাস জন্য যেরূপ আমাদের একটী স্থূল শরীর আছে, সেইরূপ ভুবর্ল্লোক ও স্বর্গলোকে বাস জন্য সেই সেই লোকোপযোগী সূক্ষ্মশরীর আছে। কথাটা আর এক দিক দিয়ে বুঝে দেখ।

আমাদের শরীরের একটি নাম ভোগায়তন; এর অর্থ হচ্চে আমরা যা কিছু ভোগ সুখ অস্বাদন করি সেটা শরীরের সাহায্যে ঘটে থাকে। তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি জীবাত্মা ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্ এই তিনটি লোক বার বার ভোগ করে। অতএব দেখা যাচ্চে যেরূপ ভূর্লোক ভোগের জন্য একটা ভূর্লোকের উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত একটা স্থূলশরীর আছে, সেইরূপ ভুবর্ল্লোক ভোগ করবার জন্য ভুবর্ল্লোকের উপাদানে গঠিত একটা সূক্ষ্ম শরীর থাকার প্রয়োজন। সেইরূপ স্বর্গলোক ভোগের জন্য আর একটি সেই লোকের উপযোগী শরীর দরকার। এখন মনে করে দ্যাখ্, কেন তোকে বলেছিলাম, শরীর একটা নয় অনেকগু'ল। এতদূর পর্য্যন্ত কথাটা বুঝ্লি কি?

ব্যোমকেশ। আপনি বল্লেন যে জীবাত্মা ত্রিলোকীকে আশ্রয় ক'রে থাকে, এই কথাটার মর্ম্ম আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। আর সেই সঙ্গে যদি জীবাত্মার স্বরূপ ও তাহার অভিব্যক্তি সম্বন্ধীয় কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বলেন তা হ'লে বড় ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

প্রেতের কর্ত্তব্যজ্ঞান।

সন ১৮৬৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ অনেকেরই স্মরণ আছে। যদিও উড়িষ্যা বিভাগে উহার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গ ও বিহার অল্পে অব্যাহতি পায় নাই।

বঙ্গদেশের অনেক অংশেই শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মানভূম জেলা একটী। মানভূমে অনেক ইতরলোক বৃক্ষপত্র ও মূল আহার করিয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আমার কয়েকটী আত্মীয় পুরুলিয়াতে গবর্ণমেণ্টের (Government) চাকরি করিতেন। ১। বাবু উমা-

চরণ মুখোপাধ্যায়, পুলিসের হেড রাইটার, ২। বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, আবগারির দারোগা এবং ৩। অমিয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী কমিশনারের হেড রাইটার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল অমিয়লাল সপরিবারে ছিলেন। অন্য দুই জনের পরিবার নিকটে ছিল না। তাঁহারা অমিয়লালের বাটীতেই থাকিতেন। মহামারি যে দুর্ভিক্ষের একটী আনুসঙ্গিক ঘটনা তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। পুরুলিয়াতেও দুর্ভিক্ষের পরই বিসূচিকার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইল। শত শত লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। ভদ্রলোকেও অব্যাহতি পাইল না। বিসূচিকা আরম্ভ হইলে, অমিয় বাবু তাঁহার পরিবার রাঁচিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সেখানে গভর্মেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারি ছিলেন। তাঁহারা তিন জনে দুইটী ব্রাহ্মণ ও চাকরের সহিত পুরুলিয়াতে রহিলেন।

কি করিবেন, চাকরি ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। চারিদিকে হাহাকার। প্রত্যহ ৩০।৪০ জন করিয়া লোক বাটীর নিকট মরিতেছে। সমস্ত সহ্য করিয়া তাঁহারা সশঙ্কিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। উমাচরণ বাবু বাল্যকাল হইতেই পরোপকারী ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল। পরিচিত লোকের পীড়া হইলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহামারির সময়েও তিনি সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইতেন। ইতিমধ্যে কুঞ্জবিহারী বাবু একটী আবগারি মোকদ্দমা তদারক করিতে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে উমাচরণ বাবু প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে রোগী দেখিয়া বাসায় আসিয়া, কুঞ্জবিহারী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কেন ফিরিয়া আসিলে, তথায় কিছুদিন থাকিতে পারিলে না, এখানকার ব্যাপার তো দেখিতেছ।"

কুঞ্জ। তোমাদের ছাড়িয়া কেমন করিয়া স্থির হইয়া থাকিব। মন বড় অস্থির হইয়াছিল, সেই জন্য আসিলাম।

তখন আর কোন কথা হইল না। উমাচরণ বাবু একটী গাড়, লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "অমিয় তোমরা সাবধান হও, আমাকে ধরিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। এই কথা শুনিয়া কুঞ্জবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনিও বলিলেন, "আমাকেও ধরিয়াছে"। তখন অমিয়বাবুর কি বিপদ তাহা লিখিয়া বর্ণন করা যায় না। ত্বরায় ডাক্তার সাহেবকে খবর পাঠান হইল। ডাক্তার সাহেব দিনে দুইবার করিয়া আসিতে লাগিলেন। এদিকে রোগীদের অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। অমিয়বাবু চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া ও প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে যতদূর সম্ভব রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জবিহারী আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া অমিয়বাবু উমাচরণ বাবুর নিকট দিনরাত্রি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারেন। ডাক্তার সাহেবও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত নয়, মনুষ্যে চেষ্টা করিয়া তাহা সফল করিতে পারে না। পরদিন বৈকালে ডাক্তার সাহেব ও আরও কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, রোগীও বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে ডাক্তারসাহেব হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "Poor Koonja Behary!" রোগী অমনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Is he dead, Sir?" ডাক্তারসাহেব অমিয়বাবুর ইঙ্গিতমতে কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু উমাচরণবাবুর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। একটী

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে ডাক্তার সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "I am very much thankful to you, for the trouble you have been taking for me; but man cannot do what God does not wish. My time is up, and I must now bid you all farewell, and ask forgiveness for all my past shortcomings. অমিয়বাবুকে বলিলেন, "অমিয় কাঁদিস না, হাস্য মুখে আমায় বিদায় দে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "লোকে মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বলে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা শান্তিময়। আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার সম্মুখে ক্রমে শান্তির দ্বার উন্মোচিত হইতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

ইহার পর হইতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিতে লাগিল। যথাসময়ে উহাদিগের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। অমিয়বাবু পুনর্ব্বার রাঁচি হইতে পরিবার আনিলেন। একদিন রাত্রিতে, আন্দাজ দুইপ্রহরের সময়, অমিয়বাবু শয়নের পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছেন, এটী তাঁর নিত্যকর্ম্ম। ঈষৎ তন্দ্রার আভাস আসিয়াছে, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, কুঞ্জবিহারী তাঁহার স্বাভাবিক বেশে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন।

"অমিয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিয়া যাইতে পারি নাই। গিরীশকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে তোমাকে বলে নাই; সেইজন্য পুনর্ব্বার আসিলাম। দুইটী আবশ্যকীয় মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কাগজপত্র মায় আমার তদন্তের রিপোর্ট আমার বাক্সে আছে, সেগুলি ডেপুটী কলেক্টার-সাহেবকে ফিরাইয়া দিবে। আর রাঁচিতে একটী মোকদ্দমায় আসামীর জরিমানা হইতে আমাকে ১৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার হুকুম হইয়াছে। রায়ের নকল আনাইয়া তুমি আমার পরিবারের অছি হইয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবে। তোমার

দাদাকেও ঐ কথা বলিয়া আসিয়াছি। দেখিও যেন বিধবা নৈরাশ না হয়"। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধ্যান হইলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে সকলে একত্রিত হইলে, অমিয়বাবু ঐ কথা উত্থাপন করিলেন। গিরীশ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল, "ঠিক কথা, আমি গোলমালে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কুঞ্জবাবু আমাকে কাগজের কথা আপনাকে বলিতে বলিয়াছিলেন, যে বাক্সতে কাগজ আছে, সে বাক্সও আমাকে দেখাইয়াছিলেন"। পরে কুঞ্জবাবুর বাক্স আনিয়া সকলের সম্মুখে খোলা হইল। খুলিয়া দেখা হইল, ঠিক কাগজ রহিয়াছে। পরদিন অমিয় বাবুর জ্যেষ্ঠকে পত্র লেখা হইল, তিনি কিছু দেখিয়াছেন কি না। তাঁহার পত্র আসিল, তিনিও ঠিক ঐরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন। রাঁচির কালেক্টরীতে তল্লাস করিয়া জানিয়াছেন যে, বাস্তবিক ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কুঞ্জকে ১৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার হুকুম হইয়াছে। তিনি রায়ের নকল লইয়াছেন ও স্বয়ং জামিন হইয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যে কিছুদিন পরে টাকা বাহির করিয়া তিনি কুঞ্জবাবুর ভ্রাতার কাছে পাঠাইলেন। ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্য, অমিয়বাবু ও তাঁহার দাদা আমার অতি নিকট-সম্বন্ধীয়, আমি তাঁহাদের নিকট ইহা শুনিয়াছি ও অমিয়বাবুর দাদা রাঁচি হইতে অমিয়বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্র স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়।

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা

(১)

ধর্ম্মের জয়

পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতীব ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একদা

তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, রাজ-ধানীস্থ বিপণীতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিবে, প্রতিদিন সন্ধ্যা-বসানে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তিনি ক্রয় করিয়া লই-বেন। এইরূপ ঘোষণা অনুসারে কিছুদিন কার্য্য চলিতে লাগিল। একদা সন্ধ্যাকালে হট্ট ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে জনৈক বিক্রেতা একটী অবিক্রীত দ্রব্য হস্তে করিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু! তোমার অবিক্রীত দ্রব্য কি এবং তাহার মূল্যই বা কত ?" তখন ঐ ব্যক্তি তাহার পণ্যটী রাজ-সমীপে উত্তোলন করিয়া বলিল "আর্য্য! আমার এই অলক্ষ্মীটী অবিক্রীত রহিয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা।" নৃপতি ইহা শুনিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন যে "এই ব্যক্তিকে লক্ষ মুদ্রা দিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া রাজ অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেও"। রাজ আজ্ঞামত কোষাধ্যক্ষ পণ্য বিক্রেতাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিল এবং ঐ অলক্ষ্মীটি রাজা-ন্তঃপুরে প্রেরণ করিল।

পরদিন প্রত্যূষে নৃপতি সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে রাজাসনে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সুমধুর নূপুর ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইলে সকলেই চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিতে পাইলেন যে, বিবিধ রত্না-লঙ্কারভূষিতা লাবণ্যবতী এক পরমাসুন্দরী রমণী রাজ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, রাজ-তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। নৃপতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে হেতু এরূপ দিব্য জ্যোতিঃ-সম্পন্না অলোক-সামান্যা রমণী তিনি রাজ অন্তঃপুরে কখন দেখেন নাই। মনে করিলেন, ইনি কে, কিরূপেই বা রাজ অন্তঃপুরে আসিলেন এবং কোথায় বা যাইতে-ছেন। অনন্তর তাঁহার গমনে বাধা দিয়া সম্বোধন করিলেন "মা! তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে এবং কোথায় বা যাইতেছ ?" উত্তরে

তিনি বলিলেন "নৃপবর! আমি তোমার রাজলক্ষ্মী! এতদিন পর্য্যন্ত তোপনার প্রাসাদে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি যখন অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তখন এ সংসারে আমার আর থাকিবার স্থান নাই। সুতরাং এ রাজ-সংসার পরিত্যাগ করিতেছি।" ভূপতি করযোড়ে বলিলেন "মা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন, যে হেতু আমার প্রতিবাদ করিবার কোন পথ নাই। এই বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন "তবে এস মা" ইহা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ পরে সকলে আবার দেখিতে পাইলেন যে,চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ এবং দিব্য পুষ্পমাল্য সুশোভিত এক অতীব সুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ রাজ-প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য তোরণ দ্বার অভিমুখে যাইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও গমনে বাধা দিয়া নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! আপনি কে কোথা হইতে আসিলেন এবং কোথায় বা যাইতেছেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "নৃপবর! আমি নারায়ণ। আপনার এই রাজ-সংসারে লক্ষ্মী-দেবীর ন্যায় আমিও অনেকদিন হইতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী যখন আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন, তখন আমি আর কিরূপে থাকিতে পারি, সুতরাং আমিও রাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম। নৃপতি পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, তবে আসুন।" নারায়ণ রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে আবার দেখিতে পাইলেন যে, তেজপুঞ্জসমন্বিত জ্যোতির্ম্ময় এক শ্বেতবর্ণ পুরুষ লক্ষ্মী এবং নারায়ণের ন্যায় রাজপুর হইতে বাহিরে যাইতেছেন। তখন নৃপতি করযোড়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! আপনি কে,কোথা হইতে আসিলেন কোথায় যাইতেছেন এবং কি জন্যই বা যাইতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন "আমি ধর্ম্ম! নারায়ণ এবং লক্ষ্মী যখন আপনার রাজ-সংসার ত্যাগ করিলেন তখন আমিই বা কিরূপে থাকিতে পারি?" তখন নৃপতি গললগ্নী-কৃতবাসে করযোড়ে বিনীত মধুর বচনে বলিলেন "দেব! আমি যখন অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়াছি তখন লক্ষ্মী দেবী যাইতে পারেন, তাঁহাকে বাধা দিবার আমার অধিকার নাই। তাহার পর লক্ষ্মীদেবী

যখন গেলেন, তখন নারায়ণকে রাখা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং সত্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বলিবার আমার কিছুই অধিকার নাই। কিন্তু দেব! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কারণে এই দাসকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—আমি কি কিছু অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছি? সত্যের আশ্রয় করিয়া আমি কি ধর্ম্ম পালন করি নাই? যদ্যপি অন্যথা করিয়া থাকি, সম্মুখে দ্বার উন্মুক্ত যাহা অভিরুচি হয় তাহা করুন। কিন্তু আমি যদ্যপি আপনার আশ্রয় অনুমাত্র ত্যাগ করিয়া না থাকি, তবে আপনি কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন? তখন ধর্ম্মদেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মহারাজ! আপনি ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই, সুতরাং আমার আর রাজসংসার পরিত্যাগ করা হইল না। আমি পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার রাজ-প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর রাজা দেখিতে পাইলেন যে, নারায়ণ আবার ধীরে ধীরে প্রত্যাগত হইয়া রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তখন রাজা করজোড়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! পুনর্ব্বার যে ফিরিয়া আসিলেন?" তখন নারায়ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "যখন ধর্ম্ম আপনার সংসারে রহিলেন, তখন আমি কি প্রকারে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি, সুতরাং আবার ফিরিয়া আসিলাম।"

ইহার কিছুক্ষণ পরে পুনরায় দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদেবী সলজ্জভাবে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করিতেছেন। তখন পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আবার যে এ অধম সন্তানের ঘরে ফিরিয়া আসিলে? লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "নৃপবর! নারায়ণ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কি থাকিতে পারি? আর যেখানে ধর্ম্ম অবস্থান করেন, সে স্থান আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। নৃপবর! তুমিই যথার্থ ধর্ম্মাশ্রয়ী। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের জয়, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। "যতো ধর্ম্ম ততো জয়ঃ।"

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

কমলমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। কৌষিতকী উপনিষদ্।

মূল, অন্বয় ও অনুবাদ। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মূল্য ॥০ আনা।

২। নারদ ভক্তিসূত্র।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী বিরচিত, মূল্য ।৵০ আনা।

৩। স্তুতি কুসুমাঞ্জলি।

হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত স্তোত্রগুলি পাগলের প্রলাপ প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতা গোবিন্‌লাল বাবুর সুমধুর পদ্যানুবাদ সহ। প্রত্যেক হিন্দু গৃহে একখানি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দু মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের বিশেষ উপযোগী। মূল্য ।৵০ আনা।

৪। ভক্ত-জীবন।

শ্রীমতী বেশান্ত—সম্পাদিত—"Doctrine of the heart"এর, অনুবাদ, মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। জীবন ও মরণান্তে জীবন।

শ্রীমতী বেশান্তের Life and Life after death নামক পুস্তকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য ৵০ আনা।

২। ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি।

শ্রীমতী বেশান্তের Devotion and Spiritual Lifeএর বঙ্গানুবাদ। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য ৵০ আনা।

৩। সদ্গুরু ও শিষ্য।

শিষ্যগুরু বিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

৪। প্রকৃত দীক্ষা।

প্রকৃত দীক্ষা যে কি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কিরূপ, তাহার নিগূঢ় তত্ত্বের আভাষ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

আর্য্যধর্ম্ম গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড।

বৃহৎ স্তব-কবচ মালা। (২য় সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত। কাপড়ে বাঁধান, সুন্দর কাগজ ও সুন্দর ছাপা ১০৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ এক টাকা।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য ও বিবিধ পাঠান্তর ও পরিশেষে কতকগুলি উৎকৃষ্ট স্তোত্র সহ) ।/০
ঐ রাজ সংস্করণ ... ... ||০

ধম্মপদ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। ধর্ম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ (২য় সংস্করণ) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত—মূল্য ১||০ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, প্রণীত।

১। মুর্শিদাবাদকাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২||০
২। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২||০
৩। প্রতাপাদিত্য ২||০
৪। সোণার বাঙ্গালা (স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে)

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে বাহির হয় নাই। মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ।

৺ শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য—১।৵০ এক টাকা ছয় আনা।

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর

বাহির হইয়াছে মূল্য—৸৹ আনা।

ঈশ, কেন ও কঠ।

বাহির হইয়াছে, মূল্য ॥০ আনা।

প্রশ্ন, মুণ্ডক্য ও মাণ্ডুক্য—(যন্ত্রস্থ) শীঘ্র বাহির হইবে।

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং

লোটস্ লাইব্রেরী, ৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমাদিগের নূতন পুস্তক।

ভক্ত-জীবন।

কমলমালিকা গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ।

শ্রীমতী আনি বেসান্ত সম্পাদিত "Doctrine of the Heart" নামক উপাদেয় ভক্তি গ্রন্থের অতি মধুর বাঙ্গালা অনুবাদ।

Philosophy of the Gods—or "Deva Tattva" by Srijut Hirendra Nath Dutt M. A., B. L.,—Price As. 12 only.

"Psychism and Theosophy" (Transaction of Theosophical Federation No. I.) Enlarged revised edition of a paper read at the Serampore Theosophical Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only.

রূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন; বিশেষ এই পুস্তক পাঠ করিলে কোন মিস্ত্রী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অল্প আয়াসে সমস্ত বুঝিতে পারা যায়, মূল্যও সুলভ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

চণ্ডী। (২য় সংস্করণ)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম্য বহুবিধ টীকার সাহায্যে সরল অভিনব টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অর্গলা-স্তোত্র, কীলকস্তোত্র, কবচ, দেবীসূক্ত, ন্যাসাদি রহস্যত্রয় এবং অত্যুৎকৃষ্ট চারিখানি দেবীপ্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। ৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।৴০ ছয় আনা মাত্র।

পল্লী চিত্র। (মাসিক পত্র।)

শ্রীবিধুভূষণ বসু সম্পাদিত।

পল্লী গ্রাম হইতে পল্লীসেবা সঙ্কল্প লইয়া প্রকাশিত। পল্লীগ্রামের শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, ইতিহাস, প্রবাদ প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বেঙ্গলী বলিয়াছেন—Among the Bengali monthlies this publication occupies a high place.

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক।
বাগের হাট, খুলনা।

ঐতিহাসিক চিত্র—৫ম বর্ষ ১৩১৬ সাল (ঐতিহাসিক মাসিক পত্র) শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্, সম্পাদিত এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত। মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ২৲ টাকা।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট মেট্‌কাফ্ প্রেসের ম্যানেজারের নিকট মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

Printer—A. Banerji, Metcalfe Press, 76, Balaram Dey Street.

অলৌকিক রহস্য।

৫ম সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [ভাদ্র, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

এই পত্রিকার অন্যত্র পাঠক মহোদয়গণ দেখিতে পাইবেন যে, এক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তির প্রেতাত্মা কিরূপে এক মৃত দেহ আশ্রয় করিয়া নিজ ইচ্ছা পুরণ করিয়াছে। আমরা এই স্থানে তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মৃত্যুকালে মনুষ্যের যে প্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল থাকে, মৃত্যুর পরে প্রেতলোকে অবস্থান-কালে সেই প্রবৃত্তির শক্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থে করিবাব জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষার বশে প্রেতাত্মা তখন সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে। স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইলেও তীব্রবাসনা-পরবশ জীব সুবিধা পাইলেই কোন জীবিত নরদেহ আশ্রয় করিয়া নিজ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে থাকে। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ ভূতাবেশ বলিয়া থাকি। কিন্তু মৃতদেহে ভূতাবেশের ঘটনা অতি বিরল, কারণ দেহমুক্ত জীব প্রাণশক্তির সাহায্য না পাইলে, সাধারণতঃ অপর দেহে কার্য্য করিতে পারে না।

তবে কেমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিল? কেমন করিয়া মৃত ব্যক্তি জীবিতের ন্যায় আচরণ করিল?

এরূপ ঘটনা কচিৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। এমন ঘটনা অনেক শুনা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবশে সঞ্চালিতের ন্যায় কত শ্মশান-প্রস্থিত দেহ হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া বাহকদিগের ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির জীবিতের ন্যায় ব্যবহার বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না!

এই সম্বন্ধে আমরা একজন মনীষীর মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—তিনি বলেন, জীবদেহ যদি একেবারে প্রাণহীন হয়, তাহা হইলে প্রেতাত্মা তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সেটিকে জীবিতবৎ আচরণ করাইতে পারে না। অন্ততঃ তাহাতে জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গ থাকিবার প্রয়োজন। সেই স্ফুলিঙ্গ আশ্রয় করিয়া প্রেতাত্মা সমস্ত দেহে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করিতে পারে। বাক্ পাণি পাদাদি ইন্দ্রিয় সকল তখন তাহার বশীভূত হয়।

অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, একটি সলিতা নির্ব্বাপিত করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই যদি সেটিকে কোন প্রজ্বলিত দীপের তলদেশে ধরা হয়, তাহা হইলে তাহার উতপ্ত ধূম্রশিখা অবলম্বন করিয়া, চক্ষের নিমেষে দীপ হইতে বহ্নি শিক্ষা নামিয়া সলিতাটিকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। কিন্তু একটু বিলম্ব হইলে আর জ্বলে না।

পত্র প্রেরকের বন্ধু তাঁহার পিতাকে মৃত মনে করিলেও, তখনও তাঁহার দেহে জীবনের শেষ শিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই। উত্তপ্ত ধূমের ন্যায় প্রাণশক্তির সহিত তখনও পর্য্যন্ত তাহার দেহের সংযোগ ছিল। প্রেতাত্মা তাঁহার পিতার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তদ্দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেক পরকায়া প্রবেশের ঘটনা উল্লিখিত আছে। ভবিষ্যতে আমাদের এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভুতের চণ্ডীপাঠ।

(উপসংহার)

বেলা আন্দাজ ১টার সময় আমাদের আহারাদি শেষ হইল। আহারের পর নিদ্রাবেশে শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিদ্রা যাইলে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গল্প শোনা হয় না। কাজেই নিদ্রার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম সার্ব্বভৌম মহাশয় পূর্ব্বেই আহারাদি করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতলের একটি ছোট ঘরে তিনি একাকী শয়ন করিতেন। সেই ঘরের দরজার সম্মুখে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, গুরুদেব, তক্তপোষের উপর উপবেশন করিয়া একটি ছোট কলি হুঁকায় কলাপাতার নল লাগাইয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছেন, ও এক হাতে তালবৃন্ত ব্যজন করি- করিতেছেন। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এস বাবুজি! ভিতরে এস, তোমাদের অপেক্ষাতেই বসিয়া আছি।" মেজেতে একখানি গালিচা পাতা ছিল, আমরা তাহার উপর উপবেশন করিলাম; পরে অতি কুণ্ঠিত ভাবে আমি বলিলাম, "মহাশয়ের যদি কষ্ট না হয়, তবে সেই গল্পটি বলিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। গল্পটি শুনিতে আমাদের বড়ই কৌতুহল হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম। আমার কোন কষ্টই হইবে না কারণ দিবা নিদ্রা আমার অভ্যাস নাই। রাত্রিকালে আমার নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। তোমরা কিন্তু সমস্ত রাত্রি একবারও চক্ষু মুদ্রিত কর নাই; তোমরা যদি কষ্ট বোধ না কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমি গল্পটি বলিব। কিন্তু বাবুজী আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, ঘটনাটি বড়ই অসম্ভব। তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকের বিশ্বাস-যোগ্য ত নয়ই,

অধিকন্তু এই ঘটনার সহিত যদি স্বয়ং লিপ্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম না। এই বৃদ্ধ বয়সে জীবনের শেষ অবস্থায় অনর্থক একটা মিথ্যা গল্প বলিয়া পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি এক মিনিটকাল চক্ষু মুদিত করিয়া হুঁকায় মনোনিবেশ করিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন।

ঘটনাটি অনেক দিনের। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বৎসরের অধিক নয়; সুতরাং প্রায় ৬৫।৬৬ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। পিতা একজন দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যাজকতা করিতেন। ২০।২৫ ঘর বর্দ্ধিষ্ণু শিষ্যও ছিল। তাহাতেই দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া একরকম বেশ সচ্ছলে আমাদের দিনপাত হইত। তাঁহার বড় ইচ্ছা আমাদের দুই ভাইকে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন। কিন্তু আমাদের গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে পূর্ব্বস্থলী গ্রাম ব্যতীত নিকটস্থ আর কোথাও টোল কিংবা ভাল পণ্ডিত ছিল না। সুতরাং একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, আমার জ্যেষ্ঠ ও গ্রামস্থ ৩।৪ টি বালকের সহিত পূর্ব্বস্থলী গ্রামে সুধাময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিতে যাইতাম। আমরা প্রাতঃকালে বেলা আটটার সময় বাটীতে আহারাদি করিয়া যাইতাম; পুনরায় সন্ধ্যার সময় বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। ইতি মধ্যে বেলা ২।৩ টার সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে মুড়ি গুড় ও কখন কখন দুগ্ধ সহযোগে উত্তম জলযোগ হইত। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর নির্ব্বিরোধে অতিবাহিত হইল। স্মৃতিতে তখন আমার একরকম ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, দুইচারিটি কঠিন তর্কেরও মীমাংসা করিতে শিখিয়াছি। সরস্বতী পূজার দিনে পূর্ব্বস্থলীতে অধ্যাপক মহাশয়-

দিগের একটি বিরাট সভা হইত। সভার উদ্দেশ্য কেবল বিদ্যাচর্চ্চা। কোনও অধ্যাপকের যদি কোনও বিষয়ে সন্দেহ হইত, কিংবা তিনি যদি কোনও সমস্যা মীমাংসা করিতে অক্ষম হইতেন, তাহা হইলে এই সভায় সে বিষয়ের বিচার হইয়া তাহার মীমাংসা হইত। চার পাঁচ বৎসর পরে এরূপ একটি সভায় কালনার নিধিরাম শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির একটি কূট প্রশ্ন উত্থাপন করেন। দুই দিন ধরিয়া এই প্রশ্নের বিচার হইল, তবু কোনও মীমাংসা হইল না। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে এই বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা পূর্ব্বস্থলী যাইতেছি, দেখিলাম পথিমধ্যে একটি পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের উপর একটি ব্রাহ্মণ বসিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দেখিতে অতি সুশ্রী। বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর; পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, গাত্রে নামাবলি মুখমণ্ডল শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত। মস্তকে স্থূল শিখা। আমরা এই পুষ্করিণীর ঘাটে বিশ্রাম করিতাম। অদ্যও বিশ্রাম করিতে যাইলাম। যাইবামাত্র ব্রাহ্মণ মস্তক সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি পূর্ব্বস্থলীতে সুধাময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে পড়" ?

আমরা। আজ্ঞে হাঁ।

ভট্টাচার্য্য। তোমাদের সভায় যে প্রশ্নের উত্থাপন হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা হ'ল ?

আমরা। আজ্ঞে না। অদ্যাপি মীমাংসা হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য। আজ দুই দিন বিচার করিয়া একটা স্মৃতির প্রশ্নের মীমাংসা হইল না ? কতগুলি পণ্ডিত সমবেত হইয়াছেন ?

আমরা। ২৫।৩০ জন।

ভট্টাচার্য্য। কি আশ্চর্য্য ! বঙ্গদেশ একবারে পণ্ডিত বিবর্জ্জিত হইয়াছে নাকি ! তোমাদের মধ্যে স্মৃতির ছাত্র কে আছ ?

সকলে আমাকে দেখাইয়া দিলে, তিনি প্রশ্নটির সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, "এই কথাগুলি সমস্ত তোমার শিক্ষককে বলিবে, ও জিজ্ঞাসা করিবে এই প্রশ্নের এরূপ উত্তর কি না। তিনি কি বলেন, আমাকে কল্য বলিবে"। আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। যে প্রশ্নের দুই দিন ধরিয়া ২৫।৩০ জন পণ্ডিতে সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারিলেন না, ইনি এক মুহূর্ত্তে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিলেন! ইনি প্রশ্ন জানিলেনই বা কিরূপে? সভায় তো ইহাকে একদিনও দেখি নাই আর ইঁহাকে কোথাও যে দেখিয়াছি, তাহাও বোধ হয় না! কে ইনি? কিছুক্ষণ পরে আমার জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের বিচার করিলেই ত ভাল হয়?"

ভট্টা। না, বাপু, সেখানে যাইবার আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

জ্যেষ্ঠ। তা হ'লে আপনার নাম ধাম সমস্ত যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তা হ'লে সভায় আপনার পরিচয় দিয়া আমরা সমস্ত কথা বলিতে পারি। নতুবা যে প্রশ্নের মীমাংসা ২৫।৩০ জন পণ্ডিতে দুই দিন বিচার করিয়া করিতে পারিলেন না, আমাদের মত সামান্য ছাত্রের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইলে লোকে কি মনে করিবে?

ভট্টা। আমার নাম ধামও এখন বলিতে পারিব না। তোমরা শুধু তোমাদের শিক্ষকের কাছে বলিবে যে একটি অপরিচিত ব্রাহ্মণের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তিনি এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

আমি। আমাদের শিক্ষক মীমাংসা শুনিয়া যে উত্তর দিবেন, আপনাকে কিরূপে জানাইব? কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাইব?

ভট্টা। এই পুষ্করিণীর ঘাটেই আমাকে কল্য প্রাতে দেখিতে

পাইবে। কিন্তু আর কাহাকেও সঙ্গে আনিও না, তাহা হইলে আমি দেখা দিব না।

এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। আমরা সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। পরে অদৃশ্য হইলে আমাদের গন্তব্যপথে গমন করিলাম।

পূর্ব্বস্থলীতে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে শিক্ষক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। তিনি মীমাংসা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এই সামান্য বিষয়, দুই দিন বিচার করিয়াও ২৫।৩০ জন পণ্ডিতের মধ্যে কাহারো মস্তিষ্কে আসে নাই! তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, তর্কের মীমাংসা আমিই করিয়াছি, এবং পাছে পণ্ডিত মহাশয়েরা অপ্রস্তুত হন, সেই জন্য একটি কাল্পনিক পণ্ডিতের গল্প রচনা করিয়াছি। তিনি আমার অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং আমার দ্বারা তর্কের মীমাংসা হইয়াছে, এইরূপ কথা সভাতে বলিতে উদ্যত হইলেন। আমরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম এবং আমাদের কথিত গল্পটি যে সত্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমরা যেরূপ বর্ণনা করিতেছ, সেরূপ আকৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিত যে বর্দ্ধমান জেলায় কখন দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ হয় না; তবে ভিন্ন দেশ হইতে আসিতে পারেন। ভাল, সভাতে গিয়া দেখি; চল, যদি কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন।"

সভার সকলেই তর্কের মীমাংসা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অপরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে আমাদের

পাঁচজন ব্যতীত আর কাহারও সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না, তখন তাঁহারা সে অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। সেই দিন হইতে সভাও ভঙ্গ হইল এবং অধ্যাপক মহাশয়েরা আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ে যাইবার পথে পুনরায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তর্কের মীমাংসা যেরূপ ভাবে সভায় গৃহীত হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের পাঠ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং অনেক নূতন বিষয় আমাদের শিখাইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ কথা-বার্ত্তার পরে তিনি বলিলেন, সপ্তাহে দুই দিন (শুক্রবার আর শনিবার) আমার সহিত তোমাদের এইখানে সাক্ষাৎ হইবে। যদি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর, অথবা কোন বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা কর, সেই দুই দিনে হইবে। আজ শনিবার, আগামী শুক্রবার পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমরাও বিদ্যালয়ে গমন করিলাম।

ক্রমাগত এক বৎসর কাল প্রতি শুক্র ও শনিবার তাঁহার সহিত পুষ্করিণীর ঘাটে সাক্ষাৎ হইত এবং শাস্ত্রালোচনা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইত। তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে সহাস্যে বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর হইল, তোমাদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে আমার দ্বারা কি তোমাদের কোন উপকার হইয়াছে? আমার কাছে কি কিছু শিখিতে পারিয়াছ?"

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উত্তর করিলাম, "অনেক নূতন ও

প্রয়োজনীয় বিষয় আপনার নিকট শিক্ষা করিয়াছি—তাহা পূর্ব্বস্থলীর কি অন্য কোন স্থানের কোন পণ্ডিত আমাদিগকে শিখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আপনি আমাদের প্রত্যেককে এই অল্প সময়ের মধ্যে সকল শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষকের নিকট আমরা যেরূপ ঋণী তদপেক্ষা অধিক ঋণী আপনার নিকট। আপনার ঋণ আমরা পরিশোধ করিতে পারিব না।”

ভট্টাচার্য্য। (সহাস্যে) ভাল তবে আমার একটি উপকার কর। আগামী পূর্ণিমার দিন আমি একটি যজ্ঞ করিব তাহার উদ্যোগ করিয়া দাও।

আমরা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল; আমরাও তাঁহার আজ্ঞামত ফুল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সমস্ত সংগ্রহ করিলাম। কেবল একটি কচি শ্রীফলের অনটন হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঐ শ্রীফলের কথা পূর্ব্বে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। (বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছিলেন)।

শ্রীফলের অনটন উপলব্ধি হইলে, পুষ্করিণীর ঘাটের নিকটস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ দেখাইয়া তিনি বলিলেন, দেখ দেখি ঐ বৃক্ষে কচি শ্রীফল আছে কি না। আমরা বৃক্ষের নিকট গিয়া দেখিলাম একটি মাত্র ফল অতি উচ্চ শাখায় এরূপ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে যে, সেখানে উঠিয়া কিংবা আঁকশি দিয়া পাড়া অসম্ভব। অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “আচ্ছা তোমরা বস আমি পাড়িতেছি। এই বলিয়া তিনি কাষ্ঠ-বিড়ালের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ডালের উপর দিয়া তড়তড় করিয়া বৃক্ষে

আরোহণ করিয়া ফলটি আনয়ন করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমরা ভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি তখন কিছুই বলিলেন না।

ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, "এখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিব, তোমরা এখন যাইতে পার। কল্য পুনর্ব্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমাদের তখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, তথা হইতে পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচি! তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে সভয়ে পুনর্ব্বার পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিল্বমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। কিঞ্চিৎ দূরে একখানি কলাপাতায় কিছু ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি রহিয়াছে। ঐ পত্র আমাদের দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যজ্ঞিয় প্রসাদ তোমরা গ্রহণ করিতে পার।" আমরা যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলাম। দুই একটি কথার পর তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কল্য আমি যখন শ্রীফল চয়ন করি, তখন তোমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলে—কেমন? আমার কার্য্য কিছু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল কি?" আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ। আমরা আপনার কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিক ভীত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। আপনি যেরূপে বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, পক্ষী ব্যতীত স্থূল দেহবিশিষ্ট কোন জীব সেরূপে আরোহণ করিতে পারে না, মনুষ্যের ত কথাই নাই।

ভট্টা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন) তোমাদের সাহস কিছু কম—নয়?

আমরা। আজ্ঞা না। আমরা কয়জনেই বেশ সাহসী। তবে

সহসা একটা অসম্ভব ঘটনা দেখিয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের ওরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

ভট্টা। আচ্ছা আজ যদি একটি অতি আশ্চর্য্য ও ভয়প্রদ কথা আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করি, তোমরা সাহস করিয়া শুনিতে পারিবে?

আমরা পুনর্ব্বার বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। আবার কি কথা বলিবেন, ভাবিয়া বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল। কিন্তু বাহ্য সাহসে ভর করিয়া একজন বলিলেন—"আজ্ঞা হাঁ,—আমরা শুনিতে পারিব, আপনি বলুন।"

ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ বাপু, যে কথা শুনিবে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য হইলেও তোমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ আমার দ্বারা তোমাদের মঙ্গল বই কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। তোমরা স্থির হইয়া শুন, আমি মনুষ্য নহি। ভূত-যোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ ভাবে আছি। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীর নিকটই আমাদের বাটী ছিল। অবশ্য মেটে বাড়ী, কিন্তু আমাদের অবস্থা মন্দ ছিল না। আমরা দুই ভাই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলাম। বাটীতে বৃদ্ধা মাতা ও আমাদের দুই ভাইয়ের পরিবার ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আমাদের বেশ সুখের সংসার ছিল। একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ আমাদের বাটীতে ডাকাইতি হয়। আমরা দুই ভাই বেশ বলিষ্ঠ ছিলাম। বাটীতে ৪।৫ জন বিশ্বাসী কৃষাণ ছিল। আমরা সকলে লাঠি হস্তে ডাকাইতদিগকে বাধা দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারাও হীনবল ছিল না এবং সংখ্যাতেও অনেক অধিক ছিল। কাজেই শীঘ্র আমরা পরাভূত হইলাম এবং দুই ভাই ও তিনটি কৃষাণ দুর্ব্বৃত্তদের যষ্টির প্রহারে প্রাণত্যাগ করিলাম। অবশিষ্ট দুইটি ভৃত্য বাটীর স্ত্রী-

লোকদিগের লইয়া গ্রামান্তরে আমার এক আত্মীয়ের বাটীতে পৌছিয়া দিল। সেই অবধি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে আছি। এ অবস্থায় যে কি কষ্টে আছি, তাহা তোমাদের জানাইতে পারি না। সেই কষ্ট কতক প্রশমিত হইবে বলিয়া তোমাদের সহিত এই এক বৎসর শাস্ত্রালাপ করিয়া কাটাইলাম। কিন্তু আমার কষ্টের শেষ হইয়াছে। কল্য আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। তোমাদের সহিত আজ শেষ দেখা। সেই জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদায় লইলাম।" বলা বাহুল্য যে আমরাও যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম? পরদিন তাঁহাকে আর তথায় দেখিতে পাইলাম না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "এইত ঘটনা আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছিল। বিশ্বাস করা আর না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"মৃত্যুর পর সকলেই কি ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়? কি করিলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।"

সার্ব্বভৌম। সে কথা অল্পে বুঝাইতে পারিব না। যদি তোমরা জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। স্থির হইয়া এ বিষয়ে আমার যাহা বিশ্বাস তোমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা যাইব প্রতিশ্রুত হইলাম, এবং ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেদিনের মত বিদায় লইলাম।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাহাও আমরা পাইয়াছি। পরে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার "অলৌকিক রহস্য" নামক পত্রিকায় নিম্ন বর্ণিত সত্য ঘটনাটি প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব। ইতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পালিত।

২০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রেতাত্মা।

হুগলীসহরবাসী কায়স্থ-বংশসম্ভূত আমার জনৈক বন্ধু তাঁহাদের বাটীতে সংঘটিত নিম্নলিখিত আশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ডের বিষয় বলিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কারণবশতঃ ও আমার বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি তাঁহার নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ করিব না।

তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা বহুকাল হইতে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একদিন তিনি গঙ্গাযাত্রা করাইতে আদেশ করেন। পিতার আদেশমত আমার বন্ধু আত্মীয়স্বজনসহ তাঁহার গঙ্গাযাত্রায় বাহির হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। সকলেই বলিল যে, পথেই তাঁহার জীবনের অবসান হইবে। কথায় বলে, পথে মৃত্যু হইলেও গঙ্গাযাত্রার ফললাভ হয়। এই বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, তাঁহারা সকলে গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমার বন্ধু দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার দেহ অসাড় ও স্পন্দন রহিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে তাঁহারা এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে আসিলেন, ও ক্লান্তিবশতঃ তথায় খাট নামাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই

তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমার বন্ধুর পিতৃদেহ এতক্ষণ শব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, কিন্তু সহসা তাহা নড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই শব-দেহের মুখে কথা ফুটিল। তখন খাটে শয়ানাবস্থাতে থাকিয়াই তিনি আমার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস্ কেন? ফিরিয়ে নিয়ে চল্।" ইহাতে আমার বন্ধু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ও উত্তরে কহিলেন, "আপনিই ত গঙ্গাযাত্রা করিতে বলিয়াছিলেন!" তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন, "আমি সারিয়া উঠিয়াছি, আর লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই, এখন বাড়ী চল।" ইহাতে আমার বন্ধু কিঞ্চিৎ বিস্মিত যাইলেন বটে, কিন্তু পিতাকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; সুতরাং সে বিস্ময় অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি পুনর্ব্বার কথা না কহিয়া তাঁহার পিতাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

পরদিবসেই তাঁহার পিতা সুস্থ হইয়া উঠিলেন ও বহুকাল অনাহারজনিত ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। আমার বন্ধু পিতার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যখনই যাহা চাহিতে লাগিলেন, আমার বন্ধু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষুধার উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তিনি পরিমাণে এত অধিক খাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তিনি রন্ধনশালায় আসিয়া আহার্য্য দিবার জন্য পুত্রবধূকে বারংবার আদেশ করিতেন। একদিন আমার বন্ধুপত্নী কোন ব্যঞ্জনাদি হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন। পরে যখন তিনি ব্যঞ্জনাদি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় সমুদয় অন্ন নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, ও পুনরায় অন্নের নিমিত্ত

তাগাদা দিতেছেন। বন্ধুপত্নী তাঁহার শ্বশুরদেবের ক্ষুধার আধিক্য বশতঃ পূর্ব্বেই সেই হাঁড়ির সমস্ত অন্ন তাঁহাকে দিয়াছিলেন। আবার কোথায় পান? কিন্তু শ্বশুর ঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন, না দিলেই নয়। অতএব পুনরায় তাঁহাকে ভাত রাঁধিতে হইল। এক দিবস নয়, উপর্য্যুপরি কয়দিবস বন্ধুপত্নী এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তিনি অবশেষে এই কথা তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন। বন্ধুবরও তাঁহার পিতার এইরূপ হঠাৎ বৈচিত্র লক্ষ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পরিচিত কোন ওঝাকে কথাসূত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে, সে ইহাকে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল। একদিন বন্ধু এই ওঝাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পিতা উপর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, ও অপরিচিত ব্যক্তিটিকে গৃহে লইয়া আসিতে তাঁহার পুত্রকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধু ওঝাকে লইয়া গেলে, তিনি উহাদের প্রতি গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ওঝা গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া মন্ত্রপাঠ দ্বারা বাড়ী বন্ধন করিল এবং বারংবার উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহাতে আমার বন্ধুর পিতাঠাকুর তীব্রশর-বিদ্ধের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ওঝা প্রেতাত্মাকে গৃহ পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক করিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন মতে যাইবে না। অবশেষে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। ওঝা জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে? তুই কি অমুকের বাপ?" উত্তর হইল, "না বাবা! আমাকে ছাড়িয়া দেও। গত দুর্ভিক্ষে আমি খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাই। সে সময় আমার খাইবার ইচ্ছা বড়ই

প্রবল ছিল। হঠাৎ গাছতলায় এই (নিজ শরীরকে দেখাইয়া দিয়া) মড়া শরীর অবস্থিত দেখিয়া ইহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলাম। বাবা, কিছু বলিও না, আমাকে খাইতে দেও।" এই বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু ওঝা কিছুতেই ছাড়িল না। সে বারংবার মন্ত্রোচ্চারণ করিলে পর প্রেতাত্মা যাইতে স্বীকৃত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বন্ধুবর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতার জীবনশূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর নড়িবার সামর্থ্য নাই। তখন আমার বন্ধু জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতার বহুকাল পূর্ব্বেই বাস্তবিক মৃত্যু হইয়াছিল, এতদিন কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা তাঁহার মৃত দেহ আশ্রয় করিয়া তাহার জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছিল।—"*

সফল স্বপ্ন চতুষ্টয়।

আমার একজন বন্ধু কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার পঠদ্দশায় তিনি নিম্নলিখিত চারিটি স্বপ্ন বিভিন্ন সময়ে রাত্রিকালে নিদ্রার সময় দেখিয়াছলেন। সে সময় তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন।

১ম স্বপ্ন। দেখিলেন যেন তিনি কোন এক পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। স্কুলের বাড়ীটি জীর্ণশীর্ণ। যে গৃহে বসিয়া তিনি পড়াইতেছেন, তাহার সম্মুখে বাটীর অঙ্গন। সে সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গৃহগুলির ছাদের নলদিয়া প্রবলভাবে বৃষ্টির জল অঙ্গনে পতিত হইতেছিল, গৃহের ভিতর বসিয়া তিনি তাহা স্পষ্ট দেখিতে-

---

* সন্দীপনী দেখ।

ছিলেন। তখন যেন সত্য বলিয়াই ধারণা হইতেছিল, স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর উক্ত ঘটনা স্বপ্নের অলীক চিন্তা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল।

২য় স্বপ্ন। পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত বাড়ী। বাড়ীর দোতলা ছাদের উপর তিনি শুইয়া আছেন। বহুদূর পর্য্যন্ত তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাটীটী পাহাড়ের গাত্র হইতে যেন বহির্গত হইয়াছে। যাঁহারা পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত বাড়ী দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহাহউক, রাত্রিকাল, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছে। তিনি শুইয়া শুইয়া স্নিগ্ধবায়ু সেবন করিতেছিলেন, এক অতি তীব্র উজ্জ্বল আলোক আসিয়া তাঁহার দেহের উপর পড়িয়াছে, এবং সমস্ত স্থানটীকে আলোকিত করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তিনি চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "প্রাণধন! আহার প্রস্তুত হইয়াছে, খাইবে এস।" খুল্লতাতের আহ্বানে আমি আহার করিতে গেলাম। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি স্বপ্নের কুহক বুঝিতে পারিলেন।

৩য় স্বপ্ন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, চারিদিকে মাঠ ধূধূ করিতেছে। মধ্যাহ্ন কাল, সূর্য্যদেব মস্তকের উপর প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করিতেছেন। সেই প্রান্তরের উপর নূতন রেললাইন পাতা হইতেছে। তিনি যেন রেলের কোন কাজ করিতেছেন। নিকটে একখানি অস্থায়ী চালা ঘর, তৃণাচ্ছাদিত। তাহার ভিতর তিনি আছেন। তখন তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। জ্বরের বেগে তৃষ্ণায় ছটুফটু করিতেছেন। মাঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, সেই তৃষ্ণা যেন আরও প্রবল করিতেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। এমন সময় যন্ত্রণার আতিশয্যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনই সেই অসহ্য যন্ত্রণা হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল।

৪র্থ স্বপ্ন। রাজকীয় বিচারালয়, সেসনে খুনী আসামীদের বিচার হইতেছে। বিচারাসন রক্তবস্ত্রে মণ্ডিত সেসন জজ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। যথাস্থানে প্রহরিবেষ্টিত আসামী দণ্ডায়মান। উকীল কাউন্সিল যথাস্থানে উপবিষ্ট। এমন সময় তিনি যেন জজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

উপরোক্ত চারিটী স্বপ্ন-কথার সফলতা সম্বন্ধে আমার বন্ধু আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কথায় নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

তিনি বলিলেন, "প্রথম স্বপ্ন দেখিবার পর দুই তিন বৎসর গত হইয়াছে। আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছি। এল. এ. পড়িবার অর্থসামর্থ্য না থাকাতে, আমাকে স্কুলমাষ্টারি পদ গ্রহণ করিতে হয়। মাষ্টারীও করি, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের পাঠ শিক্ষা করি। এখন আমি একটী পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিছুদিন পরে, একদিন গ্রীষ্মকালে, বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিদ্যালয়গৃহে বসিয়া ছাত্রদের শিক্ষা দিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি ধারা পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির শব্দে আমাদের পড়ান বন্ধ হইল। একদৃষ্টিতে বাহিরের বৃষ্টিপাত দেখিতে লাগিলাম। স্কুলবাড়ী পাকা ইমারতের বটে, কিন্তু অতীব পুরাতন। আমার গৃহের সম্মুখেই অঙ্গন। সেই অঙ্গনের উপর ছাদের নল বাহিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া পূর্ব্বকথিত আমার স্বপ্নের কথা হঠাৎ মনে উদিত হইল। ইতিমধ্যে একবারের জন্যও সে স্বপ্নকথা মনে হয় নাই। কিন্তু এখন স্মরণপথে আসাতে একবারে স্বপ্নদৃষ্ট পূর্ণ চিত্রটী মনে পড়িল। মিলাইয়া দেখিলাম, অবিকল সমস্ত মিলিয়া গেল। পূর্ব্বের স্বপ্নের সময় ও এই সময় যেন আমার এক মনে হইতে লাগিল।

তৎপরে যথাসময়ে আমি এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. পড়িলাম; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। মনের দুঃখে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া, ভাবিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলাম। আমার এক খুল্লতাত রাজপুত্তানার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে রেসিডেন্টের অধীনতায় হেড কেরাণীর কার্য্য করিতেন। আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খুল্লতাত আমাকে আদরের সহিত রক্ষা করিলেন। আমি তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

আবু পাহাড়ের গাত্রের উপর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যাঁহারা পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত বাটী দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। আমি সেই বাটীর দোতলার ছাদের উপর এক-দিন শুইয়া আছি। এই ছাদের উপর হইতে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দূরে রেসিডেন্সিগৃহের উপর উচ্চে অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হই-য়াছে। সেই আলোকরশ্মি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময় আমার খুল্লতাত নীচের তলা হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, বলিলেন "প্রাণধন! আহার প্রস্তুত হইয়াছে, খাইবে এস।" ঠিক এই সময় আমার পূর্ব্ব-দৃষ্ট দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা অকস্মাৎ মনে উদিত হইল। স্বপ্নের চিত্র ও বাস্তব চিত্র যুগপৎ মনে চিত্রিত হইয়া বিস্ময়-রসে অভিভূত হইলাম।

কিছুদিন পরে আমি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলাম। চেষ্টার ফল ফলিল, চাকরি জুটিল। সেই সময় ঢাকা লাইন রেলপথ খোলা হইতেছিল, সেইখানে আমার চাকরি হইল। সে সময় রেলের জন্ত জমি ক্রয় করা হইয়াছে,

মাঠে রেল-লাইন পাতিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পল্লীগ্রামের প্রান্তর, চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, ছায়াযুক্ত বৃক্ষাদি তথায় নাই। মধ্যে একখানি অস্থায়ী খড়ের ঘর আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থান। একে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে শরীর যেন ঝলসিয়া যাইতেছে, তাহার উপর তখন আমার জ্বরের উপসর্গ। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। অবশ্য তদানীন্তন বন্ধুগণ আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তখনকার তৃষ্ণার যন্ত্রণায় আমার তৃতীয় স্বপ্নকথা হঠাৎ স্মৃতিপটে উদিত হইল—সমস্ত ঘটনা স্তরে স্তরে মিলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আমি কলিকাতায় একটী চাকরী করিতে আরম্ভ করিলাম; এই সময় চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে পড়িয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে কর্ম্মসূত্রে আমাকে পঞ্জাব প্রদেশে যাইতে হয়। তথায় কয়েক বৎসর পরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এল পড়িয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হইলাম। তখন বি. এল উপাধি ধারণ করিয়া আমি আমার মাতৃভূমি বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসি। আমার জন্মভূমি হুগলী জেলায়। সুতরাং এখন আমি হুগলী জেলা কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় আমার হস্তে একটী খুনি মোকর্দ্দমা চালাইবার ভার পড়ে। সেই মোকর্দ্দমায় আমি ওকালতির বক্তৃতা করিবার জন্য সেসন আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেসন কোর্টের জজ যেমন রক্তবর্ণ বনাতে আচ্ছাদিত তক্তার উপর বিচারাসনে বসিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ রহিয়াছেন। প্রহরিবেষ্টিত আসামী কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। উকীল কাউন্‌সিলগণ যথাসনে আসীন। মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। আমি জজের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া যেমন নিজ আসনে উপবিষ্ট হইব, অমনি

সেই আদালত গৃহের দৃশ্য দেখিয়া ও আমার বক্তৃতার কথা মনে হইয়া, অকস্মাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্থ স্বপ্নের ঘটনার সুস্পষ্ট চিত্র আমার স্মরণ-পথে উদিত হইল। আমি তখন মনে করিতে লাগিলাম, আমি কি পুনরায় স্বপ্ন দেখিতেছি!"*

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

* স্বপ্নে ভুবর্লোকের ব্যাপার সকল লক্ষিত হয়। মস্তিষ্কের অবস্থা অনুসারে মানবে তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয় এবং ধারণা করিতে না পারিলে, তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপবৎ প্রতীয়মান হয়। আমাদের নিদ্রার সময় স্থূল দেহ এখানে (ভূলোকে) নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে; কিন্তু মানবাত্মা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবার নহেন। তিনি তখন সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। ভূর্লোকে কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে (কখন বহুপূর্ব্বে কখন কিছু পূর্ব্বে) ভুবর্লোকে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শক্তিশালী মানব সেই প্রতিফলিত ঘটনা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়া থাকেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে "coming events cast their shade before," অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার ছায়াপাত হইয়া থাকে। স্বপ্নে এই ছায়া পাত প্রত্যক্ষ হয়। কেহ কেহ তাহা অন্য সময়েও দেখিতে পান। বস্তুতঃ ইংরাজী উক্ত বাক্যের বিলক্ষণ সার্থকতা আছে। যাহা হউক, এইরূপ আমাদের মধ্যে অনবরত ঘটিতেছে, আমরা অনেক সময় তাহা ধরিতে পারি না, বা উপেক্ষা করিয়া থাকি। এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই উপরিলিখিত ঘটনাগুলি বহুপূর্ব্বে আমাদের বন্ধু স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকে দেখিয়াছিলেন।

ক্রমে এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে আমরা আলোচনা করিব; এস্থানে আর অধিক বলিলাম না, কেবল ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম মাত্র। ক্রমে আমরা বিশদরূপে এই বিষয় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব এবং সেই সময়ে এই শ্রেণীর ও এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য ঘটনাও বর্ণিত হইবে।

আমাদের একজন কৃতবিদ্য বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার বিবাহের বহুপূর্ব্বে স্বপ্নে ভাবী শ্বশুরগৃহের চিত্র দেখিয়াছিলেন।

বিবাহের দিবস তিনি সেই স্বপ্ন চিত্রের বাস্তব অবস্থান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইনি এখন বাংলার একটী জেলায় সর্ব্বোচ্চ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

আমার বন্ধুর নাম শ্রীপ্রাণধন বন্দোপাধ্যায়। তিনি এক্ষণে লক্ষ্ণৌএ ওকালতী করিতেছেন।

অ: রঃ সঃ

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পত্র।

আমি সেই স্থানে রহিলাম। শীঘ্রই অন্ধকার সেই স্থানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শীঘ্র? মূর্খ আমি, তাহাই বলিয়াছি "শীঘ্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।" কে জানে কতক্ষণ পরে সে স্থান সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারময় হইল! তবে এই মাত্র জানি গভীর তিমির অতি গাঢ় অতিশয় ঘনীভূত হইয়া আমাকে ধীরে ধীরে ঘেরিয়া ফেলিল। এই না বলিয়াছি "শীঘ্র"? আবার বলিতেছি, "ধীরে ধীরে!" আমি তখন একেবারে আত্মহারা, "শীঘ্র" ও "ধীরে, ধীরে" ইহারা প্রায় বিপরীত অর্থবোধক হইলেও আমার মনে হইতেছে আমার দুটী উক্তিই ঠিক।

সে যে কি ভীষণ অন্ধকার, তাহা বর্ণনা করা এক প্রকার আমার পক্ষে অসম্ভব। আর মর্ত্ত্যবাসী তোমরা! তোমরাই বা তাহা কিরূপে অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? তোমাদিগের কল্পনাজীবী কবিরাও তাহা ভাবিতে পারে না। যুগযুগান্তরব্যাপী দুঃখভার পুঞ্জীভূত হইয়া, যদ্যপি কাহারও হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে, তাহার সে সময়ের মনের অবস্থা যেইরূপ হয়, এখানকার গাঢ় অন্ধকারের ভারেও আমার মনের কতকটা সেই ভাব হইয়াছিল। আমি যেন অন্ধকারময় কঠিন দুইটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছিলাম। অন্ধকারময়ী ভীষণা বিভাবরীর করাল-দন্তগত হইয়া আমার নড়িবার শক্তি ছিল না,—নিশ্বাস শ্বাস-প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছিল।

ভয়ে ও শীতে কম্পিত-কলেবর আমি, সেই অতি সঙ্কীর্ণ পাষাণ-কারাগারে যাতনা ভোগ করিতে লাগিলাম। যে আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগেরই মত পার্থিব জীবনে বাসনার মোহন আকর্ষণে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিলাস করিয়াছি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া পরলোক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে উপহাস করিয়া আসিয়াছি, কত আশায় হৃদয় বাঁধিয়া "কোথায় সুখ, কোথায় সুখ" বলিয়া দৈহিক আমোদের জন্য কত উৎসাহে ছুটাছুটী করিয়া আসিয়াছি, সেই আমি এখন কোথায়? যন্ত্রণায় বিকলিতাঙ্গ, নৈরাশ্য-অনলে দগ্ধ-হৃদয়, আত্মীয়-বিবর্জ্জিত, সঙ্গিহীন, মমতাহীন, বিজন-অন্ধকারে চলচ্ছক্তিহীন একটী ভীষণ গহ্বরে আবদ্ধ! এই অল্পকালমধ্যে কি বিষময় পরিণাম! তীব্র শীত ও প্রখর উত্তাপ, আমি এই উভয়ের দ্বারা যুগপৎ আক্রান্ত হইলাম।

এটা ভয়ঙ্কর সত্য! এখানে বিপরীত-ধর্ম্মী দুইটা ভাব, তাহাদিগের মৌলিক বৈপরীত্য বিস্মৃত হইয়া মানবের যন্ত্রণাবৃদ্ধি করিতে মিলিত হয়। আমার মনে হইতেছিল যেন, আমার বহিরঙ্গ, হিমশৈলের তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের দ্বারা নিষ্পেষিত, অথচ অভ্যন্তরে কে যেন অতি উত্তপ্ত ধাতব-দ্রব ঢালিয়া দিয়াছে। নরকে যে আমি তীব্র মর্ম্ম-পীড়া ভোগ করিতেছিলাম—যে অব্যবচ্ছিন্ন মৃত্যুভয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব। একটা অনির্ব্বচনীয় ভয়, অন্ধকারের বৃদ্ধির সহিত আমার যাতনা-ক্লিষ্ট প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিতেছিল। আমি এইমাত্র অপার্থিব মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার বর্ত্তমান যাতনার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাতনার তীব্রতায়, মাঝে মাঝে অচেতন হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখানেত চৈতন্যের কোনও বিকৃতি নাই। মরণের পূর্ব্বের যে

যাতনা, যে মৃত্যুভয় চৈতন্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু এ যাতনার এখানকার এ নব মৃত্যুভয়ের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, এমনকি কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। সেখানে মরণের পর আর মরণভয় থাকেনা, কিন্তু এখানের সে কি যাতনা, তোমাদিগকে কি বলিব! সর্ব্বক্ষণ ভয়—যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে, আমি প্রাণকে যাইতে দিব না। শত চেষ্টায়ও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিনা! মনে হইতেছে, আমি নিজে অসক্ত! হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রণায় দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছে। কখনও কখনও করুণস্বরে সাহায্যের আশয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেছি,—"ওগো কে আছ, আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও।" কিন্তু কে সে কথা শুনিবে! কাহার প্রাণ আমার কাতরস্বরে ভিজিবে! সেখানে করুণাইবা কোথায়? সে কাতরধ্বনি সে বিজন প্রদেশের মহাশূন্যকে কেবল কাঁপাইল, চারিপার্শ্বস্থ গিরিশৃঙ্গগুলি যেন উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো কে আছ, আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও।" সেই উপহাসধ্বনিতে আমার প্রাণ ক্ষোভে, নিরাশায় যন্ত্রণায় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল।

তোমরা জান—প্রতি রাত্রি অনিদ্রায়, রোগ-যন্ত্রণায়, মর্ম্মান্তিক দুঃখে পড়িয়া থাকায় কি কষ্ট; কিন্তু, এখানকার এক রজনীর যে যন্ত্রণা তাহার তুলনায় সেটা কিছুই নয়; তাহা ইহার নিকট অতি সুখকর বলিয়া মনে হয়। তোমাদিগের সেই ক্ষণিক দুঃখ, নিদ্রাদেবীর আগমনী-স্তোত্রে পরিণত হয়; প্রকৃতিদেবী অতিযত্নে আপন সন্তানকে অঙ্কে স্থান দেন, এবং তন্দ্রা আসিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দেয়। সে প্রকৃতির ক্রোড়ে কত কি সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, নষ্টশক্তি পুনরায় লাভ করে। জাগরণের পর তাহার সস্মিত বদন ভারাক্রান্ত আত্মীয়দিগের মনে আশার সঞ্চার ও আনন্দবর্দ্ধন করে।

হে মর্ত্ত্যবাসী, তোমাদিগের যতই কেন দৈন্য, বিপদ বা হৃদয়জ্বালা উপস্থিত হউক না, তোমরা যদ্যপি ভাবিতে পার, সে সমস্ত কাল্পনিক, যদ্যপি জ্ঞানের আলোকে তাহাদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাদিগের কোনও দুঃখ থাকেনা। তোমাদিগের স্থূল-জগতে, বৃক্ষ লতা পশু, মনুষ্য, ইত্যাদি স্থূল পদার্থ গুলিই আপেক্ষিক প্রকৃত; কিন্তু, এইটি লাভ করিতে পারিলে সুখ হইবে, এইরূপ হইলে দুঃখ হইবে, ইত্যাদি রূপ যে রাগ বা দ্বেষের অভিনিবেশ তাহা কাল্পনিক। তোমরা তথায় কাল্পনিক সুখদুঃখের আশায় ছুটাছুটি কর। এইগুলি "আমাদিগের" সুখ, এইগুলি "আমাদিগের" দুঃখ, ইত্যাদিরূপ আমিত্ব বোধই সেখানে সর্ব্ব সুখ দুঃখের কারণ। কিন্তু, এখানকার কথা অন্য-রূপ। এখানকার গিরি, গুহা, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু, ইত্যাদিরূপ পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিষয়ই কাল্পনিক, কেবল মর্ম্মান্তিক যাতনারাশি এখানে প্রকৃত। তোমাদের পৃথিবীতে মানবের নিজের মনের উপর, তাহার সুখদুঃখ নির্ভর করে; কিন্তু, এখানে যন্ত্রণাভোগের উপর নরকভোগীর কোনও কর্তৃত্ব নাই। পৃথিবীতে বাসনা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া যে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, তাহা বীজভাবে আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মৃত্যুর পর তথাকার পঞ্চভূতাত্মক দেহ ভস্মীভূত হইয়াগিয়াছে; কিন্তু, এখানে যন্ত্রণা ভোগ করিতে যে ভোগদেহ ধারণ করিয়া আছি, তাহা প্রজ্বলিত অনল, জল, অস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, উত্তপ্ত পাষাণ, এ সকল দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। যন্ত্রণাভোগের জন্য এই দেহের সৃষ্টি,—যন্ত্রণাভোগের জন্যই এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবির্ভাব।

হায়, যদ্যপি একটু নিদ্রা আসিত! হায়, যদ্যপি তন্দ্রার ঘোরে, ক্ষণেকের তরেও এ যন্ত্রণা ভুলিতে পারিতাম! সেটা কি সুখের! কি

শান্তির! অঘটন-ঘটন-বৃথা-আশায়, কেন আমি নিজ যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিতেছি? আমার যাতনার কথা উল্লেখেই যেন হৃদয় তরলীভূত হইয়া অশ্রুর আকারে পরিণত হইতেছে, নয়নযুগল বাষ্পে আবরিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, কোথায় অশ্রু? কোথায় বাষ্প? ওগুলা তোমা-দিগের পৃথিবীর কথা। যাতনার পরিচয় দিতে তোমাদিগের পার্থিব যাতনার অনুচর অশ্রু ও বাষ্পের কথা পূর্ব্বাভ্যাসে স্বতঃই মনে পড়িল। অশ্রু বা বাষ্পের বহিঃ-প্রকাশ এখানে অসম্ভব; অন্তঃসলিল বাহিনী ফল্গুর জলরাশির মত তাহা আমার ভারাক্রান্ত প্রাণকে আরও গুরুভারে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি অনন্তকাল-ব্যাপিনী রজনীতে শৈলপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া মহাযাতনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তাহাকে ঠিক রজনী বলা যায়না; পৃথিবীর তীব্রতম দুঃখনিশাও ইহার তুলনায় আসিতে পারেনা। তথাকার মৃত্যুরজনীও অনেক সুখ-প্রদায়িনী। বাহিরে তীব্র শীত, অন্তরে পাপ ও পাপবাসনা-রূপিণী দুইটী অগ্নিশিখা ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছিল। কখন পাপ শিখা, কখন বা পাপ-বাসনা-রূপিণী শিখা উজ্জ্বলতর হইতেছিল। আমার চিন্তারাশি বিশুষ্ক ইন্ধনের মত এই দুইটী শিখাকেই বর্দ্ধন করিতেছিল।

অতীত-জীবনের আমার পাতকরাশি! সে সমস্ত স্মরণে আমায় আর এখন কি ফল? কিন্তু, আমার সেই সমস্ত স্মৃতি-অবরোধ করিবার কোনও শক্তি নাই। সে পাপ-জীবনের শেষ হইয়াছে। মৃত্যুরূপিণী যবনিকা তাহাকে মানব-নয়নের অন্তরাল করিয়াছে। কিন্তু, আমারত সে পাপ-কাহিনী বিস্মৃত হইবার সামর্থ্য নাই! অতীত-জীবন-পুস্তিকা আমার নয়ন সম্মুখে উন্মুক্ত। তাহার প্রতিপৃষ্ঠা, প্রতিছত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে-অঙ্কিত; আমাকে তাহা মহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়িতে হইতেছে।

আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি একজন মহাপাপী। জীবদ্দশায় স্বপ্নেও এ জ্ঞান আসে নাই। লোক-সমক্ষের অগোচরে অনুষ্ঠিত আমার পাপরাশিকে আমার নিজের সম্বিৎ-ক্ষেত্রেও আসিতে দিই নাই। হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের চারিপার্শ্বে এরূপভাবে অহঙ্কারকে প্রহরিকতার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম যে, তাহাদিগের বার বার উচ্চ আবেদনও আমার চৈতন্যকে তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কখন কখন হয়ত আমার অন্তরাত্মা আমার বাহ্যচৈতন্যকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকিবে, কিন্তু, তাহা এত মৃদুভাবে যে আমি তাহা উপেক্ষা করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

কিন্তু, এখন সমস্ত পাপকাহিনী আমার স্মরণে আসিতেছে। আমার এতবার পদস্খলন হইয়াছে, আমি একদিনও তাহা ভাবি নাই! অতি-সামান্য প্রত্যবায়ও আমাকে মর্ম্মান্তিক ভর্ৎসনা করিতেছিল। তোমাদিগের জগতের নিকট পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব আছে; এখানে কিন্তু, সমস্তই সমান ভীষণ বলিয়া মনে হয়। তোমরা যাহাকে পাপই বলনা, সেই সামান্য প্রত্যবায়ও অতিরঞ্জিতভাবে বিকৃত মূর্ত্তিধারণ করিয়া আমার প্রাণকে দংশন করিতে লাগিল। একটীর পর, আর একটী এইরূপে আমার সমস্ত পাপ ক্রিয়া ও চিন্তা আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়া যে দিকে দেখি, সেই দিকেই সেই ভীষণ ছবি। প্রাণ যে ক্ষণেকের তরেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, এইরূপ একটী চিত্রও দেখিতে পাইলাম না। এত অসংখ্য পাপ-স্মৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি! তখনকার আমার যে কি যাতনা, তাহা আর কি বলিব!

(ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১৩)

ছোট ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মধুর নীরবতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল! কোথায় যাইতেছিলাম, কি করিতে যাইতেছিলাম, কেন যাইতেছিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সব ভুলিয়া গেলাম। প্রবেশ করিয়া ছোটদাদা কিছুক্ষণের জন্য কোনও কথা কহিলেন না। পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তিনি অধোবদনে নীরব রহিলেন। চুরি করিয়া একবার তাঁর মুখের পানে চাহিলাম, দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জল ঝরিতেছে।

পিতা নীরব। আমিও কোন কথা কহিতে অশক্ত। ছোট দাদা কি গোপালের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন!

হায়! আমরা জীবনের কত পাপমুহূর্ত্তে কল্পনায় অন্যের চরিত্রের একটা বিকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়া, সেই ছবিকেই প্রকৃত মানুষ জ্ঞান করিয়াছি! তাহারই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্য্যতঃ নিজেই নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি! এইরূপ ভ্রমের অনপনোদনে কত হতভাগ্যের জীবন বিষময় হইয়াছে! কিন্তু যাহার জন্য ভ্রম, সে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া, হাসিয়া জীবন বহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ নীরবতায় অস্থির হইয়া পিতা যদি ছোট দাদাকে প্রশ্ন না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত চিরকালই আমার ভ্রম থাকিয়া যাইত। ছোট দাদার চক্ষুজলের কারণ আর নির্ণীত হইত না।

পিতা বলিলেন—"চক্ষু-জলের কি কাজ করিয়াছি রমানাথ?"

ছোট দাদা মাথা তুলিলেন, উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু মুছিলেন। তারপর

অর্দ্ধরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন—"চক্ষুজলের যথেষ্টইত কাজ করিয়াছ রাধানাথ! একটী মাতৃহীন, পিতৃ-সত্ত্বে পিতৃহীন—একটী বালকের, তোমরা ব্রাহ্মণ-দম্পতী পিতা ও মাতার ভার লইয়াছিলে। আমি তোমাদের সেই মমতা ছিঁড়িয়া, তাহাকে উপযুক্ত পাইয়া লইতে আসিয়াছি। গোপালের মায়ের মমতা স্মরণ করিয়া আমি চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছি, কে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ করিতেছে।"

পরের কাছে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু আত্মাপ-রাধীকে কে ক্ষমা করিবে? ছোট ঠাকুরদাদার কথা একটী একটী মৌমাছির দংশনের মত আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। মর্ম্ম-পীড়ায় অস্থির হইয়া দুই হাতে আমি চক্ষু আবৃত করিলাম। সেই অবস্থাতেই পিতার উত্তর শুনিলাম। পিতারও স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তিনিও যেন গোপালের ভাবী বিচ্ছেদ-ভয়ে কাতর হইয়াছেন। পিতা বলিতে লাগিলেন—'গোপালই তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সর্ব্বস্ব। আমিও কি তাহাকে ছাড়িতে পারিতাম? কি করিব, দামোদরের সেবার ক্রটি হইবে—তাহাকে রাখিতে সাহসী হইলাম না। গোপীনাথও দুঃখে অধীর হইয়াছে।"

চোখ খুলিতে যাইতেছিলাম। পিতার কথায় আরও জোরে চোখ চাপিয়া ধরিলাম।

ছোট দাদা বলিলেন—"কি করিব! সমস্তই বুঝিতেছি। দামোদরের সেবার ক্রটির ভয়েই তাহাকে লইয়া যাইতেছি। নহিলে কি পারিতাম! বুঝিতেই ত পারিতেছ, তোমার অসুখের সংবাদ শুনিয়াও আসিতে পারি নাই। ভাগ্যে একজন ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তাই আসিতে পারিয়াছি।"

পিতা। যদিই ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ, তাহা হইলে দুই একদিন থাকিয়া যাও না।

দাদা। না রাধানাথ, আর অনুরোধ করিও না। দামোদরের ইচ্ছায় মা সুরধুনীর জলে একবার অবগাহন করিতে পাইলাম, এই যথেষ্ট। থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারিলাম না। মায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মনে করিলাম, বুঝি এ যাত্রা গোপালকে লইয়া যাইতে পারিলাম না। শেষে দামোদরের ইচ্ছার দোহাই দিয়া, দামোদরের নামে গোপালকে জননীর কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়াছি।

পিতা। তবে কি প্রত্যুষেই রওনা হইবে?

দাদা। প্রত্যুষে! আবার মায়ের মন ফিরিলে যাইবার ব্যাঘাত ঘটিবে। আমরা আজ রাত্রেই রওনা হইব। গোপালের মাতা গোপালকে আহার করাইতেছেন।

পিতা। তুমি কিছু খাইলে না?

দাদা। আমি গঙ্গাস্নানের জন্য উপবাসী ছিলাম। স্নানান্তে এখানে আসিয়াই কিছু ফল ও দুধ খাইয়াছি। রাত্রে আজ আর কিছুই আহার করিব না।

পিতা আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ! তোমার দাদামহাশয়ের পাথেয়ের জন্য ক্যাসবাক্সে যে একশত টাকা আছে, তাহা আনিয়া দাও।" এই বলিয়াই আমাকে চাবি গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমি চক্ষু খুলিবার অবকাশ পাইলাম। ছোট দাদা বলিলেন, "টাকা! কি হইবে? রাত্রেই রওনা হইতেছি; পথে দস্যুভয়; সঙ্গে অর্থ লইয়া কি পিতা পুত্রে দস্যুহস্তে প্রাণ দিব?"

পিতা বলিলেন—"বেশ, তোমরা যাইবার পর, আমি লোক দিয়া টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।" গোপালকে লইয়া যাইতেছ, যখন যা

অনটন হয়, সংবাদ দিবে। দেখো যেন গোপালের কোনও কষ্ট না হয়।”

ছোট দাদা হাসিয়া বলিলেন—“দামোদর তোমাদের পিতা পুত্রকে দীর্ঘজীবী করুন। তোমরা বর্ত্তমানে গোপালের কষ্ট হইবে কেন? একটা সুসংবাদ তোমাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দামোদর কৃপা করিয়াছেন। কোম্পানী একটা খাল কাটাইয়া দিয়াছে। তাহাতে আমাদের জলমগ্ন জমির কতকটার উদ্ধার হইয়াছে। এবারে তাহাতে যেরূপ শস্যের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ভবিষ্যতে আমাদের পিতা পুত্রের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। উভয়ের একরূপ সচ্ছলেই দিন চলিয়া যাইবে।”

এইবারে আমি একটা কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম। বলিলাম—“দাদা মহাশয়! যদিই জমীর উদ্ধার না হইত, তাহা হইলেই কি আমরা থাকিতে আপনাদের অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হইত? পিতা কি গোপালের সচ্ছলতার ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন?”

দাদা হাসিয়া বলিলেন—“ভাই! তোমার সদিচ্ছার প্রশংসা করি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া গোপালকে চিরদিন স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিও।”

পিতা বলিলেন—“এখনও কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব! জমীর আয়ে সমস্ত ব্যয়ের সংকুলানের আশা করি না। মাসে মাসে গোপালের জন্য আমাকে কিছু খরচ পাঠাইতেই হইবে।”

দাদা বলিলেন—“পারিলেই ভাল। কেননা গোপাল এখানে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পুষ্ট হইয়াছে। সেখানে গরীবের চালে চলিতে প্রথম প্রথম তাহার কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। তবে তা যদি না পার”—

আমি একটু যেন রোষের সহিত বলিলাম—"পারিবেন না, আপনি আগে হইতেই কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

দাদা। তা বুঝি নাই। সংসারের গতিক যেরূপ দেখা যায়, তাহাতেই অনুমান করিয়া বলিয়াছি। বহুদিন চক্ষের অন্তরাল থাকিলে পুত্রের উপরেই মাতার স্নেহভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

আমি ইংরাজী আদব কায়দায় অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সেই আদবে তাঁহাকে বলিলাম—"অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। দাদা মহাশয়! আপনার এরূপ অভিমত প্রকাশে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলাম। ইহাতে আমার পিতাকে আমার সমক্ষে ছোট করা হইতেছে।"

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ভাই! আমি মূর্খ। তোমার পিতা কিংবা তোমার মতন গুছাইয়া কথা কহিতে জানি না। তাই বলিতেছিলাম, যদি না পার—"

আমি এবারে দৃঢ়তর স্বরে বলিলাম—"আবার না পার বলেন কেন?"

ছোট ঠাকুরদাদারও স্বর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরতর হইয়া গেল। তিনি উত্তর করিলেন—"তবে বলি গোপীনাথ! তোমরা পারিবে না। কেন পারিবে না, একথার উত্তর এখন জানিবার জন্য ব্যস্ত হইওনা। সময়ে আপনিই জানিবে। তবে না দিতে পারিলে, আমার তাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই।" এইবারে পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"কিন্তু রাধানাথ! দামোদরের কৃপায় তুমি যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য করিয়াছ, ভবিষ্যতে আরও করিবে। যদি সেই দামোদরের জন্য একটী পাকা ঘর, এবং গ্রামবাসীদের উপকারার্থে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার আনন্দের আর অবধি থাকিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন। একে রুগ্ন, তাহার উপর

ছোট ঠাকুরদাদার কথা গুলা মিষ্টতার ভিতর হইতেই কেমন একটা মর্ম্ম-ভেদী তীব্র রস কানের ভিতর প্রবেশ করাইতেছিল। বলিতে কি আমিও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। পিতা ঈষৎ রুক্ষভাবেই বলিলেন,—তুমি কি জেরা করিয়া বিষয়ের সংবাদ লইতে আসিয়াছ ?”

দাদা। যদিই সংবাদ লই, তাহাতেই বা দোষ কি ? পাড়া-গাঁয়ের দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র সহরে আসিয়া নিজের পুরুষকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ। এরূপ ঘর, এরূপ আসবাব, এরূপ দাসদাসী আমাদের বংশে আর কে কবে দেখিয়াছে ? আমার ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য এই প্রথম দেখা ঘটিল। প্রথমে আমি এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সাহস করিতেছিলাম না।

পিতা। তোমার ও হিঁয়ালীর কথা রাখ। বক্তব্য যদি কিছু থাকে ত বল। বৃথা বাকবিতণ্ডা করিবার আমার শক্তি নাই।

দাদা। এত ক্রোধ করিতেছ কেন ? ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিয়াছি এই ত আমার অপরাধ ? ঠাকুর ঘরটী পাকা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। তুমি হাঁ কি না বলিয়া এক কথাতেই ত তার উত্তর দিতে পারিতে।

পিতা। ঐশ্বর্য্য করিয়াছি, একথা তোমাকে কে বলিল ?

দাদা। লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি।

পিতা। তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। আমি এ যাবৎ এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারি নাই।

ছোট দাদা পিতার এই কথা শুনিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। পিতার এই উপযুক্ত উত্তরে তাঁর গমনোদ্যোগ দেখিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইতে যাইতেছি, এমন সময় ছোট দাদার কথা শুনিয়া আমরা পিতা পুত্রে উভয়েই চমকিত হইলাম। পঞ্চাশ বৎসর পরে আমি এই আখ্যায়িকা লিখিতেছি। পিতামহ এখন আর ইহ-সংসারে নাই। তথাপি তাঁহার

বজ্র-নির্ঘোষ-তুল্য কথা অটুট গাম্ভীর্য্যে আজিও পর্য্যন্ত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

ছোট দাদা বলিলেন—"রাধানাথ! এতক্ষণ তোমাকে ভাল করিয়া দেখি নাই, তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝি নাই। দামোদর আমাকে কয়দিন ধরিয়া, গোপালকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য উৎপীড়ন করিতে-ছিল। আমি স্বপ্ন বলিয়া এ কয়দিন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলাম। এখন সমস্তই আমার চোখের উপর ঘটিয়া উঠিয়াছে। যথার্থই রাধানাথ! এখন দেখিতেছি, তুমি কিছুই সঞ্চয় করিতে পার নাই। সঞ্চয় কেন—কুলাঙ্গার! তুমি পুণ্যাত্মা রামনিধি তর্কলঙ্কারের বংশধর হইয়া, কলিকাতায় উপার্জ্জন করিতে আসিয়া মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছ।"

আমাদের পিতাপুত্রের চোখ বুজিয়া আসিয়াছে। কথার ঝঙ্কার ক্ষীণ হইতে চাহিয়া দেখি খুল্ল পিতামহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন।

সেই শেষ দেখা। তাহার পর আর ছোট ঠাকুরদাকে দেখি নাই। পিতার সহিত আর কোনও কথা না কহিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রিতে কোথায় কি হইল, বলিতে পারিনা। রাঁধুনী কখন ঘরে আহার্য্য দিয়া গিয়াছে, তাহারও পর্য্যন্ত খবর রাখি নাই। আমি শয্যায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

খুল্লপিতামহ পিতাকে যে তিরস্কার করিয়া গেলেন, তাহা আমার মনে আসিল না। পিতা স্বরচিত পুস্তকে বালকবালিকাগণকে সত্যনিষ্ঠ হইবার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই পিতা নিজেই সত্যের অপলাপ করিতেছেন দেখিয়া, মর্ম্মে কেমন একটা বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও বুঝিলাম, আমারই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, আমারই ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে, পিতা এইরূপ করিয়াছেন, তথাপি আমার মনোবেদনার

অপসারণ হইল না। শিক্ষয়িতার নিজের পদস্খলনে, দীনবেশী মূর্খ ব্রাহ্মণের তেজস্বিতার সম্মুখে, প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার লইয়া, প্রভূত ধনযশের অধিকারী অধ্যাপক পিতা আমার চক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ,—জীবনহীনবৎ প্রতীয়মান হইলেন।

সুতরাং সে চিন্তা মনের ভিতরে স্থান দিতে আমার সাহস হইল না। কিন্তু অন্তর মধ্যে এক বিষম চিন্তা প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে উত্তরোত্তর অস্থির করিয়া তুলিল।

ইহারা পিতা পুত্রে একি উন্মাদের মত কথা কহিতেছে! এদিকে গোপালের মা আসিয়া গোপালের পিতার আসিবার সংবাদ দিয়া গেল, ওদিকে দামোদর ঠাকুর গোপালের সেবা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার পিতাকে জেদ করিয়া পাঠাইয়া দিল!

এসব কথার কি অর্থ আছে? যাহাদের কাছে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, তাহারা আমাকেই সর্ব্বাগ্রে পাগল বলিবে। আর গোপাল ও তাহার পিতাকে এখনি ত শৃঙ্খলিত হইবার জন্য পাগলা গারদে পাঠাইতে পরামর্শ দিবে। পূর্ব্বে মূর্খ, অন্ধবিশ্বাসী দেশবাসী এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিত। সেই সকল অন্ধবিশ্বাস দূর করিবার জন্য দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সেই জ্ঞানালোকে আলোকিত আমরা, এখন হিন্দুয়ানী যে একটা বিপর্য্যয় ভুল তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই সব রামায়ণ মহাভারত, সেই সব বিষ্ণু, ভাগবত পুরাণ—এখন বেঙ্‌মা বেঙ্‌মীর গল্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেশের অর্দ্ধেক মনীষী কেহ কৃশ্চান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বা নাস্তিক হইয়া, পৌত্তলিকতার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছেন; বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে একজন বড় অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ বলিয়া শুদ্ধ মাত্র একটা সেলাম ঠুকিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পেন্‌সন্ দিয়া নিজেরাই তাঁহার

কাজ করিতেছেন। আমাদের ক্লাসের মাষ্টার মহাশয় বলেন—সৃষ্টি সময়ে হয়ত একবার ঈশ্বর বলিয়া কোন এক জীবের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাঁহার কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁর থাকা না থাকা দুইই সমান। পৃথিবী যেমন ঘুরে, তেমনি ঘুরিতেছে; সূর্য্য যেমন উঠে তেমনি উঠিতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা হয়, চাঁদ উঠে, তারা ফুটে, কেহ তাহাদের বারণ করিতে পারেনা। ঈশ্বর থাকিলে, অন্ততঃ একদিন সখ্ করিয়াও তিনি বাধা দিতে পারিতেন। একদিন খেলার ছলেও পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাইতে পারিতেন, দুটো একটা তারা আমাদের বাড়ীর কাণাচে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন। আমরা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার সামগ্রী আবার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিতাম। গোলাপের কাঁটা তুলিয়া লইলে কি ক্ষতি হইত? ইক্ষুতে দু'টো একটা ফল ফলিলে কি আমরা সমস্তই পেটে পূরিয়া তাহার ভূয়িষ্ঠ নাশ করিতাম? মাষ্টার মহাশয়ের কাছে এইরূপ শুনিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে অল্প বয়সেই আমাদের প্রকট জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই আবার পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় বাহির হইয়াছিল। আমরা তাই পড়িয়া বিশেষরূপেই জানিয়াছিলাম—পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; কান আছে, শুনিতে পায় না; পেট আছে, খাইতে পারে না। তাহার পর ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জ্ঞানটা আমাদের দৃঢ় হইয়া গেল। গিজনীর মামুদ সোমনাথের মাথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কালাপাহাড় যেখানে ঠাকুরগুলাকে দেখিতে পাইয়াছে, সেইখানেই তাহাদের নাক কান কাটিয়া, পেট ফাটাইয়া পুরোহিতগুলার জুয়াচুরির দ্বারা অন্ন উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছে। পুত্তলিকার চরণ থাকিতেও চলিবার শক্তি নাই বলিয়া কালাপাহাড়ের ভয়ে একটা ঠাকুর পলাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে পারিল না। অথচ

তাহাদের ভোজনের খরচে সেই অনাদিকাল হইতে মূর্খ অজ্ঞানান্ধ ভারত-বাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিতেছে।

তবে কেমন করিয়া দামোদর কথা কহিল—দাদাকে অনুরোধ করিল! তাই কি ছাই এ পোড়া দামোদরের হাত পা আছে! আমাদের দামোদর শালগ্রাম শিলা—একটা কাল কুচকুচে নুড়ী। মাঝে কেবল একটা গর্ত্ত। তাহাতে সাপই আছে কি ব্যেঙই আছে—ভয়ে ভুড়ি দিয়া কাছে বসিতে হয়। তাহার মাথায় বিড়বিড় করিয়া কতকগুলা ফুল না ফেলিয়া, কলিকাতায় আনিয়া কাগজ চাপা করিলে কাজে লাগিত।

সারারাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিলাম—মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না। নুড়ী দামোদর বিশমণ পাথরের ভার লইয়া বুকে চাপিয়া বসিল, তবু তাহাতে চৈতন্য আছে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। খুল্লপিতামহের কথায় শ্রদ্ধা আসিল না। মনে করিলাম, এ সমস্ত ব্যাপার পিতা ও পুত্রের একটা দুর্জ্জেয় কৌশল। মনে হইল, উভয়ে মিলিয়া তাহারা আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিতেছে। কিন্তু করিয়া লাভ? পুত্র এমন সম্পদ ছাড়িয়া চির দুর্দ্দশাকে অবলম্বন করিতে চলিয়াছে, পিতা সেই অবস্থার পোষকতা করিতে পুত্রকে লইতে আসিয়াছে।

এমন উন্মত্ততা আর কেহ কি কখন দেখিয়াছে? অথচ খুল্লপিতামহের কি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি! কি অপূর্ব্ব আত্মসংযম! অক্রোধ, পরমানন্দময়—দরিদ্র হইয়াও পিতার সহিত বাক্যুদ্ধে যে ব্যক্তি জয়পতাকা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে কেমন করিয়া উন্মত্ত বলিব?

অর্থে লোভ শূন্য, ঐশ্বর্য্যে অবজ্ঞার হাসি—পিতার সঞ্চয় সম্বন্ধে যথার্থ অনুমান করিয়াও দীন বলিয়া, বংশের কুলাঙ্গার বলিয়া খুল্ল

পিতামহ পিতাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন! হায়! চিন্তা সমুদ্রে ভাসিয়াও খুড়ীর ভিতর কি রস আছে, স্থির করিতে পারিলাম না!

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। প্রভাতমুখে স্বপ্ন। কি ভীষণ স্বপ্ন! আমি যেন এক জনহীন পার্ব্বত্য প্রান্তরে চলিতেছি। জনলেশশূন্য, শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যময় স্থান। সম্মুখে, অরণ্যের আকাশভেদী বৃক্ষ সকলকে অতিক্রম করিয়া, উচ্চ, বন্ধুর, সৌন্দর্য্যলেশশূন্য শৈলমালা। এমন কঠোর, বোধ হইতেছে যেন, স্নেহময়ী, চরণাশ্রয় ভিখারিণী শ্যামা প্রকৃতিকে চরণ দলিত করিয়া উগ্রমূর্ত্তি শৈলরাজ গগনচারী নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রতাপকে উপেক্ষা করিতেছে।

সেই নির্ম্মম উষর পথের পথিক আমি একা। এ জগতে কেহ আমার সহচর ছিল, কিম্বা আছে, তাহা আমার স্মরণেও আসিতেছেনা। সঙ্গীর অভাবে আমি যেন মৃয়মান। জিঘাংসু শ্বাপদের লোলুপদৃষ্টির বেড়ার মধ্যে আমি কাঁপিতেছি। সম্মুখের দৃশ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য নাই, তবু আমি নিয়তি-আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকেই চলিতেছি। কেন চলিতেছি, কোথায়ই বা চলিতেছি জানিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। একটা চতুষ্পদেও ইঙ্গিত বিনিময়ে যদি আমার মানসিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহা হইলেও যেন চরিতার্থ হই। পশ্চাতে কেহ থাকিলেও, না হয়, উত্তর জানিবার জন্য তার অপেক্ষা করি। কিন্তু পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে, কেহ আছে কিনা দেখিতে আমার সাহস হইতেছে না।

ক্রমে বোধ হইল বিশাল প্রান্তর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে কুক্ষিগত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে। শ্বাপদগুলা প্রান্তরের সঙ্কোচে যেন ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বহির্গমনের পথ অন্বেষণে সম্মুখে

ছুটিতে দেখি, শৈলতল সহসা উন্মুক্ত হইয়া আমাকে গ্রাস করিতে মুখ-ব্যাদন করিল। পিছু হটিতে এক কঠোর কর, সেই গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ করিবার জন্য যেন আমার গলদেশ ধারণ করিল। যথাসাধ্য চেষ্টায় কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—আমার প্রিয়বন্ধু শ্যামচাঁদ। এ কপট বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর হাত হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমি চক্ষু মুদিলাম, কি অন্ধকারে ডুবিলাম অনুমান করিতে পারিলাম না।

সেই অন্ধকারেই কার যেন কোমল অভয় কর পতনোন্মুখ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। "গোপীনাথ! ভাই উঠ।" কি কোমল আশ্বাসবাণী!

ধীরে ধীরে চোখ মেলিলাম। দেখিলাম গোপাল আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে চোখ মেলিতে দেখিয়াই গোপাল বলিল—"ভাই বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

তন্দ্রা যেন ভারে ভারে আমার আঁখিপলক নিরুদ্ধ করিয়া আবার আমাকে সংজ্ঞাহীন করিল।

কি আর বলিব গোপাল চলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

দাদাম'শায়ের ঝুলি।

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

ব্যোমকেশের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "ভায়া, আমি দেখ্‌চি তোমার এখনও আসল কথাটা ভাল করে বোঝা হয় নি। জীবাত্মা মূলতঃ সেই এক অনাদি অনন্ত মহাত্মার অংশ স্বরূপ। ভগবান গীতায় বলেছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। যতক্ষণ সেই মহাসত্ত্বা উপাধিসম্বন্ধশূন্য পরমাত্মা মাত্র ততক্ষণ তিনি অপ্রকাশিত, নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বমাত্র, ততক্ষণ তাঁহার কোনই প্রকাশ নাই। কারণ প্রকাশ ব্যাপারের মূলেই একটা দ্বৈতভাব নিহিত রয়েছে; যাহা প্রকাশ করে, এবং যাহা প্রকাশিত হয়। যিনি কেবল, যিনি শুধুই এক, তাঁর প্রকাশ নাই, হ'তে পারে না। সেই জন্য যতক্ষণ অদ্বৈত, ততক্ষণ অব্যক্ত, ততক্ষণ অচিন্ত্য। সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্য পরমাত্মা বা পরমপুরুষ যখন প্রকাশাভিলাষী হন তখন তিনি প্রত্যগাত্মা ও মূলপ্রকৃতি রূপে দ্বিধা-বিভক্ত হন। এই প্রত্যগাত্মা হচ্চেন সগুণ ব্রহ্ম, যিনি সাধারণ ভাষায় ঈশ্বরপদবাচ্য। আর ঐ মূলপ্রকৃতি হচ্চেন তাঁর সৃষ্ট তাই তাঁরই চিন্তা-প্রসূত। যেমন অগ্নি হতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, অথবা যেরূপ সূর্য্য-মণ্ডল হতে অসংখ্য কিরণ রেখা নির্গত হয়, সেগুলি অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত এক হয়েও পৃথক, সেইরূপ এই সগুণ ঈশ্বর হতে যে অগণিত জীবাত্মাসমূহ নির্গত হচ্চে ইহারা চিরদিন প্রত্যগাত্মার বক্ষে বিরাজিত এবং তাঁহার সঙ্গে এক হ'য়েও পৃথক। "একের" "বহু" হবার ইচ্ছাই সৃষ্টির মূলমন্ত্র—"একোহং বহুস্যাম প্রজায়েয়।" পরমাত্মার এই বহু হবার ইচ্ছাই প্রথম,তাকে,—দ্বিধা বিভক্ত ক'রে প্রত্যগাত্মা এবং মূল প্রকৃতি, কিম্বা

স্বগুণ ঈশ্বর ও জগৎ এই দুইরূপে পরিণত করে। আগেই বলেছি এই জগৎরূপ উপাধি ব্যতীত তাঁর প্রকাশ হতে পারে না; নির্গুণ শুদ্ধচৈতন্যের প্রকাশ নাই, সে অবস্থা "অবাঙ্মনসোগচরম্"। প্রকাশ হ'তে হলেই তার জন্য উপাধির প্রয়োজন হয়, তাই জগতের কল্পনা।

তার পর শোন। আত্মার এই বহু হবার ইচ্ছা যত ঘনীভূত হতে থাকে, ততই বহ্নি হ'তে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁর স্বরূপাংশ সমূহ প্রকৃতির পরিচ্ছন্ন কিয়দংশের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে জীবরূপে পরিণত হন। ইহারাই জীবাত্মা নামধারী। এখন এই দুই অবস্থার পার্থক্যটা বেশ করে প্রণিধান কর। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন এরা ভগবানের মাতৃবক্ষে সুপ্তভাবে ছিল, শরীরান্তর্গত জীবলোক সমূহ যেরূপ শরীরের সঙ্গে একীভূত হ'য়েই থাকে, একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ—তখন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে ত্রিবিধ ঐশ্বরিকশক্তি তাদের মধ্যে মূর্চ্ছিতভাবে (in a latent state) থাকে, ক্রিয়াশীল (patent) ভাবে নয়। আত্মার যে প্রকাশিত হবার চেষ্টা, সেটা তাদের মধ্যেও আছে, কিন্তু সেটা তারা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানে না। এ অবস্থায় তারা আত্মবিদ্ নয়, কারণ এখনও তারা ঈশ্বরের স্বরূপে নিমজ্জিত আছে। তিনি আত্মবিদ্, তিনি নিজের উদ্দেশ্য ও পথ পরিজ্ঞাত আছেন, এরা কিন্তু এখন সে সব কিছু জানে না। ইহার পর দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় ঈশ্বরের বহির্মুখী-শক্তির বিকাশাধিক্য বশতঃ আত্মা ও অনাত্মা এ দু'য়ের পার্থক্যের একটু আভাষ হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান,—যে জ্ঞানে জগৎ হতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের একটা বিশেষ উপলব্ধি হয়, সেইরূপ একটা আত্মজ্ঞান বা ব্যক্তিত্বের লাভ করার ইচ্ছা, বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় জেগে উঠে; এবং সেই স্বাতন্ত্রজীবন লাভেচ্ছাই তাহাদিগকে উপাধি গ্রহণ করিয়ে জীবাত্মারূপে পরিণত ক'রে প্রাকৃতিক রাজ্যে টেনে নিয়ে আসে,

কারণ এই প্রাকৃতিক সংঘাতভিন্ন কিছুতেই তাদের ব্যক্তিত্বের আত্যান্তিক স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ হতে পারে না, এবং উপাধির অবলম্বনেই এই সংঘাত কার্য্য সাধিত হতে পারে। এই উপাধিসংযুক্ত ঈশ্বরাংশগুলিই জীবাত্মা।

এখন বোধ হয় ভগবান যে বলেছেন "মমৈবাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতনঃ" এই কথার অর্থ বুঝেছিস এবং কি জন্য আমি বলেছিলাম যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার উপাধি-সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকাশিত হতে পারে না, তাও স্পষ্ট হয়েছে। যে খানেই আত্মার প্রকাশ সেই খানেই তাহার এক প্রকাশসাধনোপযোগী শরীর আছে; তা সেই প্রকাশ সমষ্টি (universal) ভাবেই হোক্ আর ব্যষ্টি (individual) ভাবেই হউক। আর সেই জন্যই প্রকৃতির বিভিন্নলোকে প্রকাশিত হ'বার জন্য সেই সেই লোকের উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত, ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে।

ভূর্ভুবঃ ইত্যাদি সপ্তলোকের কথা ইতিপূর্ব্বে তোকে বলেছি। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যতদিন না জীবাত্মা পুষ্টিলাভ করে, সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহার প্রকৃতি-রস-ভোগ বাসনা সম্পূর্ণ প্রবল থাকে, ততদিন নিম্নস্থ লোকেরই অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই ত্রিলোকেতেই তাহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু হয়। জীবাত্মা যখন ভূর্লোকে জন্ম পরিগ্রহণ করে, তখন একটা স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়, এবং যাকে আমরা মৃত্যু ব্যাপার বলি সেটা ঘট্‌বার সময় সেই স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধ আবার ঘুচে যায়। তখন জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করে, ভুবর্লোকে চলে যায়।

ব্যোমকেশ। আপনি যে বল্‌চেন জীবাত্মা মৃত্যুকালে সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন ক'রে ভুবর্লোকে চলে যায়, তা মৃত্যুর সময় এই সূক্ষ্মশরীর কোথা হ'তে আসে?

ভট্টাচার্য্য। তোকে আগেই বলেছি, জীবাত্মার সংসার ভ্রমণের

উদ্দেশ্যই হচ্চে, আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করা। এই পূর্ণাভি-ব্যক্তি সাধিত হ'তে গেলে তাহার সমস্ত লোকে আত্মপ্রকাশোপযোগী উপাধি পূর্ব্ব হ'তেই থাকা প্রয়োজনীয়। আর সেই রূপই আছে। পূর্ব্বেই বলেছি আত্মা বা চৈতন্য উপাধি ভিন্ন প্রকাশিত হ'তে পারেন না। অতএব ভূরাদি সপ্তলোকে প্রকাশ জন্য জীবাত্মার কয়েকটি শরীর আছে। তার মধ্যে যেটি ভূর্লোকবাসী জীবাত্মার উপাধি সেটির নাম স্থূল শরীর; ভুবর্লোক ও স্বর্লোক বাসের উপযোগী যে উপাধি তার নাম সূক্ষ্মশরীর; এ ছাড়া আরও উর্দ্ধতম বা সূক্ষ্মতম লোকভোগের জন্য যে উপাধি আছে, তার নাম কারণ শরীর। এই যে তিনটি শরীরের কথা বল্লাম, এ তিনটি বরাবরই আছে, তবে প্রভেদ এই যে কারণ শরীরটি নষ্ট হয় না, জন্ম হতে জন্মান্তরে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বার বার পরিবর্ত্তন হয়।

ব্যোমকেশ। সে কেমন ক'রে হয় একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভট্টাচার্য্য। শোন্; পার্থিব জীবনের অন্তে প্রথমে স্থূল দেহের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, একেই আমরা সাধারণতঃ মৃত্যু বলে থাকি। মৃত্যু হ'লে পরে জীবাত্মার আরও দুটি শরীর অবশিষ্ট থাকে। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম শরীর; এই শরীরটি কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থে তৈয়ারী বলে এইটি অবলম্বন ক'রে জীবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে ভুবঃ ও স্বর্লোক ভোগ ক'রতে পারে। কিন্তু যেমন ভূর্লোক বাসের অন্তে স্থূলদেহের (বেদান্তের ভাষায় "অন্নময়কোষের") বিনাশ হয়, সেইরূপ ভুবর্লোক বাসের অন্তে সূক্ষ্মশরী-রের যে অংশটি ভুবর্লোকের উপযোগী,—বেদান্তের মনোময় কোষের কতকটা অংশ, (astral and lower mental bodies) তার বিনাশ হয়। তখন জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরের অবশিষ্টাংশ,—মনোময় কোষের উৎ-কৃষ্টাংশ, (higher mental body) আশ্রয় ক'রে স্বর্লোকবাসী হয়। কিন্তু

এই স্বর্গবাস তো আর চিরস্থায়ী নয়, যত দিন পুণ্য, তত দিন। পুণ্যক্ষয় হ'লেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোক প্রবেশের সময় হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ভগবান নিজ মুখে গীতায় বলেচেন। কিন্তু তার আগেই মনোময় কোষের বাকী অংশ টুকুরও পতন হয়, অবশিষ্ট থাকে কারণ শরীর,—বেদান্তের বিজ্ঞানময় কোষ, (causal body)। এটি হচ্চে জীবাত্মার স্থায়ী উপাধি। এটির বিনাশ হয় না; পরন্তু জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞান রাশী এতে সঞ্চিত হতে থাকে এবং তদ্দ্বারা এর উত্তরোত্তর বিকাশ বা অভিব্যক্তি সাধিত হয়। জীবাত্মার স্বরূপ হচ্চে আত্মা বুদ্ধি মনস্। ভূ ভূর্ব্বঃ স্বর, এই তিন লোকের বারম্বার ভোগ দ্বারা জীবাত্মার মনস্ ভাবের বিকাশ হয়; তাঁর অন্য ভাব দুটি তৎপূর্ব্বে অপ্রকটাবস্থায় থাকে। সেই জন্য আপাততঃ স্বর্লোকের উর্দ্ধে মহলোককে জীবাত্মার স্থায়ী আবাস ভবন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই স্থানে থেকে তাঁর বার বার নূতন বিকাশ হয়। স্বর্লোক বাসের অন্তে যখন জীবাত্মা কেবল কারণ শরীরধারী হন তখন তিনি আপনাকে চিনতে পারেন, কত জন্ম তাঁর হয়ে গিয়াছে সম্মুখে কিরূপ অবস্থা আসচে, এ সমস্ত তিনি বুঝিতে পারেন। কি উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তিনি সংসার ভ্রমণ করেন তা তখন তাহার পুনরায় উপলব্ধি হয়, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য আবার নূতন দেহ ধারণ করবার জন্য সচেষ্ট হন। তখন আবার একটি সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি হয়, এবং সেইটি অবলম্বন করে তিনি সূক্ষ্ম জগতে অপেক্ষা করতে থাকেন, পরে কালে উপযুক্ত পিতা মাতার দ্বারায় তাঁহার নিজ প্রয়োজন সাধনোপযোগী একটি স্থূল শরীর রচিত হ'তে আরম্ভ হলে মাতৃ গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে সেই স্থূল শরীরকে আশ্রয় করতে থাকেন এবং যথাসময়ে সেইটিকে অবলম্বন ক'রে নবজাত শিশুরূপে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দেখা দেন।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারলি, কেন আমি বলেছিলাম যে জীবাত্মা প্রথমাবস্থায় ত্রিলোকই আশ্রয় করে থাকে। ভূর্লোক বাসের অন্তেই ভুবর্লোক বাস করে পুণ্য থাকলে স্বর্লোকভোগ—তদনন্তর পুনরায় ভূর্লোকে প্রত্যাবর্ত্তন এর নাম হল সংসার চক্র। সাধারণ মানব এই জন্ম মৃত্যুর চক্রের সঙ্গে আবদ্ধ; বাসনাই এই চক্রকে ঘুরাচ্চে। যতদিন জীব বাসনার দাস ততদিন তাকে বার বার এই চক্রাবর্ত্ত পথে ঘুরতে হবে।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়, আপনার কথায় অনেক শিক্ষা লাভ করলুম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি শেষে বল্লেন ভুবর্লোক-বাসের অন্তে পুণ্য থাকলে স্বর্গভোগ হয়। আপনার আগেকার কথায় বুঝেছিলাম যে যখন মহর্লোক হচ্চে জীবাত্মার নিজের বাড়ী, তখন সকলেই একবার মৃত্যুর পরে ফেরবার পথে স্বর্গে যায়। এ দুটা কথার সামঞ্জস্য কোথায়?

ভট্টাচার্য্য। স্বর্গে সকলেই যায় বটে, কিন্তু যার পুণ্য থাকে তারি ভোগ হয়। যার পুণ্য নাই, সে নাম মাত্র স্বর্গে যায়, ঠিক যেন বুড়ি ছুঁয়ে আসা গোছের, আর সে সময় তার আত্মা ঠিক যেন ঘুমিয়ে থাকে, কাজেই ভোগ হয় না। কাজে কাজেই স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া ত'ার পক্ষে সমান। এখন জীবাত্মা স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ'ল কি?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ, এ গোময় পূর্ণ মস্তিষ্কে যতদূর ঢোকবার তা ঢুকেছে। কিন্তু দাদা ম'শায়, এর মধ্যে তো ভূতের কথা কোথাও পেলাম না।

ভট্টাচার্য্য। ওরে অত ব্যস্ত হ'স কেন! যদি এ পর্য্যন্ত কথাটা বুঝে থাকিস্ তা হলে কাল ভূতের তত্ত্বটা বোঝাতে সুরু করবো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

প্রেতাত্মার সপত্নী-বিদ্বেষ।

হুগলী জেলায় কৈকাল গ্রাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। একমাত্র তাঁতের কাপড়ের জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে বিহারীলাল সরকারের বাস। চাস বাসই তাহার একমাত্র উপজীবা ছিল। বিহারী-লাল এক্ষণে স্বর্গীয়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র, শ্রীমান কিরণশশী, ২য় পক্ষের স্ত্রী, জ্ঞানদাদাসী এবং তৎগর্ভজ সন্তান অতুলসুন্দরী ও শ্রীমান্ পঞ্চানন এখনও বর্ত্তমান। এই জ্ঞানদাকে লইয়া অদ্যকার আখ্যায়িকা বিরচিত।

বিহারী সরকারের ১ম স্ত্রী অর্থাৎ কিরণের মাতা সূতিকা রোগে, মানব লীলা সম্বরণ করিলে তিনি তাহারই ভগ্নী অর্থাৎ স্বীয় শ্যালিকা, জ্ঞানদাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর হইতেই প্রথমা স্ত্রীর প্রেতাত্মা নানা উৎপাত আরম্ভ করে। কোন দিন রন্ধন ভাণ্ড দূষিত করা, কোন দিন দ্রব্যাদির অপচয় করা, কোন দিন বা শায়িত দম্পতীর উর্দ্ধদেশে গৃহের আড়ার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকা,—ইত্যাদি। অনেক প্রকারের উপদ্রবই সে করিয়াছিল। প্রেতের এই অনিবার্য্য সপত্নীবিদ্বেষ দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল—জ্ঞানদার গর্ভজ সন্তান কোন রকমেই সে জীবিত থাকিতে দিবে না।

যথা সময়ে জ্ঞানদা গর্ভবতী হইল। প্রেত স্বপ্নযোগে তাহাকে জানাইল—তুই আমার বহিন্। সুতরাং বিনা দোষে তোর ছেলে পুলেকে মারিব না; তবে আমার ছেলেকে (কিরণকে) যদি কোন অযত্ন করিস্, তাহ'লে আর তোর্ ছেলেপুলের রক্ষা নাই।

সুতরাং জ্ঞানদা ভয়ে ভয়ে সপত্নী পুত্রের প্রতি স্নেহ করিতে লাগিল।

যথাক্রমে তাহার ১ম কন্যা ও ২য় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সপত্নীর প্রেতাত্মা যদিও এই সন্তানদ্বয়ের কোন অনিষ্ট করিল না; কিন্তু স্বীয় স্বামীর সহিত ভগিনীর সুখভোগ তাহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে জ্ঞানদা পাগল হইল। এই বাতুলাবস্থায় সে কেবল সপত্নী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর করাল ছায়া অবলোকন করিত এবং স্বামীর সহিত তাহার অহিনকুল ভাব উপস্থিত হইয়াছিল।

এইরূপে কিছু দিন যাইল। বিহারী সরকার তাদৃশ লেখাপড়া না জানিলেও বড় সামাজিক ছিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে, মৃতপত্নীর প্রেতাত্মার প্রতিকূলতাতেই "জ্ঞানদার" এই অবস্থা হইয়াছে। অতএব অচিরে তিনি গয়ায় পিণ্ডাদি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সময়ে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাহার পর হইতেই জ্ঞানদা প্রকৃতিস্থ হইল। এবং প্রেতের উপদ্রব প্রশমিত হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় বিহারী লাল এ অবস্থায় অধিকদিন থাকিতে পান নাই। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন আর কোন অত্যাচার-কাহিনী শুনা যায় না।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ কাব্যভূষণ
(কৈকালা হুগলী)।

পতি ও পত্নী।

এক ইংরাজ মহিলা লিখিতেছেন:—আমি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ২৪ শে অক্টোবর তারিখে কোন কার্য্যোপলক্ষে চেলটেন্‌হাম নগরে গমন করি এবং একটি হোটেলে আশ্রয় লই। ঐ হোটেলে তৎকালে এক স্ত্রীলোক কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। আমি যে রাত্রে সেখানে যাই সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরদিন প্রাতঃকালে আমি স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলে, স্বামী বলিলেন "আজ রবিবার। বিশেষতঃ

মৃতদেহের এখনও সংকার হয় নাই। এই অবস্থায় ইহাকে ফেলিয়া গেলে লোকে নিন্দা করিবে।” অগত্যা আমরা সে রাত্রি তথায় থাকিতে বাধ্য হইলাম। আমরা যে ঘরটি লইয়াছিলাম ঠিক তাহার নীচের ঘরে শবটি শায়িত ছিল। সে যাহা হউক আমি যথা সময়ে শয়ন করিলাম এবং শীঘ্র নিদ্রিত হইলাম। বোধ হয় মধ্যরাত্রে, কি জানি কেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম শয্যার ঠিক পাদদেশে একটি বৃদ্ধ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখটি কিছু গোলাকার। তিনি হাসিতেছিলেন এবং এক হাতে টুপিটি ধরিয়াছিলেন। একটা পাতলা ওয়েষ্ঠ কোট, ট্রাউসার এবং পুরাতন ধরণের একটা নীলবর্ণ কোট তাঁহার গাত্রে ছিল। কোটে পিতলের বোতাম লাগান ছিল। আমি যতই অধিক দেখিতে লাগিলাম, ততই চেহারাটি স্পষ্ট হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি ২।১ মিনিট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম। চাহিয়া দেখি বৃদ্ধ আর নাই।

এই অদ্ভুত ব্যাপারে আমি খুব বিস্মিত হইলেও বিশেষ ভীত হই নাই। সুতরাং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার এক ভাগিনেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ঐ গ্রামেই বহুকাল বাস করিতেছিলেন, সুতরাং মৃত স্ত্রীলোক এবং তাঁহার স্বামীকে চিনিতেন। তিনি আমার পূর্ব্বরাত্রির বৃত্তান্ত শুনিয়া চমকিত হইলেন, বলিলেন “আপনি যাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি এই মৃতা রমণীর স্বামী। তিনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই কৃষকের ন্যায় পোষাক পরিতেন। তাঁহার গোল মুখ, নীলবর্ণ কোট প্রভৃতি আমার ঠিক স্মরণ হয়। তিনি তিন বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন।”

এই ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেতগণ তাঁহাদের আত্মীয়ের মৃত্যুর বিষয় জানিতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে আসিয়া থাকেন।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধের আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০ প্যাকিং ডাকমাশুল ।৵ টাকা।
,, ছোট বোতল ৷৷৵০, ঐ ঐ ৷৵০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম)

প্লীহা ও যকৃতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০।

এডওয়ার্ডস, "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানি করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা-গুণ-প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে।

সোল্ এজেণ্টস্ :—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

সুরকী, কাট, মজুরী প্রভৃতি যে সমস্ত আবশ্যক, তাহার বিষয় সরল ভাষায় সহজ প্রণালীতে লেখা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই পুস্তকের সাহায্যে কোন ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ারের সাহায্য না লইয়া সুন্দর-রূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন; বিশেষ এই পুস্তক পাঠ করিলে কোন মিস্ত্রী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অল্প আয়াসে সমস্ত বুঝিতে পারা যায়, মূল্যও সুলভ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

চণ্ডী। (২য় সংস্করণ)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম্য বহুবিধ টীকার সাহায্যে সরল অভিনব টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অর্গলা-স্তোত্র, কীলকস্তোত্র, কবচ, দেবীসূক্ত, ন্যাসাদি রহস্যত্রয় এবং অত্যুৎকৃষ্ট চারিখানি দেবীপ্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। ৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

DATTA, FRIENDS & Co.
Lotus Library,
No. 50. Cornwallis street, Calcutta.

পল্লী চিত্র। (মাসিক পত্র।)

শ্রীবিধুভূষণ বসু সম্পাদিত।

পল্লীগ্রাম হইতে পল্লীসেবা সঙ্কল্প লইয়া প্রকাশিত। পল্লীগ্রামের শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, ইতিহাস, প্রবাদ প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বেঙ্গলী বলিয়াছেন—Among the Bengali monthlies this publication occupies a high place.

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক।

বাগেরহাট, খুলনা।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ ; বি, এল দ্বারা প্রণীত।

গ্রন্থকার পুরাণসমূহ বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে ভাগবতের অনেক দুর্ভেদ্য গূঢ়ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের যুক্তিযুক্ত প্রমাণে নাস্তিকেরও ভক্তির উদয় হয় এবং সাধারণেরও ভাগবতের ন্যায় অনেকটা বোধগম্য হয়। শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ.

"It gives the logic and philosophy of many a knotty problems of the Hindu religion". * * The book will prove an excellent *Vedi Mecum* for readers of Bhagabat. The language is simple and flowing. The get-up is as it could be desired. We hope the work will be highly valued by all students of the Hindu religion.' —Bengalee"

উপনিষদ্ (বারখানি)।

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে উপনিষদ্ প্রকাশিত হয় নাই।

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত।

ঈশ্বর, কেন, কঠ	॥০	ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়	
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য	॥০	ও শ্বেতাশ্বতর	৸
বৃহদারণ্যক	১॥০	কৌষিতকী	॥
ছান্দোগ্য	১।৶০		

নারদ ভক্তিসূত্র।

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় দ্বারা

সঙ্কলিত

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ

ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

ভক্তজীবন।

শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, দ্বারা

শ্রীমতি এনিবেসেন্টের Doctrine of the Heart হইতে

অনুবাদিত।

সৎপথ অবলম্বী সদ্ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাল এম, এ ; বি, এল ; দ্বারা

শ্রীমতি এনিবেসেন্টের Laws of the Higher life অবলম্বনে

লিখিত

আধ্যাত্ম জীবনলাভে অনেকেই পিপাসু ; আধ্যাত্ম জীবনে যে মহান্ নিয়মাবলীর ক্রম আছে, অনেক পিপাসু জন তাহা না জানিয়া, যে কোন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া কত কষ্ট পান ! সেই আর্য্যমাত্রেরই একমাত্র গন্তব্য "আধ্যাত্মিক জীবন" তাহার অধিকার অবস্থা সকল ও মূলতত্ত্ব সমূহ বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন।

জন্মান্তর রহস্য।

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ, কৃত

এই পুস্তকে শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা জন্মান্তরতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। জীবন ও মরণান্তে জীবন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ; বি, এল; দ্বারা শ্রীমতি এনি-বেসেণ্টের Life and life after death নামক বক্তৃতার অনুবাদ; মৃত্যুই আমাদের শেষ নহে, পরকাল আছে, জন্মের পর জন্ম আছে ইত্যাদি এবং মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা ইহাতে বর্ণিত আছে।

২। ধর্ম্ম-জীবন ও ভক্তি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি-এল্ দ্বারা শ্রীমতি এনিবেসেণ্টের Devotion and Spiritual Life এর অনুবাদিত।

৩। সদ্‌গুরু ও শিষ্য।

কি প্রকারে জীবন গঠন করিলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং গুরুতত্ত্বরহস্য কি, কেহ যদি বুঝিতে চান, তাঁহার এই পুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। প্রকৃত দীক্ষা।

বাস্তবিক দীক্ষা কি? এই মহান্ তত্ত্ব অনেকেই জানে না, দীক্ষা ভিন্ন মানবের চৈতন্যের প্রসার হয় না, এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে কথিত আছে।

৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

যদি "কোন পথে গেলে আমার আমি মিলে" বুঝিতে চান, যদি জন্ম মৃত্যুময় সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য পথ খুঁজিবার পিপাসা হয়, যদি পরমার্থ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিলে কতকটা সাহায্য পাইতে পারেন।

অলৌকিক রহস্য।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [আশ্বিন, ১৩১৬।

একখানি পত্র।

শ্রদ্ধেয় বাণীবাবু—

মহাশয়! আপনাদের প্রকাশিত "অলৌকিক রহস্য" একখানি পাঠ করিয়া জানিলাম, আপনারা বাঙ্গালায় নূতন ধরণের একখানি পত্রিকা প্রচার করিতেছেন। ইহা বাঙ্গালির বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।

আজ ২৫ বৎসর অতীত হইল, আমার জীবনের উপরে একটী অদ্ভুত শক্তির পরিচালনে, আমার আত্মীয়গণের মধ্যে ভৌতিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপিত হওয়ার বিষয়ে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, অদ্য সেই রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটনের অবসর পাইয়া, সাধারণের নিকট একটী অভ্রান্ত সত্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম। আশা করি, আপনারা "অলৌকিক রহস্যে" আমার জীবনের এ রহস্য প্রকাশ করিয়া, আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।

২০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ম্মচারী)

হাঃ সাঃ ৩০নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুরপনেয় মূর্ত্তি।

—:*:—

এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। আমার যখন পাঁচবৎসর বয়স, তখন নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। শৈশবের শত শত ঘটনা, যাহার কোনওটী সম্পূর্ণ স্মরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই এবং এ ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর না হইলেও, এই বহু পুরাতন শৈশব জীবনের শঙ্কট-কাহিনীর কথা আমার স্মৃতিপটে এখনও বেশ জাগরূক আছে। আমার এই স্মৃতিশক্তি সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল করিবে, সন্দেহ নাই।

জামালপুর ই, আই, রেলওয়ের একটী প্রধান কেন্দ্র। এখানে উক্ত রেলওয়ের লোকো আপীস স্থাপিত। এখানকার Work Shop উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল হইবে। ইহা ভারতের সর্ব্বপ্রধান Work Shop। পূর্ব্বে অডিট্ এবং ট্র্যাফিক আপীস জামালপুরে ছিল। আমার পিতা ট্র্যাফিক আপীসে কর্ম্ম করিতেন। সেই সময়ে জামালপুর বাজারের একটী উত্তম অট্টালিকা আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাড়ীখানি আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের অত্যন্ত মনোনীত হওয়ায় অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সেই বাড়ীতেই আমাদের লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসারে তখন কেবল আমরা দুই ভাই এবং মাতা ঠাকুরাণী।

এই বাড়ীতে প্রবেশাবধিই আমাদের জ্বর আরম্ভ হইল। দাদা ও মাতাঠাকুরাণী অপেক্ষা আমার জ্বর কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে পার্শ্বের ঘরে স্ত্রীলোকের অতি করুণ-ক্রন্দন শ্রুত হইত। মাতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উহা বিড়ালের ডাক বলিয়া পিতা

হাস্য করিতেন। আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর একটী কেরাসিনের টিন ছিল। মধ্যে মধ্যে কে যেন তাহা বাজাইত। মাতা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, পিতা বিড়ালের পায়ের শব্দ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিলেও আমার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় ইহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না।

এইরূপে দুই মাস কাটিল। একদিন রাত্রি ৯॥• টার সময় আমি প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, পিতা বলিলেন "এত রাত্রে আর বাহিরে যাইতে হইবে না, এই দরজার উপর প্রস্রাব কর।" পিতার কথামত আমি দরজার নিকট যাইবামাত্র দেখিলাম, একটী ৪০।৪৫ বর্ষ বয়স্ক সুন্দর প্রৌঢ়পুরুষ দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার গলায় উপবীত, আজানুলম্বিত বাহু, অতি সুন্দর অতি সুপুরুষ। আমি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে চীৎকার করিয়া বলিলাম——————"বাবা! দরজায় পৈতে গলায় কে একটী লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।" আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা আমার নিকট আসিলেন এবং অবিলম্বে একটী ঝাঁটা লইয়া দরজার উপর দুই চারিবার সজোরে আঘাত করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কিছু দেখা যাচ্চে?" আমি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলাম "না।" কারণ সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেও, ভয় তখনও আমার পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। তাহার পরে প্রস্রাব করিয়া, যেমন শয়নের জন্য খাটের নিকট অগ্রসর হইয়াছি, অমনি দেখি, আমার শয্যা স্থানের মস্তক রাখিবার নিকট সেই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। আমি আবার চীৎকার করিয়া পিতাকে ইহা বিবৃত করিলাম, তিনিও পুনরায় ঝাঁটা প্রহারে সেই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিটীকে সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন। আমিও নিরাপদ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে পিতার কোলের মধ্যে শয়ন করিলাম।

এ অবস্থায় অতি অল্পক্ষণেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কারণ সেই মূর্ত্তি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার পায়ের নিকট খাটের ধারে দাঁড়াইয়া, দুই হস্ত প্রসারণে আমাকে তাহার কোলে যাইবার জন্য দৃঢ় ভাবে আহ্বান করিতে লাগিল। এখন মূর্ত্তিটী পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্ত নহে, অতি উগ্র. অতি বিকটমূর্ত্তি, দেখিয়াই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আর তখন আমার রক্ষা করা পিতার ক্ষমতার অতীত হইয়া উঠিল। তখন নিরুপায় হইয়া পিতা প্রতিবেশিগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমার চীৎকারে এবং পিতার আহ্বানে, দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন আসিয়াই পিতার কোল হইতে অতি দ্রুত-ভাবে আমাকে তাঁহার আপন কোলে উঠাইয়া লইলেন। সেই লোকের কোলে উঠিবামাত্র আমার মূর্চ্ছাপনোদন হইল। তখন আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং শান্ত হইলাম।

যিনি আমাকে কোলে করিলেন, তিনি পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"যদি ছেলে বাঁচাইতে এবং নিজেরা বাঁচিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন, নচেৎ অন্য রাত্রে কাহারও রক্ষা নাই।" পিতাও তখন অত্যন্ত ভীত, সুতরাং প্রস্তাবমাত্রেই তিনি সম্মত হইলেন; এবং যত লোক আসিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের সঙ্গে প্রত্যুপকারের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেককেই পিতা টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। সকলেই সেই বিপদে তাঁহার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। আমার মাতুলালয় নিকটেই ছিল। মাতামহ রেল আপীসেই কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং আমরা মাতুলালয়েই গমন করিলাম। যিনি আমাকে কোলে লইয়া-ছিলেন, তিনিই আমাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলে পিতা সকলকে টাকা দিতে গেলেন, কিন্তু কেহই

সে বিপদে সাহায্য করার জন্য মুদ্রা গ্রহণ করিল না। যিনি আমাকে লইয়াছিলেন, তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"অদ্য রজনী কোনও রূপে কাটাইয়া দাও। আগামী কল্য প্রাতে আসিয়া আমি ব্যবস্থা করিব।" বলা বাহুল্য, সে রাত্রি ভয়ে, হুতাশে অতি ভীষণভাবেই কাটিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে—আমাদের প্রতিবাসী সেই বিহার-বাসী ব্রাহ্মণ—একটী ঘটে জল লইয়া তাহা মন্ত্রপূত করতঃ আমার অঙ্গে প্রদান করিলেন, এবং একটী মাদুলী দিয়া বলিলেন—"যে দিন ঐ মূর্ত্তি উঁহাকে ত্যাগ করিবে, এই মাদুলীও সেই দিন হারাইয়া যাইবে। এই মাদুলি কোন ক্রমে পরিত্যাগ করিবে না; কেহ ফেলিতে বলিলেও তাহা শুনিবে না।" আমার ১২ বৎসর বয়সের সময় সেই মাদুলী হারাইয়া গিয়াছে। সাত বৎসর কাল অবিশ্রান্তভাবে শয়নে স্বপনে সে মূর্ত্তি আমার পাছে পাছে ঘুরিয়াছে। আমি এই সাত বৎসর কাল নিশ্চিন্তভাবে খাইতে বা ঘুমাইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে হাত ছানি দিয়া ডাকিয়াছে, মাদুলী ফেলিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছে। আমি সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইতাম, পূর্ব্বস্মৃতি লোপ হইত। এই কয় বৎসর আমার আত্মীয় স্বজন অনবরত আমার পাছে পাছে সতর্ক প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ হয়ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও এক দিন তন্ময়ভাবে সেই মূর্ত্তির উপদেশে মাদুলী ফেলিয়া দিতাম। যাহা হউক মাদুলী হারাইবার পরে, আর সে দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই।

উক্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার চক্ষুর সম্মুখে থাকিত। তবে ঊর্দ্ধদিকে দেখা যাইত এবং কি জানি, কোন্ শক্তি বলে জানি না, আমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই উপরের দিকে থাকিত, নামাইবার ক্ষমতা হইত না। কিন্তু

খোলা মাঠে যখন অপর বালকদের সহিত খেলা করিতাম, তখন সে মূর্ত্তি সেই ক্ষণের জন্য অপসৃত হইত। এই মূর্ত্তি ছায়ামূর্ত্তি নহে, এখনও আমার মনে হয় যে, সে মূর্ত্তি বাস্তব, ইতস্ততঃ-দৃষ্টপদার্থ-নিচয়ের ন্যায় বাস্তব। তবে মূর্ত্তি অতি গম্ভীর এবং তাহাতে রাগদ্বেষের কোন ভাব নাই। শয্যাপার্শ্বে বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া অবধি আমার ভয় মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেই ভয়ের জন্যই এখনকার এই শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হইতাম। মাদুলী হারাইয়া যাইবার পরে সে মূর্ত্তি আর দেখি নাই বটে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি আর ছিল না বটে, কিন্তু মনের "ছম ছম" ভাব কিছুদিন পর্য্যন্ত ছিল। তবে কোন প্রকার ভয় পাই নাই বা শরীর অসুস্থ হয় নাই।

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।

মাতৃস্নেহ।

—:০:—

(১)

রামলাল দাদা একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। বাকুড়া জেলায় কোনও স্থানে ডাক্তারি করিয়া বেশ দশ টাকা রোজগার করেন। ডাক্তারি ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাতেও তিনি বেশ পারদর্শী। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও একজন প্রসিদ্ধ কবি। স্বদেশে ও কর্ম্মস্থানে তাঁহার বেশ যশ, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। অনেক দিনের পর তিনি বাটী আসিয়াছেন। যখন তিনি বাটীতে আসিতেন গ্রামস্থ ছোটবড় সকলের বাটী গিয়া সাক্ষাৎ করিতেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। এবারেও সেইরূপ করিলেন। দিবাভাগে

আমরা বাটী থাকি না, সেই জন্য সন্ধ্যার পর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

গ্রীষ্মকাল পূজার দালানের রকে একখানি মাদুর বিছাইয়া শুক্ল দ্বাদশীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় নির্ম্মল দক্ষিণা বায়ু সেবন করিতে করিতে আমরা ৭।৮ জন বসিয়া গল্প করিতেছি। রামলাল দাদা বড় সুন্দর গল্প করিতে পারেন ও নানা বিষয়ের সমাচার রাখেন। অনেক দিনের পর আত্মীয় স্বজনকে পাইয়া, মনের আনন্দে গল্প করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বৈটকখানার ঘড়িতে ১১টা বাজিয়া গেল। আমি বলিলাম দাদা রাত্রি অনেক হইয়াছে, এস এইখানে কয় ভাই একত্রে আহার করি, তারপর বাটী যাইও। দাদা বলিল, "না ভাই অনেক দিনের পর বাটী আসিয়াছি, আজ বাটীতে না খাইলে মা রাগ করিবেন। কাল তখন এই খানে খাইব। এস প্রিয়নাথ আমাকে একটু দাঁড়াও ভাই; আজ আমি বাড়ী যাই।" তাঁহাদের বাটী আমাদের বাটী হইতে ২।৩ মিনিটের রাস্তা। পরিষ্কার জ্যোৎস্না; তবুও রামলাল দাদা দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "ব্যাপার কি দাদা? তোমার এত ভয় কতদিন হইয়াছে? চিরকাল তুমি রাত্রি দুই প্রহর একটার সময় একাকী গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে; কখনও ভূত প্রেত মানিতে না ভূতের গল্প কেহ করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে। তোমার এত কিসের ভয় হইল? কি ভূতের নাকি?" সেখানে আর আর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। রামলাল দাদা চিরকাল রহস্যপ্রিয়, সকলেই মনে করিলেন তিনি রহস্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "রহস্য নয় বাস্তবিক আমি ভূত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একবার নয়, দুই তিন বার দেখিয়াছি এবং ভূতের কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ভূত না মানিয়া

কি করি ? সেই অবধি আমি একাকী কোথাও যাইতে সাহস করি না।" আমরা সকলে বলিলাম "কি রকম ? গল্পটি আমাদের বল।" "তবে বলি শুন বলিয়া তিনি পুনরায় বসিলেন ; পরে বলিতে লাগিলেন ;—

অনেক দিনের কথা নয় গত মাঘমাসে একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ ধুইতেছি, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক বেগে অশ্বারোহণে আমার বাটীর সম্মুখে আসিয়া, আমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার বাবু বাটীতে আছেন ?" ভৃত্য বলিল "হাঁ আছেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?" তিনি কোনও উত্তর না দিয়া অশ্বটি বাগানের বেড়াতে বাঁধিয়া বৈটকখানায় প্রবেশ করিলেন পরে বলিলেন "ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও।" ভৃত্য আসিবার অগ্রেই আমি তথায় গেলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মহাশয় আমি—গ্রামের জমিদার মহাশয়ের বাটী হইতে আসিতেছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের আজ দুই সপ্তাহ হইল জ্বর হইয়াছে ; জ্বরের অত্যন্ত তেজ ১০৫।১০৬ ডিগ্রি অবধি উঠে, ১০৪ ডিগ্রির নীচে নামে না। বুকে সর্দ্দিও আছে কল্য হইতে ভুল বকিতেছেন। এতদিন গ্রামস্থ নেটিভ ডাক্তার দেখিতেছিলেন, কোনও উপকার হয় নাই এবং পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই জন্য আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আপনি যাহা চাহিবেন, বাবু তাহাই দিতে প্রস্তুত আছেন।"

যে গ্রামে আমি থাকি সেখান হইতে জমিদারের বাটী প্রায় ৩০ মাইল দূরে। রোগীর যেরূপ অবস্থা শুনিলাম, তাহাতে একবার সেখানে যাইলে ৮।১০ দিনের ভিতর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। গ্রামে আমার হাতে অনেকগুলি রোগী ; তাহাদের ফেলিয়া কিরূপেই বা যাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলাম "তাইত কেমন করিয়া যাই ? এখানে আমার হাতে অনেকগুলি রোগী তাহাদের উপায় কি হইবে ?"

আগন্তুক। "যাহা হয় একটা উপায় করুন; তাহাদের পীড়া তেমন কঠিন নয়, অনায়াসে অন্য উপায় করিতে পারিবেন। আমাদের বড় বিপদ। আপনি না যাইলে রোগীর রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই।"

লোকটির কাকুতি মিনতি দেখিয়া, আর কতক অর্থলোভেও বটে যাইতে সম্মত হইলাম; বন্দোবস্ত হইল যতদিন থাকিব প্রত্যহ ১০০ টাকা করিয়া দিবে, খাই খরচ দিবে, ও যাইবার আসিবার পাল্কী ভাড়া দিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে যোগেন্দ্রকে (রামলাল দাদার কনিষ্ঠ যোগেনও কম্পাউণ্ডারি পাশ করিয়া ডাক্তারি করে) হাতের সমস্ত রোগীর অবস্থা ও কাহার কিরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিয়া, বেলা ১০টার সময় শিবিকারোহণে জমিদার ভবনে যাত্রা করিলাম, সঙ্গে একটি ভৃত্যও চলিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিলাম।

জমিদার মহাশয়ের সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। আমি পৌঁছিবামাত্র স্বয়ং আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং সরোদনে আপন বিপদের কথা জানাইতে লাগিলেন। ক্রমে আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "ডাক্তার বাবু আমার বিমলকে বাঁচাইয়া লক্ষ টাকা আমার নিকট হইতে লইয়া যান, আর আমাকে জন্মের মত কিনিয়া রাখুন।" বিপদের সময় এরূপ লোক অনেকেই চিকিৎসককে দেখান কিন্তু আরাম হইলে সমস্ত বিস্মরণ হন।

আমি। মহাশয় আমাকে টাকা দিয়া আনিয়াছেন। আমি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব তাহা বলা বাহুল্য। বাঁচা না বাঁচা ঈশ্বরের হাত। মনুষ্যের যাহা সাধ্য তা করিব।

জমি। দুই বৎসর হইল বিমলের গর্ভধারিণী আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিমলকে লইয়া কোনও রকমে তাহার শোক কতক

বিস্মরণ হইয়াছি। বিমল ছাড়িয়া গেলে, আমি একদিন বাঁচিব না। (শুনিলাম বিমলের মাতার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই বাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং বিমলের মাতার শোক যে তাঁহাকে বড়ই অস্থির করিয়াছে তাহার সন্দেহ কি ?) তখন আর অধিক কথা হইল না ; আমি রোগী দেখিতে গেলাম। ছেলেটিকে একটি বাগান বাটীতে রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, বাবুর ভদ্রাসন বাটীতে বড় গোলমাল ও লোকজনের ভিড় বলিয়া বাগান বাটীতে আনা হইয়াছে। বাটীটি একতলা হইলেও বেশ শুষ্ক ও অনেকগুলি দরজা জানালা থাকাতে বেশ বায়ু চলাচল হয়। এখানে বাবুর মাতা, ভগ্নি, দুইটী পরিচারিকা একটি পাচিকা আর কয়েকটি ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই থাকে না।

বাটীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, ছেলেটি একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে পরিষ্কার শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছে ; নিকটে বাবুর মাতা ও ভগ্নি বসিয়া আছেন, কিঞ্চিৎ দূরে একটি তেপাইয়ের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি রহিয়াছে ও একটি বাতিদানে দুইটি বাতি জ্বলিতেছে। ঘরে ধূনা গুগ্‌গুলের সৌগন্ধের অভাব নাই, কিন্তু দরজা জানালা সমস্ত হিম নিবারণের জন্য বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি যাইয়া প্রথমে উত্তর দক্ষিণের দুইটী জানালা ও দরজা খোলাইয়া দিলাম। ঘর একটু ঠাণ্ডা হইল। পরে ডাক্তার বাবুর নিকট প্রথম হইতে রোগের সমস্ত বিবরণ ও তিনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা শুনিলাম। পরে উত্তমরূপে রোগীকে পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম পীড়া অত্যন্ত কঠিন, তবে এখনও বাঁচিবার আশা আছে। দুই একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে একটি সুন্দর ঘরে আমার থাকিবার স্থান হইয়াছে। ঘরের ভিতর একখানি পালঙ্কের উপর পরিষ্কার বিছানা, একটি বনাত মোড়া

টেবিল, কয়েকখানি চৌকি, একখানি শোফা ও একখানি আরাম চৌকি। টেবিলের উপর কয়েকখানি পুস্তক ও খবরের কাগজ ও একটি সুন্দর কেরোসিন ল্যাম্প। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলাম। জমিদার মহাশয়কে বলিলাম, রোগীর অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলে আমাকে ডাকিবেন।

বলা বাহুল্য যে, শয়নমাত্রই নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি আন্দাজ ১টার সময় জমিদার মহাশয় আমাকে উঠাইয়া বলিলেন "একবার আসুন বড় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।" গিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বমতই আছে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইরূপ বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম; ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে হইলে, একটি অপ্রশস্ত বারাণ্ডা দিয়া আসিতে হয়। যেই বারাণ্ডায় পৌঁছিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম একটি সুন্দরী সধবা স্ত্রীলোক বাহির হইতে ভিতরে যাইতেছে। বারাণ্ডার উজ্জ্বল কেরোসিনের আলোতে দেখিলাম স্ত্রীলোকটির দুই হাতে সুবর্ণবলয় গলায় হার ও নাকে নত। আমাকে দেখিয়া হটাৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। আমি চলিয়া আসিলে বাটীর ভিতরে গেল, আমি বাহিরে আসিয়া বারাণ্ডায় একখানি চৌকীতে বসিলাম; ভৃত্য তামাক দিয়া গেল তামাক খাইতেছি ও রোগীর বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় স্ত্রীলোকটি পুনরায় বাহিরে আসিল। জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখিলাম আমার দিকে চাহিয়া পূর্ব্বমত অবগুণ্ঠন টানিয়া, দ্রুতগতিতে বাগানের পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। তখন আমার মনে সন্দেহ হইল কে এ স্ত্রীলোকটি? আমি সন্ধ্যা হইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি বাগানবাটিতে সধবা স্ত্রীলোক কেহই নাই; আর যদিই থাকেন কিম্বা কোনও প্রতিবেশিনী যদি বালকটিকে দেখিতে আসিয়া থাকেন তবে এত রাত্রে একাকিনী এমন করিয়া কেন যাইবেন? ভূত মানি না। মনে মনে সন্দেহ হইল কোনও দুশ্চরিত্রা

স্ত্রীলোক ভৃত্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে অন্দরমহলে যাইবে কেন? এইরূপ নানারকম চিন্তা মনে আসিতে লাগিল। ঠিক কোনও মীমাংসা হইল না। তখন আর সে বিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া আস্তে আস্তে শয়ন করিলাম। কিছু পরে নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত' ধুইয়া বালকটিকে একবার দেখিয়া আসিলাম পূর্ব্বমতই আছে। পরে চা পান করিতে বসিলাম, বাবু ও নেটিভ ডাক্তারও আসিয়া যোগ দিলেন। নানা রকমের কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কল্য রাত্রে বাহির হইতে কোনও সধবা স্ত্রীলোক আপনাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন কি?"

বাবু। কৈ না! কত রাত্রে? স্ত্রিলোকটির আকৃতি কিরূপ?

আমি। রাত্রে যখন আমি বিমলকে দেখিতে যাই। রাত্রি আন্দাজ একটা হইবে। স্ত্রীলোকটির চেহারা যতদূর আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহাতে বোধ হইল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, নাসিকা মানানসই ও তাহাতে একটি নত আছে। বয়স আন্দাজ ৩০।৩৫ হইবে।

বাবু। কৈ এমন কোনও স্ত্রীলোক ত কাল রাত্রে আসে নাই—বলিয়া যেন কিছু বিমর্ষ হইলেন। সে বিষয়ে আর কোনও কথা-বার্ত্তা তখন হইল না। দিন কাটিল রাত্রিবেলা শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঘড়িতে এলারম্ দিয়া রাত্রি একটার সময় যাহাতে নিদ্রা ভাঙ্গে তাহার বন্দোবস্ত করিলাম। যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বারাণ্ডার চৌকীতে পূর্ব্বদিনের মত বসিলাম। আন্দাজ ৫ মিনিট মাত্র বসিয়াছি, স্ত্রীলোকটি আসিতে আরম্ভ করিল। আমি ঘরের ভিতর গেলাম, সে বাটিতে প্রবেশ করিলে তফাত হইতে অদৃশ্য ভাবে তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। দেখিলাম

অন্দর মহলে গিয়া সে বরাবর বিমলের ঘরে প্রবেশ করিল, আমিও বারণ্ডার চৌকিতে গিয়া বসিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিল এবং পূর্ব্বমত দ্রুতগতি বাগানের পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। সেই সময় আমি ভিতরে খবর পাঠাইলাম যে, বিমলকে একবার দেখিতে যাইব। একজন পরিচারিকা আসিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বিমল এখন কেমন আছে?

পরি। সেই রকমই আছে, তবে এক একবার একটু একটু ঘাম হইতেছে বোধ হয়।

আমি। তুমি কখন হইতে বিমলের কাছে আছ?

পরি। ১১ টার পর হইতে।

আমি। কে কে এগারটাব পর হইতে আছে?

পরি। আমি আর পিসিমা (অর্থাৎ বাবুর বিধবা ভগ্নি) বাবুও মধ্যে মধ্যে এক এক বার দেখিয়া যাইতেছেন।

আমি। আর কেহ আসে নাই?

পরি। না।

আমি দেখিয়া আসিলাম পূর্ব্ব মতই আছে,—তারপর তিন দিন কাটিল। প্রত্যহই স্ত্রীলোকটি ঠিক রাত্রি একটার সময় আসে এবং অর্দ্ধঘণ্টা আন্দাজ থাকিয়া চলিয়া যায়। চতুর্থ দিবস বেলা তিনটা হইতে বিমলের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, ঘাম হইতেছে, নাড়ির গতিও খারাপ হইয়াছে। সেদিন রাত্রে বাটীর কেহই নিদ্রা যায় নাই, প্রতি ঘণ্টায় আমি বিমলকে দেখিতে যাইতেছি, অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতেছে। রাত্রি একটার সময় পূর্ব্ব কথিত অপ্রশস্ত বারণ্ডায় জমিদার মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; আমি তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম তিনি

কম্পিত কলেবরে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমি তাঁহার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আনিলাম ও বারাণ্ডায় বসাইয়া মুখে হাতে জল দিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলাম, পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি ? কেন ওরূপ ভীত হইলেন।

বাবু। যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে বিমলের আর কোন আশা নাই ; আমার সর্ব্বনাশ হইল।

আমি। আপনি জ্ঞানী লোক হইয়া, কেন ওরূপ অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছেন। কি দেখিয়াছেন বলুন।

বাবু। সেদিন যে স্ত্রীলোকটির কথা আপনি বলিয়াছিলেন সেটি আর কেহ নয়, বিমলের মাতার প্রেতমূর্ত্তি। তাহার পর দুই দিন আমি সেই মূর্ত্তি দূর হইতে দেখিয়াছি। আজ সেই মূর্ত্তি আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "মৃত্যুরপূর্ব্বে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আর বিবাহ করিবে না ; কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে তুমি বিবাহ করিলে। বিমলের প্রতি তোমার আর পূর্ব্বমত স্নেহ যত্ন নাই, তোমার নূতন স্ত্রী ও তাহার পুত্রই এখন তোমার সর্ব্বস্ব। আমি আমার পুত্রকে লইয়া যাই, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র লইয়া থাক। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম। মুখে বলিলাম বটে "ও কিছুই নয়" কিন্তু মনে মনে সমস্তই বুঝিতে পারিলাম, ভয়ও হইল। বিমলকে একবার দেখিয়া আসিলাম, পূর্ব্বমতই আছে। দেখিলাম ঔষধে ফল হইয়াছে ; আপাততঃ কোন ভয় নাই। বাবুকে বুঝাইয়া শয়ন করাইলাম।

পরে বাহিরে আসিলাম। একাকী শয়ন করিতে পারিলাম না ; ভৃত্যকে কাছে শয়ন করিতে বলিলাম। শয়ন করিয়া ঐ সমস্ত চিন্তা করিতেছি, ঘরে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, এমন সময় মশারির

একদিকের বাড় আস্তে আস্তে উঠিতে আরম্ভ করিল, চাহিয়া দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি মুখ বাড়াইয়া বলিতেছে—“তুমি আর এখানে কেন? এখনও কি বিমলকে বাঁচাইবার আশা আছে। আচ্ছা দেখ” আমি ত কম্পমান! ভৃত্য লাফাইয়া উঠিয়া বলিল “ও কে বাবু নিশ্চয়ই ভূত, চলুন বাড়ি যাই, ছেলে যত বাঁচিবে তা বুঝিতে পারিয়াছি।” আমি “কিছু না” বলিয়া তাহাকে তামাক সাজিতে বলিলাম। তামাক খাইয়া শয়ন করিলাম।

পর দিন কোন ক্রমে কাটিল কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হইতে হাত পা ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। রাত্রি একটার পর পুনরায় সেই স্ত্রীলোক। মশারি ফেলিয়া শয়ন করিয়া আছি, পূর্ব্ব মত বাড় উঠাইতে লাগিল এবং পূর্ব্ব মত বলিল “তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ। বিমলকে বাঁচাইবে, আচ্ছা বাঁচাও” এই পর্য্যন্ত বলিয়া, যেমন চলিয়া গেল অমনি অন্দর মহল হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা। ভৃত্যকে বলিলাম আর এখানে থাকিয়া কি হইবে, চল যাই, বেশ জ্যোৎস্না আছে, বেহারাও ঠিক করা আছে কোন কষ্ট হইবে না। ভৃত্য পলাইতে পারিলে বাঁচে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বেহারা ডাকিতে গেল। সেই অবকাশে বাবুর প্রধান কর্ম্মচারিকে আমি বলিলাম, আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি চলিলাম।

কর্ম্মচারী দুইএকবার আপত্তি করিল, পরে বলিল আচ্ছা, আশুন আপনার যাহা পাওনা আছে, পরে পাঠাইয়া দিব। কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম।

এই ব্যাপারের পর হইতে আমার ভূতে বড় বিশ্বাস হইয়াছে।

আমি। আর যে দুই বার দেখিয়াছিলে সে কিরূপ? রাঃ দাদা। সে তখন আর এক দিন বলিব আজ রাত্রি হইয়াছে। এস দাঁড়াইবে আজি বাড়ি যাই।—

তাঁহাকে সকলে দাঁড়াইয়া আসিলাম। পরে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

আর দুইটি ঘটনা পরে বলিয়াছিলেন ও ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন; সে সকল পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়

অদৃশ্য সহায়।

আমার পিতৃদেব একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার সুনাম ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি শিক্ষাবিভাগে যে প্রকার উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, ভারতের কম লোকেব ভাগ্যেই সেরূপ ঘটিয়া থাকে। তিনি ভূত প্রেতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, এবং এই সমুদয়ের তত্ত্ব নিরূপণ জন্য যে সকল সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনটীতেই যোগ দান করেন নাই। এমন কি তিনি কোন জাতি বা ধর্ম্মগত বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। আমার পিতৃব্য মহাশয়ও গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, ও তাঁহারও অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন।

আমার পিতৃব্যের মৃত্যুর আন্দাজ ৪।৫ বৎসর পরে, ৺পিতাঠাকুরের কঠিন পীড়া হয়। শরীরের অভ্যন্তরে একটী স্ফোটক হওয়ায়, তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক সাহেব ও অন্যান্য কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করেন। ব্যাধি উৎকট আকার ধারণ করিলে, একদিন স্থির হইল যে, সন্ধ্যার সময় অজ্ঞান

করিয়া অস্ত্রচালনা করা হইবে। ৺পিতা ঠাকুর অস্ত্রচিকিৎসায়, বিশেষতঃ ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে চিকিৎসায় ভীত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাতে অস্ত্র-চালনা পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইল।

আমার বয়স তখন অল্প। আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তিন ভগিনী, ৺পিতাঠাকুর যে ঘরে ছিলেন, তাহার পার্শ্বস্থিত ঘরে, শয়ন করিতাম। এই দুই কামরার মধ্যের দরজা রাত্রিকালে খোলা থাকিত। আমার মাতা ঠাকুরাণী রাত্রিতে একাকিনী ৺পিতা মহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। পরদিন প্রাতঃকালে অস্ত্রচালনা করা হইবে এই ভাবনায় পিতা ও মাতা উভয়েই চিন্তিত ছিলেন।

মাতা ঠাকুরাণী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পিতা মহাশয় তখনও নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দুইটি জানালা খোলা ছিল। সেই জানালা দিয়া চন্দ্রের কিরণ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহকে আলোকিত করিতেছিল। পিতার শয়নকক্ষ এবং আমাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

সেই সময়ে মা লক্ষ্য করিলেন যে, শুভ্রবসন-পরিহিতা আনুমানিক অষ্টমবর্ষীয়া একটি অসামান্য জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা পিতা ঠাকুরের পাদদেশ-স্থিত জানালার পার্শ্ব দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিঃশব্দে পদসঞ্চার করিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া, তাঁহার দেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জননী যে সেখানে ছিলেন বা তাঁহাকে দেখিতে ছিলেন, বালিকা যেন তাহা লক্ষ্য করিলেন না। একমিনিটের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটিয়া গেল। বালিকা, আমরা যে ঘরে নিদ্রিত ছিলাম, সে ঘরের দিকে যাইতে গেলে, মাতা ঠাকুরাণী প্রদীপ হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু সেখানে বালিকা অদৃশ্যা হইলেন। আমার মাতা ঠাকুরাণীর বিশ্বাস

হইল যে, এই বালিকা তাঁহারই পরলোকগতা কন্যা। তিনি জীবিতা থাকিলে, প্রায় অষ্টমবর্ষীয়া হইতেন।

ভয়বিহ্বলা হইয়া মাতা ঠাকুরাণী ৺ পিতা ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ৺ পিতা মহাশয় বলিলেন "স্থির হও, ভয় করিবার কিছুই নাই। ভূত কি প্রেত নয়।" এই কথা বলিয়াই, পিতা ঠাকুর মলত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইলেন। মলত্যাগ করিয়া তাঁহার এরূপ কম্প হইতে লাগিল যে, অতিকষ্টে তাঁহাকে বিছানায় আনা হইল। এই কম্পে তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ প্রত্যূষেই আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার পর, রাত্রিকালে তিনি যে মলত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। দেখা গেল, সেই মল, মল নয়, তাহা কেবল পূয। আভ্যন্তরিক স্ফোটক আপনা আপনিই ফাটিয়া গিয়াছে, অস্ত্র চালনার আর আবশ্যক হইল না।

৺পিতা ঠাকুর তখন মাতা ঠাকুরাণীর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখার কথা সম্বন্ধে যে অদ্ভুত কাহিনী বলিলেন তাহা এই :—

"রাত্রিতে শুইয়া কাল অস্ত্রচালনার কথা ভাবিয়া মনে হইল যে; এযাত্রা বুঝি আর রক্ষা নাই। যাতনায় ব্যাকুল হইয়া পরলোকগত ভ্রাতার উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম, "হয় আমার অসুখ বিনা অস্ত্রচালনায় সারিয়া যাউক, না হয় আমার মৃত্যু হউক।" তাহার পর স্বপ্নে দেখিলাম যে, ভ্রাতা আমাকে বলিতেছেন 'দাদা আমি তোমার অসুখ ভাল করিয়া দিতে পারি, কিন্তু এরূপ শীত করিবে যে, তুমি মারা যাইতে পার'। আমি বলিলাম, আমার শরীর যেরূপ সবল ও দৃঢ়, তাহাতে আমি শীতের ভয় করি না। ভ্রাতা বলিলেন 'আচ্ছা, আমি তোমার আরোগ্যের জন্য খুব (ধীর চিকিৎসক) mild medium পাঠাইয়া দিব। তোমারই কন্যাকে দিয়া আরোগ্য দান করিব।' তাহার পর আমার যেন মনে হইল যে, কোমল

হস্তদ্বারা আমার গায়ে কে হাত বুলাইতেছে। ইহারই পর আমার স্ত্রী ভয়ে অভিভূত হইয়া, আমাকে এই দৃশ্যের কথা বলিলেন। পাছে তিনি ভয়ে মূর্চ্ছা যান, আর আমারও মলত্যাগের ব্যাঘাত ঘটে, সেজন্য আমি উক্ত দৃশ্য কিছুই ভয়ের নয় ও রাত্রি জাগরণ জন্য মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফল এই সব বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম।"

বলা বাহুল্য, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চিকিৎসকেরা বলিলেন যে, এরূপ রোগ বিনা অস্ত্রচিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া ঐশ্বরিক সাহায্য ভিন্ন হয় না। ইহার পর ৺পিতা ঠাকুর অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন।

আমি এই ঘটনা ৺ পিতৃদেবের মুখে নিজে শুনিয়াছি। মাতা ঠাকুরাণী এখনও এই ঘটনা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি এখনও বলেন, সেই বালিকা তাঁহারই স্বর্গগতা সুন্দরী কন্যা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ৺ পিতৃদেব প্রেতাত্মা সম্বন্ধে কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহার লেশমাত্র তিনি জানিতেন না। তাঁহার সিংহরাশি ও সিংহলগ্ন যুক্ত জন্মরাশি ও লগ্ন, তাঁহাকে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী করিয়াছিল। তাঁহার স্নায়ু বজ্রের ন্যায় সর্ব্বদা অটুট থাকিত। সর্ব্বোচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী হউন, বা ক্ষমতাশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজাই হউন, কাহারও নিকট তাঁহাকে অবসন্ন হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার গাম্ভীর্য্যগুণে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়া ১১।৮।০৯।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মা আমার বুঝি মায়াবিনী! নহিলে গোপাল চলিয়া যাইবার পর হইতে আমার ভাগ্য এমন পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? গোপালের প্রতি তাঁহার যে অগাধ মমতা ছিল, আমি এখন তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছি। শুধুই কি তাই! ছয় বৎসর গোপাল চলিয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তাঁহার মুখ হইতে গোপালের নাম বহির্গত হয় নাই। অন্ততঃ আমি ত এক দিনের জন্যও শুনি নাই।

বুঝি মা পরের ছেলে পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আমার পিতামহী তাঁহাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, মা তাহা দেবতার বাক্য-জ্ঞানে শিরে ধরিয়া পালন করিয়াছেন। পালন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। গোপাল বড় হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার কাছে মমতার প্রতি-দানের আশা রাখেন নাই। তাই বুঝি মায়ের মুখ একদিনের জন্যও মলিন দেখিলাম না! গোপালের স্মরণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখিতে পাইলাম না!

মা এখন দিবারাত্রি আমাকে লইয়াই ব্যস্ত। কিসে আমি সুস্থ ও সন্তুষ্ট থাকি, এখন ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। আমি বাড়ীতে থাকিলে, সর্ব্বদাই আমার পরিচর্য্যার তত্ত্বাবধান করেন, ইস্কুল হইতে আসিবার সময় পথপানে চাহিয়া থাকেন।

এখন আমাদের সকল ঝঞ্ঝাট একরূপ মিটিয়া গিয়াছে। আমার পিতার 'মুখে রক্ত-উঠা' উপার্জ্জনের সুখ-শয্যা-শায়ী অংশীদার এবং আমারই

মাতৃস্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী পিতা ও পুত্র উভয়েই আর আমাদিগের সুখের পথে বাধা দিতে আসিবে না।

গোপাল চলিয়া যাইবার দুই দিন পরেই পিতা রোগমুক্ত হইলেন। তথাপি যেন মায়ের ভয়ে তিনি নীরোগ হইয়াও কিছুদিন সুস্থ হইতে পারিলেন না। পাছে মা কোন দিন গোপালকে ফিরাইয়া আনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এক দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল : দেখিতে দেখিতে বৎসর চলিয়া গেল ; মা পিতার কাছে গোপালের নামও মুখে আনিলেন না। পিতা এইবারে যথার্থ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার আশ্বাস-প্রাপ্তির নিদর্শনও আমরা অল্পে অল্পে দেখিতে পাইলাম। প্রথমে তিনি মাতাকে সঞ্চিত অর্থের কথা জ্ঞাপন করিলেন, পরে একখানি সুন্দর অট্টালিকা ক্রয় করিলেন। মায়ের নামেই ক্রয় করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একমাত্র পুত্রের দোহাই দিয়া মাতা তাহা নিজের নামে গ্রহণ করিলেন না। মায়ের বুদ্ধি ফিরিয়াছে দেখিয়া পিতাও আনন্দিত হইলেন।

এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমরা সকলেই এখন গোপালের পুনরাগমনের অসম্ভাবিতায় নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এই ছয় বৎসরে পিতা আরও এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা এখন পটলডাঙ্গায় একটি প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় বাস করিতেছি।

গোপাল চলিয়া যাইবার প্রথম বৎসরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করি। দুই বৎসর পরে এল. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বৃত্তি পাইলেও এবারে কিন্তু সেরূপ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। আমার নামের উপরে অনেক লোকের নাম উঠিয়াছিল। লজ্জায় আমি সাধারণ বিভাগ ছাড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে আরম্ভ করি। তখন এখনকার মত শিবপুরে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হইত না ;

এবং এতদিন ধরিয়াও পড়িতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজেই ক্লাস ছিল। সুতরাং কলেজের একঘর ছাড়িয়া অন্যঘরে প্রবেশ করিলাম। তিন বৎসর পরে আবার সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, গবর্ণমেণ্ট হইতে চাকরীর প্রতিশ্রুতি পাইলাম। এই বৎসরেই কলিকাতার সন্নিকটে এক জমীদারের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। এই জন্যই এই ষষ্ঠ বৎসরের কথার উল্লেখ করিতেছি।

এই ছয় বৎসরে কলিকাতা সহরেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সহরের রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল গভীর নালা ছিল, যে গুলাকে দেখিলে নরকের একটা নূতন মূর্ত্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইত না, সে গুলাকে বুজাইয়া তাহাদের স্থানে জলনিকাশের জন্য বড় বড় পাইপ বসিয়াছে, কলের জল হইয়াছে, এবং তেলের আলোর পরিবর্ত্তে রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো হইয়াছে। অনেক রমণীয় উদ্যান, গভীর পুষ্করিণী সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই সকল সাধারণের উপভোগের উদ্যান, এই নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া প্রথম প্রথম যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, বহুদিন দেখিয়া অভ্যস্ত তোমরা এখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটী বাগানের সম্মুখে আমাদের বাড়ী। আমি প্রতি-সন্ধ্যায় দুই একজন সহচর সঙ্গে এইস্থানে আসিয়া বেড়াইতাম। আমা-দিগের পূর্ব্বস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দেশের যে সমস্ত বালক পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে থাকিত, তাহাদের আর কেহই এখন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ চাকরীর জন্য কেহ বা থাকিবার অসুবিধায় অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। পিতা যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতেন, তথাপি তাহাদের কাছে সুখ্যাতি পাইতেন না। সুখ্যাতি দূরে থাক্, সামান্য ত্রুটি হইলেও তাহার নিন্দা করিতে ছাড়িত

না। প্রতিবাসিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেন তাহাদের কাছে ঋণ করিয়াছি, এইভাবে তাহারা সর্ব্বদা আমাদের আতিথেয়তার অপব্যবহার করিত। বিরক্ত হইয়া পিতা এই অযথা সেবাকার্য্য উঠাইয়া দিলেন।

বিশেষতঃ গোপালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই পূর্ব্বনিবাসভূমির সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছি। পাকা সহুরে হইয়াছি। সুতরাং গ্রামস্থ লোকের সমাগম আমাদের আর ভালই লাগিত না। পিতা তৎপরিবর্ত্তে অসমর্থ অথচ বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ছাত্রের জন্য মাসে মাসে কিছু নির্দ্দিষ্ট ব্যয় করিতে লাগিলেন। যোগ্যতার ও দরিদ্রতার সুপারিশ আনিলে, তাহারা ইস্কুলে পড়িবার বেতন প্রাপ্ত হইত। তাহাতে বাহির হইতেই ঝঞ্চাট মিটিয়া যাইত, বিশেষ হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না।

পূর্ব্ব সঙ্গীদিগের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, শুধু শ্যামচাঁদ। সে কখনও আমাদের কাছে সমতার অভিমান রাখিত না। শ্যামচাঁদ একাধারে খানসামা, সরকার, মোসাহেব। নানামূর্ত্তিতে সে আমাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। নানাপ্রকারে সে পিতার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমিও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতাম। পিতা তাহাকে কলেজের লাইব্রেরীতে একটা কাজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহের কাজ করিবার জন্য মাসে মাসে তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ মাহিয়ানার স্বরূপ দান করিতেন। অন্ন, বস্ত্র, জলখাবার সমস্তই আমাদের গৃহ হইতে তাহার প্রাপ্য ছিল। আমি কোথাও যাইলে, প্রায়ই শ্যাম আমার সঙ্গে থাকিত। পিতার সে একরূপ মন্ত্রী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সময়ে সময়ে পিতা তাহার সঙ্গে এমন অনেক পরামর্শ করিতেন, যাহা আমিও পর্য্যন্ত জানিতে পারিতাম না। এক কথায় সে পিতাকে ও সেই সঙ্গে আমাকে মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সেই স্বপ্নের কথাটা মনে পড়িয়া আমাকে কিছু চিন্তিত করিত, কিন্তু তাহাকে দেখিলেই স্বপ্নের

সেই ভীমভাব আমার কাছে অলীক বলিয়া বোধ হইত। শ্যাম হইতে আমার যে কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা আমি অনেক দিন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। অথবা যা ঘটে ঘটুক, শ্যামের সঙ্গ আমাদের অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

বাগানে বেড়াইবার সময় শ্যাম প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকিত। এই নবাগত স্থানে প্রতিবাসী বালকদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। পরিচয় রাখিবারও একটা বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তখনও সহরে আজি কালিকার মত ইংরাজীশিক্ষার এত প্রচলন হয় নাই। তখন অলিগলিতে ইস্কুল ছিল না। আমাদের পাড়ার অনেক যুবকের পাঠশালা হইতে বিদ্যার মীমাংসা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে কথা গুলাকে ইংরাজী কথার মসলা দিয়া গাঁথিতে জানিত না। শুষ্ক হিঁদুয়ানীর সঙ্কীর্ণতায় তাহারা আমাদের স্বাধীন ব্যবহারের ছল ধরিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। সুতরাং পটলডাঙ্গায় আসিয়া প্রতিবাসী যুবকদের সঙ্গে বড় একটা আলাপ পরিচয় রাখি নাই।

যে দুই চারি জন আমার সহচর ছিল, তাহারাও আমার মত শিক্ষিত। তাহারা প্রতিবেশী না হইলেও, পাড়ায় মনোমত সঙ্গীর অভাবে আমার কাছে আসিত। তাহাদেরই সমভিব্যাহারে লইয়া আমি প্রতিসন্ধ্যায় বাগানে ভ্রমণ করিতাম।

একদিন কোনও সঙ্গী ছিল না। পূজার অবকাশে অনেকেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে। চিরসঙ্গী শ্যামও দেশে চলিয়া গিয়াছে। কয়দিন হইতেই সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু উক্তদিবসে অভাবটা বড়ই অসহ্য বোধ হইল।

বাড়ীতেও আমি একাকী। পিতা আমার ভাবী শ্বশুরকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত একটী স্বাস্থ্যকর

স্থানে গমন করিয়াছেন। বিশেষ কারণে সে স্থানের নামোল্লেখ করিলাম না। তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তাঁহার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। পিতার সঙ্গে আমিও সেখানে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু পিতা বাড়ীতে থাকিবার নানা কারণ দেখাইয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন না। নানা দুশ্চিন্তার লক্ষ্য হইবার জন্যই যেন আমি একাকী বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।

মা আমার বড়ই অল্পভাষিণী; সুতরাং বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটা কথা বার্ত্তায় যে, সময়টা অতিবাহিত করিব, তাহারও উপায় রহিল না। বৃদ্ধ চাকর বেচু ছিল, বাল্যকালে গোপাল ও আমাকে সে অনেক গল্প শুনাইত। সে'ও একপ্রকার গোপালের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। আসিবার জন্য পিতা শ্যামকে দিয়া তাহাকে অনেক পত্র দিয়াছিলেন, সে উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।

একটী সহচরের অভাবে হৃদয়টা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই ব্যাকুলতায়, ছয় বৎসর পরে, আমার আশৈশব সহচর, আমার মাতৃ-অঙ্কের প্রবল অংশীদার গোপালের অভাব প্রথম অনুভব করিলাম। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্ত দুর্ব্বল চির নিরীহ বালক, দেবোপম কান্তি লইয়া জীবিতবৎ আমার চোখের উপরে ফুটিয়া উঠিল! মানসচক্ষে কি স্থূলচক্ষে তাহাকে দেখিয়াছি, ভাই সব! আজিও পর্য্যন্ত আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই। স্বপ্ন জাগরণ আজিও পর্য্যন্ত সেই প্রহেলিকাময়ীমূর্ত্তি লইয়া আমার নিকটে দ্বন্দ্ব করিতেছে।

তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কিন্তু একথা মাকেত জানাইতে পারিলাম না! অস্থির হইয়া বাটীর বাহির হইলাম। গাড়ী করিয়া কলিকাতার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিলাম, জ্বালার নিবারণ হইল না। মনকে প্রবোধকথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, মন

দ্বিগুণ অশান্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। অন্যদিন এমনি সময়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতাম; আজ আর করিলাম না। বাগানে চলিয়া গেলাম। বহুলোক তখন বাগানে প্রবেশ করিয়াছে; জনকোলাহলে বাগান পরিপূর্ণ। কিন্তু হায়! নরারণ্য আমার চক্ষে বিজন অরণ্য প্রতীত হইল।

বারকতক এদিক ওদিক ঘুরিয়া আমি একটা বেঞ্চে বসিলাম। কত লোক তাহাতে বসিল, উঠিয়া গেল। আমি যেন অনন্ত অধিকার লইয়া বসিয়াছি।

গোপালের কথা মুহুর্মুহুঃ মনে উঠিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি, গোপালের প্রতি প্রকৃত স্নেহ ত কোন কালেই ছিল না, তাহার উপর এই ছয় বৎসরের অদর্শনে তাহাকে একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছি। তাহার মুখশ্রী মনে জাগাইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয়। সেই গোপালের স্মৃতি যে, আমাকে এতটা ব্যাকুল করিবে, তাহা স্বপ্নেও বুঝিতে পারি নাই।

চিন্তার প্রহারে জর্জরিত হইয়া একবার প্রাণের সহিত বলিয়া উঠিলাম, "গোপাল আজ যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম আমার চক্ষে তোমার মূল্য হইত।"

"এই যে আছি ভাই!" তড়িৎ-প্রেরিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কে কহিল দেখিবার জন্য চারিধারে চাহিলাম, দেখিলাম বাগানের সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে, আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

সেই অন্ধকারেই গোপালের অন্বেষণে একবার বাগানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলাম। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্র আমার কার্য্যের বিফলতায় একটু সস্মিত মুখভঙ্গি দেখাইবার জন্যই যেন আমাদেরই অট্টালিকার অন্তরালে আত্মগোপন-মুখে ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

অতঃপর অন্ধকারে সে স্থানে দুর্বৃত্তেরা আশ্রয় গ্রহণ করিবে বুঝিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

(১৫)

গৃহে মাতা উৎকণ্ঠার সহিত আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিলম্ব দেখিয়া আমার সন্ধানে ভৃত্য পাঠাইতে ছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ না পাইলে, বোধ হয় আমার এত বিলম্বে ব্যাকুল হইতেন। হয়ত একদিন যেমন গোপালের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, আমাকেও সেইরূপ লোকের জানাজানিতে অপ্রস্তুত হইতে হইত।

মা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে কি সত্য উত্তর দিতে পারিতাম? উত্তরের দায় হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া, আমি আহার করিতে বসিলাম। আহারে একটা বিশেষ রুচি ছিল না। যা-তা মুখে দিয়া, সমস্ত আহার্য্যই একরূপ অভুক্ত রাখিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি, গোপীনাথ! খাবার সব পড়িয়া রহিল কেন?"

আমি আর কি উত্তর করিব? বলিলাম—"ক্ষুধা নাই।"

"ক্ষুধা নাই, না রান্না ভাল হয় নাই?"

এইবারে ফাঁপরে পড়িলাম। মা বলিতে লাগিলেন—"যদি রান্না ভাল না হইয়া থাকে ত বল, আমি আবার রাঁধিয়া দিই।"

"তুমি রাঁধিতে থাকিবে, আর আমি ততক্ষণ থালা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিব?"

"কেন, হাত মুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। সময় হইলেই আমি সংবাদ দিব।"

আমি রাঁধুনীর উপর দোষারোপ করিতে যাইতেছি, তিনি বাধা

দিয়া বলিলেন—"আজ রাঁধুনী রাঁধে নাই। আমি নিজ হস্তে সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছি।"

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! কি উত্তর করিব স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্য, রাঁধুনীর নিন্দা করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে মায়েরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছিলাম! অথচ অমৃতের আস্বাদ প্রতি পরমাণুতে লুকাইয়া সুরচিত ব্যঞ্জনাদি পাত্রে পড়িয়া আমার রসনাস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে। গোপালের এক মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মস্তিষ্ককে এমন আলোড়িত করিয়াছে যে, এমন অমৃতের স্বাদ আমি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি!

মা বলিতে লাগিলেন—"তোরা ত আর ব্রাহ্মণের আচার কিছুই রাখিস্ নাই। আচমন, গণ্ডূষ কিছুই করিস্ না। তখন তোর উঠিয়া যাইতে দোষ কি?"

এই স্থলে বলিয়া রাখি, মা গোপালকে "তুই" বলিতেন। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার প্রতি 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। আজ অযোগ্য বয়সে, সংসার-প্রবেশ-মুখে মায়ের এই প্রীতির সম্ভাষণ শুনিয়া প্রাণটা কেমন গলিয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়টা দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে, আমি চক্ষুর নিষেক অবরুদ্ধ করিতে পারিলাম না। পাছে মা দেখিতে পান, এই জন্য মাথাটা অবনত করিলাম। বুঝিলাম গোপালের প্রাপ্য সম্পত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আজ মায়ের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি।

মায়ের হৃদয় আজ আমার কাছে বুঝি প্রথম উন্মুক্ত হইতেছে! নহিলে, তাঁহার প্রতিশব্দঝঙ্কারে আমি এত অস্থির হইতেছি কেন? আঘাতে আঘাতে আজ কি হৃদয়টা চূর্ণ হইয়া যাইবে!

মা আবার কহিতে আরম্ভ করিলেন—"গোপীনাথ! তোদের অনেক

দিন রাঁধিয়া খাওয়াই নাই।” বলিয়াই মাতা ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন। ছয় বৎসর পরে এক ক্ষুদ্র পলের অসতর্কতায় জননী এক পুত্রকে বহু করিয়া, গোপালের প্রতি অগাধ স্নেহের নিরুদ্ধ উৎসের চিত্র আমার চোখের উপর তুলিয়া ধরিলেন। মাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এই স্নেহের নিবদ্ধ ধারায় ছয় বৎসরের প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয়টাকে নিষ্পীড়িত করিয়া, মা অম্লানবদনে আমাদের সেবা করিয়াছেন। অযোগ্যই হই, নরাধমই হই, এমন দেবীর মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষমই হই, তাঁহার গর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম বলিয়া, আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মা বলিলেন—“তাই আজ স্বহস্তে পাক করিয়া তোমাকে আহার করাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল।”

মাকে আর আমি আত্মগোপনে অপরাধিনী দেখিতে ইচ্ছা করিলাম না। মাথা তুলিয়া বলিলাম, “মা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?”

“কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, বল।”

“তোমার কাছে মিথ্যা কহিব কেন? আমি তোমার প্রস্তুত এ আহার্য্যের কোনটাই স্পর্শ করি নাই।”

“যথার্থই কি তোমার ক্ষুধা নাই?”

“ক্ষুধা আছে, কি না আছে, তাও বলিতে পারি না। বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই।”

“একি কথা! আমিত বুঝিতে পারিতেছি না!”

“তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমি তোমাকে কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি বলিয়া এতক্ষণ বসিয়া আছি।”

মা যেন কি কহিতে যাইয়া নীরব হইলেন। একটী দীর্ঘশ্বাস তাঁহার

কথাবরোধের পরিচয় দিয়া আমাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিতে যেন আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। মন্দবুদ্ধি আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "বলি ?"

মা বলিলেন—"বল।"

আমি অতি সভয়ে, অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপাল কি আজ এখানে আসিয়াছিল ?"

"কই আমি ত দেখি নাই !" কি কষ্টে, কি বিষম স্বরভঙ্গে মায়ের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বাহির হইয়াছিল, প্রিয় পাঠক! তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদের আমি বুঝাইতে পারিলাম না। প্রসভো-ন্মুক্ত, অর্দ্ধযুগ ধরিয়া অবরুদ্ধ শোকাবেগ প্রতি অক্ষরে যেন যাতনাগ্রন্থি গাঁথিয়া বহ্নিশিখার সমষ্টিরূপে মায়ের হৃদয় হইতে অবকাশে অবকাশে বহির্গত হইতে লাগিল। মায়ের সে মধুরকণ্ঠ! মনে হইল কে যেন নির্দ্দয় হস্তে আকুল বংশীর মুখ আবদ্ধ করিতেছে!

কহিতে কহিতে মাতা সংজ্ঞা হারাইলেন। বাতাহতের ন্যায় এই নিষ্ঠুর সন্তানের প্রশ্নাভিঘাতে তিনি ভূপতিতা হইলেন।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া মায়ের মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিলাম; মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। মা মা বলিয়া অনেক ডাকিলাম, মা উত্তর দিলেন না। ক্রমে ব্যাপার দাসদাসীর গোচর হইল, বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

আমাদের চেষ্টায় মাতার যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না, তখন বাস্তবিক বিপন্ন হইলাম। পিতা গৃহে নাই, রাত্রিতে তাঁহার কাছে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় নাই। কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, মাকে উঠাইয়া তাঁহার নিজের কক্ষে শয়ন করাইলাম, এবং নিজেই ডাক্তার আনিতে ছুটিলাম।

দাসদাসীদিগকে মায়ের এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ বলিতে

সাহসী হই নাই। কিন্তু ডাক্তারকে রোগের কারণ না বলিলে ত চলিবে না। তাঁহাকে আনিতে, পথে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার আন্তরিক অবস্থাও সেই সঙ্গে তাঁহার কাছে বিবৃত করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া, রোগীকে না দেখিয়াই পথ হইতে তিনি আমাকে রোগমুক্তির আশ্বাস দিলেন। বলিলেন—"তোমার প্রশ্নই যদি তাঁহার মূর্চ্ছার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইতে বিলম্ব হইবে না।"

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, মায়ের অবস্থার সামান্যমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া ডাক্তারের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"ডাক্তার মহাশয়! যে কোন উপায়ে মাকে আমার রক্ষা করুন; আমাকে মাতৃহত্যার পাতক হইতে উদ্ধার করুন।"

ডাক্তার বাবু রোগ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুই একটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

"আর কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল কি?"

উত্তর করিলাম—"না।"

"শিরঃপীড়া হইয়াছিল কি?"

"বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে, এমন শিরঃপীড়া কখনও হয় নাই। মা চিরসুস্থ, কচিৎ জ্বর হইতে দেখিয়াছি।"

"ইদানীং অধিক পরিশ্রম করিতেন কি?"

"পরিশ্রম আগে করিয়াছেন। বুঝিতেই ত পারিতেছেন, আগে দাসদাসী কিছুই ছিল না। দেশে একা মাকে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এখন ত একরূপ পরিশ্রম নাই বলিলেই চলে।"

"গোপাল কতদিন গিয়াছে?"

"ছয় বৎসর।"

"তাঁহার জন্য ইনি কি কখন কখন অত্যন্ত রোদন করিতেন?"

"নির্জ্জনে কখনও করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। আমরা কেহই কিন্তু কখন মাকে গোপালের জন্য শোক করিতে দেখি নাই। শোক দূরের কথা, একদিনের জন্য মুখে মালিন্য পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।"

পরীক্ষা শেষে ডাক্তার বাবু কিয়ৎক্ষণ নিষ্পন্দের মত বসিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম দেখিলেন?"

দাসদাসী রাঁধুনী সকলে ডাক্তার বাবুর উত্তর শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইল। তিনি তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া আমাকে ইংরাজীতে বলিলেন, "রোগ কঠিন। ইহাকে য়্যাপোপ্লেক্‌সি বলে। অতি উল্লাসে, অতি অবসাদে, শোকে, রক্তস্রোত সহসা মস্তিষ্কের দিকে বেগে প্রবাহিত হইতে যদি শিরাপথ কোনক্রমে রুদ্ধ অথবা ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা দুই একজন বাঁচে, পুস্তকে পাঠ করিয়াছি।"

আমি শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রী যেন শিথিল হইয়া গেল। গৃহে যাহারা ছিল, তাহারা আমার ভাব দেখিয়া, আমার সঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু আমাকে নিরস্ত হইতে, ও সেই সঙ্গে সকলকে নিরস্ত করিতে বলিলেন। আমার ইঙ্গিতে সকলে চুপ করিল।

আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম—"তবে কি সত্য সত্যই মাকে হত্যা করিলাম!" কলিকাতায় আসা অবধি তিনিই আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। আমি ও গোপাল উভয়েই তাঁহার কাছে অনেকবার চিকিৎসিত হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে স্নেহের সহিত সম্বোধন

করিতেন। মা তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। গোপালের সামান্য অসুখে তিনি যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত ডাক্তার বাবুকে প্রশ্ন করিতেন, তাহাতে গোপালের প্রতি মাতার স্নেহের গভীরতা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

আমার শেষোক্ত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আমাকে একটু তীব্রতার সহিত বলিলেন—"শুধু তুমি কেন গোপীনাথ! তোমরা পিতাপুত্রে উভয়ে নৃশংসের ন্যায় এই সাধ্বী করুণাময়ীকে হত্যা করিলে।"

আমি তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিলাম। আর বলিলাম—"ব্যয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না। মাকে জীবনে ফিরাইবার যে কোন উপায় থাকে, আপনি তাহার বিধান করুন।"

"ব্যয়ে যদি কার্য্য সফল হইত, তাহা হইলে তোমাকে এত কথা কহিতাম না। আমি এই বয়স পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপ পঁচিশটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। কিন্তু একটী ভিন্ন আর কাহাকেও বাঁচিতে দেখি নাই।"

বড়ই আশান্বিত হইয়া বলিলাম—"তবেত বাঁচে!"

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"বাঁচে, কিন্তু ডাক্তার-দত্ত ঔষধে নয়—ভগবদ্দত্ত শক্তিতে। সে রোগীরও তোমার মায়ের ন্যায় অবস্থা হইয়াছিল। তিনিও রমণী। তাঁহার একমাত্র পুত্র উন্মাদরোগে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। রুদ্ধ শোকাবেগে তোমার মায়েরই ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া তিনি রোগাক্রান্ত হন। আমরা বহুচিকিৎসকে হতাশ হইয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। এমন সময়ে সেই নিরুদ্দিষ্ট উন্মত্ত সন্তান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে উন্মাদের আবেগে মা বলিয়া ডাকিল। বিস্ময়ের কথা তোমাকে কি বলিব! সেই 'মা' শব্দ শুনিবামাত্র মুমূর্ষু রোগী নিদ্রোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন।

গোপীনাথ! তোমার জননীর রোগের ঔষধ তোমরা ভিন্ন চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাক্তার বাবু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোনও ঔষধ দিলেন না।

আমিও সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সেই রাত্রেই গোপালকে আনিতে দরোয়ান পাঠাইলাম। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ দিলাম। আর বলিলাম—"যত অর্থই ব্যয় হউক, পাল্কী করিয়া যত শীঘ্র পারিবে গোপালকে দেশ হইতে লইয়া আসিবে।" শ্যামকেও সংবাদ দিতে বলিলাম। দরোয়ান সে দেশে কখনও যায় নাই। সুতরাং তাহার হাতে আমাদের গ্রামের ঠিকানা লিখিয়া ও তৎসম্বন্ধে গোপালের নামে একখানা পত্র দিয়া বিদায় করিলাম।

(ক্রমশঃ)

যমালয়ের পত্রাবলী।

২য় পত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পৃথিবীতে যাহাকে মহাপাতকী বলে, আমি ঠিক তাহা ছিলাম না। পার্থিব জীবনে আমি ঘোর স্বার্থপর ছিলাম, কিন্তু পরের দুঃখে ও কষ্টে আমার যে একেবারে কোনও সহানুভূতি ছিল না, তাহা নয়। মন বাসনার পরিতৃপ্তির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলেও, আমার মাঝে মাঝে তাহাতে উচ্চভাব আসিত; ধী-শক্তির উজ্জ্বল আলোকে ক্রীড়া করিবার সাধ ছিল। প্রতিভাক্ষেত্রের তীব্র আনন্দের আস্বাদও অনুভব করিয়া আসিয়াছি। মানবচক্ষে আমার প্রকৃতি বেশ সৎ ছিল, এবং যেখানে আপনার কোনও রূপ ক্ষতি না করিয়া পরের উপকার সম্ভব হইত, আমি অপরের উপকার

করিতাম। তবে জগৎ-সেবাব্রত গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ আমার মনে, কে জানে কেন, একপ্রকার আভিজাতিক অহঙ্কার বদ্ধমূল হইয়া ছিল;—আমার মনে হইত, আমি যেন সকলের পূজা ও সেবা পাইতে জন্মিয়াছি। পরকাল ও ভগবানে অবিশ্বাসী আমি, ভোগ-লালসা চরিতার্থতাই জীবনের সার করিয়াছিলাম। আমার যে কখনও ভগবানে বা পরকালে বিশ্বাস ছিল না, তাহা নয়। সুদূর অতীতে, অতি শৈশবে, আমার ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ভগবানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয় প্রেমপূর্ণ হইত, কিন্তু যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সব বিশ্বাস ও প্রেমের অন্ত হইল। নিদাঘের উত্তপ্ত কিরণজালে শ্যামল দূর্ব্বাদলে প্রফুল্ল শিশির কণার অবসান মত যৌবনের প্রখর কামনার সুউষ্ণ ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের কোমল ভাববিন্দু সকল সব শুকাইয়া গেল। আর একবার অনেক পরে, আমি আমার সেই বিশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়াছিলাম; কিন্তু এবার তাহা সেই শৈশবের মত প্রাণময় ও কমনীয় নহে। দিবসে রবিকর-ভাসিত গগনকোলে নিষ্প্রভ শশিকলার মত প্রাণহীন।

সারা জীবন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি। বিলাসীর বিবিধ প্রমোদে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়াছিলাম। নিত্য নূতন উত্তেজনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে আমার জীবন-তরণী ভাসিয়া যাইত। সে সমস্ত তীব্র উৎকট কার্য্যকলাপের আর অধিক কি পরিচয় দিব।

জীবদ্দশায় হৃদয়মাঝারে কি অগ্নিই জ্বালিয়া ছিলাম! তখন বুঝি নাই তাহা ভবিষ্যতে এত যাতনা দিবে। এই জ্বালাময়ী তুষানলে সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছি, অথচ সে অনলেরও অন্তনাই, দেহেরও অবসান নাই। জীবিত-দাহন শুনিলেই, তোমরা পৃথিবীর লোক, তোমাদিগের প্রাণ-শিহরিয়া উঠে। কিন্তু, আমার এ যাতনার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। ভস্মীভূত

হইলেই তোমাদিগের জ্বালার শেষ। আমার যাতনার শেষ নাই, ক্রম নাই, তাহার শেষ হইবার আশাও নাই, উদ্ধারের আশাও নাই।

এখনও আমার সব যাতনার কথা বলা হয় নাই। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এই সমস্ত এখানকার সকলের সাধারণ সম্পত্তি। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত সকলের আবার বিশেষ বিশেষ যাতনা রাশি আছে। নরকে প্রবেশ করিয়াই, আমি একটা ঐরূপ যন্ত্রণার তীব্র দংশনের জ্বালা সহ্য করিয়া আসিতেছি। পার্থিব জীবনের একটা অতি সামান্য ঘটনা,—তাহারই পরিণাম এই তীব্র যাতনা ভোগ!

আমার বয়ঃক্রম তখন সপ্তবিংশতি বৎসর। প্রবাসে কোনও প্রকারে রজনী-যাপনার্থে, আমি সন্ধ্যাকালে শূন্য হৃদয়ে, এক ক্ষুদ্র পান্থাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। এক বর্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছে, আমরা তিনটি প্রাণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া দুর্গম পশুপতিনাথ হইতে আমরা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। গৃহ হইতে তিনজনে যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন ফিরিতেছি দুইজনে। আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, শত বাসনার রাণীকে নির্জন পর্ব্বত কন্দরে ফেলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই পান্থাশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভীষণ মনস্তাপে ভগ্নহৃদয়, উদ্দাম বাসনা-বেগের প্রতিরুদ্ধ গতিতে বিকলিতচিত্ত, স্নেহহীন, সংসারে মমতাহীন আমি, একমরুময় প্রাণ লইয়া সেই আশ্রয়ে প্রবেশ করিলাম।

মানবজীবনে অনেক অভাবনীয় ঘটনা আসে। আমি মাসাধিক কাল এইরূপে জগতে বীতরাগ হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, প্রকৃতি দেবীর যেন তাহা আর সহ্য হইল না। তাই যেন আবার আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে, আমার নির্ম্মম তুষার কঠিন হৃদয়কে আবার গলাইতে তিনি আমাকে এইখানে আনিয়া ফেলিলেন। আমি কি দেখিলাম! ছিন্ন, অতি মলিন বসনে আবৃত-দেহ পিতৃমাতৃহীন এক দশমবর্ষীয় সুন্দর বালক। তাহার জননী অতি রূপ-

বতী। নাম নির্ম্মলা, আমার স্বজাতীয়া। নির্ম্মলা একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াই সেই বৎসরে বিধবা হয়। ছয় বৎসর হইল সে অনকতক দূরাত্মীয়ের সহিত তীর্থ যাত্রায় বাহির হয়। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া মাসাধিক হইল এক রজনীতে আমারই মত তাহারা এই পান্থাবাসে আশ্রয় লয়। পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বালক দেখিল যে, সংসার ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ অসহায়। তাহার সহযাত্রীরা কেহই নাই; তাহার একাধারে পিতা, মাতা পার্থিব দেবীর লাবণ্যময়ী দেহলতা নিকটস্থ জলাশয়ের ধারে পড়িয়া আছে। সেই অবধি কপর্দ্দকশূন্য আত্মীয় বিহীন এই শিশু এই আশ্রমে বাস করিতেছে। যাত্রীদিগের অনুগ্রহে কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতেছে। তাহাদিগের আদি বাসস্থান কোথায়, এবং বালকের পিতারই বা কি নাম ইত্যাদিরূপ তাহার আর কোন পরিচয় আমি পাই নাই।

সেই অসহায়, সংসার পরিত্যক্ত বালক, আমার নেত্রপথে পতিত হইবা মাত্র, তাহার বিশাল ভাসমান কমল-নয়ন দুটিকে আমার পানে স্থির করিয়া, আবার চকিত ভাবে ফিরাইয়া লইল। তাহাতে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হরিণের উদাস ও শঙ্কিত বন্য শশকের ব্রীড়া, এই দুইভাব একত্রে যুগপৎ মিশাইয়া গেল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অব্যক্ত মোহন ভাবে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

আমাদিগের দুইজনার মধ্যে একটা প্রকৃতি ও অবস্থাগত একতা ছিল। সে সমস্ত প্রাণটুকু দিয়া, অতি অনুরাগ সহকারে ভালবাসিয়া আসিয়াছে—আমিও তাহাই। যাঁহাকে সে ভালবাসিত তাঁহার বিয়োগে সে এখন উদ্‌ভ্রান্ত,—আমিও তদ্রূপ। কেবল কি তাই? তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্বও আমাকে অল্প মুগ্ধ করে নাই। তাহার মহতী উগ্রতা, গর্ব্ব, এমন কি তাহার অশাসনীয় অশিষ্টতা যেন আমারই অন্তরের অনুরূপ। তাহার ভাব যেন আমার নিদ্রিত অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া দিল। আমার বোধ হইল

যেন আমি ব্যতিরেকে আর কেহই তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিবে না। আমিও যগুপি তাহার বয়সের, তাহার অবস্থায় পড়িতাম, তাহা হইলে আমিও তদ্ভাবান্বিত হইতাম।

তাহার ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যও আমায় অল্প মুগ্ধ করে নাই। তাহার অতি মলিন চীরখণ্ড যেন তাহার রূপকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সেই কৃষ্ণ ভ্রমরশোভিত নীললোহিতাভ লোচনযুগ্মের স্থিরচপল দৃষ্টি, কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশদামের অতি সুন্দর কপোল—ও ললাটের চারিভিতে—কম্পিত-শোভ আমার হৃদয় একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার নাম রাখিলাম বনবিহারী। বনবিহারীর কোন আত্মীয় না থাকায়, আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিলাম। তিনজনে যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, আবার তিনজনে ফিরিলাম,—কিন্তু কি পরিবর্ত্তন !

বনবিহারীর আত্মীয়ের কোনও সন্ধান পাইলাম না। তাহার গলদেশে একটী সুবর্ণ কবচ ছিল ইহাই তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র নিদর্শন। একদিন দেখি সেই কবচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং তাহার মধ্য হইতে চিত্রাঙ্কিত কাগজ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমি কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া দেখি যে, তাহাতে এক রাজহংসের চিত্র এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কত কি সাঙ্কেতিক লেখা রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, নিশ্চয়ই এই সাঙ্কেতিক লেখার মধ্যেই বনবিহারীর পরিচয় প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। আমি কাগজখানি অতি যত্নে তুলিয়া রাখিলাম।

বনবিহারী আমার যত্নে ক্রমে সবল সুন্দর যুবকে পরিণত হইল। সে কখনই আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিত না। আমিও বালক সাজিয়া তাহার খেলার সাথী হইতাম। একস্থানে ভ্রমণ, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও আহার। সকলে ভাবিল, আমি তাহাকে পোষ্যপুত্র করিব, এবং

আমার অবর্ত্তমানে আমার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইবে সেই অজ্ঞাত কুলশীল বনসংগৃহীত ভিখারী বনবিহারী।

আমি তাহার অন্তরে কতকটা আমারই প্রকৃতির যেন প্রতিরূপ দেখিয়াছিলাম, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই তাহার সুপ্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে জাগাইতে এত আমার স্ফূর্ত্তি হইত। তাহার রাগদ্বেষাদি লইয়াই আমার সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়া ছিল। কখনও কোন একটী বৃত্তিকে উত্তেজিত করাইয়া আবার হয় ত তাহাকে সহসা সংযত করাইতাম। কখন বা সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর আমার আত্মতৃপ্তির জন্য তাহাকে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ নিষ্ঠুরভাবে অযথা অত্যন্ত বিরক্ত করিতাম। তাহাতে তাহার অদমনীয় অমর্ষ জাগিয়া উঠিত। তাহার পর নানারূপ ভীতি প্রদর্শনেও যখন তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতাম না, তখন আপনার আত্মম্ভরিতাকে অক্ষুন্ন রাখিতে, আমি তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তাহার গলদেশে আমার পদতল রাখিতাম। আমার চরণস্পর্শে তাহার ভাবের সহসা পরিবর্ত্তন হইত। সে তখন অতি দীনভাবে আমার জানুবেষ্টন পূর্ব্বক সকরুণ কণ্ঠে আমার ক্ষমা ভিক্ষা করিত। তাহার ছল্‌ছল্‌ সজল নয়নদ্বয় যেন মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিত, "জগতে তোমার মত কে আর আমার আত্মীয় আছে? কে বা তোমার মত এত ভাল বাসিতে পারে।" তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, আমি তাহার প্রতি কি নিষ্ঠুর আচরণ করিতাম। বস্তুতঃ কিন্তু, তাহা নয়। তাহাকে যেরূপ ভালবাসিতাম, সেরূপ আমি অতি অল্পসংখ্যক নরনারীকে জীবনে ভাল বাসিয়াছি। আমার মত অতি ঘোর স্বার্থপর আত্মতৃপ্তির জন্য ভালবাসার সামগ্রীর সহিত যেরূপ অলস ক্রীড়া করে, আমার এগুলি তদন্তর্গত।

মানববৃত্তিতে দুইটা ভাবের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়; কতকগুলা দৈবভাব, কতকগুলা আসুরিক ভাব। আমি তাহার দেবভাব জাগাইতে

কখনও কোন চেষ্টা করি নাই। আমার কর্ষণে তাহার আসুরিক প্রকৃতিই সমধিক শক্তিশালিনী হইয়াছিল। তাহার ফলও শীঘ্র ফলিল।

আমাদিগের গৃহের অনতিদূরে কোথা হইতে এক ভুবনমোহিনী রমণী আসিয়া বাস করিতে লাগিল। আমি তাহার অসাধারণ রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হইলাম না। এরূপ অপমান আমি জীবনে কখনও সহ্য করি নাই। আমি মনভুলান বিদ্যায় এত পারদর্শী ছিলাম যে, আমার একটা অভিমান জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সকল রমণীই আমার করায়ত্ব। আমার এই প্রত্যাখ্যানের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় যুগপৎ উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম। আমি দেখি রমণী বনবিহারীতে আসক্ত।

আমি বনবিহারীকে ডাকিলাম। সে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া, আমার সম্মুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল।

আমি বলিলাম "দুর্বৃত্ত, আমি সমস্তই জানিয়াছি, তুমি আমার ঘর হইতে দূর হও। তোমার স্থান কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে হইতে পারে না।"

আমার এই কর্কশ বচন শুনিয়াই, "সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল।" সে নির্ভীকভাবে আমার বদনের উপর তাহার জ্যোতির্ম্ময় আয়তলোচন স্থির রাখিয়া অল্প শ্লেষের সহিত বলিতে লাগিল,—

"বেশ, তাহাই হবে। আত্মীয়-বিহীন, সংসার-পরিত্যক্ত যুবাকে এ আদেশ কি অধিক ভীতি উৎপাদন করিবে? আমি বনে বনেই বিহার করিতাম। আপনিও সেই অবস্থায় আমায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন বলিয়াই আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন, "বনবিহারী।" আমি না হয় আবার বনে বনে বিচরণ করিব। না আমি তা পারিব না! আমার

এই নিকৃষ্ট আসুরিক বৃত্তি লইয়া প্রকৃতি সুন্দরীর শান্তিভঙ্গ করিতে যাইব না। সে স্থান অতি পবিত্র তীর্থের পথে; কি জানি যদ্যপি করিতে অন্তর-অসুরের উত্তেজনায় কোন সরল নর-নারীর সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলি। আমি সমাজচ্যুত মানবের সাধারণ ধর্ম্মভাবরহিত নিকৃষ্ট পথাবলম্বীদিগের সহিত মিশিব, তাহাদিগের মত আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কিন্তু বিদায়ের কালে বলিয়া যাই, পিতা (হয়ত পিতা বলিয়া এই আমার শেষ সম্বোধন) পরে আমার জন্য কাঁদিবেন, আমাকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য অনেক অন্বেষণ করিবেন।"

বস্তুতঃ বনবিহারী যাইবার কালে ঠিক কথাই বলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার জন্য অনেক দিন কাঁদিয়াছি। তাহার উদ্দেশে গৃহছাদে অনেক দিন বসিয়াছি, বৃথা আশায়—সে আবার ফিরিয়া আসিবে আমায় 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিবে। আমি তাহার অনুসন্ধানও অনেক করাইয়াছি। বনবিহারী আর ফিরিল না। যে কার্য্যের জন্য সে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহাতে তাহারই বা সম্পূর্ণ দোষ কই? কে প্রকৃতি-সুন্দর সরল বালককে, প্রকৃতির সরলতাময় বক্ষ হইতে কুটিল সংসার ক্ষেত্রে আনিয়াছিল? সে আমি। কে তাহার উচ্চভাবগুলিকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিল? সে আমি। কে তাহার আসুরিক প্রকৃতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার উগ্র ভাবগুলিকে পোষণ করিয়া ছিল? সে আমি। আমিই নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ঐ সমস্ত দানবীয় ভাব সকলকে জাগরিত করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া আসিয়াছি। আমিই স্নেহের ও দয়ার আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া আত্মতৃপ্তি-সাধন করিয়া আসিয়াছি। আমিই তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি।

আমার শেষপীড়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি যখন রুগ্ন শয্যায়, তখন বনবিহারীর পত্র পাইলাম। সে অতিশয় বিনীতভাবে আমাকে একখানি

ভক্তিপূর্ণ পত্র দিয়াছে। সে লিখিয়াছে, শীঘ্রই সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। মহাশক্তির কৃপায় তাহার উচ্চভাব ফুটিয়াছে। সে আত্ম-পরিচয় পাইয়াছে। সে লিখিয়াছে, সেকথা জানিলে আর আমাদিগের উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য তাহা আর থাকিতে পারে না। সেই পত্রে আবার এক স্ত্রীলোকের কথারও উল্লেখ আছে! সে কে? তাহার সহিত আমার বা বনবিহারীর কি সম্বন্ধ তাহা লেখা নাই। পত্রখানা যেন সন্দেহার্থক, অথচ আমার মনে হইল যে, এই বাহ্য অসংলগ্নতার অন্তরে যেন মহান সত্য ও রহস্য নিহিত আছে।

আমি রোগশয্যায়। পত্রের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। বন-বিহারী কে? সেই রমণীই বা কে? তাহাদিগের সহিত আমার কি কোনও সম্বন্ধ আছে? বনবিহারী কি জানিয়াছে, যাহাতে তাহার স্বভাব ও আমার প্রতি ব্যবহার এত পরিবর্ত্তিত হইল! এই সমস্ত রহস্য কে আমায় ভাঙ্গিয়া দিবে? এই সমস্ত চিন্তা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে উদ্বেলিত করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর ছায়ার মত এই সমস্ত চিন্তা এখানে আসিয়াও আমাকে অস্থির করিতেছে। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আমার হৃদয়কে পুড়াইতেছে! কেবল কি ঐ সমস্ত চিন্তা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে? আমার মনে হইতেছে, আমার জন্যই বনবিহারী কত না যাতনা ভোগ করিয়াছে। আমিই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। আমিই তাহার অসৎপ্রকৃতি জাগাইয়াছিলাম। আমিই আত্ম-অহঙ্কারের পুষ্টির জন্য এক প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ অধীনকে আশ্রয়চ্যুত করিয়াছি। এই সমস্ত চিন্তা নরকের নরক।

২য় পত্র সমাপ্ত।

ক্রমশঃ

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক রহস্য"—সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার কাগজে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধীয় বর্ণনা যেরূপ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্ভূত কয়েকটী সত্য ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেছি। ভরসা করি আপনার পত্রিকার উপযোগী হইবে। ইতি

ভবদীয়
শ্রীনীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ।
"সাধু সংবাদ"—সম্পাদক।
৭নং বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, হাওড়া।
২।৯।০৯

অদৃশ্য-সহায়।

(কয়েকটী ঘটনা)।

অনেক সময়ই আমরা এরূপ আশ্চর্য্যরূপে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাই অথবা আরব্ধ কার্য্যে সাফল্য লাভ করি যে, তাহা কোনও শরীরী জীবের দ্বারা কৃত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকাংশ স্থলেই আমরা এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করি না, অথবা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রসূত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই; কিন্তু একটু স্থির হইয়া এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সহজেই অবধারণ করিতে সক্ষম হই যে, নিশ্চয়ই কোনও অমানুষিক সাহায্য দ্বারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার অথবা কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি।

আমার মনে পড়ে যখন আমরা প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে

অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় গণিতের প্রশ্নপত্রে জ্যামিতির অনুশীলনী সম্বন্ধে এক অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, আমি অপর সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া বারংবার ভাবিতেছি কিরূপে অনুশীলনীটীরও সমাধান হয়; এরূপ সময়ে হঠাৎ চকিতের ন্যায় কি যেন আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মনে এক প্রণালীর বিষয় উদয় হইল এবং সেই প্রণালী মত কষিয়া অনুশীলনীটীর সমাধান করিলাম। উত্তরের খাতা দেখিয়া পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কিরূপে এ দুরূহ অনুশীলনীর এত সুন্দর সহজ সমাধান করিলে। তখন সাহস করিয়া কোন উত্তর দিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি কোন অশরীরী মহাত্মার সাহায্যে সে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য আমাদের শ্রেণীতে তখন আমার অপেক্ষা অধিক গণিতজ্ঞ একটী মধ্য ইংরাজী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল এবং সেই গণিতে প্রায় প্রথম হইত; এবারে কিন্তু সে এইটী কষিতে পারে নাই। এবং আমিই প্রথম হইয়াছিলাম।

আমার জীবনের আর একটী ঘটনা বলিব। উহা আজ হইতে দশ বার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর নিকটে একটী বাগান বাড়ী ছিল। বাগানটী পার্শ্বস্থ রাস্তা অপেক্ষা ৪।৫ হস্ত উচ্চ ছিল। বাগান ও রাস্তার মধ্যে একটী ইষ্টকের প্রাচীর ছিল। প্রাচীরটীর উচ্চতা বাগানের ভিতর হইতে ২।৩ হাত, কিন্তু রাস্তা হইতে ৭।৮ হাত। একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে সেই বাগানে হাডুডুডু খেলা হইতেছে। আমি এবং আমার দুই একটী সঙ্গী প্রাচীরের উপর উবু হইয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছি। হঠাৎ দুইজন খেলুড়ে হুটোপাটি করিতে করিতে আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া ছিলাম। যেই তাহারা আমার উপর আসিয়া পড়িল আমি অমনি মাথা নীচের দিকে, পা আকাশের

দিকে এইরূপ ভাবে প্রাচীর হইতে ৭।৮ হাত নিম্নে রাস্তার উপর পড়িয়া গেলাম। পড়িবার সময় আমার মনে এরূপ অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় ও আনন্দ মিশ্রিত রসের উদয় হইয়াছিল যে, সেরূপ ভাব জীবনে কখনও হয় নাই ও হইবে কি না সন্দেহ। অতদূর হইতে ওরূপ অসতর্ক অবস্থায় পড়িয়া যাইলাম, বিশেষ আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় আমার দেহে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই বলিলেই হয়—সামান্য ২।১টা আঁচড় যাহা লাগিয়াছিল তাহা ২।১ জন উপস্থিত বন্ধু ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন অশরীরী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাকে এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, শিশুদিগের বিপদে মা ষষ্ঠী রক্ষা করেন। এ প্রবাদটীর সত্যতা আমার শিশু পুত্রটীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। ৫।৬ মাসের শিশু ২,২॥ হাত উচ্চ খাট হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু কিছুই আঘাত লাগিল না। ২,২॥ বৎসর বয়স, ছুটাছুটী করিতেছে—ধড়াস্ করিয়া কপাট পার হইতে গিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল—মনে হইল যেন বুকটা অথবা মাথাটা গুঁড়া হইয়া গেল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পর মুহূর্ত্তেই দেখি শিশু পুনরায় ছুটিতেছে, তাহার দেহে যেন কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। আবার উঁচু র'কের ধারে ধারে ছুটিতেছে, ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট লাগিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, বোধ হইল যেন উঠানের উপর পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যাইবে, ও মা! সজোরে রকের ধার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে মাথা ঝুলিতেছে, কিন্তু উঠানে পড়ে নাই। এ সকল ক্ষেত্রে অদৃশ্য সহায়তা ব্যতীত এরূপ হঠাৎ দুর্ঘটনা হইতে আর কিরূপে পরিত্রাণ পায় বুঝিব?

এইবার বিশেষ আত্মীয়ের নিকট শ্রুত অত্যন্ত আশ্চর্য্য কিন্তু প্রকৃত দুইটী ঘটনার বিষয় বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথমোক্ত ঘটনা

আজ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ত্রি—বাবু তখন—স্থানীয় সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। দীর্ঘ অবকাশের পর তিনি বাড়ী হইতে সপরিবারে চাকরির স্থানে চাকরিতে যোগ দিতে যাইতেছিলেন। অধিকাংশ পথই রেল গাড়ীতে করিয়া আসিতে হয়। ত্রি—বাবুর সঙ্গে স্ত্রী, একটী ২ বৎসরের শিশু পুত্র ও একটী খোট্টা চাকর। একখানি কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া আসিতেছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন সময় হঠাৎ শিশু পুত্রটী গাড়ির দরজা যেই ঠেলিয়াছে অমনি উহা খুলিয়া গেল, এবং সেও ধুপ করিয়া গাড়ি হইতে পড়িয়া গেল। ত্রি—বাবুর স্ত্রী ইহা দেখিতে পাইয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন গাড়ি থামাইবার যন্ত্রাদি ছিল না। কাজেই ত্রি—বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেও গাড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। হতভাগ্য স্ত্রীলোক আর কি করে, সমস্ত পথ মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া যেই পরের ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছিল অমনি সকল বৃত্তান্ত চাকরকে দিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইল। ধন্য ইংরাজের কার্য্য কুশলতা! তখনই পাইলট এঞ্জিন বাহির হইল। সম্মুখে ধূ ধূ করিয়া মশাল জ্বলিতে লাগিল। চালক ও সঙ্গে ৪ জন বলবান লোক গেল। বাঁশি দিতে দিতে মৃদুমন্দ গতিতে এঞ্জিন যায়, কাহাকেও আর দেখিতে পায় না। বহুদূর যাইবার পর তবে ত্রি—বাবুকে দেখিতে পাওয়া গেল। তিনি হারানিধি কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, ছেলেকে একটী আঁচড়ও লাগে নাই। অতঃপর মহা আহ্লাদের সহিত উহাদিগকে আনা হইল। মর্ম্মাহতা স্ত্রী স্বামী পুত্রকে পাইয়া উল্লসিত হইল। এইবার ত্রি—বাবুর কথায় তাঁহার পতনকাল হইতে উদ্ধারকাল পর্য্যন্ত কি অবস্থায় ছিলেন তাহাই বলিতেছি। "আমি পড়িয়াই ত চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে কতদূরে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। আন্দাজ দশ মিনিট পরে তবে একটু জ্ঞান

হইল, বোধ হইল যেন গায়ে হাতে অত্যন্ত ব্যথা। সে যাহা হউক শিশু-পুত্রের বিষয় স্মরণ হওয়াতেই তখনই লাফাইয়া উঠিলাম, মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল—আহা! বাছা কি আমার এখনও বাঁচিয়া আছে। সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দেখি কতকগুলা শৃগালে কি ঘেরিয়া রহিয়াছে। কাছে গিয়া শৃগালগুলাকে তাড়াইয়া দেখি আমারই পুত্রটী পিট পিট চাহিতেছে। আমাকে দেখিয়া দুই হাত বাড়াইয়া দিল। আমি কোলে তুলিয়া লইয়া কতক দূর অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা, ওদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে কি করি ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে রেলের ধারে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। সুখের বিষয় ছেলেটীর গায়ে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। শিশু অল্প সময়ের মধ্যেই আমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। আমি সেই বিজন অরণ্যে কেবল শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিলাম। কখন বাঘ ভল্লুক আসিয়া আক্রমণ করে, সমস্ত রাত্রি কিরূপে কাটিবে, এই ভাবিয়া আকুল হইলাম। ঘণ্টা দুই এইরূপে কাটিল। তারপরে দেখি দূর হইতে এক বিশাল আলোকের রশ্মি আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি এঞ্জিন। এই এঞ্জিন আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিল।"

ত্রি—বাবু বলেন তাঁহার স্থির বিশ্বাস কোনও দয়ালু মহাপুরুষের সহায়তা ব্যতীত এরূপ বিপদ হইতে এরূপে উদ্ধার হওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় ঘটনাটী মোটে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। হাবড়ার ময়দানের ধার দিয়া মার্টিন কোম্পানীর একটী ছোট রেলের লাইন গিয়াছে। ঐ লাইন একাধিক স্থানে সরকারী রাস্তার উপর দিয়া গিয়াছে। এখন একদিন বৈকালে স্ত্রীলোক ও বালক একখানি আরোহীপূর্ণ ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী সাঁতরাগাছি রামরাজাতলা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়িটীতে কলিকাতার হাইকোর্টের জনৈক খ্যাতনামা

উকীলের পরিবারবর্গেরা যাইতেছিলেন। ঘোড়ার গাড়িটী রেলের লাইন প্রায় পার হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় রেলগাড়ীর সহিত উহার ধাক্কা লাগিল। ধাক্কার চোটে গাড়ীখানি উল্টাইয়া গেল এবং ট্রেণ থামাইতে থামাইতে ৫।৭ হাত গড়াইতে গড়াইতে গেল। গাড়ীর পশ্চাতে একটী ঝি বসিয়া ছিল তাহার মস্তক রেলের গাড়ীর চাকার নীচে পড়ায় সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। একজন ষণ্ডামার্ক দরওয়ান গাড়ীর ছাদে ছিল সে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানপ্রায় হইল। ঘোড়া সকল রাশ ছিঁড়িয়া পলাইল। গাড়োয়ান বেটা খুব চালাকি করিয়া এক লম্ফ দিয়া বিপদের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকগণ গাড়ীর ভিতরেই উলটপালট খাইতে লাগিলেন ও বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। একটী ৩।৪ বৎসর বয়সের ছেলে কি রকমে গাড়ির ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিয়া ঠিক এঞ্জিনের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এঞ্জিন তখনও থামে নাই, চলিতেছে। বালকটীকে বোধ হইল যেন তখনই রেলগাড়ির চাকার তলায় পড়িয়া ঝির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কে যেন বালকটীকে লাইন হইতে তুলিয়া পার্শ্বে বিপদের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। অথচ শতাধিক হস্তের মধ্যে জনপ্রাণীও ছিল না। এখন বলুন দেখি, এ সব ক্ষেত্রে অদৃশ্য সহায় ব্যতীত এ সমুদায় ঘটনা কিরূপে সম্ভবে?

এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিলে অদৃশ্য লোকে যে ইহজগতের মনুষ্যের ইষ্টসাধনে সহায়তা করে সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

শ্রীনীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

স্থানাভাব বশতঃ "দাদামহাশয়ের ঝুলি" এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইল না।—অঃ রঃ মঃ।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

পৌরাণিক কথা। মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল দ্বারা প্রণীত।

গ্রন্থকার পুরাণসমূহ বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে ভাগবতের অনেক দুর্ভেদ্য গূঢ়ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের যুক্তিযুক্ত প্রমাণে নাস্তিকেরও ভক্তির উদয় হয় এবং সাধারণেরও ভাগবতের ভাব অনেকটা বোধগম্য হয়। শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ.

"It gives the logic and philosophy of many a knotty problems of the Hindu religion". * * The book will prove an excellent *Vedi Mecum* fot readers of Bhagabat. The language is simple and flowing. The get up is as it could be desired. We hope the work will be highly valued by all students of the Hindu religion.' —Bengalee"

উপনিষদ্ (বারখানি)। ১॥০

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে উপনিষদ্ প্রকাশিত হয় নাই।

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত।

ঈশ্বর, কেন, কঠ	॥০	ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর	৸০
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য	৷০		
বৃহদারণ্যক	১॥০	কৌষিতকী	॥০
ছান্দোগ্য	১৷৵০		

নারদ ভক্তিসূত্র । ।৵৹

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় দ্বারা

সঙ্কলিত

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ

ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

ভক্তজীবন । ।৵৹

শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, দ্বারা

শ্রীমতি এনিবেসেন্টের Doctrine of the Heart হইতে

অনুবাদিত।

সৎপথ অবলম্বী সৎব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম। ।৵৹

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাল এম, এ. বি, এল ; দ্বারা

শ্রীমতি এনিবেসেন্টের Laws of the Higher life অবলম্বনে

লিখিত

আধ্যাত্ম জীবনলাভে অনেকেই পিপাসু ; আধ্যাত্ম জীবনে যে মহান্ নিয়মাবলীর ক্রম আছে, অনেক পিপাসু জন তাহা না জানিয়া, যে কোন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া কত কষ্ট পান! সেই আর্য্যমাত্রেরই একমাত্র গন্তব্য "আধ্যাত্মিক জীবন" তাহার অধিকার অবস্থা সকল ও মুলতত্ত্ব সমূহ বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন।

জন্মান্তর রহস্য। ৸৹

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ, কৃত

এই পুস্তকে শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা জন্মান্তরতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। জীবন ও মরণান্তে জীবন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল; দ্বারা শ্রীমতি এনি-বেসেণ্টের Life and life after death নামক বক্তৃতার অনুবাদ; মৃত্যুই আমাদের শেষ নহে, পরকাল আছে, জন্মের পর জন্ম আছে ইত্যাদি এবং মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা ইহাতে বর্ণিত আছে।

২। ধর্ম্ম-জীবন ও ভক্তি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি-এল্ দ্বারা শ্রীমতি এনিবেসেণ্টের Devotion and Spiritual Life এর অনুবাদিত।

৩। সদ্‌গুরু ও শিষ্য।

কি প্রকারে জীবন গঠন করিলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং গুরুতত্ত্বরহস্য কি, কেহ যদি বুঝিতে চান, তাঁহার এই পুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। প্রকৃত দীক্ষা।

বাস্তবিক দীক্ষা কি? এই মহান্ তত্ত্ব অনেকেই জানে না, দীক্ষা ভিন্ন মানবের চৈতন্যের প্রসার হয় না, এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে কথিত আছে।

৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

যদি "কোন পথে গেলে আমার আমি মিলে" বুঝিতে চান, যদি জন্ম মৃত্যুময় সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য পথ খুঁজিবার পিপাসা হয়, যদি পরমার্থ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিলে কতকটা সাহায্য পাইতে পারেন।

"ভাষাতত্ত্ব"

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত।

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ৫৯নং "লোটাস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রতি খণ্ডে ১৲ টাকা।

বঙ্গভাষায় নিত্য ব্যবহৃত অনেক শব্দ, কারকের বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় সকলের সংস্কৃতের সহিত কিছুমাত্র ঐক্য নাই মনে করিয়া, এই ভাষাকে সংস্কৃত হইতে এক পৃথক ভাষা বলিয়া লোকে মনে করে। এই পুস্তক বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঐ সকল শব্দ বিভক্তি প্রত্যয়াদি সকলই সংস্কৃত মূলক। আর ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে সংস্কৃত কথিত ভাষা নহে, ইহা সাহিত্যিক ভাষা, এবং ইহা যে ভাষার সাহিত্যিক আকার বাঙ্গলা ভাষা তাহারই কথিতাকার। এই পুস্তকে যে গভীর গবেষণা, এবং অসামান্য চিন্তা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইবে। স্থূল কথা বঙ্গভাষায় অভাবনীয় মৌলিক তত্ত্ব সকল এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষাধ্যায়ী মাত্রেরই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত—প্রকাশক।

শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, প্রণীত

"রোগীর প্রতি উপদেশ"

বা

দীর্ঘজীবন লাভ করিবার উপায়

পাঠ করুন।

বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় নূতন নূতন উপদেশ, যাহা ডাক্তার কবিরাজ বা কোন

অলৌকিক রহস্য।

৭ম সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [কার্ত্তিক, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

আমরা সাধারণতঃ চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, এবং যুক্তি, বিচার, কল্পনা প্রভৃতি মানসিক শক্তির সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ শুনা যায় যে, কোন একটি সত্য কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানবের চিত্তে সহসা উদিত হয়, সে বুঝিতে পারেনা, উহা কোথা হইতে বা কিরূপে আসিল। হয়ত সে বসিয়া আছে কিংবা কোন কাজ করিতে যাইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা আদেশ বাক্য শুনিতে পাইল, কে যেন বলিল "ইহা কর" বা "উহা করিও না" বা "অমুক দিন এই প্রকার ঘটিয়াছে বা ঘটিবে" ইত্যাদি। এই আকস্মিক জ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির নামই দৈববাণী বা আকাশবাণী বা প্রত্যাদেশ। তত্ত্বদর্শিগণ প্রত্যাদেশের বহুবিধ কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। মোটামুটি ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য। মানবের জীবাত্মা অন্তর হইতে যে ভালমন্দ, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য বলিয়া দেন—তাহাই আভ্যন্তরিক প্রত্যাদেশ, এবং দেবতা, মহাপুরুষ, গুরু, প্রেতাত্মা অথবা সূক্ষ্ম জগতের যে কোন অধিবাসী

অলক্ষ্যে আমাদিগকে যে সকল আদেশ বা উপদেশ দেন—তাহাই বাহ্য প্রত্যাদেশ বলিয়া গণ্য। "জীবাত্মা" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে আমাদের The Ego, The Higher Self, অথবা "কারণ-শরীর"ই লক্ষ্য। এই জীবাত্মা বা কারণ-শরীর উচ্চলোকে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন; এবং ইঁহার কতক অংশ সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূলদেহ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন; যেমন একটি শিকড় মাটির নীচে স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া মাটির উপর পুনঃ পুনঃ ডাল পালা ও পাতা বিস্তার করে এবং এই ডালপালার সাহায্যে বৃষ্টি ও বায়ু হইতে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহারই সারভাগ টানিয়া লইয়া উক্ত শিকড়টি যেমন পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই কারণ-শরীর স্বীয় সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূলদেহের সারভাগ গ্রহণ করিয়া প্রতি জন্মে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইতেছেন। যেমন একটি বালক সমস্ত দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করে এবং রাত্রিকালে স্বগৃহে প্রত্যাগত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও প্রতিজন্মে নূতন নূতন দেহে পৃথিবীতে আসিয়া জ্ঞানার্জ্জন করেন এবং জীবনান্তে স্বরাজ্যে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ 'যাওয়া আসা' যে কতবার হইয়াছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক মানব হয়ত লক্ষবার জন্মিয়াছে এবং এই লক্ষ লক্ষ জন্মার্জ্জিত জ্ঞানের সারাংশ লইয়াই তাহার কারণ-শরীর নির্ম্মিত। কিন্তু সকলের কারণ-দেহ সমভাবে উন্নত (তুল্যরূপে পরিপুষ্ট) নহে; কারণ বিদ্যালয়ের যত্নশীল ও মনোযোগী ছাত্রগণ অল্প সময়ে যাহা শিখিয়া লয়, অনাবিষ্ট ও খেলাপ্রিয় বালকেরা তাহা শিখিতে পারে কি? এই জন্যই বিভিন্ন কারণ-দেহ বিভিন্নরূপে উন্নত,—কোনটি অধিক কোনটি কম। যে কারণ-দেহ যত অধিক উন্নত, তাহা স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহকে তত অধিক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই হেতু সভ্য মানব মধ্যে মধ্যে যে বিবেক-বাণী

(voice of conscience) শুনিতে পান, অসভ্য মনুষ্য তাহা আদৌ পান না। আবার সভ্য মানবের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী, বা ভক্ত বা সাধক, তাঁহারা হয়ত সর্ব্বদাই জীবনের প্রতি কার্য্যেই, জীবাত্মার আদেশ স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে পান এবং কেহ বা ইঁহাকে "গুরু", কেহ বা "মা" (অথবা যাঁহার যাহা ইষ্টদেবতা সেই নামেই) সম্বোধন করেন। এই তো গেল আভ্যন্তরিক প্রত্যাদেশের কথা। বাহ্য প্রত্যাদেশে দেবতা বা মহাপুরুষ তাঁহার প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা আমাদের সূক্ষ্মদেহে একটা জ্ঞান বা আদেশ সঞ্চারিত করিয়া দেন। কোন্‌টি বাহ্য, কোন্‌টি আভ্যন্তরিক অনেক সময় তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হয়।

পুরাণাদিতে প্রত্যাদেশের অনেক গল্প আছে। ইহা অধিকাংশ হিন্দুরই পরিচিত। আমরা পাশ্চাত্য জগতের কতকগুলি এইরূপ ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে দুইটি এইবারে পাঠকদিগকে উপহার দিব।

প্রত্যাদেশ।

সক্রেটিসের বৃত্তান্ত।

গ্রীসের অসাধারণ পণ্ডিত সক্রেটিস্ বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকেরই সুপরিচিত। ইনি প্রায় সর্ব্বদাই প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইতেন। বিশেষত্ব এই যে তাঁহার প্রত্যাদেশগুলি প্রায়ই নিষেধ-সূচক। কোন কার্য্য করিতে যাইতেছেন, প্রত্যাদেশ হইল "ইহা করিওনা"। কিন্তু "ইহা কর" এরূপ প্রত্যাদেশ কখনও হইত না। ইহা হইতে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যে

কার্য্যে কোন প্রত্যাদেশ হইবে না, তাহা করা উচিত এবং করিলে ভালই হইবে। একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্লেটোর সহিত এক গৃহে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল "যাইওনা"। তিনি বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তথায় কতকগুলি যুবক উপস্থিত হইয়া, এরূপ এক বিষয়ের অবতারণা করিলেন, যাহার আলোচনা করিয়া তিনি এবং শিষ্যবর্গ পরম উপকার লাভ করিলেন। তাঁহার দেশবাসিগণ অথবা কোন একটি বন্ধু হয়ত কোন যুদ্ধযাত্রা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সক্রেটিসের "গুরু" তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা নিষেধ না মানিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যে কত ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

একদিন রাত্রিকালে তিনি টিমারকস্ নামে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধুর সহিত বসিয়াছিলেন। টিমারকস্ সেই রাত্রিতেই একটি গুপ্তহত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহা টিমারকস্ এবং তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। সক্রেটিস্ নিজমুখে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শুনুন। "কিয়ৎক্ষণ পরে টিমারকস্ বলিলেন, 'সক্রেটিস্ আমি কোন কার্য্যে যাইব, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।' ঠিক এই সময়ে আমি দৈববাণী শুনিতে পাইলাম এবং টিমারকস্কে বলিলাম 'না, না, তুমি কখনই এখন যাইতে পারিবে না।' ইহা শুনিয়া টিমারকস্ উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার বলিলেন, 'সক্রেটিস্, আমাকে যাইতেই হইবে।' পুনরায় দৈববাণী হইল, সুতরাং তাঁহাকে আবার বসাইলাম। ইহার পর যেমন আমি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছি—টিমারকস্ আমাকে কিছুই না বলিয়াই অলক্ষ্যে সরিয়া গেল। পরদিন শুনিলাম সে কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছে।"

আর একটি ঘটনা শুনুন। কয়েকটি বন্ধুর সহিত সক্রেটিস ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইলেন "এ পথে যাইও না।" বন্ধুদিগকে এই কথা বলাতে, কয়েকজন তাঁহার সহিত ফিরিলেন এবং অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর কয়েকটি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই পথেই যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে একদল বন্য বরাহ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সকলেই অল্পাধিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধূলিধূসরিত গাত্রে মনোদুঃখে বাটী ফিরিলেন।

যুবকদিগকে কুশিক্ষা ও কুমন্ত্রণা দিয়া কলুষিত করিতেছে, যখন সক্রেটিস এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "সক্রেটিস, তোমার ধর্ম্মমত কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ কর, জীবন রক্ষা হইবে।" ইহা শুনিয়া তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমি সুনীতি শিক্ষা দিয়া দেশবাসীদিগকে সৎমার্গে লইয়া যাইতেছি, সুতরাং আমি দণ্ডিত না হইয়া পুরস্কৃত হইবার যোগ্য।" তিনি অচল, অটল ভাবে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, আত্মরক্ষার জন্য একটি বর্ণও উচ্চারণ করিলেন না। ইহার রহস্য তিনি বিচারকদিগের নিকট নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, "হে বিচারকগণ, আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। যখনই আমি কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে গিয়াছি, তখনই একটি দৈববাণী আমাকে নিবারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান ব্যাপারে ঐ দৈববাণী আমি একবারও শুনি নাই;—কেবল একদিন মাত্র যখন আমি আত্মরক্ষার জন্য কিছু বলিব ভাবিতেছিলাম, তখনই একবার মাত্র ঐ বাণী আমাকে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ইহা হইতে কি এই প্রমাণ হইতেছেনা যে, এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা হইয়াছে, সবই ভালর জন্য এবং আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় ও হিতকর? কারণ ইহা অন্যায়

বা অহিতকর হইলে, দৈববাণী নিশ্চয়ই আমাকে বাধা দিত।" পাঠক! জীবাত্মার (Higher self এর) কিরূপ জোর একবার লক্ষ্য করুন।

অর্লিন-কুমারী জোন। (Joan of Arc.)

ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অর্লিন-কুমারীর বৃত্তান্ত অবগত আছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি ফরাসীদেশে এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের ন্যায় ইনিও বাল্যকাল হইতে এক অলৌকিক স্বর শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বয়স যখন তের বৎসর, তখন তিনি ইহা প্রথম শুনিতে পান। দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অস্বাভাবিক আলোক-ছটা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঐ আলোকের মধ্যে দেবদূত এবং মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে লাগিল, তিনি স্পষ্টরূপে তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহাদের ইসারা ইঙ্গিত দেখিতে লাগিলেন।

তৎকালে অর্লিন্স দুর্গ ইংরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং ফরাসীগণ ক্রমাগত যুদ্ধে পরাজিত হইতেছিল। জোনের উপর প্রত্যাদেশ হইল, "তুমি অবিলম্বে ফরাসীগণের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর। সেণ্ট কাথ্যারিন্ গির্জ্জার বেদির পশ্চাতে একখানি তরবারি প্রোথিত আছে। উহা আনাইয়া লও। নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ইংরাজ অবরোধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে এবং ফরাসীর জয় হইবে। রাজপুত্র চার্লস্ রিমস্ নগরে অভিষিক্ত হইবে। কিন্তু যুদ্ধে তুমি আহত হইবে। মে মাসের ৭ই তারিখে একটি তীর তোমার দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিবে। ইহাতে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে না; তুমি সুস্থ হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অবশেষে কম্পিনের যুদ্ধে তুমি বন্দীরূপে ধৃত হইবে। ইত্যাদি।"

অবশ্য, এই সকল প্রত্যাদেশ তিনি এক দিনে বা এক সময়ে শুনেন নাই, ইহা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল। প্রথমে তিনি আপত্তি করিলেন

"আমি দুর্ব্বল কৃষক-বালিকা, যুদ্ধের কিছুই জানিনা, এমন কি ঘোড়া চড়িতেও পারি না, আমি সেনাপতি হইব কিরূপে?" দৃঢ়ভাবে উত্তর আসিল, "তুমি নিশ্চয়ই পারিবে।" সুতরাং তাঁহার এক অমানুষী শক্তি আসিল, অসাধারণ সাহস আসিল, তিনি সেই দেব-দত্ত অসি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, ইংরাজেরা হটিতে লাগিল, ফরাসীর বিজয়-পতাকা গগনে উড্ডীন হইল, দৈববাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইল।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

প্রেতিনীর আত্মকথা।

(প্রথম দিনের কথা)

সে আজ বেশী দিনের কথা নহে, গত বৎসর শরতের প্রথম ভাগে যখন মায়ের মন্দিরে আরতীর বাদ্য শুনিবার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালির প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, সন্তান মায়ের কোলে যাইবার জন্য স্বামী সংসার কুঞ্জের শান্তিদায়িনী স্ত্রী দর্শনার্থ, দূর দূরান্তর হইতে গৃহপানে ছুটিয়াছে,—ঠিক এমনি দিনে, পূজার কিছু পূর্ব্বে আমাদেরও কালেজের ছুটি হইল। আমরাও অনন্ত আশা বুকভরা আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাড়ী ছুটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রথম চিন্তার বিষয় হইল, কাহার জন্য কি লইব? ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলি আগ্রহ পূর্ণ নেত্রে আমার গমন প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে। তাহাদের জন্য অন্ততঃ আবশ্যক-মত কিছু লওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে অনেক কিনিলেন। এই স্বদেশীর পূর্ণ জোয়ারেও প্রেমময়ী স্ত্রীর জন্য আদরের, সোহাগের বিলাসের অনেক দ্রব্য অনেকে কিনিলেন। আমি দেখিলাম আর হাসিলাম। কেন হাসিলাম জানি না, এ দায়ে

আবদ্ধ হইলে আমাকেও হয়ত কতই লইতে হইত, কিন্তু ভগবান আমাকে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত রাখিয়াছেন। আমার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ভালবাসা, হৃদয়ের সমস্ত স্থান জুড়িয়া প্রাণাধিক ভ্রাতাভগিনীগুলি বিরাজ করিতেছিল; তথায় আর কাহারও অধিকার এ পর্য্যন্ত বর্ত্তে নাই।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমি—নং মানিকতলা ষ্ট্রীটের একটী মেসে থাকিতাম, আমার জনৈক বন্ধু—নং কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীটের একটী মেসে থাকিতেন। বন্ধুটীর নাম পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর মেসের সকল ছাত্র চলিয়া গিয়াছে; একা সে ও তাহার পার্শ্বের ঘরের একটী ছাত্র সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতলে অবস্থান করিতেছেন। ঠিক হইল আমি ও পার্ব্বতী এক সঙ্গে বাড়ী রওনা হইব। উভয়েরই বাড়ী ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী কোনও গণ্ডগ্রামে, উভয়ের গ্রাম পরস্পরের অতি নিকটেই অবস্থিত।

আজ আমরা বাড়ী রওনা হইব। আমি মানিকতলা মেস ছাড়িয়া কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্ মেসে পার্ব্বতীর নিকট আসিয়াছি। সমস্ত দিন ভাবিয়া এটা-ওটা-সেটা আবশ্যকীয় কত কি কেনা হইল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া, আসিল, অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভাটুকু দ্বিতল, ত্রিতল ছাদের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলে লুকাইল। অন্ধকারের অদৃশ্য আবরণ কলিকাতার বুকের উপর আসন পাতিয়া বসিবার জন্য ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। আফিস ছুটী, স্কুল-কলেজ ছুটী, তাই কলিকাতার মত স্থানও যেন একটা নীরবতা বুকে লইয়া কি একটা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সকাল সকাল আহার করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। বাক্স দুইটী ছাদের উপরে, ভিতরে আমরা দুই বন্ধু। কিন্তু তবুও যেন মনে হইতেছিল, গাড়ী বড় ভার বোধ হইতেছে, ঘোড়া দুইটা যেন বহু কষ্টে আমাদের লইয়া ছুটিতেছে। সেই নীরবপথেই আমরা নীরবেই ছুটিয়াছি, তবুও যেন গাড়ীর ভিতরে কাহার

দীর্ঘনিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কিরূপ একটা কাতর প্রাণের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। ভাবিলাম গাড়ীর পশ্চাতে লোক আছে, চাহিয়া দেখিলাম সইস কোচবাক্সে বসিয়া রহিয়াছে, পিছনে কেহই নাই। আশে পাশে চাহিলাম, কোথাও কিছু দেখিলাম না। গাড়ীতে আমরা দু'জন' তবুও যেন মনে হইতেছিল—এক গাড়ী মানুষ বসিয়া সমস্ত স্থানটা এমন ভাবে জুড়িয়া বসিয়াছি যে, পাশ ফিরিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। দেখিতে দেখিতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শরীর উভয়েরই অনেক পাতলা বোধ হইল, কিন্তু জানিলাম ট্রেণ তিন মিনিট পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। পরের দিন সকালের ট্রেণে যাওয়া ব্যতীত উপায় নাই বিবেচনায় একটা নিরাশা বুকে লইয়া আবার' সেই কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীটের মেসেই ফিরিলাম। দ্বিতলে পার্ব্বতীর প্রকোষ্ঠেই কোন রকমে রাত্রি কাটাইব, এই ভাবিয়া দুই জনে এক বিছানায় শয়ন করিলাম। বাক্স বিছানা এখানে ওখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে ঘরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। উভয়েই নিস্তব্ধ, উভয়েরই প্রাণে গাড়ীর মধ্যের সেই করুণ দীর্ঘ নিশ্বাস জাগিতেছে। আমাদের শয্যার দক্ষিণপার্শ্বে মস্তকের নিকট একখানা টেবিলের নিকট ঘড়িটী রাখিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিয়া কেবল সেই দীর্ঘনিশ্বাস ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরে শব্দ উঠিল, টক্ টক্ টক্; আবার শব্দ হইল টক্ টক্ টক্; এক দুই তিন করিয়া গুণিলাম। থাকিয়া থাকিয়া ছয় বার শব্দ হইল। একে পার্ব্বতী একটু ভীতু, তার পর সেই গাড়ীর ঘটনা। ইহার উপর আবার এই প্রকার শব্দে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আবার—আবার সেই শব্দ! কিন্তু আশ্চর্য্য এই প্রত্যেক বারই উপর্য্যুপরি ছয় বার করিয়া শব্দ হইতেছে। কোন প্রকার লাঠী দ্বারা থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক

তেম্‌নি টক্ টক্ শব্দ। ভাবিলাম ইন্দুরে ঐরূপ করিতেছে। পার্ব্বতীকেও তাহাই বুঝাইলাম। আলো জ্বালিয়া সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও কিছু নাই; যেই আলো নিবাইলাম আবার সেই শব্দ। ভাবিলাম বাক্সের ভিতর ইন্দুর গিয়াছে। আমার ও পার্ব্বতীর বাক্স খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কৈ কোথাও তো কিছু নাই। আলো জ্বালিলে কোন শব্দ নাই—নির্ব্বাপিত করিলেই সেই শব্দ। পার্ব্বতী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইহা নিশ্চয়ই ভূত, আমি শুনিয়াছি, এ বাড়ীতে ভূত আছে। আমার বড় ভয় করিতেছে, চল অন্য প্রকোষ্ঠে যাই।" ইহা বলিয়াই আমাদের পাশের ঘরে যে ছাত্রটি ছিল, তাহার নিকট যাইবার জন্য আমাকে মিনতি করিতে লাগিল। পার্ব্বতী ভয়ে কাঁপিতে ছিল, আমি কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করিতাম না, হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি পাগল, ভূত নির্ব্বোধের কল্পনা, পাগলের খেয়াল।"—যেই বলা কে যেন দরজার কাছে অস্ফুট হাসির ধ্বনিতে ঘরটার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিল। সে হাসি অতি ক্ষীণ ও অতি কোমল। যেন ভূতে বিশ্বাস করি না বলিয়া আমাকেই উপহাস করিল। এক বার দুই বার তিন বার সেই হাসির লহর উঠিল, থামিল। আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে ভারী সন্দেহ হইল, দরজা খুলিলাম পার্ব্বতী ছুটিয়া বাহির হইল, সমস্ত বাড়ী খুঁজিলাম কিছু দেখিলাম না। নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা করিতে করিতে পার্শ্বের প্রকোষ্ঠেই যাইয়া সেই ছাত্রটীকে উঠাইয়া তাহার পার্শ্বে দুইজনে শয়ন করিলাম। দুইজনের কাহারও ঘুম হইল না। নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। কি জানি হয় ত ভীতু বলিয়া উপহাস করিবে, এই জন্য পার্শ্বের ঘরের ছাত্রটিকে কিছু বলিলাম না। তাহার পরের দিন সকালের ট্রেণে বাড়ী যাত্রা করিলাম। বাড়ীতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

মাসৈক সময় শস্য-শ্যামলা পল্লীর নিভৃত ভবনের শান্তি উপভোগ করিয়া আবার কোলাহল-পূর্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। মাতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া ভ্রাতা-ভগিনীর মলিন মুখ ভাবিতে ভাবিতে ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমে মানিকতলা মেসেই উঠিয়া বিছানাপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া একেবারে পার্ব্বতীর মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পত্রে জানিয়াছিলাম, পার্ব্বতী একদিন পূর্ব্বে রওনা হইয়াছে। আসিয়া দেখি, তখনও কেহ উঠে নাই, মেসের দরজা ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ। "পার্ব্বতী আছ?" বলিয়া ডাকিতেই সে দৌড়িয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিলাম তাহার মুখখানা শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ; কি যেন একটা ভীষণ চিন্তায় মুখে কালিমা পড়িয়াছে। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম পার্ব্বতী! তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে? সে বলিল—"যাহা হ'য়েছে বল্‌ব এখন, চল উপরে যাই।" তাহার প্রকোষ্ঠে উভয়ে যাইয়া বসিলাম। আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার কি হ'য়েছে পার্ব্বতী? আজ তোমাকে এরূপ দেখা যাইতেছে কেন?" সে ক্ষীণকণ্ঠে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আকুল নেত্রে বলিল,—"ভাই! আর আমি বাঁচিব না, ভাবিয়াছিলাম ভূত আমাকে ভুলিয়াছে, কিন্তু তাত নয়! কল্য সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়াছিলাম। যেই আলো নিবাইয়াছি, অমনি সেই শব্দ, সেই হাসি—আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।" আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ থেকে তুমি এখানেই থাকিবে, নতুবা একা কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকিতে পারিব না।" অগত্যা তাহার প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হইলাম।

আমাদের মানিকতলা মেসে Edward Institutionএর একজন master থাকিতেন। তিনি প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

করিয়া থাকেন। লোকটা বিদ্বান ও সাত্বিক। পার্ব্বতীকে লইয়া আমি দ্বি-প্রহরের আহারাদির পরে তাঁহার নিকট যাইয়া পূর্ব্বরাত্রি ও পূজার পূর্ব্বের ঘটনা সমস্ত জানাইয়া কি করা কর্ত্তব্য পরামর্শ চাহিলাম। অন্য কেহ হয় ত এতটা করিতেন না, কিন্তু আমি সাধারণতঃ একটু কৌতূহল-প্রিয়। তিনি অনেক কথা বলিলেন। আমাদিগকে অনেক বুঝাইলেন। আসিবার সময় বলিয়া দিলেন,—"তোমরা ভয় পাইও না। Spirit (প্রেত) দুই রকমের আছে। দুষ্ট প্রেত যাহারা তাহারাই সাধারণতঃ লোকের অপকার করিয়া থাকে। এইটী দুষ্ট প্রেত কি না, তাহা তাহার কার্য্য কলাপেই বুঝিতে পারিবে। আমার তো বিশ্বাস ইহা দুষ্ট প্রেত নহে। অনেক সময় সংসার সুখে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র স্মৃতি মৃত্যুর পরেও আত্মাকে সংসারে আসক্ত করিয়া রাখে এবং সেই জন্যই জন্মান্তর পর্য্যন্ত আত্মা সেই আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া বাসনার জ্বালায় ছুটোছুটী করিয়া বেড়ায়। তাহারাই তাহাদের প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের কথা বলিবার জন্য মানুষের কাছে আসিয়া থাকে। আমরা অজ্ঞান, আস্থা হীন তাই হয় ত তাহাকে দূর করিয়া দিই, নানা প্রকার উপদ্রবে, ওঝা ডাকাইয়া, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া তাড়াইয়া দিই, অথবা আমরা নিজেরাই সরিয়া যাই। সেই আত্মা মর্ম্ম কথা বলিতে না পারিয়া প্রাণের যন্ত্রণায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আর আমরা তাহাকে দূর দূর করিয়া সরাইয়া দিই। যদি তাহা না করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতাম, তাহাদের প্রাণের বাসনা জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতাম, তবে জন্মান্তরবাদ কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। প্রেতত্ত্ব, অদৃশ্য সহায় (Invisible helper) প্রভৃতিতে অবিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তোমরা যাও, সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাহার আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান কর, দেখিবে কত নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবে।"

আজ আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মেসে আসিয়াছি। ভয় ও বিস্ময় বুকে লইয়া রাত্রের প্রতীক্ষা করিতেছি। ক্রমেই যত অন্ধকারের আবরণ ছাইয়া পড়িতে লাগিল, আমরাও ততই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজ আমরা সংকল্প করিয়াছি, যাহাই হউক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া একবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিব। ক্রমে আমাদের মেসের আহারাদি সমাপ্ত হইল। যে যাহার প্রকোষ্ঠে যাইয়া দরজা বন্ধ করিল। আমরাও দরজা বন্ধ করিলাম। আলো জ্বলিতেছিল, নিবাইয়া দিলাম। দু'জনেই বসিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই। পার্ব্বতী পিছন হইতে আমাকে জড়াইয়াছিল। অদৃশ্য বিপদের আশঙ্কায় শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। ভয় না হইলেও কি যেন একটা চিন্তার অতীত ভাবনা আসিয়া মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কান পাতিয়া আছি, এমন সময় শব্দ হইল ঠক্ ঠক্ ঠক্। পার্ব্বতী আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, আমি শক্ত হইয়া বসিলাম। একবার, দুইবার, তিনবার সেই শব্দ হইল। ভাবিলাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বহু কষ্টে, শুষ্ক জিহ্বায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

উত্তর পাইলাম, ঠক্, ঠক্, ঠক্—ছয় শব্দ! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, —"তোমার নাম?" আবার সেইরূপ শব্দ। কিন্তু এবার শুধু শব্দ নহে। আমাদের মনে হইল শব্দের সঙ্গে একটা ক্ষীণ কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও যেন আমাদের কথার উত্তর দিতেছে! কিন্তু বুঝিলাম না।

তিন বারের বার যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম সেই শব্দ কথায় পরিণত হইতেছে। যেন বলিতেছে,—"জ্ঞানদা সুন্দরী!"

পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিছু বুঝিলে? সেও বলিল জ্ঞানদা সুন্দরী? আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি জ্ঞানদা সুন্দরী? শব্দ আরও স্পষ্টভাবে উত্তর করিল, "না।"

"তবে কি ?" আরও স্পষ্ট, আরও উচ্চে উত্তর আসিল, "সারদা সুন্দরী ! !" জিজ্ঞাসা করিলাম, "সারদা সুন্দরী" ? উত্তর হইল, "হাঁ।"

ক্রমেই যেন শব্দগুলি জীবন্ত মানুষের কথার ন্যায় স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছিল। ক্রমেই যেন আমাদের ধারণা হইতেছিল আমরা জীবন্ত, জাজ্জল্যমান সম্মুখ উপবিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছি। কিন্তু কথাগুলি বড় কোমল ! বড় মর্ম্মস্পর্শী ! বড় বিষাদ বিজড়িত নম্রতা ব্যঞ্জক ! ভয় হইল এ কিছু অনিষ্ট করিবে না ত ? জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবে ?" উত্তর—"না।"

আমি—আচ্ছা বল দেখি ঘড়ীতে কয়টা বাজিয়াছে ?

উত্তর—১০টা ৩৫ মিনিট।

আলো জ্বালিয়া মিলাইয়া দেখিলাম ১১টা বাজিয়া ৫ মিঃ হইয়াছে। ঠিক বলিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্যই এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। না বলিতে পারায় একটু সন্দেহ হইল, ভাবিলাম হয়ত আমার ঘড়ী ঠিক চলিতেছে না। আবার আলো নিবাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আমার ঘড়ীতে কয়টা ?"

উত্তর হইল—১১টা ৫ মিঃ।

তখন বুঝিলাম আমার ঘড়ীটী দ্রুত চলিতেছে।

ক্রমে আমাদের সাহস বাড়িতে লাগিল। বলিলাম,—"তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বড়ই কৌতূহল হইতেছে; দয়া করিয়া বলিবে কি ?"

তখন সেই অন্ধকারে অদৃশ্য মনুষ্য কণ্ঠ ধীরে ধীরে আত্ম পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। সে কণ্ঠ যে কি কোমল, কি মর্ম্মস্পর্শী তাহা ভাষার অতীত !! আমরা পুত্তলিকাবৎ সেই বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় কোমল স্বরলহরী কেবল শুনিয়া গেলাম। সে বলিল,—"আমি যে স্ত্রীলোক তাহা

হয়ত আমার নামেই পরিচয় পাইয়াছ। আমার বাড়ী ২৪ পরগণার মধ্যে * * গ্রামে। যখন আমার বয়স ১৬ বৎসর তখন পাপের সর্ব্বনাশী মূর্ত্তি আমি বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। যৌবনের প্রবল নেশায়, হিন্দু ঘরের কুলবধূ আমি, সাধ করিয়া বিষবল্লী সৃজন করিয়াছিলাম। পিশাচ দেবরের কুপরামর্শে—দেবতা, পুণ্য, ধর্ম্ম, স্বামী—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রাহ্মণের কুলে কালী দিয়া সেই নরপিশাচের সঙ্গে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া আসি। দেবতা তুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একটা মদ্যপায়ী কামনার দাসকে, একটা কুকুরকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠা করি। ওগো! কাহাকে সে দুঃখ কাহিনী বলিব? কে এ পাপীয়সীর মর্ম্ম-কথা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে? বড় জ্বালা, বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি!!” সে সমস্ত ঘরটা একটা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোলে ছাইয়া গেল। আমি বলিলাম, “যদি পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে তোমার কষ্ট হয় তবে থাক্, আমি শুনিতে চাহি না।

সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল;—

“না আমিই বলিব। যেখানে যাই সেখান হইতেই বিতাড়িত হই। সকলেই ভয় পায়। এ জ্বালা, প্রাণের এ ভার বলিয়া যে একটু লাঘব করিব, তাহাও পারি না। কেবল ছুটাছুটী করিয়া বেড়াই। ওগো! আমি বড় পাপীয়সী, বড় কুলটা—আমার কি হবে!!”

“আমি সেই দেবরের সহিত আসিয়া ৬ মাস তাহার সহিত একত্রে ছিলাম। তারপর এক দিন হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার দেখা পাই নাই! দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলাম। তার পর, তারপর যে কি হইল বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চক্ষু ফুটিয়া জল বাহির হয়। আমি জগতের ঘৃণ্য, সমাজের ঘৃণ্য প্রকাশ্য * * বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। নিত্য নূতন লইয়া আমার বিলাস বাসনা, আমার

জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতাম। আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম; দিবারাত্রি মদে বিভোর হইয়া থাকিতাম। হায়! হায়! সেই মদই আমার কাল হইল।”

আবার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। স্বপ্নের প্রহেলিকার ন্যায় অসাড় দেহে আমরা কেবল শুনিতে লাগিলাম। “সেই উন্মাদনায় আমি একজনকে ভাল বাসিয়াছিলাম। সে ভালবাসার প্রতিদান পাই নাই। আমি সুন্দরী বলিয়া গর্ব্ব করিতাম, যৌবনের অহঙ্কার করিতাম, আমাকে দেখিলে কতজনে ভুলিত। হায়! সেই আমি,আমাকে কেহ দেখিতে পায় না! ভয়ে কাহারও সম্মুখে যাইতে সাহস পাই না। যাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, যাহাকে না দেখিলে অস্থির হইতাম, কি জানি কেন সে না আসিলে আমার আহার হইত না, সে না আসিলে আমার নিদ্রা হইত না; সেই যুবক, সেই অকৃতজ্ঞ প্রেমিক আমাকে মদে কি মিশাইয়া পাগল করিয়া দিল! একে একে আমার সমস্ত অলঙ্কার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া পলায়ন করিল। আমি বুঝিয়াও বুঝিলাম না, দেখিয়াও দেখিলাম না। সেই উন্মাদ অবস্থায় আমি অমানিশার অনন্তব্যাপী ঘোরান্ধকারে জলে পরিপূর্ণ চৌবাচ্চায় লাফাইয়া পড়িলাম। যদিও চৌবাচ্চা ছোট ছিল, তথাপিও মদের নেশায় আর আমি উঠিতে পারি নাই। উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই। সেই অবস্থায় একাকী অসহায়া আমি—আমার প্রাণ গিয়াছে!! উঃ সে যে কি যন্ত্রণা তাহা কে বুঝিবে!!!” আবার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল! কিছুক্ষণ কাঁদিয়া হঠাৎ যেন দাঁড়াইয়া পড়িল। আমাদের মনে হইতেছিল, সেই আত্মা মেঝেতে বসিয়া কহিতেছে। দাড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল! “আমি এখন যাই?” আবার বলিল,“আমি তবে এখন যাই?” বড় কাতরতার সহিত, বড়ই বিনয়ের সহিত, বড় কষ্টে বলিল,

"আমি এখন যাই ?" আমি বলিলাম আর কি আসিবে না! উত্তর দিল, "কল্য আসিব।" আমি বলিলাম "আচ্ছা তবে যাও।" বলামাত্র খস্‌খস্‌ শব্দ হইল। সেই মুহূর্ত্তেই দরজায় হস্তদ্বারা আঘাত করিলে যেমন শব্দ হয়, সেইরূপ একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই আর কোন সাড়া নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া আর উত্তর পাইলাম না।

সেই নীরব গৃহে আমাদের কর্ণে যেন কেবল সেই করুণা-উদ্বেলিত বামা-কণ্ঠ, সেই বিদায়ের বিষাদ বিজড়িত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অলৌকিক রহস্যের সম্পাদক

মহোদয় সমীপেষু

মহোদয়,

*　*　*　*　*

নিম্নলিখিত ঘটনাটী ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতই ঘটিয়াছিল,—তখন আমার বয়স ৮ বৎসর। এই ঘটনা যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লিখিতে হয়ত দু' একটী কথার প্রভেদ হইতে পারে। ইতি।

*　*　*　*

বশংবদ,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য,

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

৩রা সেপ্টেম্বর
১৯০৯

শাপভ্রষ্ট অপ্সর।

মেদিনীপুর জেলায় কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অধিকারী মহাশয়ের নিবাস। তিনি বেশ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে তাঁহার নাম ডাক আছে। তাঁহার চারিটী পুত্র। আমার এই আখ্যায়িকা তাঁহার মধ্যম পুত্র ভবতোষ অবলম্বনে লিখিত। এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য।

ভবতোষের বয়স যখন ১৮ কি ১৯ বৎসর, তখন সে নিকটবর্ত্তী কোন এনট্রেন্স স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। প্রত্যহ বাড়ী হইতে স্কুলে যাওয়া কষ্টকর এই ভাবিয়া, অধিকারী মহাশয় তাহাকে বোর্ডিংএ থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং পুত্রের পাঠে বেশ মনোযোগ আছে দেখিয়া, বোর্ডিংএর পার্শ্ববর্ত্তী একটী নির্জ্জন কক্ষে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিত।

ভবতোষকে দেখিলে সকলেরই মনের ভাব কেমন একরূপ হইত; বোধ হইত যেন সে এখানের নয়। তাহার সেই টানাটানা চক্ষুদ্বয় যে দেখিয়াছে, সেই তাহাকে ভালবাসিয়াছে, যে তাহার হাসিভরা মুখখানি দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে। আমাদের আত্মীয় বলিয়া বলিতেছি না. বাস্তবিকই ইহা যথার্থ সত্য।

বাল্যকাল হইতে ভবতোষ সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শী ছিল। তাহার মধুর-কোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত-গীত যে শ্রবণ করিয়াছে, সে জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। তাহার আর এক বিশেষত্ব ছিল এই যে, কোন রাগ রাগিণী বা তাল কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয় নাই,—যেন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত।

এন্‌ট্রেন্স্‌ পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার্থিগণের পড়িবার চাড় পড়িয়াছে; সকলেই দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ভবতোষেরও পরীক্ষা; কিন্তু সে অপরাপর ছাত্রের ন্যায় অনবরত পরিশ্রম করিত না। দিবাভাগে স্কুল হইতে আসিয়া বন্ধুগণের বাসায় গান গাহিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু রাত্রিকালে কেহ তাহাকে বাহিরে দেখিতে পাইত না। বোর্ডিংএর যে কক্ষে সে থাকিত, তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিত। এমন এক এক দিন দেখা গিয়াছে যে চীৎকার করিয়া ডাকিলেও, ভবতোষ শুনিতে পাইত না।

জ্যৈষ্ঠ মাস—পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ভবতোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। অধিকারী মহাশয় স্ত্রীর অনুরোধে তাহার বিবাহ দিতে উৎসুক। চারিদিক হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে, কোন স্থানেই পাত্রী মনোমত হয় না। অবশেষে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। ভবতোষ কিছুতেই বিবাহ করিবে না, পিতা মাতাও ছাড়িবেন না। তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতে খুব জাঁক জমকের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। দুচারি দিন আমোদ আহ্লাদের উৎস ছুটিল।

বিবাহের পর, ষষ্ঠ দিবস, মধ্যাহ্ন সময়, মাতা গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা,—সহসা ভবতোষ আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"আমার আর জীবনের আশা নাই। আমার সম্পূর্ণ অনভিমতে বিবাহ দিয়াছ, পরে ইহার ফল ভোগ করিবে।" স্নেহময়ী মাতা পুত্রের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন, এবং অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও, কেন যে সে এরূপ বলিল, তাহার উত্তর পাইলেন না।

অষ্ট মঙ্গলার পর তিন চারিদিন হইল ভবতোষ শ্বশুরালয় হইতে প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শরীরের স্থানে স্থানে দু একটা

কাল বর্ণের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। যন্ত্রণায় অধীর, প্রলাপ বকিতেছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর আশুতোষ নিকটে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভব, কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে? মেয়েমানুষের কথা কি বলিতেছে, চুপ কর।"

ভবতোষ অতি কষ্টে বলিল—"দাদা আমার বড় দুঃখ যে, মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারিলাম না।"

আশুতোষ বলিলেন—"এমন সময়ে কোন কথা গোপন করিও না, প্রকাশ কর।"

ভবতোষ পুনরায় বলিল—"আপনি গুরুজন, কেমন করিয়া আমার পাপ কথা প্রকাশ করিব? তবে যদি কাগজ পেন্সিল আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে লিখিয়া দিয়া যাই।" আশুতোষ কাগজ পেন্সিল আনিয়া তাহার হস্তে দিলেন। যন্ত্রণায় অধীর অবস্থায় সে ইংরাজি ভাষায় অস্পষ্টভাবে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা হইতেই পাঠক মহোদয়গণ সেই অলৌকিক ঘটনা বুঝিতে পারিবেন। নিম্নে যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

পরীক্ষার সময় এক দিন রাত্রিকালে বোর্ডিংএর ভিতর পড়িতেছিলাম,—রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, সহসা কোথা হইতে যেন আঁখি-ভরা তন্দ্রা আসিয়া আমায় অভিভূত করিল। পড়া হইল না, পুস্তক-খানি বক্ষের উপর রাখিয়াই নিদ্রাগত হইলাম। কি একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। আমি আতঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে তুমি? বৃদ্ধা উত্তর করিল—এখন পরিচয় দিব না,—তুমি পরে সব জানিতে পারিবে। আমার কথা শ্রবণ কর—আমার সঙ্গে আইস। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—

তুমি কে? তোমার সঙ্গে কোথায় যাইব? বৃদ্ধা বলিল—* * বাবুর উদ্যানে যাইতে হইবে। যদি না আইস, তাহা হইলে তোমার প্রাণ সংশয় হইবে।

বৃদ্ধার মুখভাব দেখিয়া আমার সেই অসীম সাহস কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলাম। উভয়েই নির্ব্বাক। কতক্ষণ পরে আমরা উদ্যানের সমীপবর্ত্তী হইলাম। এইখানে আসিয়া বৃদ্ধা বলিল—আমি ভিতরে প্রবেশ করিব না। তুমি ঐ বাম-দিকের রাস্তা ধরিয়া মালতী বৃক্ষের নিকটে গমন কর। দেখিবে একটী যুবতী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। এই বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্হিত হইল, দেখিতে পাইলাম না।

গভীর রজনী—নির্জ্জন প্রদেশ—তাহার উপর একাকী—ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে করিলাম চীৎকার করি, কিন্তু পারিলাম না—কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল। পশ্চাৎ দিকে চাহিলাম, দেখিলাম বৃদ্ধা। সে বলিল, এখনও যাও নাই!

আমি নিরুত্তর। বৃদ্ধা আবার বলিল—আইস, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। প্রাণের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, তাহার সঙ্গে উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

পূর্ব্ব কথিত মালতী বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা কাহার অস্ফুট নাম ধরিয়া চীৎকার করিল। নিমিষের মধ্যে দেখিলাম, এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী যুবতী শূন্য হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছে। যুবতীর পরণে নীল বসন, পদদ্বয় অসামান্য কারুকার্য্য-খচিত পাদুকা দ্বারা আবৃত, পৃষ্ঠভাগে কোন্ অজানা প্রদেশের সুরভিত কুসুম-মণ্ডিত বেণী দুলিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইল। কিন্তু

পরক্ষণেই যুবতী যখন আমার পাণি স্পর্শ করিল, তখনই সে ভ্রম দূর হইল।

অজ্ঞাতকুলশীলা একটী রমণী অপরিচিত একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করিবে, ইহা অসম্ভব! তবে কি ইহা কোন ভৌতিক কাণ্ড, অথবা কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক! এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় যুবতী বলিয়া উঠিল—না না দুশ্চরিত্রা নই। আমি বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের প্রতি তাকাইলাম, দেখিলাম যুবতী ঈষৎ হাস্য করিতেছে। আমি জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে? যুবতী উত্তর করিল—একি, এখনও আপনি এত আত্মবিস্মৃত! চিনিতে পারিতেছেন না? আমি আপনার দাসী।—তাহার মুখের প্রতি পুনরায় তাকাইলাম, বোধ হইল সত্যই যেন ইহাকে বহুপূর্ব্বে দেখিয়াছি, যেন ইহার সঙ্গে বহুদিন একত্রে অবস্থান করিয়াছি। * * * * * তাহার পর পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা একে একে আমার মনে পড়িল। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আমি মানব নহি, অপ্সর; সম্মুখস্থিত যুবতী আমার স্ত্রী।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে? যুবতী উত্তর করিল—আপনিত জানেন, আমাদের অগম্য স্থান কোথাও নাই।—এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দূর হইতে একটা কোকিল শব্দ করিয়া উঠিল। প্রাতঃকাল আগত দেখিয়া উভয়েই বিদায়ের জন্য ব্যস্ত হইলাম। আসিবার কালে যুবতী আমায় বলিয়াছিল—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আপনার কক্ষে প্রত্যহই যাইব। কিন্তু দেখিবেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। সহসা যুবতী অন্তর্হিত হইল; আমিও শূন্য মনে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুবতী নিত্য নূতন পোষাকে সজ্জিত হইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিত ও নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া

যাইত। প্রত্যহ যাইবার সময় সে এক ছড়া অপূর্ব্ব কুসুমের মালা আমায় প্রদান করিত; আমিও তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম। একদিন যুবতী আমায় বলিয়াছিল—যদি এখানে অপর কোন স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন অথবা আমাদের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জানিবেন আপনার জীবনের আশা থাকিবে না।

এইরূপে যুবতী বিবাহের পূর্ব্বরাত্রি পর্য্যন্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু সে দিন যখন আমার বিবাহের কথা প্রকাশ করিলাম, তন্মুহূর্ত্তেই সে অশ্রুত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সে যে মালা রাশি আমায় প্রদান করিয়াছিল, তৎসমস্তই আমার বাক্সের ভিতর সযত্নে রাখিয়াছি। আবশ্যক হইলে দেখিতে পারেন—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ভবতোষের সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; আর লিখিতে পারিল না। চক্ষুস্থির হইল—দু তিন বার মুখ ব্যাদন করিল, অবশেষে প্রাণ-বায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল! হায়, কে জানে আরও কত রহস্য যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল!

দাহনাদি ক্রিয়া শেষ হইলে অধিকারী মহাশয় যখন প্রিয়তম পুত্রের সমস্ত দ্রব্যাদি বাড়ী হইতে সরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন, সে সময় আশুতোষ ভবতোষের বাক্স হইতে পূর্ব্ব কথিত সযত্নে রক্ষিত মালারাশি বাহির করিয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট দেখাইয়াছিলেন। সকলে সে কুসুম ও মালা গ্রন্থনের প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্ত রাত্রি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের প্রতি আমাদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এতদিন অহং বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছি, একদিনের অদৃষ্টের প্রহারে, একরাত্রির নির্জ্জন চিন্তায়, তাহা যেন পৈশাচিক কার্য্যে পরিণত হইল।

সম্মুখে শয্যায় জননী নিদ্রিতার ন্যায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছেন। মা মা বলিয়া কত সম্বোধন করিয়াছি; কিন্তু মা প্রিয় সন্তানের স্নেহ ভুলিয়া দেহের কোন্ নিভৃত দেশে এমন করিয়া লুকাইয়াছেন যে, নিজে স্বেচ্ছায় না বাহিরে আসিলে, আমার শত চীৎকার সেদেশের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

যাহার কোমল-মধুর ধ্বনি সে স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ, সে এখানে নাই। হায়! সে কি আসিবে? স্নেহের গৌরবে যে একদিন আমাদের সংসারে রাজত্ব করিয়াছে, সে দীন বেশে এস্থান হইতে দূরীকৃতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। সেকি এই অট্টালিকার প্রতি প্রাচীরে আপনার দীন মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিতে আসিতে পারিবে?

এক মায়ের প্রতি মমতা ব্যতীত গোপালকে কলিকাতায় আনিবার অন্য কোনও আকর্ষণ দেখিতে পাইলাম না! কিন্তু এই ছয় বৎসরের মধ্যে গোপাল ত একটী দিনের জন্য কোনও ছলে আসিতে পারিল না! আমাদের আচরণে তাহার মনে না হয় মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু মায়ের প্রতি তাহার ঘৃণা অভিমান জাগিবার কোনও কারণ হয় নাই!

তাহার স্নেহময়ী 'মা' তাহার অদর্শনে কিরূপ অবস্থায় আছে, আছে কি না আছে, এটাও ত একবার তাহার দেখিয়া যাওয়া উচিত ছিল! আমাদের পিতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতে মর্ম্মবেদনা দ্বিগুণিত হইবার ভয়ে যদি সে আসিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগও ত তাহার সম্যক্ বিদিত ছিল।

চিন্তা করিতে করিতে একবার যেন গোপালকে সম্বোধন করিলাম— একবার যেন বলিয়া উঠিলাম—"অকৃতজ্ঞ! আমাদিগের উপর ক্রোধে তোর 'মা'কে এইরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তুইই বা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিস্? নির্দ্দয় একবার আয়, নিদ্রিত মা তোকে স্বপ্নের ভাষায় "গোপাল" বলিয়া ডাকিতেছে, একবার তাকে দেখিয়া যা।"

কি আশ্চর্য্য! সম্বোধন মাত্র মনে হইল যেন গোপাল গৃহ মধ্যে আসিয়াছে। আসিয়া কোমল করপল্লবে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে।

চমকিয়া উঠিলাম! একবার গৃহের চারিদিক চাহিলাম! নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতিহীন দীপ, মমতাহীন বায়ু সাগরে পড়িয়া যেন মরণযন্ত্রনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। মৃত্তিকাশয্যায় ঝীদুইজন ঘুমাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক দীর্ঘশ্বাসে দুরভিগম্য স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন কি এক অননুমেয় দুঃখময় সমাচার জাগরিতের রাজ্যে বহন করিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি জাগরণে মস্তিষ্ক-বিকার অনুমান করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম প্রভাত হইতে অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে।

প্রভাত হইতে না হইতেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই মাতার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ভালমন্দ কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল বলিলাম—"আমি কেমন করিয়া বলিব!"

ডাক্তার। এখনও প্রাণ আছে কি না আছে, জানিতে আসিয়াছি।

আমি। তাহাও বলিতে পারি না।

ডাক্তার। মূর্খের মত কথা কহিও'না। শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কিনা, দেখিয়া এস।

আমি। আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আপনিই দেখুন না।

ডাক্তার। এই সামান্য কার্য্য তুমি করিতে পারিবে না! কাল মনের আবেগে শুধু তোমাকে তিরস্কারই করিয়াছি। মাকে বোধ হয় ভাল করিয়া দেখি নাই; কোন ঔষধ দিই নাই! হয়ত রোগ নির্ণয়ে আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। তাই যদি হয়, যদি মা এখনও জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি নিজে সাহেব ডাক্তারকে লইয়া আসিব। বিলম্ব করিওনা। শীঘ্র দেখিয়া—শুধু দেখিয়া নয়—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, এখনি আমাকে সংবাদ দাও। তোমার পিতা এখানে নাই, কর্ত্তব্যের ভার আমার মাথায় রহিয়াছে।

আমি তখনই ছুটিয়া বাটীর মধ্যে গেলাম। মাতার শ্বাস পরীক্ষা করিলাম। অতি ক্ষীণভাবে নিশ্বাস পড়িতেছিল।

ডাক্তার বাবুকে সেই সংবাদ দিলাম। তিনি আর কোনও কথা না কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি পিতাকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইলাম।

* * * *

সমস্তদিন অতিবাহিত হইয়াছে। সাহেব ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার বাবু যথাসময়ে আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে ভ্রম করেন নাই। মায়ের সন্ন্যাসরোগ-দুশ্চিকিৎস্য। ডাক্তারেরা ঔষধেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঔষধ গলাধঃকৃত হয় নাই।

আমি দৈব-প্রেরিত ঔষধের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—অন্যথা প্রতি-মুহূর্ত্তে মাতার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছি।

সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মাতার অবস্থাও দণ্ডে দণ্ডে হীনতর হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে দুই একবার হাত পা নাড়িতেছিলেন; এখন তাও আর নাই। গোপাল আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পিতাও বুঝি মাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না!

ডাক্তার বাবু সন্ধ্যায় আর একবার আসিলেন; নাড়ীপরীক্ষা করিলেন। তারপর বলিলেন—"প্রভাতে কেমন থাকেন, সংবাদ দিও, সংবাদ দিলে আসিব।"

বুঝিলাম, কাল আর তাঁহাকে রোগী দেখিবার জন্য আসিতে হইবে না। তথাপি হৃদয় বাঁধিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"নাড়ী কেমন দেখিলেন?" রুমালে চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কি আর মাথামুণ্ড তোমাকে বলিব!"

আমি কিন্তু কাঁদিলাম না। মাতৃঘাতীর হৃদয় পাইয়াছি—চক্ষে জল আসিল না। আবার প্রশ্ন করিলাম—"তবে কি নাড়ী নাই?"

ডাক্তার বাবু উত্তর করিলেন—"নাই।"

গোপালের কথা, পিতাকে সমাচার দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, এবং রোগীর পার্শ্বে একজনকে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া, ডাক্তার বাবু উঠিয়া গেলেন। আমি নিজেই সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। ঝী দুইজনকে অন্যঘরে যাইতে আদেশ করিলাম। বলিলাম—"অধিক লোক এঘরে থাকিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন বুঝি ত ডাকিব।"

দ্বাররুদ্ধ করিতে যাইতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল

—"দরোয়ান ফিরিয়াছে, কিন্তু একা ফিরিয়াছে—কাকাবাবু অথবা শ্যাম বাবু কেহই আসেন নাই।"

মনে করিলাম, বুদ্ধিহীন দরোয়ান দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই। গ্রাম স্থির করিতে না পারিয়া সে বৃথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যদ্যপি সংবাদ পাইয়াও গোপাল ও শ্যাম না আসে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর আমার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হইবে। মনে স্থির করিলাম, এরূপ হইলে গোপালের মাসহারা বন্ধ করিয়া দিব, আর শ্যামকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

বাহিরে গিয়া দরোয়ানের সহিত দেখা করিলাম। তাহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। কেন হইলাম, সে কথা এখন বলিব না।

(১৯)

দরোয়ান আমাকে যাহা বলিল, সে কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে, আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। বলিলাম পিতা পর্য্যন্ত যেন একথা জানিতে না পারেন।

এমন কি সে কথা গোপন রাখিতে আমি তাহাকে মিথ্যার সাহায্য লইতে বলিয়াছি। তাহাকে শিখাইয়াছি, সে আমাদের পৈত্রিক বাসভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। পথ ভুলিয়া অন্যগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে।

এখন হইতে মাতার জন্য মর্ম্মযাতনা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিল। এক একবার মনে হইল, এরূপ গৃহে এরূপ সাধ্বীর থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

মাতার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া স্থির হৃদয়ে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ভৃত্য ও দাসী ঘর আগুলিয়া বসিয়াছিল। তাহারা আমার আদেশে গৃহত্যাগ করিল।

সারারাত্রি জাগিব বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু বসিয়া বসিয়া কখন যে নিদ্রায় মায়ের পদপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।

নিদ্রায় কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম!

আমি যেন আমার ঘরের পালঙ্কের উপর বসিয়া আছি। মা যেন আমারই গৃহের এক কোণে মেজের উপরে শুইয়া আছেন। মাকে দীনার ন্যায় মৃত্তিকার উপরে পতিত দেখিয়া, আমার মনে কেমন একটা অকথ্য যাতনা হইতেছে! আমি ডাকিতেছি—"মা উঠ" "মা উঠ"! কতবার যে মাকে সম্বোধন করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। চীৎকারে আমার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে, মা যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার কথা কাণে তুলিতেছেন না। উঠিয়া গাত্রস্পর্শে মাকে যে উঠাইব, সে শক্তি আমার নাই। কে যেন দড়ী দিয়া আমাকে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমি দড়ীটা খুলিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছি, ততই যেন দড়ীর পাকে পাকে বেশী করিয়া জড়াইতেছি।

হতাশ হইয়া একবার কড়ি কাঠের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম ছাদ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশে অসংখ্য তারা অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া করুণার্দ্র হইয়া, যেন আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। তাহার মধ্যে একটী তারকা কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল! তাহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন করুণ-কিরণ-প্রবাহে তাহার প্রাণ গলিতেছে। সেই অনন্ত দূর হইতে সূক্ষ্ম সুধা ধারার ন্যায় তাহার করুণাগীতি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। "তোমাকে

দেখিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছি। এই দেখ আমি কাঁদিতেছি। কিন্তু ওগো, আমি অনেক দূরে—এই অন্ধকার প্রাচীর ভেদ করিয়া আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেছি না।”

তাহার করুণ ক্রন্দন ধরার সমীরণ ব্যাপ্ত করিল। আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানের বৃক্ষপত্রে, লতারন্ধ্রে, সরসীর জল-কল্লোলে, ঝিল্লী-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল—“ওগো! আমি অনেক দূরে! ওগো! আমি অনেক দূরে!”

আমি কাঁদিলাম, কেবল কাঁদিলাম। কি চাই বুঝিতে পারিলাম না; বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন মর্ম্মবেদনায় কাঁদিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কাঁদিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখন মনে হইতেছে, তাহা যেন কত বৎসর, কতযুগ!

কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলাম, সেই করুণাময়ী তারা যেন নিজ কক্ষে জ্বলিতেছে। তাহার জ্যোতিতে সমস্ত উদ্যান, তরুলতা, উদ্যান মধ্যস্থ সরসী সলিল সমস্ত স্থান বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

আমার বোধ হইতেছে, দেবী আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু আমি যেন তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিতেছি না বলিয়া, তিনি আসিতে পারিতেছেন না।

মন বলিতেছে, “এস মুক্তিদায়িনি! আসিয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত কর।” কিন্তু কথা ফুটিতেছে না—কথা কহিতে কে যেন গলা চাপিয়া ধরিতেছে।

বহুক্ষণ পরে ভূমিশায়িনী মাকে মনে পড়িল। চাহিয়া দেখি মা পূর্ব্বের মতন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন।

অতি কষ্টে মুখ হইতে কথা ফুটিল। সে যে কি কষ্ট তাহা কাহাকে বুঝাইব। আমার মনে হয়, একটী কথা কহিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে

আমি দেহের প্রতি স্নায়ুর পায়ে ধরিয়াছি। কথার সঙ্গে বোধ হইয়াছে যেন প্রাণ বাহির হইতেছে। বলিলাম—"দেবি মাকে জাগাইয়া দাও।"

অমনি সেই তারকা কৌমুদী-কান্তিতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আকাশসাগরে ভাসিতে ভাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল। রূপ-জ্যোতি ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, আমি আর তার দেখা সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

চক্ষু নিমীলনের পরক্ষণেই মায়ের মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি, মা পঞ্চমবর্ষীয়া গোপালকে কোলে করিয়া আমার শর্য্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নীলবসনা এক রমণী। নীলাবরণ ভেদ করিয়া তাহার রূপ সমস্ত ঘরটার ভিতরে যেন ঢেউ খেলিতেছে।

দেখিয়াই আমার বোধ হইল, অতি আগ্রহে যাহাকে তারকাজ্ঞানে আবাহন করিয়াছি, তিনি আমার ঘরে আসিয়া এই রূপ ধরিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনি কে মা ?"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমিই অনুমান করিয়া বল না।"

আমি বলিলাম—"গোপালের মা।" কে যেন ভিতর হইতে কথাটা শিখাইয়া দিল।

মা বলিলেন—"ঠিক চিনিয়াছ। তাঁহাকে প্রণাম কর। উনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন।"

আমি। কোথায় যাইবে ?

মা। আমি জানি না, খুড়ীমাকে জিজ্ঞাসা কর।

আমি শয্যাতে বসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"মাকে কোথায় লইয়া যাইবেন ?"

তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আকাশ দেখাইলেন ; মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বুঝিলাম, মা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। কেমন করিয়া মাকে ফিরাইব ?

এ অযোগ্য সন্তানের চক্ষুজল মায়ের গন্তব্য পথ কর্দ্দমাক্ত করিয়া মাকে কি প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে ? গোপাল ! তোকে সম্বোধন করিবার মুখ রাখি নাই। তুই কি দয়া করিয়া আমার মাকে ফিরাইয়া দিবি ?

এতক্ষণ গোপাল মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়াছিল। আমার কথা শুনিয়াই সে মাথা তুলিল। মাকে বলিল—"মা ! ফিরিয়া চল।"

দেখিলাম, মা যথার্থই ফিরিতেছেন ; কিন্তু যেন কত অনিচ্ছায়। মুক্ত-হরিণী পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইতে যেরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করে—সেইরূপ অনিচ্ছায়, কতই কষ্টে যেন তাঁহার গৃহ-কারাগারে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন !

ধীরে ধীরে আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, মাতা গোপালকে কোল হইতে ভূমিতে রক্ষা করিলেন।

অঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াই গোপাল বাল্যচাপল্যে আমার শয্যার উপরে লাফাইয়া উঠিল ; এবং সসব্যস্তে আমার বন্ধন মোচন করিতে লাগিল।

গোপাল যখন বন্ধন মোচন কার্য্যে ব্যস্ত তখন মা আমাকে বলিতে লাগিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কর যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আমার কাছে গোপালের নাম মুখে আনিবে না ?"

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা আবার বলিলেন—"এই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর, তুমি যা শুনিলে, তা তোমার পিতার কাছে কখনও প্রকাশ করিবে না ?"

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা শুনিয়া বলিলেন—"তবে আমি ফিরিলাম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

দাদাম'শায়ের ঝুলি।

(২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবকাশ অতি অল্প। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহাকে নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাই মধ্যে কয়েক দিন তিনি ব্যোমকেশ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত সায়াহ্নে সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। অদ্য একটু অবসর পাইয়া তিনি পুনরায় আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যোমকেশ। দাদা'মশায়, আপনার সঙ্গে ভাব করা আর দেখ্‌চি পোষায় না। রোজই আপনার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকি, আপনি কিন্তু একেবারেই নিরুদ্দেশ। বলি, যদি এতটাই মনে ছিল, তা'হলে কেন মিছামিছি আমাদিগকে এতদিন ছলনা কর্‌লেন?

ভট্টাচার্য্য। না রে রাগ করিস্‌নে। বুড়োমানুষ একলা সকল দিক সাম্‌লে উঠ্‌তে পারি নি। আচ্ছা আর তোদের দরবারে হাজির হওয়া কখনও বন্ধ হবে না। এখন আমাদের কথাবার্ত্তা কত দূর হয়েছিল বল দেখি?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞে, আপনি জীবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে আলোচনা একপ্রকার শেষ করেছিলেন, এবং অতঃপর প্রেততত্ত্ব আরম্ভ কর্‌বেন বলেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য। ভাল কথা; তোদের বোধ হয় মনে আছে যে, মানুষ যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক ভোগ করে। এর মধ্যে যে টুকু ভূর্লোকে বাস সেই টুকুই আমরা সাধারণতঃ মানবজীবন নামে

অভিহিত ক'রে থাকি। পার্থিব জীবনের অবসানে জীবাত্মার স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়। এরি নাম মৃত্যু। স্থূল শরীরের অপর নাম অন্নময় কোষ। স্থূল শরীরের পরে সূক্ষ্মশরীর। বোধ হয় স্মরণ আছে, প্রাণময়কোষ ও মনোময়কোষ নিয়ে সূক্ষ্মশরীর গঠিত। তার মধ্যে প্রাণময়কোষ দ্বারা যে কাজ সাধিত হয়, সেটা আগে বোঝ্। যাকে তোরা ঈথর (Ether) বলিস্, সেই ঈথর হচ্চে এই প্রাণময়কোষের উপাদান এবং জীবিতকালের সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া এই প্রাণময়কোষ সঞ্চারী প্রাণবায়ুর কার্য্যমাত্র। আমার বোধ হয়, তোদের বিজ্ঞানশাস্ত্রও সিদ্ধান্ত করেচে যে, জাগতিক শক্তিমাত্রেই ঈথর পদার্থের সঞ্চালন মাত্র। যত দিন পরমায়ু থাকে, ততদিন প্রাণময়কোষটি স্থূলশরীর বা অন্নময়-কোষের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে এবং উহার সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন করে। পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে উহা আস্তে আস্তে স্থূলশরীর হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন স্থূলদেহটি বিবর্ণ ও অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আত্মীয় স্বজন তখন সেই দেহটাকে ল'য়ে বিষম কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, যেন সেই অস্থিমাংসের পিণ্ডটাই তাদের সর্ব্বস্ব। বাস্তবিক মানুষটি কিন্তু তখন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েচেন এবং নিজের দেহ হ'তে পার্থক্য ও আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্চেন। সে কথা থাক্।

মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই প্রাণময়কোষটি আবার সূক্ষ্মদেহের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। একটু চিন্তা কর্‌লেই এর হেতু উপ-লব্ধি হবে। যতদিন স্থূলদেহ ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সেটির পরিচালন কার্য্য সাধনের জন্য এই প্রাণময়কোষের দরকার ছিল। স্থূলদেহের পতন হ'লে এর কাজ ফুরিয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে এটি তফাৎ হয়ে পড়ে। যে প্রাণশক্তি এতে কার্য্য কচ্ছিল, সে তখন মহাপ্রাণ সমুদ্রে

মিশে যায় এবং তাহার আধারকোষটি শবাকার স্থূলদেহের নিকট দ্বিতীয় শবদেহের মত প'ড়ে থাকে। পরে স্থূলদেহের দাহ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটিও একবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।

অতঃপর যা ঘটে, তা মন দিয়ে শোন। প্রাণময়কোষটির পতন হ'লে জীবাত্মার যে অবস্থা হয়, তার নাম প্রেতাবস্থা এবং এই অবস্থায় যে লোকে উপস্থিত হয়, তার নাম প্রেতলোক।

ব্যোমকেশ। দাদা'মশায়, এ আবার কি নূতন কথা বল্‌চেন। পূর্ব্বেতো বলেছেন, যে ভূর্লোকের পর ভুবর্লোক। এখন আবার প্রেতলোক কোথা হ'তে এল ?

ভট্টাচার্য্য। যাকে আমি প্রেতলোক বল্‌চি, সেটা ভুবর্লোকেরই একটা অংশ মাত্র। কিন্তু অংশ বল্‌লে কথাটা ঠিক বোঝা যায় না। ভুবর্লোকে বাসকালে জীবাত্মার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তার মধ্যে মৃত্যুর পরেই যে অবস্থা, সেই অবস্থা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই প্রেতাবস্থা। প্রেত কারে বলে বলি শোন। যে মানুষের স্থূল শরীরটা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু যা'র সাধারণ-মানব-সুলভ কাম ক্রোধ আদি নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, মৃত্যুর পর তার যে অবস্থা হয়, তাহার নামই প্রেতাবস্থা। এ অবস্থার বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, এ অবস্থার মনোময়কোষটির উপাদানগুলি ভেঙ্গে চুরে একটি নূতন শরীর গঠিত হয়। এই শরীরটির নাম ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহ। জীবাত্মা এই শরীরের মধ্যে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে এবং তাহার ঊর্দ্ধগতি কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়। যতদিন এই শরীরে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে, ততদিন তাকে বিশেষ যাতনা অনুভব কর্ত্তে হয়। সেইজন্য এই প্রেতাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং সেই কারণেই আমাদের দেশে প্রেতাবস্থা হ'তে মৃত আত্মীয়কে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য এত চেষ্টা, এত

ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধ তর্পণ যা কিছু বল, সব সেই উদ্দেশ্যে। সে সব কথা পরে বিস্তারিত ক'রে বল্‌ব।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়ের কথাটা সম্প পরিষ্কার ক'রে বুঝে উঠ্‌লাম না। তবে কি মানুষ মাত্রেই ম'রে এই প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হবে এবং এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ কর্ব্বে না কি? এত বড় সুবিধা মনে হচ্চে না।

ভট্টাচার্য্য। ওরে রাজার রাজ্যে জেলখানা আছে, দারোগা আছে, তাতে চোর ডাকাতেরই ভয়, ভাল মানুষের কি? কথাটা একটু তলিয়ে বোঝ্‌। একটু আগেই আমি বল্লাম না যে, যাদের কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, মৃত্যুর পর তাদেরই এই অবস্থা ঘটে। অবিশ্যি ঠগ বাছ্‌তে গাঁ ওজড় বটে; কিন্তু সংসারে কি আর এমন লোক নেই, যিনি আজীবন কুপ্রবৃত্তি দমন কর্‌বার চেষ্টা ক'রে এসেছেন? এবং শাস্ত্রও সদাচার নির্দ্দিষ্ট পথে যথাসাধ্য চল্‌বার জন্য যত্ন করেছেন? এই শ্রেণীর লোক আর যারা কেবল কামক্রোধ লোভের সেবা ক'রে এসেছে, এই উভয়ের মৃত্যুর পরের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। যিনি সৎপথে চলেছেন এবং প্রবৃত্তি দমন ক'রে এসেছেন, জীবিত কালেই তাঁর মনোময়কোষ ক্রমশঃ অবিশুদ্ধ উপাদান বর্জ্জন ক'রে বিশুদ্ধ উপাদান সংগ্রহের দ্বারা সংশোধিত হয়েচে। কাজেই ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহ গঠিত হ'তে পারে, এরূপ উপাদান তাদের মনোময়কোষে হয় আদৌ থাকে না কিংবা এত অল্প থাকে যে, তাতে বিশেষ কিছু একটা প্রতিবন্ধক ক'রে উঠ্‌তে পারে না। কাজেই এই শ্রেণীর লোক মৃত্যুর পরে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেটা ভুবর্লৌকিক অবস্থার অন্তর্গত হ'লেও প্রেতাবস্থা নয়। কিন্তু যারা আজীবন বাসনার অনলে আহুতি দিয়ে এসেছে এবং ইন্দ্রিয় সেবা ক'রে এসেছে, উৎকট কামক্রোধ লোভদ্বেষ হিংসা ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তি সকলের দাসত্ব কর্ত্তেই যাদের জীবন কেটেছে, তাদের মনোময়কোষ

গুলি অতিমাত্র অবিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট হ'য়ে থাকে এবং মনোময়কোষের সেই অবিশুদ্ধ ভাগ মৃত্যুর পরে নূতনরূপে বিন্যস্ত হ'য়ে একটি লৌহ পিঞ্জরের ন্যায় সুদৃঢ় শরীরের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সেই আজন্ম পাপাচারী জীবাত্মা আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে অতিমাত্র ক্লেশ পায়। তা'হলেই কথা হচ্চে, যে ব্যক্তি সারাজীবন বা জীবনের কোন কালে উৎকট পাপাচরণ করেছে এবং কোন সময়েই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তজন্য চেষ্টাবান্ হয়নি, তারই মৃত্যুর পর প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সাধু প্রকৃতি, তার নয়; কারণ যাতে প্রেতদেহ রচিত হ'তে পারে, এরূপ উপাদান সাধু প্রকৃতি ব্যক্তির মনোময়কোষে থাকে না বল্‌লেই হয়। কথাটা বুঝ্‌লি কি?

ব্যোমকেশ। দাদা মশা'য়! ঐ যে অবিশুদ্ধ-বিশুদ্ধ উপাদান বর্জ্জন-গ্রহণ করার কথা বল্লেন, ওঁটা ঠিক বোঝা গেল না। ও সব কি? একটু যদি খোলসা ক'রে বুঝিয়ে বলেন, ত' ভাল হয়।

ভট্টাচার্য্য। ওরে তোরা সব সায়েণ্টিফিক (Scientific) মনিষ্যি তোদের এগুলো বুঝ্‌তে কষ্ট হয় কেন, আমি বুঝতে পারিনি। তোদের ফিজিকেল (Physical Science) কি বলে? স্থূল শরীরটা কি চিরদিন একই জিনিষ থাকে, না পরিবর্ত্তন হয়?

ব্যোমকেশ। সেত সবাই জানে, নানা রকম শারীরিক ক্রিয়ার জন্য দেহের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হ'চ্চে এবং আমরা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য থেকে নূতন উপাদান সংগ্রহ ক'রে সেই ক্ষতি রোজ রোজই পূরণ কর্চ্ছি।

ভট্টাচার্য্য। বলি ঐ সূত্র ধ'রে আর একটু এগিয়ে গেলে ত কথাটা বুঝ্‌তে পারিস্। যেমন চলা ফেরা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়ার আশ্রয় স্থূল-দেহ, তেম্নি কাম, ক্রোধ, লোভ, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে মনোময়কোষ। যেমন চলা ফেরা ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি হয়, তেম্নি কাম,

ক্রোধ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মানসিক ব্যাপারের দ্বারা মনোময়কোষের পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি হয়। আহার্য্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে স্থূল শরীরের গঠনের বিভিন্নতা হয়। যেমন যে ব্যক্তি কেবলই পেঁয়াজ, রসুন, গোমাংস, পচা জিনিষ ইত্যাদি খায়,তা'র একরূপ স্থূল শরীর আর যে ব্যক্তি গব্যঘৃত, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ জিনিষ দিয়ে শরীর পুষ্ট করে, তার একরূপ শরীর। দু'জনেরই স্থূল শরীর বটে, কিন্তু উপাদানের বিভিন্নতা ও কার্য্যকারিতা এ হিসাবে এ দু'য়ের বিশেষ-তফাৎ। মনোময়কোষ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে ব্যক্তি অনবরত সচ্চিন্তা করে ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হয় এবং কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য যথার্থ উদ্যম ও যত্ন করে, কুপ্রবৃত্তি পোষণ উপযোগী মনোময় প্রকৃতির উপাদানগুলি কাজ কর্ব্বার অবকাশ না পে'য়ে ক্রমশঃ তার মনোময়কোষ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে এবং সচ্চেষ্টা ও সদিচ্ছা দ্বারা আকৃষ্ট উচ্চশ্রেণীর উপাদান গুলি এসে তাদের স্থান অধিকার করে, ক্রমাগত এইরূপ ভাবে জীবন যাপন কর্ত্তে কর্ত্তে তার মনোময়কোষটি ক্রমশঃ বিশুদ্ধি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সারা জীবন কেবল পাপচিন্তা ও পাপাচরণ ক'রে এসেছে, তার মনোময় কোষ হ'তে সচ্চিন্তা ও সচ্চেষ্টা-পোষণোপযোগী উৎকৃষ্টজাতীয় উপাদান-গুলি ক্রমশঃ খসে পড়ে এবং ত'াদের জায়গায় যত নিকৃষ্টজাতীয় পরমাণু এসে জমা হয়। এরূপে তা'দের মনোময়কোষের ক্রমশঃ অবিশুদ্ধি ঘটে এবং মৃত্যুর পর এই অবিশুদ্ধ মনোময় কোষ ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহে পরিণত হ'য়ে, সেই পাপাচারী জীবাত্মার প্রেতাবস্থার পিঞ্জর স্বরূপ, এবং তা'র অশেষ ক্লেশের কারণ হয়।

ব্যোমকেশ। দাদা মশা'য়! পাপাচারী মানবের মনোময়কোষ মৃত্যুর পরে তা'র ক্লেশের কারণ হচ্ছে, এটা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

ভট্টাচার্য্য। কথামালা কখনও প'ড়েছিলি? সেই সারস ও

শৃগালের গল্পটি কি মনে আছে? শৃগাল যখন সারসকে নিমন্ত্রণ ক'রে মৃৎপাত্রে ঝোল রেখে "সখে এস, ভোজনে বসা যা'ক" ব'লে সেই ঝোল চাটুতে সুরু কল্লে, তখন সেই দীর্ঘ চঞ্চু বিশিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত সারসের মনের অবস্থাটা কিরূপ হ'য়েছিল? ভেবে দেখ্ দেখি। সে কি শৃগালের তৃপ্তি ও নিজেই সেই তৃপ্তিলাভের অক্ষমতা যুগপৎ অনুভব ক'রে দারুণ কষ্ট পায় নি?

ব্যোমকেশ। দাদা মশা'য়ের এ ধান্ ভান্তে কি শিবের গীত হ'ল, তা এ অধমের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ কল্লে না। বলি, হেঁয়ালি ছেড়ে একটু সাদা কথায় বল্লে কি ভাল হয় না? আমি জান্তুম, বয়সের সঙ্গে রসের পরিপাক হয়!

ভট্টাচার্য্য। তোর যদি রসে এত অরুচি, তবে নাত ব'য়ের সঙ্গে ঘর করিস্ কি ক'রে। তা ভাল, তোর যেরূপে পছন্দ হয়, সেই রকমেই আমি বল্‌চি। মানুষের স্থূল শরীরের সঙ্গে তার মনোময় কোষের যে কি সম্বন্ধ, সেটা বেশক'রে বুঝে দেখ্। আমার একটা মনে মনে লোভ হ'ল যে, তোদের দোফলা গাছের পাকা আমটা পেড়ে খাই, ভারি লোভ, কিছুতেই সামলান যাচ্ছে না। এই যে মানষের ব্যাপারটা হচ্ছে, এত হচ্ছে মনোময়কোষের কাজ। কিন্তু যখন আমটি পেড়ে খেতে হ'বে, তখন এই বেপথুমান্ জীর্ণশীর্ণ দক্ষিণ বাহুটির এবং এই প্রাণ প্রিয়তম লাঠি গাছটির বিশেষ দরকার। কেমন?

ব্যোমকেশ। আঃ! দেখচি আম্‌টা আর আমাদের ভোগে নেই। সেটা আপনাকেই দেওয়া যাবে। কিন্তু তার পরে কি বলুন।

ভট্টাচার্য্য। দেখিস্, তোর এ (Noble) "নোবল" "(Resolution)" "রেজোলিউস্নটা" যেন উপে না যায়! কথাটা হচ্ছে এই। স্থূল শরীরটা একটা যন্ত্র, মন তার যন্ত্রী। মন যা' ইচ্ছে ক'রে, হা'ত পা প্রভৃতি স্থূল

শরীরের কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ সে গুলি নানা স্থান থেকে আহরণ ক'রে নিয়ে এসে দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেগুলি জীবাত্মার কাছে পৌঁছে দেয় এবং তিনি সে গুলি আস্বাদন ক'রে তৃপ্তিলাভ করেন। এর নাম হ'ল ভোগ। এখন মনে কর, এক ব্যক্তি বারাঙ্গনা রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হ'য়ে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন ক'রে এসেছে। এই যে মোহিত হওয়া ও কামের তাড়না অনুভব করা, এ গুলা মনের কাজ এবং মনোময়কোষের দ্বারা সাধিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু এর তৃপ্তি বা চরিতার্থতা হয়, স্থূল শরীরের সাহায্যে। এখন ভেবে দেখ, যখন সেই মানুষটা মর্‌বে তখন কি হ'বে? মৃত্যুর পর তার মনে সেই কামের তাড়না সমান ভাবেই থাক্‌বে, কারণ আজীবন সে শুধু তা'ই দিয়ে মনকে গঠিত এবং মনোময়কোষকে পুষ্ট ক'রে এসেছে। কিন্তু এখন আর সে স্থূল শরীর নেই, যে সুন্দরী রমণী উপভোগের দ্বারা তা'র সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়। কাজেই এখন তা'র অবস্থা কি? এক দিকে তার প্রবল লালসা, অপরদিকে সেই লালসার তৃপ্তি সাধনে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব জনিত অক্ষমতা বোধ; ফল, উৎকট যন্ত্রণা। সেই কথামালার সারসের অবস্থা। এখন বুঝ্‌লি কি? যে সমস্ত লোক সারা জীবন বাসনানলে ঘৃতাহুতি দিয়ে এসেছে, তা'র মৃত্যুর পরে স্থূল শরীরের অভাবে সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ আর না পেয়ে কেন যন্ত্রণায় ছটফট করে? ভুবর্লোক বাসের প্রথমাবস্থায় জীবাত্মা যতদিন এই অতৃপ্তকামনা জনিত দুঃখানলে দগ্ধ হ'তে থাকে, ততদিন তা'কে প্রেতবলে এবং যতদিন তার এই অবস্থা থাকে, ততদিন সে তা'র সেই নবরচিত ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ভুবর্লোকের অপর কোন অংশ বা অবস্থার মৃত্যুর পর যে দিকে তার গতি সুরু হ'য়েছে—পরিচয় বা আস্বাদন পায় না। সেই জন্য যতদিন

প্রেতাবস্থা ততদিন তার যেন একটা স্বতন্ত্র লোকে বাস গোছের হয় এবং এই জন্যই "প্রেতলোক" ব'লে একটা নূতন আখ্যার উৎপত্তি হ'য়েছে। নরক টরক যা কিছু শুন্‌তে পাস্‌, সবই এই প্রেতাবস্থা বা প্রেতলোকের অন্তর্ভূত।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, প্রেতাবস্থা কি ক'রে হয় এবং কা'রই বা হয়, সেটা যেন কতকটা বুঝ্‌লেম। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন থাকে? এবং কি ক'রেই বা এ হ'তে জীবাত্মার মুক্তি হয় এবং নরকের ব্যাপারটাই বা কি, এই সব কথা একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে না ব'ল্লে আমার কৌতূহল চরিতার্থ হ'চ্ছে না।

ভট্টাচার্য্য। ভায়া! তোমার এখন নবানুরাগ; ফুলশয্যার রেতে বুড়ের ইচ্ছে সারা রাত গল্প করি। কিন্তু মনে রেখ, আমি একটা বুড় মানুষ। তাতে আবার আজকে আফিমটা ভুল হ'য়ে গেছে, অতএব দয়া ক'রে আজ যদি ছুটী দিস্‌, তা' হলে প্রাণটা বাঁচে। কাল না হয়, আবার দেখা যাবে।

ব্যোমকেশ। আফিম ভুল হ'য়েছে, কিন্তু মৌতাতের ত কিছু কম দেখি না। তা যান্‌, আজ ছুটী দেওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মলয়ানীল শর্ম্মা।

যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পত্র।

সেই অতি গাঢ় অন্ধকারে, কতক্ষণ যে আমি পড়িয়াছিলাম, তাহা জানি না। সেই ভীষণা শর্ব্বরী যে কতকাল স্থায়িনী, তাহাও আমার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। কেবল এইমাত্র জানি, সেই সূচি-ভেদ্য, মসীমেয় তিমিরের মাঝারে ভেকের মত পড়িয়াছিলাম, আমি একা। সেই কঠিন, তুষার-শীতল, গিরি-কন্দরে, কুঞ্চিত কলেবরে আমি একা দুঃখরজনী অতিবাহিত করিতেছিলাম। যদিও আমি একা ছিলাম, আমার কিন্তু, শান্তি ছিল না। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাতে, তীরস্থ পর্ব্বতমালা যেমন চূর্ণবিচূর্ণিত হয়, অতীত জীবনের ঘটনারাজি সেইরূপ আমার হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছিল। একটীর পর আর একটী ঘটনা, এক পাপ চিত্রের পর, আর একটা পাপের চিত্র, আমার প্রাণকে অধিকার করিতেছিল। জীবিতকালে তাহাদিগের ত অনেক-গুলিকেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম! তবে তাহারা আমাকে লুকাইয়া কোথায়, কোন নিভৃত প্রকৃতিক্ষেত্রে, অদৃশ্য হইয়াছিল! আমার বাহিরে, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার থাকিলে কি হয়? সে প্রাণিচিহ্নবিবর্জ্জিত স্থানে আমি একাকী ছিলাম, তাহাতেই বা কি? বাহিরে অতি গভীর অন্ধকার, কিন্তু অন্তরে কি অত্যুজ্জ্বল আলোক! সেই আলোকে অতীত জীবনের প্রত্যেক প্রত্যবায়, অতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। আমার ব্যর্থজীবনে, প্রতি পদস্খলন ব্যাপারে, যত লোক, যত জীব, সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহারা

সকলেই আমার অন্তরে বর্ত্তমান। আমার বিগত জীবন-নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা, প্রত্যেক অভিনেত্রী, আমার হৃদয়মঞ্চে উপস্থিত, আমি আমার অতীত জীবনের পুনরভিনয় করিতেছিলাম। ইহাতেই তোমরা বুঝিতেছ, আমার কি যন্ত্রণা।

অবশেষে সেই নিশার অবসান হইল। অতি ধীরে, তমিস্র-প্রাচীর ভেদ করিয়া, যেন উষার আলোকরশ্মি দেখা যাইতে লাগিল। হে পৃথিবীবাসি, সাবধান! আমি উষার আগমন বলিলাম, ইহাতে যেন তোমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইও না। ইহা তোমাদিগের নানা পুষ্পভারে সজ্জিত, রক্তিম মেঘ-রঞ্জিত, স্নিগ্ধ-পাটল-রশ্মি শোভিত, মর্ত্ত্যের উষারাণী নহে। ইহা অন্ধকারময়ী উষা। যে রজনীর কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, রজনীর অন্ধকার অধিকতর গাঢ়। পূর্ব্বেই ত আমি এখানকার দিবাকে কাক-জ্যোৎস্না বলিয়া আসিয়াছি। সে দিবালোক, যে প্রকারেরই হউক, আমি এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সহসা আশান্বিত হইলাম। আশার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণে এক প্রকার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম যা কিছু আনন্দবোধ। এইরূপে দিবাগমন প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে হইল যেন একটা ছায়া,—যেন বিস্মৃতিরূপী এক খণ্ড মেঘ, আমার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিল। তোমরা মানব, জ্ঞানের অহঙ্কার লইয়া আছ, তোমরা স্তম্ভিত হইও না, আমি বিস্মৃতিটাকে সুখের রূপান্তর বলিয়া ভাবিয়া লইলাম। আমরা এখানে ইহার অধিক সুখ অনুভব করিতে পারি না। আহা এই বিস্মৃতিও যদ্যপি প্রকৃত হইত! শীঘ্রই বুঝিয়াছিলাম, সেটাও কাল্পনিক। আবার সবই আমার স্মরণে আসিয়াছিল।

দিবা আসিল। আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু তাহাতে কি? সেই ক্ষীণ আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণে বাঁচিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়া উঠিল। আমার সঙ্কুচিত দীন অঙ্গসমষ্টিকে প্রসারণ করিলাম। দেখি গত নিশার হিমানী শৈলের কঠিন ও সঙ্কীর্ণ পিঞ্জর আর নাই! যে দিক হইতে আলোকরশ্মি আসিতেছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। কতক্ষণ বা কতদূর যে এইরূপে ছুটিলাম, তাহা জানি না। দেখিলাম, আমার চতুর্দ্দিকেই নরকের বীভৎস মূর্ত্তি। নরক কতরূপ ভীষণ আকার লইয়া আমার যে ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় কি ফল! সেই ক্ষীণ আলোক অয়স্কান্ত পাষাণের মত আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। আশ্রয়শূন্য অতি ভীষণ প্রান্তরে আমার লক্ষ্য ছিল, কেবল সেই অস্পষ্ট আলোকরেখা। অবশেষে আমার একটা বিশ্রানস্থান মিলিল। বিশ্রামস্থান! হে পৃথিবীবাসি, আবার বলি, আমার এই সমস্ত নিরর্থক বাক্যপ্রয়োগে ভ্রমে নিপতিত হইও না। আমার জীবিতদশার সংস্কার বশতঃই আমি এই অর্থহীন কথার ব্যবহার করিতেছি। তোমরা যে অর্থে বিশ্রাম বুঝ, তাহা এই যন্ত্রণাকুণ্ডে কোথায়! যে বহিঃশক্তির আকর্ষণে আমি তীব্র গতিতে ছুটিতেছিলাম, একস্থানে আসিলে সহসা তাহার বিরাম হইল। আমি দেখি, আমি দণ্ডায়মান রহিয়াছি। ইহাকেই বিশ্রাম বলিয়াছি।

সেই স্থানে আসিবামাত্রই, চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু ও প্রাণীর উপর আমার লক্ষ্য পড়িল। যাহা দেখিলাম,—সেই অকিঞ্চিৎকর ঐন্দ্রজালিক জীবকুল ও স্থল,—আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে তদুপযোগী করিলাম। তাহাদিগের যেমন আচার, যেমন কার্য্য, আমিও সেইরূপ করিতে লাগিলাম। সকলেরই একপ্রকার ব্যবহার, অথচ সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র ছিল। নরক পৃথিবীরই বিকট, বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি! আমি তাহা বুঝিয়াও, যেন কোন বহিঃশক্তির প্রভাবে তাহাতে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। জীবদ্দশায় যে যাহা করিত, এখানেও তাহার পুনরভিনয়

হইতে লাগিল। সকলেই আমরা বুঝিতেছি যে, এ সমস্ত অনর্থক, এ সমস্ত অপ্রাকৃত; অপরের এই সমস্ত ঘৃণার্হ, অসঙ্গত কাল্পনিক ব্যবহারে আমরা সকলেই মনে মনে অপরকে ব্যঙ্গ করিতেছি, অথচ কে জানে কেন তাহা হইতে বিরত হইবার শক্তি নাই। আমরা বুঝিতেছি যে, আমাদিগের কার্য্যকলাপে সকলে ব্যঙ্গ করিতেছে, অথচ আবার যন্ত্রের মত তাহাই করিতেছি। প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা বাধা দিবার আমাদিগের শক্তি কোথায়!

এখানে আমারই মত অভাগ্যবান সকলেই। পৃথিবীর যাহার যেরূপ জীবনযাপন, এখানে তাহারই কেবল অনুকরণ,—সেই সমস্ত পৃথিবীর পুঞ্জীভূত পাপ কর্ম্মরাশি, সেই সঞ্চিত প্রত্যবায় সমূহ, সেই কামনার প্রলোভনে উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকলাপ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে যে যাহা যাচ্ঞা করে, তদ্দণ্ডেই সে তাহা প্রাপ্ত হয়; মনে একটা কামনা জাগিলেই, তখনই সেই অভিলষিত বস্তু সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশব বাসনা ও অনুরাগ জীবদ্দশায় যেইরূপ আধিপত্য করিত এখানেও তদ্রূপ, তবে প্রভেদ এই, এখানে তাহারা আরও প্রবল, অধিকতর ভীষণ। পৃথিবীতে কোন একটা বাসনা অতি বীভৎস হইলেও, তাহাতে কিছু না কিছু মধুরভাব থাকে, অতি বিকট হইলেও, বাহিরে তাহা একটা সৌন্দর্য্যের আকার ধারণ করে, কিন্তু, এখানে মধুরতা বা সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না। নগ্ন বাসনা, মাংসচর্ম্মবিরহিত বীভৎস কেবল অস্থিময় আকৃতির মত, তাহার করাল করাগত করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যেমন বাসনা আছে, বাসনা মিটাইবার বস্তুরও তথায় অভাব নাই। এখানকার কল্পনা অন্তঃসারশূন্য কেবল প্রহেলিকা। পৃথিবীতে অগ্রে বিষয়, কল্পনা বিষয়াবলম্বনে গঠিত; এখানে কল্পনার সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু উদ্ভূত হয়। কিন্তু হায় দুঃখের বিষয় এই, সমস্ত জানিয়া ও বুঝিয়াও আমরা এখানে

বাসনার সম্পূর্ণ দাস। জানি আমরা এখানে যাহা কিছু জীবনের পুনরভিনয় করিতেছি, তাহা অসার স্বপ্নের ন্যায় অলীক। এখানকার আমাদিগের কার্য্যকলাপ, আমাদিগের নিকট ঘৃণিত ও উপহসনীয়, তাহাতেই বা কি? পার্থিব জীবনে যে সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলাম, যে সমস্ত বাসনার প্রলোভনে আত্মহারা হইয়াছিলাম, এখন তাহারাই আমাদিগের প্রভু। পৃথিবীতে আমরা যাহা ছিলাম, কে যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে, আমাদিগকে বাধ্য করিতেছে।

জনকত আমরা একমত হইয়া যেমন মনে করিলাম, এখানে একটা নগর থাকিলে বেশ হইত, অমনি দেখি, সুন্দর নগরী সম্মুখে বিরাজিত। তথায়, অতি মনোহর রঙ্গালয়, সান্ধ্য সমীরণ-সেবনোপযোগী সুন্দর সাধারণ উদ্যান, প্রণয়প্রণয়িনীর ঈপ্সিত নিভৃত নিকুঞ্জ, আকাশভেদী বনস্পতি সমন্বিত প্রকৃতির লীলাভূমি গভীর গহন, মরালমরালী পরিপূরিত শতদল সুশোভিত, পরম রমণীয় দীর্ঘিকা,—এ সমস্ত কিছুরই অভাব নাই। মনে তাহাদিগের চিন্তা উদিত হইলেই, সম্মুখে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার কল্পনায় আসিয়াছে বলিয়াই যে, কেবল আমি এই সমস্ত দেখিতে পাইতেছি, তাহা নয়। তথায় যাহাদিগেরই সহিত মিলিত হইতেছি, যাহারাই আমার ভাবে ভাবান্বিত, তাহারাই সে সমস্ত দেখিতে পায়। কিন্তু, এ সমস্ত যে কাল্পনিক, এ সমস্ত যে ছায়া-দৃষ্টি, তাহাত একদণ্ডের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না। বুঝিতেছি, এ সমস্ত কেবল মায়ার খেলা, কিন্তু বুঝিয়াও এ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। কেবল কি তাই? এই যে সমস্ত লোক, যে সমস্ত দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগের কি কিছু স্থায়িত্ব আছে? তাহারা সকলেই পরিবর্ত্তনশীল। এই এক দৃশ্য, পরমুহূর্ত্তে আবার অন্য দৃশ্য; এই এক সম্প্রদায়ের সহিত বিহার করিতেছি, পরক্ষণেই আবার

নূতন লোক, নূতন ভাব। আমার বিশ্বাস তোমরা যদ্যপি তথায় একবার পদার্পণ কর ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা উন্মাদ হইয়া যাও।

দাসদাসী পরিবৃত সুন্দর সৌধে বাস করিবার সাধ হওয়ায় দেখি, সুন্দর হর্ম্ম্যমালা আমার সম্মুখে বিরাজিত। তোমরা ভাবিতেছ, এখানে দাসদাসী কোথা হইতে আসিবে। এখানে তাহারও অভাব নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই স্থান যেন পৃথিবীরই ছায়া। এখানে মত্ত পরিচারক, চরিত্রহীনা পরিচারিকা, কিছুরই অভাব নাই। পররাজশ্রী-কাতর, স্বাধীনতা-হারী, পরলোকগত, নিষ্ঠুর রাজার অভিলাষ পূরণ করিতে, এখানে রক্তলোলুপ নরশার্দ্দূল সৈনিকদলেরও অভাব নাই। তবে প্রভেদ এই, পৃথিবীতে শস্যশ্যামলা, অধীন জাতীয় মাতৃস্বরূপা, জন্মভূমিকে শ্মশানে পরিণতঃ করিয়া, শক্রর রুধীররঞ্জিত মাতৃবক্ষের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী যে আমোদ অনুভব করিত, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে কেবল অতৃপ্তির হাহাকার। তোমরা এখন বাসনার মোহন সঙ্গীত-ঝঙ্কারে হিতাহিত ডুবাইয়া দিয়া হয় ত ভাবিতেছে, "বাসনা পূর্ণ হইতেছে, তবে অতৃপ্তি কোথায়?" মূর্খ তোমরা জাননাক, তৃপ্তি জ্ঞানে, অতৃপ্তি মোহে, অজ্ঞানে। পৃথিবীতে বুঝি নাই, কিন্তু এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, যতই তৃপ্তিপ্রদ মনে হউক, কামসেবায় সুখ নাই, শান্তি নাই। কাম "বিষকুম্ভং পয়োমুখম্"; কাম সুবর্ণ কণ্টক, দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বিদ্ধ হইলে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক।

নগরের সন্নিকটে, কল্লোলিনীর কূলদেশে, পুষ্পবীথি-পরিশোভিত, আমার পার্থিব হর্ম্ম্যের অনুরূপ, এখানকার আমার বাসগৃহ। জীবদ্দশায় যেমন করিতাম, এখানেও সেইরূপ রঙ্গালয় ও বিহার মন্দিরে আমোদে যাপন করিয়া, সময় অতিবাহিত করিতাম। পৃথিবীতে তোমরা যাহাকে

সুখ বল, জীবদ্দশায় আমার তাহা বহুল প্রকারে ছিল। কিন্তু এখন? হয়ত তাহা শুনিলে তোমাদিগের আমার প্রতি অনুকম্পা হইবে, হয়ত আমার দুঃখে তোমাদিগের নয়ন আর্দ্র হইবে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল নাই। তোমাদিগের অনুকম্পা বা তোমাদিগের সহানুভূতি আমার অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে না। আমার এখানকার যন্ত্রনা এই :—আমি সুখের অনুসন্ধানে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি কই? বিলাসের তৃষ্ণা সর্ব্বক্ষণ জ্বলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সে তৃষ্ণা মিটিতেছে না। এখানে কেবল মরীচিকা, বালুকাময় মরুদেশে মৃগের সুনীল সলিলপূর্ণ সরসীদর্শন।

একটা কথা, না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, আমি এখানে প্রত্যহ আমার পরিচিত আত্মীয়গণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের দেখা পাইতেছি; কিন্তু আমি তাহাদিগের নাম ধাম বলিব না। তোমরা সভ্যতাভিমানী পৃথিবীর লোক, তোমাদিগের সদসৎ বিচার মানবের কথা ও ব্যবহারের উপর; তোমাদিগের প্রচলিত মান-দণ্ডের পরিমাণে যে অতি ভদ্র ও উচ্চ সে হয়ত এখানে আমারই মত অথবা ততোধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহার পার্থিব আত্মীয় বন্ধু কি ভাবিতেছে?—তাহাদিগের পরলোক গত আত্মীয়ের সদ্‌গতি হইয়াছে, সে নন্দনের পারিজাত তলায় অথবা শান্তিপূর্ণ বিষ্ণু, শিবলোকে বিহার করিতেছে। কেন তবে আমি প্রকৃত পরিচয় দিয়া তোমাদিগের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব? তবে একটা কথা মনে রাখিও, তোমরা পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের যে, অবস্থার সমালোচনা কর, তাহা অনেক সময়েই মিথ্যা। তোমাদিগের ধন্যবাদ, মৃতব্যক্তির যন্ত্রণার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

অলৌকিক রহস্য

সন্দীপনি

অলৌকিক রহস্য।

৮ম সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

—:*:—

কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায় জড়বাদ-বন্যায় এরূপ ভাবে প্লাবিত হইয়াছিলেন যে, স্থূল জগৎ ও স্থূলদেহ ব্যতীত আর কিছুর অস্তিত্ব কল্পনায় আনিবার চেষ্টাকেও তাঁহারা উপহসনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই দুর্দিনে, ভগবানেরই অনুকম্পায় প্রেততত্ত্ববাদী (Spiritualist) নামক এক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল। তাঁহাদিগের অধ্যবসায় ও সৎসাহসে, প্রেত চক্রের সাহায্যে, ঋষিপ্রোক্ত সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্মজীবের অস্তিত্ব একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মীমাংসা সূক্ষ্মদর্শী ঋষিদিগের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী না হইলেও, কালে যে তাঁহারা সেই সনাতন সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারাই তাঁহাদিগের যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থাদি সম্যক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আর ঋষিদিগের কথা প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। সেই সাহসে আমরাও এই জড়বাদের যুগে জড়বাদীর দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বসিয়া, প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক

আমাদিগের উদ্দেশ্য।

জগৎ ও মানবকে যেইরূপ ভাবে দেখিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। যে উদ্দেশ্যে প্রেততত্ত্ববাদী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্যেই "অলৌকিক রহস্যের" প্রচার। জড়বাদ-দৈত্যের প্রলোভনে ঘর ছাড়িয়া আমরা অনেক দূর বাহিরে গেছি; আমাদিগের উদ্দেশ্য ঘরের ছেলেকে আবার ঘরে ফিরান। মা যেমন খেলানার প্রলোভনে, দুষ্ট পুত্রকে আহ্বান করে, আমরাও এখন তাহাই করিতেছি। ভূতপ্রেতাদির আলোচনায় মানবের আধ্যাত্মিক কোনও উপকার হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস আসে, ইহলোকেই যে স্থিতির শেষ নয়, এ ধারণাটাও মনে বদ্ধমূল হয়। ইহ ও পরলোকের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন, "শরীরে শারীর বায়ুর অবরোধ হইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্তির নাম মরণ।" মরণের পর মানবের কি অবস্থা ঘটে? প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হইলে এবং দেহ শবাকারে পরিণত হইলে জীবচেতনা পূর্ব্বোপার্জ্জিত বাসনা-সংশ্লিষ্ট জীবাত্মায় অবস্থান করে। জীবের স্থূল দেহ ব্যতীত আরও অনেকগুলি দেহ আছে। মৃত্যুর পর তাহার স্থূল দেহের নাশ হইলেও তাহার অপর অপর দেহ রহিয়া যায়। পাঠক মহোদয়গণ যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া "দাদা ম'শায়ে"র ঝুলিটি অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে এ সমস্ত বিষয় বিশদভাবে দেখিতে পাইবেন।

পিণ্ড দেহ ও সমাধি ক্ষেত্রের প্রেত।

মৃত্যু হইলে পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ড দেহের সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ভাণ্ড দেহটি শব হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রাণ পদার্থ পিণ্ড দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। ভাণ্ড দেহটি পোড়াইয়া ফেলিলে উহার কণা সকল ভস্ম ও বাষ্পরূপে পরিণত হয়; মাটি তখন মাটিতে মিশিয়া যায়, জল জলে, বায়ু বায়ুতে মিশিয়া

যায়। ভাণ্ড দেহটি না পোড়াইলে, তাহা পচিতে আরম্ভ করে এবং রোগ বীজ উহা আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই জন্য তাহা পোড়াইয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য। পিণ্ড দেহও শীঘ্র শব হইয়া পড়ে, এবং প্রাণশক্তি ইহাকে ত্যাগ করিলে ইহাও পচিতে আরম্ভ করে। তখন মানুষের অনিষ্টকারী জীবাণুসকল তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাই, ভাণ্ড দেহের মত পিণ্ড দেহটিকেও মহাভূতে লয় করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। হিন্দুরা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃতের পিণ্ড দেহের লয় করেন, তাহার নাম সপিণ্ডকরণ। মৃতব্যক্তির পুত্রের পিণ্ড দেহের সহিত, তাহার পিণ্ডদেহের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাই পুত্রই সপিণ্ডকরণের প্রথম অধিকারী। তণ্ডুল, গোধূম, যব ইত্যাদি ওষধিজাত দ্রব্যকে আধার করিয়া ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্রশক্তি বলে মৃতব্যক্তির পিণ্ড শরীরকে সংকুচিত করিয়া সেই আধার ন্যাস করতঃ, উক্ত পিণ্ড চন্দ্রলোকবাসী পিতৃগণের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করাই সপিণ্ডকরণ ক্রিয়া। উক্ত পিণ্ড এইরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই পিতৃপুরুষ মুখ নিঃসৃত অগ্নি উহাতে সংযুক্ত হইয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। অহিন্দুর সমাধিক্ষেত্রে যে প্রেতাদির বিষয় পাঠ করা যায় তাহা প্রায় এই অদগ্ধীভূত পিণ্ডদেহ মাত্র। পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ ভস্মীভূত হইলে রক্তশোষক প্রেতের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সত্য ঘটনা মূলক ভীষণ রক্তশোষক বেতাল (vampire) শীর্ষক গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠে পাঠকেরা আমাদিগের এই উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

এই ত গেল পিণ্ড দেহের কথা। তখন জীবাত্মা কি অবস্থায় থাকে? মৃত্যুর পর, কিছুদিন সে মরণ মূর্চ্ছায় থাকে। সেই সময়ে 'শিলাজঠরের ন্যায় জাড্য' অনুভব করতঃ অতিশয় যাতনা ভোগ করিতে থাকে। যে

অবস্থাকে শাস্ত্র বলিয়াছেন "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। * দশপিণ্ড দ্বারা এই নিরালম্ব দেহের পূরণ হয় বলিয়া, উহাকে "পূরকপিণ্ড"ও বলে; ইহাতে এই কষ্টকর অবস্থার শেষ হয় এবং জীবাত্মার কিঞ্চিৎ স্থূলতর প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। প্রেতের দশপিণ্ডদান পর্য্যন্ত ক্রিয়াকে "প্রথম ক্রিয়া" বলে। পরে সপিণ্ডকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধকে "মধ্যমক্রিয়া" বলে।

প্রেত দেহ।

ইহার দ্বারা প্রেতত্ব নাশ হইয়া, জীব ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। ইহা হইল সাধারণ মানবের কথা। কিন্তু, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদিগের প্রেতাবস্থা হয় না। সেইরূপ যাঁহারা অতিশয় বিষয়াসক্ত তাঁহাদিগের এই অবস্থা অতি দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী। যাহারা আত্মঘাতী, বা পৃথিবীর জীবনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া মৃত্যু দশা প্রাপ্ত হয়, তাহারা মৃত হইলেও পৃথিবীর মমতা ও সংসর্গ ছাড়িতে পারে না। তাহারা মাঝে মাঝে মানবকে দেখা দেয় ও আত্মকাহিনী বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। তাই শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত কাহিনীতে প্রেতিনী আত্মকথা বলিতে এত লালাইত। (ক) প্রাণকৃষ্ণের পিতার জীবদ্দশায় একটা প্রাণে বিশ্বাস ছিল যে, গুরু না মিলিলে মুক্ত হওয়া

---

* দশপিণ্ডের মন্ত্র :—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বাপীত্বা সুখীভব॥ ১
আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব॥ ২

(ক) "প্রেতিনীর আত্মকথা"।

অসম্ভব। তিনি জীবদ্দশায় উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধান অনেক করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মনের মত গুরুলাভ হয় নাই। তাঁহার আশা মিটে নাই বলিয়া, মরিবার সময় তিনি প্রাণে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার আর মুক্তি নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন, তথাপি, তাঁহার বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই বলিয়া মরণের পর তাঁহার প্রেতত্বলাভ হইয়াছিল। পরে স্বামীজির অনুগ্রহে তাঁহার প্রেতত্ব ঘুচিয়া ছিল। (ক)

অতএব আমরা বুঝিলাম,সাধারণ লোকের কিছুদিনের নিমিত্ত প্রেতাবস্থা অবশ্যম্ভাবী হইলেও, কেন সকলে স্থূল সংস্পৃষ্ট হন না বা আত্মীয় স্বজনকে দর্শন দেন না। স্থূলদর্শী আমরা, আমরা না হয় মৃত আত্মীয়ের সূক্ষ্মতর প্রেতদেহ দেখিতে পাইলাম না, তাহারা যে, সেই ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহা যেন আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না, তাহাতে কি তাঁহাদিগের তীব্র কষ্টের কিছুও উপশম হয়? তাহারা যে যাতনা ভোগ করিতেছিল তাহাই করিতে থাকে। তাই, সর্ব্বজীবে দয়াবান সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা তাহাদিগকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পূর্ব্বকথিত "মধ্যমক্রিয়ার" ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা পুত্রাদিপ্রদত্ত মাসিক শ্রাদ্ধের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া বৎসরান্তে ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয় ও আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। ইহাই পিতৃযান। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা হইয়া পৃথিবীতে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাঁহারা মরণের পর এইপথে যান, এবং ভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করেন। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "সংবৎসরই প্রজাপতি; তাহার দুইটি অয়ন,—দক্ষিণ ও উত্তর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা চন্দ্রলোকে যায়; তাহারা আবার

প্রেত দেহের অবসান ও মাসিক শ্রাদ্ধ।

(ক) "প্রেতের দীক্ষালাভ।"

পৃথিবীতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।" * মানব কামদেহ ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে কিছুদিন অবস্থান করে। তাহার পর যখন আত্মা-বুদ্ধি-মন সমন্বিত জীব সেই দেহ ছাড়িয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যায়, তখন তাহার এই সূক্ষ্ম দেহটিও শবাকারে পড়িয়া থাকে। ইহাই তাহার তৃতীয় মৃত্যু। কামদেহ সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত বলিয়া স্থূল দেহের মত শীঘ্র নষ্ট হয় না। তাহার উপর আবার, বহির্মুখী মন কামদেহের সহিত জড়িত থাকিয়া বহুকাল অবধি কার্য্য করিয়া আসিয়াছে; সুতরাং যখন আত্মা-বুদ্ধি-মন-সমন্বিত জীব কাম দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া চলিয়া যায়, তখন মনোদেহের কতকটা কামদেহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়। প্রকৃত জীব যদিও তখন স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছে, তথাপি বহির্মুখী-মন-সঞ্জীবিত কামদেহ তাহার পূর্ব্বদেহীর আকার ও হাবভাব কতকটা অনুকরণ করিতে সক্ষম হয়। তাহার দেহীর জীবনের সমস্ত ঘটনা তাহারও স্মৃতিতে থাকে। স্মৃতি বলিতেছি, কারণ মনের কিয়দংশ ইহার সহিত জড়িত থাকে। প্রেত-তত্ত্ববাদীদিগের চক্রে যে সমস্ত ভূতের বিষয় পাঠ করা যায়, তাহাদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর। পার্থিব জীবনে যে যতদূর কাম প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন করিয়া আসিয়াছে তাহার কামদেহের স্থায়িত্ব তদনুযায়ী।

প্রেততত্ত্ববাদিগণের চক্রে আগত ভূত।

যতই মনোদেহের অংশটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ততই এই ছায়া শরীরের পূর্ব্ব স্মৃতি হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্থূল জগতের অধিক আকর্ষণ থাকিলে, ইহা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে,

---

* সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হবৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে॥ ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাৎ..."
প্রশ্নোপনিষদ্, ১—৯।

এবং আমরা তাহাকে "ভূত" বলিয়া অভিধান করি। যাহারা অত্যুগ্র রাগ, দ্বেষ বা তীব্র বাসনা লইয়া পার্থিব জীবন কাটায়, তাহারা বড়ই অনিষ্টকারী। দয়াবান ঋষিরা ইহাদিগের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? পার্ব্বণ ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ দ্বারা কেবল যে এই কামদেহের নাশ হয়, তাহা নহে, জীব মন্ত্র ও দেবতার সাহায্যে কামলোক হইতে পিতৃলোক, এবং তথা হইতে স্বর্গলোকে যায়। এই পরিত্যক্ত কামদেহও মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নষ্ট হয়। বিশেষ বিশেষ স্থলে, গয়ায় পিণ্ডাদি দিতে হয়।

কামদেহের শব।

পূর্ব্বে যে কামলৌকিক দেহের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সংশ্লিষ্ট মলকণা হইতে বিচ্যুত হইলেও কিছুকাল থাকে। তখন আর আদৌ তাহাতে চিন্তাশক্তি থাকে না। মেঘের মত অন্তরীক্ষে তাহা ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহাও প্রেত-তত্ত্ব-বাদিগণের মণ্ডলের সমীপে আসিয়া পড়িলে আবিষ্ট ব্যক্তির বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়। ইহাও সময়ে সময়ে "ভূত" বলিয়া অভিহিত হয়।

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা এতদূর পাপী যে মরণের কিছুদিন পরে তাহারা তাহাদিগের অবিনশ্বর উৎকৃষ্টতর আধ্যাত্মিক অংশটুকু হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদিগের বহির্মুখী-মনের সমস্ত অংশটুকু কামদেহের সহিত জড়িত হইয়া যায়। তাহারা অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং মানবের অজ্ঞানতা বা অসাবধানতা দেখিলেই

বেতাল or Vampire,

তাহারা তাহাদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত স্বীয় জীবনীশক্তির বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পায়। তাহারাই বেতাল (vampire or werewolf) নামে প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় ভূত পূর্ব্বে যত ছিল, সুখের বিষয় এখন আর তত লক্ষিত হয় না। ইহাদিগকে কেহ কেহ জীবাত্মা-বিচ্ছিন্ন মানব বলেন

(soulless men) বলে। তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। কিন্তু বিশুদ্ধ মানবগণের উপর তাহারা কোনও অত্যাচার করিতে পারে না।

অনেক কৃতবিদ্য মনে করেন আমরা প্রেতাদির বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদিগের জাতিকে ভয়বিহ্বলিত করিতে বসিয়াছি। আমরা তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা কৃতবিদ্য হইলেও মানব চরিত্র পর্য্যালোচনা করেন নাই। যাহা আমরা জানি না তাহা হইতেই বেশী বিপদ আসে; আমাদিগের অজ্ঞানতাই আমাদিগের ভয়ের কারণ। অজ্ঞানান্ধ শিশুই অপরিচিত লোক দেখিয়া ভয়ে মাতার ক্রোড় আশ্রয় লয়; কিন্তু অজ্ঞাত লোক দেখিতে দেখিতে, সে যখন অপরিচিত লোক দর্শনে অভ্যস্ত হয়,—তখন কি আর তাহার ভয় থাকে? সূক্ষ্ম ভূতাদির উপর চিন্তাশক্তি যেইরূপ কার্য্য করিতে পারে স্থূলভূতের উপর সেইরূপ পারে না। স্থূলভূতের উপর চিন্তারূপিণী মানব-শক্তি একেবারে অসহায়, কিন্তু প্রেতাদির দেহ সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত। মন পবিত্র রাখিয়া, জীবনে যিনি সংযম অভ্যাস করেন, শত প্রেতেও তাঁহার কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। বরঞ্চ, তিনি প্রেতের অনেক উপকারে আসিতে পারেন। এ সম্বন্ধে "প্রেতিনীর আত্মকথা" মূলক ঘটনাটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। প্রেততত্ত্বের আলোচনায় আরও ফল আছে। ঋষিশিক্ষিত ভারতবর্ষ যদ্যপি আবার পূর্ব্বগরিমায় উঠিতে চায়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের প্রচারিত একটিও আর্য্য অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। জড়বাদীর শিক্ষায় আমরা সর্ব্বদা বিদ্যাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া সাহঙ্কারে বলি "মরা ঘোড়া কি ঘাস খায়?" আমাদিগের প্রার্থনা আপনারা চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করিয়া স্বাধীনভাবে এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করুন। দেখিবেন যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন,

আমাদিগের শেষ কথা।

চিরানুগৃহীত ভারতে, কাহাকেও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না। দেখিবেন আর্য্যঋষিদিগের সমস্ত সনাতন সত্য আপনার নিকট প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

আমরা সংক্ষেপে মানবের মৃত্যু হইতে, তাহার পুনর্জন্ম অবধি আলোচনা করিলাম। এই সংখ্যায় আমরা ভূত সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিয়া এইবারের সন্দীপনী শেষ করিব। মানবের চিন্তা-সমূহ সকলেই এক একটি সজীব পদার্থ। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা চিন্তা-মূর্ত্তিগণের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চিন্তা-প্রসূত, অর্দ্ধসংজ্ঞাযুক্ত, নির্দ্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট, শক্তি-সমূহ অনেক সময়ে ভূতাদির মত কার্য্য করে।

চিন্তামূর্ত্তির ক্রিয়া।

চিন্তামূর্ত্তিদিগের অদ্ভুত ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় এরূপ কতকগুলি সত্য ঘটনা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠকেরা স্তম্ভিত হইবেন। আমরা শীঘ্রই সেই সমস্ত আপনাদিগের করকমলে উৎসর্গ করিব।

রক্ত শোষক বেতাল।

Vampire.

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে রুশিয়া দেশে এক রক্তশোষক প্রেতের নিম্নলিখিত ভয়ানক ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল।

চ——নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত হিংস্র, নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরবশ ও অত্যাচারী ছিলেন। এই স্বেচ্ছাচার শাসনকর্ত্তার ক্ষমতায় বাধা দিবার লোক না থাকাতে, তিনি অনায়াসে নিজের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। এক দিবস তিনি

তাঁহার একজন অধীন কর্ম্মচারীর সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত কন্যাটির সহিত অন্য কোন একটি যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অত্যাচারী শাসন কর্ত্তার আদেশে ঐ কন্যার পিতা তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যাটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ শাসনকর্ত্তার পরিণীতা হইয়াছিলেন।

বিবাহ করিয়াও উক্ত শাসনকর্ত্তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অবলা পরিণীতা স্ত্রীর প্রতিও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সর্ব্বদাই তাহাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নিজের অসাক্ষাতে অপর স্ত্রী বা পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না, এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা ঐ শাসনকর্ত্তা পীড়িত হইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশা নিকটস্থ দেখিয়া একদিন তিনি তাঁহার পত্নীকে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সে অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহ করিতে পারিবে না এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, যদি সে তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্য লোকের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে নদীর পরপারস্থ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার মৃত দেহ প্রোথিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক শাসন কর্ত্তার মৃত্যুর পরে কিছু কাল পর্য্যন্ত ঐ বিধবা মৃত স্বামীর দ্বারা কোন প্রকারে অত্যাচারিত হন নাই। সুতরাং ক্রমে কাল বশে শাসনকর্ত্তার ভয় বিধবার মন হইতে বিদূরিত হইল। অবশেষে পূর্ব্বে যে যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।

বিবাহ রাত্রিতে ভোজনের পর যখন বাটীর সকলে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন ঐ রমণীর গৃহ হইতে এক ভয়ানক চীৎকার শব্দ শ্রবণে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রমণীর গৃহের দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ অথচ ভিতর হইতে কাতরোক্তি হইতেছে শুনিয়া বাটীর লোকেরা তাঁহার গৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে তিনি শয্যায় শায়িত অবস্থায় মূর্চ্ছিতা হইয়া আছেন। সেই সময়ে যেন এক খানি গাড়ী বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে যাইতেছে, এইরূপ শব্দ শ্রুত হইল। ঐ স্ত্রীলোকের শরীরের স্থানে স্থানে কালসিটা দাগ দেখা গিয়াছিল, যেন কে তাঁহাকে চিমটি কাটিয়া দাগ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার গ্রীবা দেশ ক্ষত বিক্ষত। তন্মধ্য হইতে রক্ত বিনির্গত হইতেছে। কিছু ক্ষণ পরে উক্ত স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন আমার পূর্ব্বতন স্বামী হঠাৎ আমার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবিতবৎ বোধ হইল, কিন্তু তাঁহার বর্ণ অত্যন্ত মলিন। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছি বলিয়া, তিনি আমাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে প্রহার করিয়াছেন। প্রথমে কেহই ঐ স্ত্রীলোকের এই কথা বিশ্বাস করেন নাই।

পর দিন প্রত্যূষে উপরিউক্ত নগর প্রান্তবর্ত্তী নদীর উপরিস্থিত পুলের শান্ত্রীরা সকলের নিকট নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছিল। এই নদীর অপর পারে পুলের সম্মুখের রাস্তা দিয়া সমাধি স্থানে যাওয়া যায়। চৌকিদার বলিল, একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় একখানি কৃষ্ণবর্ণের গাড়ী ৬ জন আরোহী লইয়া ঐ পুলের উপর দিয়া অতিদ্রুত বেগে সহরের দিকে তাহাদের বাধা না মানিয়া আসিয়াছিল। নূতন শাসনকর্ত্তা এই শকট আরোহী ভূতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পুলের চৌকি-

দারের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতি রাত্রিতেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে ছিল। চৌকিদারেরা আরও বলিল যে পুলের ফটক যেন আপনি আপনি উঠিয়া যাইত ও তাহারা বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও ঐ গাড়ী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত। এ দিকে প্রতি রাত্রিতেই প্রায় এক সময়েই ঐরূপ গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ঐ বাটীর প্রাঙ্গণে শোনা যাইত। উক্ত রমণীর বাটীর ভৃত্যেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সময় নিদ্রাভিভূত হইত। প্রত্যহ ঐ রমণীর শরীরে পূর্ব্ববৎ প্রহারের দাগ দেখা যাইত। ঐ সময়ে রমণী মূর্চ্ছিতা হইত। এই সকল সংবাদ ক্রমশঃ সহরের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। উক্ত রমণীর কোন রোগ হইয়াছে মনে হওয়াতে, চিকিৎসক আনাইয়া দেখান হইল। চিকিৎসকেরা ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেম না। পুরোহিতেরা স্তোত্র পাঠ করিলেন। কিন্তু পর দিন প্রত্যূষে ঐ স্ত্রীলোকটির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ঐ স্ত্রীলোকটি মৃত্যু দশায় উপনীত হইলেন।

ঐ প্রদেশের নূতন শাসনকর্ত্তা পরিশেষে সহরের এই জনশ্রুতি বন্ধ করিবার জন্য কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এবং একজন সাহসী ও বলিষ্ঠ কসাক্ সৈনিককে ঐ পুলের উপরে দাঁড় করাইয়া তাহাকে হুকুম দিলেন যে, যত কেন বিপদ হউক না ঐ দৈত্যের গাড়ী বন্ধ করিতেই হইবে। তদনুসারে পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী সেই দিন ঠিক রাত্রি দুই প্রহরের সময় যখন সমাধি স্থানের নিকট হইতে ঐরূপ গাড়ী পুলের নিকট আসিল, তখন ঐ সেনাধ্যক্ষ ও একজন ক্রশধারী পুরোহিত চীৎকার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বরের শপথ ও রুশিয়া সম্রাটের আজ্ঞা, কে যাইতেছ? বলিয়া যাও।" তাহাতে এক ব্যক্তি গাড়ীর বাহিরে মস্তক বাহির করিয়া বলিলেন 'চ——প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটের অমাত্য।

তৎক্ষণাৎ ঐ দৈত্যের গাড়ী ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ, পুরোহিত ও সৈন্যদিগের মধ্য দিয়া তড়িতের বেগে চলিয়া গেল, সৈন্যদিগকে নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ দিল না।

তখন প্রধান পুরোহিত প্রথানুসারে পূর্ব্বোক্ত গবর্ণরের দেহ কবর হইতে উঠাইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ওকবৃক্ষের শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জমির মধ্যে পুনরায় প্রোথিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। সকলে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে পর পুরোহিত সকল লোকের সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। যে সময়ে ঐ শূল তাহার বক্ষঃস্থলে প্রথম বসান হইয়াছিল, সেই সময়ে একটি ভয়ানক ক্রন্দন শব্দ ঐ দেহ মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং সেই কবরস্থ শবদেহ হইতে রক্তধারা অতি তেজে বহির্গত হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক ঐ শবদেহ মৃত্তিকা মধ্যে পুনঃপ্রোথিত হইবার পর ঐ রক্তশোষক বেতালের আর কোন কথা শুনা যায় নাই।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রেতিনীর আত্মকথা।

দ্বিতীয় দিনের কথা।

তার পরদিন ভোরে উঠিয়া কেবল গত রাত্রের কথাই ভাবিয়াছি। কথা আছে আজও আসিবে! সমস্ত দিন অন্যমনস্ক ভাবে কাটিয়া গেল। পড়াশুনা মাথা মুণ্ডু কিছুই হইল না। সত্যই কি আত্মার কোন অস্তিত্ব আছে? মরিলেও ভূত বলিয়া কিছু থাকে কি? কেবল এই চিন্তা করিয়াছি। ধীরে ধীরে রাত্রি আসিল। ক্রমে অন্ধকার আরও ঘনাইয়া

আসিল। অন্যদিনের মত আহার করিতে বসিলাম কিন্তু আজ বড় তাড়াতাড়ি আহার হইল। মনে কেবল আতঙ্ক—এই বুঝি আসিয়াছে। ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিলাম, আলো নিবাইয়া দিলাম। তখনও ১০॥টা বাজে নাই। উভয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। এরূপ ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা ছিলাম। এমন সময় শব্দ হইল! একবার, দুইবার, তিনবার সেই ঠক্ ঠক্ ঠক শব্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসিয়াছ?"

উত্তর। হাঁ!

প্র। আচ্ছা, তুমি এখানে আমাদের কাছে কেন আইস; আমরা তোমার কি করিতে পারি?

উত্তর। কেন আসি জানি না, কিন্তু প্রাণের বড় জ্বালা! আজ মনে পড়ে এই থানে, এই প্রকোষ্ঠে—যে প্রকোষ্ঠে তোমরা আছ, যেথানে আমি অসিয়া বসিয়াছি এইখানে আমার অতীতের কত স্মৃতি জড়িত আছে, কত সুখ দুঃখের খেলা খেলিয়াছি। এইখানে আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এইখানে আমি একজনকে পাইয়াছিলাম, এইখানে তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম; আবার এইখানেই তাহাকে হারাইয়াছি। আরও আছে। ঐ যে নিম্নে চৌবাচ্চা! হায়, হায়! কি যন্ত্রণায়, কি কষ্টে, উহাতেই আমার জীবনের শেষ হইয়াছে! সে যে কি যন্ত্রণা, কি অব্যক্ত অনিচ্ছা-মৃত্যু তাহা মনে হইলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই দেখিতে আসি। আমি তো কিছুই ভুলিতে পারি নাই! আমি যেই আমি সেই আমিই আছি। হায়! কেন তবে এমন কষ্টে এমন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াই।

রমণী কাঁদিতে লাগিল। ঘরে মানুষ নাই কিন্তু রমণীর ক্রন্দনধ্বনিতে ঘরটা একটা বিষাদের ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। রমণী শান্ত হইল।

আমরা বলিলাম, থাক্ কাজ নাই সে সব কথা বলিয়া। তুমি কি লেখা পড়া জান?

উত্তর। জানি।

প্রঃ। আচ্ছা লেখ দেখি? ঐ টেবিলে দোয়াত কলম আছে।

কান পাতিয়া শুনিলাম দেওয়ালে খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। আস্তে একটা কিছু পতন শব্দ হইল। আলো জ্বালিয়া দেখিলাম দেওয়ালে স্পষ্ট স্পষ্ট পার্ব্বতী ও আমার নাম লেখা রহিয়াছে। কিন্তু লেখাগুলি ঠিক একটানে লেখা নহে। অক্ষরগুলি কেমন ছাড়া ছাড়া। "প"টা যেন বহু কষ্টে ২।৩ টানে লেখা হইয়াছে; প্রত্যেক শব্দই এইরূপ। এক খানা অর্দ্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত টীকা নিম্নে পড়িয়াছিল, বুঝিলাম উহা দ্বারাই লেখা হইয়াছে! আলো নিবাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কালি কলমে কাগজে লিখিলে না?

উত্তর। আমার কোন অবয়ব নাই। ইচ্ছা করিলেই কলম ধরিতে পারি না।

প্রঃ। তবে দেওয়ালে লিখিলে কি করিয়া?

উত্তর। বায়ুর শক্তি দ্বারা টীকা খানাকে উপরে উঠাইয়াছি এবং উহা দ্বারা অতি কষ্টে লিখিয়াছি তাই ছাড়িয়া ছাড়িয়া লেখা হইয়াছে। কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব ছিলাম হঠাৎ যেন বিষম যাতনায় একটা চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই শুনিলাম—

"বড় তৃষ্ণা, বড় ক্ষুধা, পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, ক্ষুধায় আমি সমস্ত অন্ধকার দেখিতেছি। আর যে সহ্য হয় না! উঃ কি যন্ত্রণা! আমার কি হবে!

প্রঃ। তোমাকে জল আনিয়া দিতেছি খাবার আনিয়া দিতেছি—তুমি সুস্থির হইয়া আহার কর।

উত্তর। তা যদি পারিতাম তবে এ যন্ত্রণা কেন সহ্য করি। কত স্থানে ভ্রমণ করি, কত পুষ্করিণী, কত কূপ, কত খাদ্য পড়িয়া আছে, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আহার করিতে পারি না। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক তবুও জল পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না। হায়! হায়!! অপমৃত্যুর কি বিষময় প্রায়শ্চিত্ত!

মনে মনে দুঃখ হইল। ভাবিলাম হা অভাগিনী! সংসার ছাড়িয়া গিয়াছ, তবুও শান্তি নাই। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আমরা তোমার এ কষ্ট দূর করিব। গয়ায় পিণ্ড দিলে নাকি পাপের মুক্তি হয় আমরা তোমার নামে যে ভাবে হউক গয়ায় পিণ্ড দিব।"

সে উত্তর করিল,—"কাজ নাই তোমাদের সে কষ্ট করিয়া। আমি গয়ার জনৈক পাণ্ডাকে বলিয়াছি। সে পিণ্ড দিবে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু যে দিন সে পিণ্ড দিবে, সে দিন হইতে আর ত তোমাদের দেখিতে পাইব না।" আমরা বলিলাম "তা হউক, তবুও তুমি মুক্ত হও।" বলিতে কি প্রাণের কোন নিভৃত কক্ষ হইতে যেন যাহার রূপ দেখি নাই, যাহাকে দেখিবারও আশা নাই, সেই একটা অসৎ চরিত্রা স্ত্রীলোকের জন্য কি একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভূত হইল। কে বলিবে ইহা কি?

পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের দিনের ন্যায় নম্র কণ্ঠে ধীরে, অতি ধীরে যেন কত অনিচ্ছায় কত কোমলতায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে এখন আসি?" অনিচ্ছায় বলিলাম "যাও"। সে কণ্ঠস্বর আজও ভুলিতে পারি নাই।

তৃতীয় দিনের কথা।

আজও ঠিক তেমনি সময়ে, তেমনি আহারাদি করিয়া আসিয়া আলো নিবাইয়া বসিলাম। আবার তেমনি শব্দ হইল। ক্রমেই আমাদের

কুতূহল বাড়িতে ছিল, ক্রমেই যেন অলক্ষ্যে একটা আত্মীয়তা, একটা সহানুভূতির টান আমাদের অধিকার করিয়া বসিতেছিল। এখন আর ভয় নাই, বিস্ময় নাই। এখন আর বিলম্ব সহ্য হয় না। এক মিনিটে দশ মিনিট বলিয়া অনুমান হয়। আসিবে না মনে হইলে প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। কেন এমন হয় জানি না; আপনাকে আপনি অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি উত্তর পাই নাই।

আজও আসিয়াছে, আজও কত কথা হইল। কত ভূত, ভবিষ্যৎ, অতীত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কত পাপ পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিজের সম্বন্ধে কতই জিজ্ঞাসা করিলাম! প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক স্বরভঙ্গীতে একটা গর্ব্ব, যেন একটা অহঙ্কারের ঢেউ, খেলিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার এখন কি ইচ্ছা হয়?"

সে উত্তর করিল,—"আমি মরিয়াছি, আমার পাপ চিন্তা পাপ প্রবৃত্তি ছাড়িতে পারি নাই। আমার সাধ হয় আমার সেই পূর্ণ যৌবনের বিশ্ববিমোহন রূপের ছটা তোমাদের একবার দেখাই। জগৎকে দেখাই, আমি কত সুন্দরী, আমার কত অগাধ প্রেম, আমি কত ভালবাসিতে পারি। ইচ্ছা কতই হয়; কিন্তু হায়, পারি না কিছুই! যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, যাহার নিকট দিবারাত্র থাকিতে, আমার প্রাণ এখনও লালায়িত। সে আমাকে দেখিয়াও দেখেনা, বুঝিয়াও বুঝেনা। ভয়ে জড়সড় হইয়া সর্ব্বদা জন কোলাহলে থাকে, আমাকে অজ্ঞাত অপরিচিত ভূত মনে করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাড়াইয়া দেয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কোথায়, তাহার নাম কি?

উত্তর করিল—"বৌবাজার"; কিন্তু নামটা কিছুতেই বলিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, মৃত ব্যক্তিসকলকে কি তোমরা দেখিতে পাও?"

উত্তর করিল—"সকলকেই পাই। কিন্তু পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে পারি না। এখানেও শ্রেণীবিভাগ আছে। মৃত্যুর পর পরবর্ত্তী জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সকলকেই একটা নির্দ্দিষ্ট অথবা অনির্দ্দিষ্ট কাল প্রেতলোকে বাস করিতে হয়। তবে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা অনেক ঊর্দ্ধে নিশ্চিন্ত মনে, নিরুপদ্রবে বাস করেন, আর আমরা—আমাদের কষ্টের সীমা নাই।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কোথায় আছেন?" তখন অনেকের প্রাণেই উপাধ্যায়ের 'স্মৃতি' জাগিতেছে; আর আমরা তাহার বড়ই গুণমুগ্ধ ছিলাম তাই উপাধ্যায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে সে বলিল "তিনি আমাদের অনেক উর্দ্ধে, তিনি সাধক, তাহাকে আমরা দেখি মাত্র কাছে যাইতে পারি না।" আবার সেইরূপ অস্থির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। আবার সেই [illegible]তির প্রার্থনা, আবার—"আমি তবে আসি?" ধ্বনি। মনে হইল, যেন বেশী-ক্ষণ থাকিলে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করে। যেন শত চেষ্টা করিলেও থাকিতে পারিবে না। সেই কথার ভাবে, সেই কাতরতাব্যঞ্জক স্বরে আপনা হইতেই সহানুভূতি আইসে। কি জানি হয়ত প্রাণে ব্যথা লাগিবে এই ভয়ে, কারণ অনুসন্ধান করি নাই, অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছি।

চতুর্থ দিন।

আমরা আমাদের নিজেদের কথা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলামঙ্গল, কে কোথায় কেমন আছে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিয়াছি এবং প্রকৃত উত্তরও পাইয়াছি। আমার জনৈক বন্ধু পত্নির সন্তান হয় নাই। তাহার কথা আমার মনেই ছিলনা কিন্তু ভূত নিজে বলিয়া উঠিল, "সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমার অমুক বন্ধু-পত্নির কথা জিজ্ঞাসা করিলে না? সে যে আমার আত্মীয়া! পূর্ব্বজন্মে,

অর্থাৎ আমার গত জন্মের পূর্ব্বজন্মে সে আমার ভগ্নি ছিল। তাহাকে আমি একটী ঔষধ দিব তোমরা দিতে পারিবে কি ?"

আমরা অবাক্! বলিলাম, "পারিব।"

আমরা বলিলাম, তুমি যেমনটী ছিলে সেই অবয়ব ধরিয়া কি আমাদের একবার দেখা দিতে পার না ? সে উত্তর করিল—"পারি, কিন্তু তোমারা হয়ত ভয় পাইবে তাই দেই না"। আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করায় স্বীকৃত হইয়াছিল একদিন আমাদের তাহার পূর্ব্বরূপ দেখাইবে। আরও কত কিঁ কথা হইল। কিন্তু কাজের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইচ্ছা ছিল প্রত্যহ উহাকে লইয়া কত কথাই কহিব। কত প্রয়োজনীয় কথারই মীমাংসা করিব। কত বন্ধু বান্ধবকে এই আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইব। কিন্তু হায়! আমরা নির্ব্বোধ, আমাদের কপালে তাহা হয় নাই। আমরা কোন্ দিন কোন্ কার্য্য করিয়াছি; ভাল মন্দ সকল কথাই বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল! কত গোপনীয় কথা, যাহা জগতে কাহারও জানিবার উপায় নাই, ঠিক্ ঠিক্ তাহা এই প্রেতাত্মা বলিতে লাগিল। আমরা কুতূহলের বশীভূত হইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ক্রমে যাইবার সময় হইয়া আসিল, আবার সেই বিদায়ের কাতর প্রার্থনা—"আমি তবে আসি ?" আমরা বলিলাম যাও। হায়! জানিতাম না এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হইবে।

তার পরের দিন আমাদের মেসে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, এ দিন আরও দুই একটী বন্ধুও আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। আসিয়া আলো জ্বালিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে হতবুদ্ধি হইলাম। প্রাণের মধ্যে যে কি একটা কেমন করিয়া উঠিল তাহা বুঝাইবার নহে,—দেখাইবার নহে। অনুভব করিয়া দেখিলাম, দেওয়ালের গাত্রে কি যেন লেখা আছে। আলো ধরিয়া দেখিলাম এই কয়টী কথা,—

"আমি চলিলাম, যদি থাকি দেখা হইবে নতুবা বিদায়। ঔষধ টেবিলের কোলে রহিল তাহাকে দিবে।" দেখিলাম সত্য সত্যই এক-টুকরা কাগজের উপরে একটী ছোট শিকড়ের মত কি একটী পদার্থ পড়িয়া আছে। বুক ফাটিয়া কান্না পাইল। কেন পাইল জানি না। আগে যদি জানিতাম এত শীঘ্রই তাহাকে হারাইতে হইবে, তবে আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিতাম। প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিতাম। কে জানিত এমন হইবে? কে জানিত এত শীঘ্র হারাইব? কে বলিবে অব্যক্ত যাতনা আসিল কেন? সে মুক্ত হইবে, এই জ্বালা যন্ত্রণা পূর্ণ জীবনের শান্তি লাভ হইবে, ইহাত সুখের কথা! তবে কেন আমার প্রাণে এমন হাহাকার ধ্বনি! কে বলিবে ইহা অনুরাগ কি না!

আশ্চর্য্য এই আমার বন্ধু-পত্নিকে সেই ঔষধ মাদুলী করিয়া দেওয়ায় তিনি এখন গর্ভবতী। কতদিন সেই প্রেত-আত্মার জন্য একা শূন্য মনে বসিয়া থাকি, কিন্তু আর কখন সপ্নেও তাহাকে দেখি নাই।

শ্রীসতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ।

(তাঁহার জীবনের কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা।)

(স্বামীজীর বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর, ইনি এক্ষণে বৃন্দাবনে নাগলা গোপীনাথে থাকেন। তথায় তিনি ব্রজবোলা বলিয়া পরিচিত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ, পড়িতে থাকেন, নানা কারণে পরীক্ষা দেওয়া ঘটে নাই। কিছুদিন ঢাকায় শিক্ষকতা করিয়া সংসারে

বৈরাগ্য হওয়ায় প্রায় ২৫ বৎসর হইল গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কাশী-ধামস্থ পরমহংস স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস ও পরমহংস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইহাঁর এক স্ত্রী ও এক পুত্র বর্ত্তমান আছেন। স্বামীজী একজন সম্প্রদায় বিহীন সাধক, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, শৈব, সকল উপাসকের প্রতিই ইহাঁর সমান অনুরাগ, নিজেও অনেক মতে সাধন করিয়াছেন। বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে ইহাঁর নাম প্রায়ই বহু সমাদরের সহিত ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়; অথচ ইহাঁর আচার ব্যবহার ঘোর শাক্তের মত।

স্বামীজীর প্রকৃতি বালকের ন্যায়, এবং তিনি নিজ জীবনের ঘটনা-বলী গোপন রাখিতে পারেন না। এক সময়ে স্বামীজী তিন মাসকাল শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেখক কার্ত্তিক বাবুর হাকোলার বাটীতে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তৎকালে প্রবন্ধলেখক অনেক প্রকার ভৌতিক ও দৈব ঘটনা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন। স্বামীজীর অনুমত্যানুসারে, এবং তাঁহা-রই আবৃত্তিমত তিনি নিজ হস্তে অনেকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন। উক্ত ঘটনাবলি হইতে কতকগুলি আমরা অলৌকিক রহস্যের পাঠকবর্গকে উপহার দিব।)

(১)

প্রেতের দীক্ষালাভ।

স্বামীজী ভাগলপুরে গঙ্গাতীরে একটি মন্দিরে কয়েকদিন ছিলেন। তথায় প্রত্যহ শিবলিঙ্গ, নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি চিত্র-বিগ্রহের পূজা করিতেন ও অপরাহ্নে কয়েকটি পরিচিত লোকের সহিত কীর্ত্তনাদি করিতেন। ব্রহ্মচারী কুলদাপ্রসন্ন, প্রাণকৃষ্ণ, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটি লোক স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন।

একদিন কীর্ত্তন সমাপনের পর সকলে চলিয়া যাইলে স্বামীজী উক্ত মন্দিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটী দীপশিখার মত আলোক ক্রমশঃ স্বামীজীর দিকে আসিতেছে, দেখিলেন। নিকটস্থ হইলে দীপ শিখাটি যেন একটি অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। মূর্ত্তিটি কহিল "আমি আপনার প্রাণকৃষ্ণের পিতা। আমাকে কৃপা করিয়া আপনি একটি নাম দিন।" স্বামীজী বলিলেন "এটি কাল্পনিক কি প্রকৃত ঘটনা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি আপনার পূর্ব্বের মূর্ত্তি স্পষ্ট করিয়া দেখান, এবং এমন কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে, তাহাও দেখান, যাহাতে আপনাকে প্রাণকৃষ্ণের পিতা বলিয়া প্রত্যয় করা যায়।"
———অতঃপর সেই মূর্ত্তিটি স্পষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিল ও মস্তকে টাক দেখা যাইতে লাগিল। স্বামীজী ঐ মাথার টাককে বিশেষ চিহ্ন বলিয়া বুঝিলেন। তিনি মূর্ত্তিটিকে পরদিন সায়াহ্নে কীর্ত্তনকালে আসিতে বলিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া, যথারীতী স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি তাহার দিকে চাহিয়া এরূপ ভাবে হাস্য করিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণকৃষ্ণ মনে করিল যে স্বামীজী তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন। প্রাণকৃষ্ণ ব্যাপার জানিতে উৎসুক হওয়ায় তিনি গত রাত্রের ঘটনা সমুদয় তাহাকে বলিলেন। প্রাণকৃষ্ণও নিজের পিতার জীবদ্দশায় মস্তকে টাক থাকা স্বীকার করিল। তাহার পিতার চেহারার সহিত স্বামীজীর বর্ণিত চেহারার ঠিক মিল হইল। পিতার দীক্ষালাভ একটা বহু ভাগ্যের কথা বিবেচনা করিয়া, প্রাণকৃষ্ণ সেই দিন কীর্ত্তন জন্য একটু বিশেষ ভাবে আয়োজন করিল।

সন্ধ্যায় কীর্ত্তন কালে প্রাণকৃষ্ণের পিতা আসিলেন, স্বামীজী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একটি নাম দিয়া দিলেন, তিনিও পূর্ণ মনোরথ হইয়া

অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অবশ্য এই দীক্ষা ব্যাপার অপর কীর্ত্তনকারীদের চক্ষুর গোচর হয় নাই।

এই ঘটনাটি ১৯০৭ সালের জানুয়ারি সংখ্যা হিন্দুস্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে একবার প্রকাশ হয়। তৎকালে সম্পাদক শিশির বাবু ঘটনাটির সত্যতা নির্ণয় জন্য স্বামীজীকে পত্র লেখায়, স্বামীজী ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। শিশির বাবু এইরূপ ইহার মীমাংসা করিতে চান। "ভক্তিযোগ প্রভাবে স্বামীজীর মত লোকে অলৌকিক শক্তিলাভ করেন। ইহাঁদের কাছে শক্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে অর্থাৎ এরূপ ভক্তে শক্তিলাভ জন্য প্রার্থনা বা অভিলাষ করেন না। ভক্তি ও সাধনের বহু-পথের মধ্যে কীর্ত্তন করা একটি অন্যতম পন্থা। এই কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তের সমাধি হয়। এই সময়ে তাঁহাদের আত্মা দেহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্ হইয়া যায়। এই সমাধি অবস্থায় অন্য লোকের জীবের সহিত দর্শন ইত্যাদি ভক্তদের ঘটে।" আমাদের কিন্তু এমত ভাল লাগে না।

(২)

মৃতের সদ্গতি লাভ।

ভাগলপুরের মন্দির হইতে তথায় জনৈক উকিলের বাটীতে স্বামীজীকে কয়েক দিনের জন্য যাইতে হয়। উক্ত উকিল বাবুর জনৈক কর্ম্মচারীর মুমূর্ষু অবস্থা হওয়ায় লোকটিকে তীরস্থ করিতে স্বামীজীর ইচ্ছা হয়। কয়েকটি লোকে তাহাকে গঙ্গায় লইয়া গেল। স্বামীজীও সঙ্গে গেলেন। রাত্রি অন্ধকার, তাহার উপর ঝড়বৃষ্টি থাকায় পাড়ার লোকে একে একে সরিয়া গেল, একটি বালক উপরের মন্দিরে বসিয়া রহিল মাত্র। স্বামীজী রোগীকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময়

স্বামীজী দেখিলেন একটি লোক যেন শিবমন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। কোন একটি অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া স্বামীজী একটু সতর্ক রহিলেন। কিছু পরেই স্বামীজী দেখিলেন একটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল "আপনি উহাকে ছাড়িয়া দিন।" তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করায় মূর্ত্তিটি কহিল "আপনি সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন, আপনি নিকটে থাকিতে আমরা উহাকে লইতে পারি না।" তিনি মুমূর্ষুকে নাম না শুনাইয়া ছাড়িতে পারিবেন না বলায় মূর্ত্তিটি চলিয়া গেল। পরে স্বামীজী নাম শুনাইতে শুনাইতে লোকটির মৃত্যু হইল।

দিনকয়েক পরে মৃত ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি স্বামীজীকে দর্শন দিয়া বলিল "আপনি নিকটে থাকায় আমার অনেক উপকার হইয়াছে আমি সদ্গতি পাইয়াছি।"

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যমালয়ের পত্রাবলী।

তৃতীয় পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখানে একটী কৃষ্ণ, পঙ্কিল, গুরুভারবারিপূর্ণ, স্রোতস্বিনী প্রবাহমান। তোমাদিগের সুসভ্য বিজাতীয় বিজেতারা তাহার নাম দিয়াছেন, "লিথ্" (Lethe) বিস্মৃতি। তোমরা তাহাকে বৈতরিণী বল। তোমরা যে নামেই তাহাকে অভিহিত কর না কেন, তাহাতে তাহার প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না,—তাহা মানবের কুকর্ম্মের বিস্মৃতি

উৎপাদন করিতে পারে না। বিস্মৃতি হওয়া দূরের কথা, সেই নদী দর্শনমাত্রেই, পার্থিব জীবনের সমস্ত পাপকাহিনী, একেবারে স্মরণে জাগিয়া উঠে। তবে, জীবদ্দশায় যাহার কিছু উচ্চ বা ধর্ম্মভাব ছিল, তৎসমুদয় এখানে বাসকালীন আর মনে আসে না। তাই বুঝি ইহার নাম লিথ! তাহাই বুঝি প্রকাশ করিতে প্রাচ্য জ্ঞানীরা ইহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন! স্মরণে আনিতে অনেক চেষ্টা করিতেছি, স্মৃতিতে আসিতেছে না,—জীবদ্দশায় কাঁহার নাম যেন আমি মাঝে মাঝে করিয়াছি, কাঁহার পবিত্র লীলা কথায় আমার চিত্ত মুগ্ধ হইত, কে যেন অন্তরে থাকিয়া মধুর আশ্বাসবাণীতে আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত করিত! এখনও যেন তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই! তিনি অন্তরে আছেন বলিয়াই যেন, আমি তৃপ্তিলাভ করিতে ছুটিয়া বেড়াই, কিন্তু নিজ কর্ম্মদোষে প্রকৃত শান্তি খুঁজিয়া পাই না। ওই যে দূরাগত আলোক রশ্মির কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা কি সেই অজানা দেশের অজ্ঞাত শান্তি-কেন্দ্র হইতে আসিতেছে? তাহাই হইবে। তাই সেই আলোক দর্শনে যেন সুখের আশা আসিয়াছিল। আবার যখন বৈতরিণীর কৃষ্টকিরণজাল তাহাকে গভীর কৃষ্ট আবরণে মগ্ন করিতেছিল, তখন পূর্ণ নিরাশা আমার প্রাণ আচ্ছন্ন করিতেছিল। কৃষ্টকিরণজাল বলাতে তোমরা স্তম্ভিত হইতেছ? কিরণজাল আবার কৃষ্ট, সে কি? হাঁ, বৈতরিণী হইতে ঘোর কৃষ্ট তিমির মাঝে মাঝে চারিদিক আচ্ছন্ন করে। অতি নিবিড় অন্ধকারময় কুয়াসারমত যেন কি একটা আবরণ, বৈতরিণী হইতে উঠিয়া দিকদিগন্ত ছাইয়া ফেলে। ইহাই আমার পূর্ব্বকথিত গাঢ় মসীময় বিভাবরী। এই নদী অসুরের বাসভূমি, মহাপাতকীর ভোগস্থান। তাহাদিগের বীভৎস চিন্তা-রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে নদীগর্ভ হইতে উঠিতে থাকে। তীব্র যাতনায়

তাহাদিগের অব্যক্ত ভাষা, নিরাশার তীব্র হৃদয়-জ্বালা, কুয়াসার মত আসিয়া আমাদিগকেও সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করে, এবং সেই দারুণ অন্ধকারময় আবরণের ভিতরে পড়িয়া আমরা প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশনের যাতনা পাই।

তোমাদিগের পার্থিব নদীর জুয়ার ভাটার ন্যায় এই নদীরও জলের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। যখন পৃথিবীতে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, এই নদীও সেই সময়ে ফুলিয়া উঠে। মানব রাজ্যের প্রত্যেক অত্যাচার, প্রত্যেক পাতক ইহাকে পুষ্ট করিতে থাকে। তাই এই নদীর জল এত পঙ্কিল, এত অপবিত্র, ঘনীভূত রুধীরের মত গাঢ়। যখন তোমাদিগের পৃথিবীতে অস্বাভাবিক অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় বৈতরিণীর গাঢ় জল দুই কূল ছাপাইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। তাহারই ফলে তোমাদিগের রাজ্যে মহামারি ও প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটে। তখন আমাদিগের যে কি যাতনা; তাহা আর তোমাদিগকে কি জানাইব!

আমি শুনিয়াছি, এখানেও মাঝে মাঝে অতি বৃষ্টি হয়, কখন কখন তুষারপাতও হইতে দেখা যায়। নরকে আবার অতিবৃষ্টি তুষারপাত! তোমরা হয় ত একথা শুনিয়া হাসিবে; ভাবিবে, আমি প্রলাপ বলিতেছি। আমার কিছুই প্রলাপ নয়। তোমাদিগের জগতে যখন দুষ্ট কার্য্যের অতিশয় বৃদ্ধি হয়, অথবা শূন্য গর্ব্ব, বৃথা আত্মাভিমান বর্দ্ধিত হয়, তখনই এখানকার প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তোমরা বলিবে, এ গুলিত পৃথিবীর ধর্ম্ম, দুষ্ট কার্য্য, বা মানবের বৃথা আত্মাভিমান ইহারা ত পৃথিবীর নিত্য ব্যাপার। সেটা অনেকটা ঠিক। সত্য এই সমস্ত পৃথিবীর নিত্য বস্তু; কিন্তু তত্রাচ তাহারা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া উঠে যে, পৃথিবীতেও সে সমস্ত

অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। তখন সেই অতিরিক্ত অংশটুকু এখানে আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটায়। আমরা পৃথিবীর ভাষাই শিখিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই ভাষায় তখন বলি, "কয়দিন ধরিয়া অতি বৃষ্টি হইতেছে", "কয়দিন ধরিয়া গাঢ় তুষার জালে আমরা আবরিত রহিয়াছি।"

এই ভোগ লোকের যে কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নয়। তথায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে থাকে। সমধর্ম্মী সমস্বাভাবান্বিত নানাস্থানের লোক মিলিত হইয়া একটা নগর নির্ম্মিত হয়। এইরূপে এখানে নরঘাতীর, পরস্বাপ-হারীর, ধনলোলুপের, কর্ত্তব্যহীন বিচারকের ও কামাসক্তের বিভিন্ন বিভিন্ন পুরী বর্ত্তমান। তোমরা ভাব তোমাদিগের কারাগার বা মৃত্যুদণ্ড মানবের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়। যেমন তোমাদিগের সকল ধারণা, এটাও সেইরূপ ভ্রমপূর্ণ। তোমাদিগের রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপ-রাধীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক দল অতি শিশু-প্রকৃতির মানব। তাহাদিগের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি অতি অল্পই বিকসিত হইয়াছে; তাহাদিগের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান অতি অল্পই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহা-দিগের চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা অসভ্যজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং ভীষণ কার্য্যকলাপরূপ ঘাত প্রতি-ঘাতের দ্বারা তাহাদিগের অর্দ্ধ বিকসিত চিত্তের বিস্ফারণ করিত। কিন্তু তোমাদের সভ্যজাতিরা কি করিল? তাহাদিগের মাতৃরূপিণী জন্মভূমিকে ছলে ও বলে অধিকার করিয়া সভ্যজাতির উচ্চনীতি ও রাজনিয়ম তথায় প্রচার করিয়া দিল; তাহাদিগের সহানুভাবিনী জননীস্বরূপিণী জন্মভূমিকে নষ্ট করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে মমতাবিহীনা বিভিন্ন আচার-বতী রঙ্গিণী ধাতৃকরে সমর্পণ করিল। সেই শিশুজাতি বিজাতীয় কৃত্রিম

শাসনে শীঘ্রই উচ্ছেদিত হইয়া, তাহার উচ্ছেদকারী স্বার্থপর জাতির মধ্যেই কর্ম্মের সূক্ষ্ম বিধানে জন্মগ্রহণ করিল এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে তাহাদিগের পাশবিক চিত্তভাব অদমিত না হওয়ায়, তাহারা সভ্যজাতির রাজনিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অতি বীভৎসভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। ইহারা পূর্ব্ব জীবনে তাহাদিগের সভ্য বিজেতার হস্তে অনেক অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, এই জীবনে তাহাদিগেরই অন্তঃশত্রুরূপে পরিণত হইল, এবং তাহাদিগের শাসনপ্রণালী অগ্রাহ্য করিয়া নানারূপ অত্যাচার করিয়া রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। পরে, রাজদ্বারে নীত হইয়া কারাবাসে তাহারা জীবনলীলা সাঙ্গ করিল। ইহারা মৃত্যুর পর সকলে মিলিত হইয়া এক পুরীতে বাস করিতে থাকে, এবং জীবদ্দশার সমস্ত ঘটনার পুনরভিনয় করিতে থাকে। কি তাহাদিগের ভীষণ কার্য্য! তাহারা কৃত্রিম কারাগারে যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র করে এবং কোন উপায়ে তাহাদিগের মমতাহীন অত্যাচারীর জীবনলীলা সাঙ্গ করিবে তাহা ভাবিতে থাকে। কখন তাহারা গুপ্ত হত্যা করিতে যাইতেছে, কখন বা কারাগার ধ্বংস করিয়া শান্তিপ্রিয় শত শত নরনারীর উপর অত্যাচার করিতেছে। যে হিংসাবীজ পূর্ব্বে একটুমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা এখন বিষম বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

আর এক দল মানব সম্প্রদায় আছে, যাহারা ইহাদিগের মত অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত নয়। তাহাদিগের মানসিক উন্নতি বেশ হইয়াছে, কিন্তু তদনুযায়ী বিবেকজ্ঞানের স্ফুরণ হয় নাই। তাই তাহাদিগের প্রচুর ধীশক্তি সত্ত্বেও, স্বার্থের জন্য মানবের কত না অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর, তাহারা যগুপি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হয়, তখন কি তাহাদিগের একেবারে নীতি-

জ্ঞান আসিয়া পড়ে? তাহারা কারামুক্ত হইয়া, অতি সতর্কতার সহিত তাহাদিগের অভ্যস্ত কার্য্যে আবার ব্যাপৃত হয়। মৃত্যুর পর তাহারা আবার পূর্ব্বকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। ইহাদিগের যন্ত্রণা কি ভয়ানক! তাহাদিগের মানসিক শক্তির অধিক বিকাশ হওয়ায় তাহাদিগের যাতনাও আপেক্ষিক গুরুতর। যেমন এক দিকে তাহাদিগের তীক্ষ্ণ উদ্ভাবিনী শক্তির সাহায্যে তাহারা নানারূপ নূতন মানব-বঞ্চনার উপায় আবিষ্কার করিতেছে, অপরদিকে ঠিক সেইরূপ সেই কল্পনা-শক্তি প্রভাবেই আবার নানাদিকে বিপদ আশঙ্কা করিতেছে। সেই হতভাগাদিগকে যদ্যপি তোমরা দেখিতে, তাহা হইলে তোমরা কখনও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতে না। তবে, আমাদিগের কথা স্বতন্ত্র, আমরা আপনা লইয়াই ব্যস্ত, আপনার যাতনায় অস্থির, পরের চিন্তার অণুমাত্র স্থানও আমাদিগের হৃদয়ে নাই। তাহারা হেতায় কেবল চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি করিতে থাকে, কেবল সন্দেহ, কেবল ভয়, কে তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতেছে,—ওই কে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে আসিতেছে। হায়, সে অশান্তির, সে যাতনার আর অধিক পরিচয় কি দিব? তোমরা যদ্যপি, তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া কেবল যন্ত্রণা না দিয়া, তাহাদিগের বিবেক বুদ্ধিকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে হয়ত তাহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারিতে, এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগের এখানকার গুরু যাতনার পসরাও লঘু ভারাক্রান্ত করিতে পারিতে।

নরহন্তাদিগের বিষয়েও ওই কথা বলা যাইতে পারে। তোমরা হত্যাকারীকে হত্যা করিয়া ভাব, যে প্রাণদণ্ডের ভয়ে জগৎ হইতে নরহত্যা উঠিয়া যাইবে। তোমাদিগের কি বিষম ভ্রম! সর্ব্বসাধারণে করুণা, মানবজীবনের প্রতি সমাদর বর্দ্ধিত হইলে, তবে ত মানব অপরকে

হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে? তোমাদিগের কঠোর রাজনিয়মে সেই করুণার বা সমাদরের কি বৃদ্ধি হয়, না তাহাতে তাহার মানবজাতির উপর একটা তীব্র প্রতিহিংসা, একটা ভীষণ দ্বেষ ও ক্রোধ জন্মিয়া যায়? সে হয় ত কোনও বিকট মানসিক উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া ওই নৃশংস কার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু তোমাদিগের সভ্য জগৎ তাহার প্রতিশোধ লইতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। একটা হত্যা উত্তেজনায় বিকৃতি চিত্তের ফল, অপরটা ন্যায়বান স্থিরচিত্ত বিচারকের ধীর, নীতি প্রদর্শিত বিচারের ফলে। যে মানবজীবনে সমাদর, ধীর ব্যবস্থাকারকের প্রাণে আসিল না, যে করুণার মধুরবাণী, দ্বেষ, ক্রোধাদিরদ্বার অবিলোড়িত বিচারকের হৃদয়ে শুনা গেল না, তাহা কি ক্রোধান্ধ উত্তেজিত হত্যাকারীর মনে স্থান পায়? তোমরা কি ভাব ওই নরহন্তাকে হত্যা করিয়া, তোমরা তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে? সেটা তোমাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম। তোমরা তাহার দেহটা হইতে মুক্ত হইলে। তাহার যে দেহ পিঞ্জরে, সে জীবদ্দশায় অবরুদ্ধ ছিল, যে দেহটিকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখিলে তোমরা তাহা হইতে নিরাপদে থাকিতে পারিতে, রাজদণ্ডের দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে তোমাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারী প্রবল শত্রু করিয়া তুলিলে মাত্র।

এখানে এই নরঘাতীর পুরীতে আমি কি দেখিতেছি? তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে, এই অস্থির ভাবে লুকাইত হইতেছে, কোনও উপায়ে আত্মজীবন বাঁচাইতে পারিল না বলিয়া, প্রাণের মমতায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আবার পর মুহূর্ত্তে মানবসম্প্রদায়ের উপর, তাহাদিগের হত্যাকারীদের উপর তাহাদিগের অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে ছুটি-তেছে। ক্রোধান্ধ বা বিকৃতচিত্ত হইয়া পরজীবন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া

মনের ভিতরে যখন তাহাদিগের তীব্র তুষানল জ্বলিতেছে, তাহারা ছুটিয়া গিয়া ভীত ও সন্দিগ্ধচিত্তে অপরের করুণা ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করিতেছে; কিন্তু আবার পরক্ষণেই তোমাদিগের পৃথিবীতে যাইয়া শত শত নরনারীকে হত্যা করিতে অদৃশ্য ভাবে উৎসাহিত করিতেছে। তাহারা প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্ত নরনারীকে নিমিত্ত কারণ করিয়া কত লোকের প্রাণনাশ করিতেছে। তোমরা কি দেখিতে পাওনা, এক সময়ে একরূপ হত্যা ভূয়ঃ ভূয়ঃ ঘটিতে থাকে? এই সমস্ত হত্যাকার্য্য জানিও এই সম্প্রদায়ের উত্তেজনার ফলে হইতে থাকে।

কেবল যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীরাই এখানে মিলিত হইয়া নানারূপ কুকর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহা নয়। কৌশলময় ও জীবদ্দশায় মহাধনী মহাজনদিগেরও এখানে নগর আছে। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহাদিগের অনেককে জানিতাম। তাহারা বিপুল অর্থের অধিপতি ছিল। শত শত দাস দাসী পরিবৃত হইয়া বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে অতি সুখে তাহারা জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। রাজদ্বারে মহা সম্মানিত, সাধারণের আদর্শ স্থল, অধীন আশ্রিত জনের পূজ্য দেবতা, তখন কে জানিত যে, মৃত্যুর পর তাহারা এই দশাগ্রস্থ হইবে? তাহাদিগের জীবিত কালে কে ভাবিয়াছে, তাহাদিগের বিশাল কুবের-ভাণ্ডার কাহার ধনে পূর্ণ হইতেছে? তাহাদিগের কৌশলে কত পরিবার যে নিঃস্ব হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিয়াছে? তাহারা কিসে এত ধনী হইয়াছে জান? অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, বা অপর কোন চতুরতায় দীন, ঘর্ম্মাক্তকলেবর, শতশত কৃষকের অতি কষ্টে সংগৃহীত, বুভুক্ষিত পরিবারের জীবনস্বরূপ, ধান্য অপহরণ করিয়া, অধিকমূল্যে বিদেশে বিক্রয় করিয়া, তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। নিজ স্বার্থের জন্য, নিজ বিলাস চরিতার্থ করিতে, কত প্রাণীকে যে তাহার উচ্ছেদিত করিয়া আসিয়াছে

তাহার অবধি নাই। সেইরূপ আরও কত উপায়ে সহস্র সহস্র লোকের অর্থ, ভক্ষ্য বা জীবনোপায় লুণ্ঠিত করিয়া তাহারা আপনাদিগের ধন-তৃষা মিটাইয়া আসিয়াছে। তোমাদিগের সভ্য নিয়মে যে একজনের কোনও তুচ্ছ বা পরিত্যক্ত সামগ্রী অপহরণ করে, তাহাকে কারাবাসের কঠিন যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু, যাহারা শত শত লোকের জীবনোপায় নাশ করিতেছে, তাহারা পূজিত। এখানকার নিয়ম কিন্তু, অন্যরূপ। তাহারা পূর্ব্বের অভ্যস্ত বৃহৎ হর্ম্মে বাস করিতেছে, পূর্ব্বের বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে, অথচ ভাবিতেছে, তাহাতে সুখ নাই, শান্তি নাই। সেই সুন্দর হর্ম্যমালা যেন অগ্নিনির্ম্মিত, তাহাদিগের অঙ্গ যেন দগ্ধীভূত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার, অথচ তাহাদিগের ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। মহামূল্য নানা বসনে দেহ আবৃত করিয়াও তাহারা মানসিক নগ্নতা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। তাহারা এখানে বিপুল সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়াও ভাবিতেছে, তাহারা কপর্দ্দক শূন্য। মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও উদারান্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনাহারের তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া পাষান চর্ব্বন করিতেছে, ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না।

আবার ঐখানে বিচারক পুরীতে স্বার্থান্ধ বিচারকেরা, তাহাদিগের আত্মকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। উপরিতন প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে তাহারা কর্ত্তব্য ডুবাইয়াছিল, তাহার যে কি ভীষণ পরিণাম এখন তাহা দেখিতেছে। ঐখানে কামুকীপুরীতে নরনারীগণ কি বীভৎস কার্য্যই করিতেছে। কিছুতেই তাহাদিগের কাম নিবৃত্ত হইতেছে না, বরং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সেত কামচরিতার্থতা নয়, সে যে অগ্নিমূর্ত্তি আলিঙ্গন! আরও কত আমি বলিব। সে সমস্ত তীব্র যাতনা-কাহিনী বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব।

আমি এখানে আসিয়া এখানকার যাতনার প্রকৃতি কি, তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছি। তাহা একাধারে দুস্তোষণীয় তীব্র কামনা ও হৃদয়বিদগ্ধকারী অতি তীক্ষ্ণ অনুতাপ। না না! অনুতাপ নয়, শুষ্ক যাতনা। অনুতাপ অনেক স্নিগ্ধ, অনেক সুখকর। ইহা পাষাণের অপেক্ষা শুষ্ক। ইহা মনস্তাপ নয়, মনস্তাপ আসিতেছে না বলিয়া অতি ভীষণ সে এক প্রকার অব্যক্ত যাতনার আবদ্ধ বেগের পেষণ। এখানে দুই প্রকারের যাতনা আছে, কিন্তু তাহারা উভয়েই মর্ত্ত্যের আত্ম পাপকার্য্যের প্রতিফলাত্মক। কেহ কেহ' পৃথিবীতে যে নীচবাসনার অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে, তাহারই এখানে পুনরভিনয় করিতে থাকে, প্রভেদ এই, এখানে কিছুতেই তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে সক্ষম হয় না। যে সমস্ত পাপকার্য্য তাহাদিগের মর্ত্ত্যের জীবনকে কলুষিত করিয়া আসিয়াছে, এখানে তাহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে তাহাই করিতে বাধ্য হয়। তবে পৃথিবীর বাস কালে সেই সমস্ত কার্য্য করিতে একটা সুখবোধ করিত, এখন সুখের পরিবর্ত্তে তীব্র ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছে, অথচ সেই সমস্ত হইতে বিরত হওয়ায় তাহাদিগের কোনও সামর্থ্য নাই। কৃপণ কেবল ধনের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সেই বৃথা স্বপ্নের কিছুতেই পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেইরূপ তাহার অপবিত্র কার্য্যকলাপের, উদরিক চব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াদি খাদ্যের, হত্যাকারী তাহার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বৃথা স্বপ্ন দেখিতেছে। অথচ তাহাদিগের কিছুতেই বাসনা মিটিতেছে না বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ কেহ আবার জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত প্রত্যবায় করিয়া আসিয়াছে, নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের যাহা কিছু অনিষ্ট করিয়াছে, তাহারই সংশোধন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা জানে এখানে সে চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, তত্রাচ তাহা হইতে বিরত হইবার শক্তি নাই! এইরূপে যাহারা জীবনে অবৈধ আচরণ করিয়া আসিয়াছে,

তাহারা সংযতাচারী হইতে, পক্ষপাতদুষ্ট সমদর্শী হইতে, নিষ্ঠুর কৃপাবান হইতে নিরর্থক চেষ্টা করিতেছে। আত্মঘাতী ভাবিতেছে কিছুতেই এবার আর প্রাণকে যাইতে দিবে না। কিন্তু হায়, তাহার শত চেষ্টাতেও বুঝি প্রাণকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, প্রতিমুহূর্ত্তেই সে ভাবিতেছে, "দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণপাখী উড়িয়া গেল।"

কিন্তু একটা কথা এখানে সকলেরই মনে স্বতঃই আসে। এই যে আমরা সকলেই অকথ্য যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা যে কোন অব্য-বস্থিতিচিত্ত শক্তিমানের যথেচ্ছাচার, তাহা নহে। আমরা যে যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, ইহা তাহারই পরিণাম। হে মর্ত্ত্যবাসী নরনারী-বৃন্দ! হে সংসার-পুষ্পের বিলাসী প্রজাপতিগণ! এখনও সাবধান হও, জানিয়া রাখিও, পৃথিবীতেই মানবস্মৃতির শেষ হয় না। যেন মনে থাকে একটী সামান্য পাপেরও পরিণাম আছে। তুমি জগতের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেও অতি সামান্য অপরাধও মানসে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে বাসকালে না হয় আর তাহা স্মরণে আসিল না, কিন্তু তাহাতেই বা কি? এখানে আসিবামাত্রই তাহা স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে; তখন আর সহস্র চেষ্টাতেও তাহা আর মানসপট হইতে ধৌত করিতে পারিবে না। আবার বলি মনে রাখিও,—এখানে যাহা কিছু কষ্ট সমস্তই আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ।

হায়! আমি যে আপনাকে কতখানি ভুলিয়াছি, তাহা কে প্রত্যয় করিবে! আমি আমার জীবনের সমস্ত খানি যেন ভুলিয়া গিয়াছি! জীবন মহাশ্মশানের মত যেন শূন্যময়, তবে চিতাগ্নির মত কেবল পাপকর্ম্মগুলি তথায় জাগিয়া আছে। সেগুলির যেন একটীও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যেন তাহারা নির্ব্বাপিত হইতে জানে না। তথায় আর কে জাগিয়া বসিয়া আছে? আর সেথান বসিয়া আছে "আমি", কেবল

"আমি"। পৃথিবীতে যাহা কিছু আমার স্বার্থের প্রিয় ছিল এখানে সমস্তই আসিয়াছে, অথচ যেন আমার কিছুই নাই। আছে কেবল নগ্ন "আমি"। আমার সমৃদ্ধি থাকিলেও মনে হইতেছে যেন কিছুই নাই। বেশভূষা, সৌধ, পরিচারক, পরিচারিকা সমস্ত থাকিয়াও যেন কিছুই নাই। তাহারা রহিয়াছে বলিয়াই যেন আমার কষ্ট দ্বিগুণিত হইতেছে। আমার জ্ঞান, আমার চিন্তাশক্তি, আমার ধন, আমার বিলাসের ও বাসনার সামগ্রী—যাহা পৃথিবীতে "আমার" বলিয়া আসিয়াছি তাহারা এখন কোথায়!

আমি এখানে "আমি" ব্যতীত আর কিছুই লইয়া আসি নাই। সেই "আমি" বা কিরূপ! তাহা কেবল প্রজ্বলিত মনস্তাপ রাশি। তাহার দাহিকাশক্তির নির্ব্বাণের কি কোন উপায় নাই! আছে! কিন্তু যে অমৃত-বারিতে তাহার অবসান হইবে, তাহা কেন মনে আসিয়াও আসিতেছে না। ওগো কে তোমরা তাহা শিখাইয়া দিবে?

তৃতীয় পত্র সমাপ্ত

ক্রমশঃ

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধ্যা সমাগত। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য নস্য ডিবেটী হস্তে করিয়া আস্তে আস্তে ব্যোমকেশ ও তাহার বন্ধুবর্গের সান্ধ্য-সম্মিলন-গৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন। বোামকেশ এতক্ষণ ঔৎসুক্য-পূর্ণ চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়! তার পর?

ভট্টাচার্য্য। দূর ছোঁড়া! "কার পর?" এই বলিয়া একটিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

ব্যোমকেশ। এঃ দাদা মহাশয়, দেখ্ ছি, আপনার এখনও মৌতাত হয়নি। আপনি আর দুটিপ নস্য নিন; তা' না হলে আপনার মেজাজটা ঠিক ধাতে বস্‌বে না।

ভট্টাচার্য্য। বেশ বেশ, তোদের মত কালেজে পড়া ছেলেগুলোর মধ্যে আমি একটা বড় ভাল গুণ দেখ্‌তে পাই। নস্য জিনিসটার মর্ম্ম-গ্রহণ তোরা অনেকেই কর্‌তে পেরেছিস্। তাই তোদের সম্বন্ধে নিরাশ হবার কোন কারণ আমি এখনও দেখ্‌তে পাইনি। আচ্ছা, তা'হলে তার পর শোন। তুই কাল শেষ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি যে, প্রেতা-বস্থা কত দিন থাকে এবং কি করেই বা তা'থেকে জীবাত্মার মুক্তি হয়। আজ সেই কথাটা আলোচনা করা যাক্। তোর বোধ হয় স্মরণ আছে যে প্রেতাবস্থায় জীবাত্মার যে শরীর, তার নাম ধ্রুবশরীর বা যাতনা দেহ। যত দিন এই দেহ বর্ত্তমান থাকে তত দিনই প্রেতাবস্থা। যখন এই শরীরের নাশ হয় তখনই জীবাত্মা প্রেতাবস্থা হ'তে মুক্তি লাভ করে,

পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃলোক প্রাপ্তির কথা পরে বিশদ করে বলা যাবে। এখন যাতনা দেহ কত দিন থাকে এবং কিরূপেই বা তাহার পতন হয়, সে কথা শোন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটা অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে। তোরা সব বাবু মনিষ্যি, ঘড়ির তত্ত্বটা তোদের বেশ জানা আছে, কেমন? সকাল বেলা উঠে ঘড়িতে বেশ করে ক'প্যাঁচ দম দিয়ে দিলি আর ঘড়িটী বেশ টিক্ টিক্ টিক্ চল্‌তে লাগল। পরে সমস্ত দিন চ'লে চ'লে যখন সব প্যাঁচ ক'টা খুলে যায় এবং স্প্রীংটা শিথিল হ'য়ে পড়ে তখন ঘড়ীটা আপনা আপনি বন্ধ হ'য়ে আসে। পুনরায় দম না দিলে আর চলে না। মানুষের মধ্যেও এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটে থাকে। সারাজীবনের চিন্তা, ভাবনা ও ইচ্ছা যেন 'মনোময় কোষ রূপ স্প্রীংটীতে প্যাঁচ কস্‌তে থাকে। স্থূলদেহের অবসান হ'লে সেই সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও ইচ্ছার শক্তি মনোময় কোষটীর অথবা নবরচিত "যাতনা দেহের" প্রাণস্বরূপ হয়ে থাকে। জীবিত কালে "মনোময় কোষটী" যেরূপ ভাবে কাজ ক'রে এসেছে এখনও অভ্যাস বশতঃ সেইরূপ ভাবে কাজ কর্ত্তে থাকে। এবং যতদিন তার এইরূপ কার্য্য প্রবণতা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত "যাতনা দেহটী"ও সেই শক্তি-বলে অটুট থাকে। কিন্তু ঘড়ীর স্প্রাং যেমন প্যাঁচ খুলে খুলে ক্রমশঃ আল্‌গা হয়ে পড়ে, সেইরূপ "মনোময় কোষে" পরমাণুগুলির পূর্ব্ব অভ্যাসমত কাজ করিবার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে আসে, এবং শেষে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে "মনোময় কোষটী" নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে এবং তাহার পতনকাল উপস্থিত হয়। স্থূল শরীরটী যেমন কার্য্য করতে অক্ষম হ'য়ে পড়্‌লে তাহার দ্বারা জীবাত্মার আর কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না ব'লে সেটী জীবাত্মা হ'তে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে সেইরূপ "মনোময় কোষটী" ও যখন পূর্ব্বাভ্যাস মত কার্য্য করিবার শক্তি হারিয়ে

ফেলে তখন সেটীও জীবাত্মা হ'তে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তখন "যাতনা দেহের" বিনাশ হয়, এবং জীবাত্মা উর্দ্ধতর লোকে গমন করে। অর্থাৎ যে কাম ক্রোধাদির শক্তি এতদিন পর্য্যন্ত তার চতুর্দ্দিকে একটা "যাতনা-দেহ"রূপ দুর্ভেদ্য লৌহ বেষ্টন সৃজন ক'রে তাহার উচ্চতন লোক প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হ'য়েছিল, যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা সেই সমস্ত কাম ক্রোধাদির শক্তি ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজে কাজেই জীবাত্মা তখন সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে উর্দ্ধতন লোক প্রাপ্ত হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝ। একটা সেতারকে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে যদি তার তার গুলিতে আঘাত করা যায়, তাহলে তারগুলি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনা আপনি সেই সুরটী উৎপাদন করিতে থাকে। সেই জন্য দ্বিতীয় বার আঘাত না করলেও একটা সুর বেশ শুনতে পাওয়া যায়। সেই রেশটী ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে এসে শেষে একেবারে মিলিয়ে যায়। জীবিত কালে কাম ক্রোধাদির প্রবল তাড়ণায় "মনোময় কোষ"রূপ সেতারটীতে যে সুরগুলি বেজেছে, দেহান্তে অনেক দিন পর্য্যন্ত তার রেশ থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত নীচ প্রবৃত্তির রেশ থাকে, প্রেতাবস্থা ততদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তার পর ঐ যাতনা দেহের অন্তর্গত "মনোময় কোষের" পরমাণুগুলির উপরোক্ত প্রকারের অভ্যাস ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'য়ে এলে "যাতনা দেহটী" নিস্তেজ হয়ে হয়ে শেষে একেবারে ভেঙ্গে যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই অবস্থা অত্যন্ত কষ্টের অবস্থা; সে যে কিরূপ কষ্ট তা পৃথিবীর মানুষ ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তোদের "অলৌকিক রহস্যে" যে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণিত হচ্চে সে গুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই লক্ষ্য করতে পারবি, এ কথা কতদূর সত্য। যমালয়ের পত্রাবলী ভাল করে' দেখিস।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়, ব্যাপারটা এক রকম কতকটা বুঝেছি

বটে, কিন্তু আর একদিকে যে বিষম খট্‌কা লাগে! তবে কি পাপীর জন্ত এই নিষ্পেষণ ছাড়া আর ব্যবস্থা নাই? এই জগৎ শরীরের কি হৃদয় নাই? যাঁকে সকলে সর্ব্বকালে অগতির গতি বলে আখ্যা দিয়ে থাকে, তাঁর রাজ্যে কি এর কোন উপায় নাই? তাই যদি হয়, তবে পায়ে পড়ি দাদা ম'শায়, আমাদের অজ্ঞান আমাদের মধ্যেই থাক্, তাতে তবু মাঝে মাঝে একজন মঙ্গলময় পুরুষের কথা বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে জেগে উঠে এবং এই উৎকট অশান্তির মধ্যেও প্রাণটা যেন একটু ক্ষণের জন্য একটা নঙ্গর ফেলবার জায়গা পায়। সেটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে একটা বিরাট হৃদয় হীন যন্ত্র মাত্রকে জ্ঞানের নামে তার স্থানে বসাতে পারব না।

ভট্টাচার্য্য। ভাই, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও। তোর কথা শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ভাই তুই কি ভুলে গেলি যে, যে অনন্ত কোটি জীবকে ব্রহ্মরস-সুধা পান করবার জন্যই লীলাময়ের এই বিচিত্র সৃষ্টিলীলা, তাই তিনি বাক্য মনের অতীত অবস্থা, তাঁর সেই আনন্দ ঘনস্বরূপ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এই জগৎরূপ গন্তীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করেছেন। এই প্রেম-যজ্ঞকথা প্রেমময় তোদের হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলুন। হায় ভাই! আর কি সে প্রেমের গোরাচাদ আছে, যে "কিশোরীর প্রেম কে নিবি আয়" ব'লে দুই বাহু তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে? হা শ্রীগৌরাঙ্গ! আজ বাবাজীর দল তোমার পবিত্র নাম কলুষিত ক'চ্ছে! ওরে ভাই, জগজ্জননী তাঁহার কি স্নেহের কোল পেতে "আয় বাছা, আয় বাছা" ব'লে প্রেমের অশ্রু বিসর্জ্জন ক'চ্ছেন, সে কথা, বাসনার দাস, কাম ক্রোধের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলি তুমি আমি কি ক'রে বুঝ্‌ব। সে কথা বোঝেন তাঁর ভক্তকুল। নির্ব্বাণ মুক্তির ভূমানন্দ বিসর্জ্জন দিয়া এই তাপত্রয় ক্লিষ্ট এই দুঃখী মনুষ্য শিশুর কল্যাণ চেষ্টায় আপনাদিগকে বলি দিয়াছেন। সে কথা কে বুঝ্‌বে ভাই? তবে যদি কাম ক্রোধের রাশটাকে বেশ

করে চেপে ধরে, "কোথা দয়াল, কোথা দয়াল" ব'লে তাঁদের রাস্তায় পা ফেল্‌তে চেষ্টা করিস, তবে একদিন না একদিন তাঁদের শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান পাবিই পাবি।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্॥

ইত্যাদি ভগবানের শ্রীমুখের কথা মনে রাখিস। আর ভুলিস না তাঁর সেই অভয় বাণী

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

এই প্রেতলোক থেকে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়াময়ের রাজ্যে কি ব্যবস্থা আছে, সে কথা তোকে কাল বোল্‌ব। তুই হয়ত ভাববি এত যন্ত্রণায় সৃষ্টি ক'রে তার মোচনের ব্যবস্থা করা অপেক্ষা, দয়াময় তিনি, এগুলোর সৃষ্টি মোটে না কর্‌লেই পার্‌তেন। তোকে ইসারায় স্বধু একটুকু বলি, সর্ব্বশক্তিমান মানুষ গড়্‌তে চান, কতকগুলো স্বাধীনতা বিহীন বহিঃশক্তি চালিত নিখুত যন্ত্ররাজির সৃষ্টি করতে চান না। কিন্তু তোর বুড়ো দাদা ম'শায়কে যে মেরে ফেললি। গায়ে হাত দিয়ে দেখ, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তোর প্রাণটা নরম আছে তাই দেখিয়ে দিলুম। আজ আসি ভাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

"পুনরাগমন"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২০)

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখি, জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আমার মুখের উপর পড়িয়াছে। আমি পূর্ব্বে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিতাম। জীবনে প্রথম সূর্য্যরশ্মি আমার ঘুম ভাঙ্গাইল! দেখিলাম সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহে মাকে দেখিলাম না! ঝীকে ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। দুই তিন বার উচ্চকণ্ঠে সম্বোধনের পর পরিচারিকা ঘরে আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সে ঘুমাইতেছিল। আমার ডাকেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তথাপি তাকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে অপ্রতিভভাবে একবার আমার দিকে চাহিল, আর একবার মায়ের শয্যার দিকে চাহিল। তারপর কোনও উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ ঝীয়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ইহার মধ্যেই চিন্তার ভারে অবসন্ন হইয়াছি। রাত্রির স্বপ্নকথা অক্ষরে অক্ষরে আমার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছিল। প্রত্যেক ধ্বনি আমার মনে এক একটী প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া আমার হৃদয়দেশে বিষম আঘাত করিতে লাগিল। মন বলিতেছে মা আমার ফিরিয়াছেন, কিন্তু মাকে দেখিতে ঘরের বাহির হইতে আমার সাহস হইতেছে না।

ঘড়ীতে সাতটা বাজিল, ঝি ফিরিল না, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সভয়ে কম্পিতহৃদয়ে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে যাইয়া দেখি, ঝী সকলের নীচের সিঁড়ির এক কোণে বসিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার অবস্থান দেখিয়া বুঝিলাম

মা নাই। তবু একবার মনকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কোথায়?" ঝী কোনও উত্তর দিল না—মুখও তুলিল না।

বাটীর ভিতরে ঝী, রাঁধুনি কাহাকেও দেখিলাম না। বাহির বাটীতে চাকরকে দেখিলাম না। বহির্দ্বারে দরোয়ান বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাটীর চাকর দাসী সকলে কোথায় গেল?" সে বলিল—"গঙ্গাজীমে গিয়া।"

শুনিবামাত্রই চারিদিক যেন অন্ধকারময় দেখিলাম। "মাকে তবে কি গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে!" কিন্তু আমাকে না জানাইয়া মাকে লইয়া গেল কে?

আমি গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। একটা জামা ও চাদর আনিতে ঘরের দিকে ছুটিলাম।

বাটীর বাহির হইয়া পথে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি আমাদের কোচম্যান গাড়ী লইয়া আসিতেছে।

অধিক আর কি বলিব! গোপাল আমার মাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে! একবার মনে হইল, মায়ের সহিত দেখা না করিয়া, ছুটিয়া গোপালের কাছে যাই। তাহার হাত দুটী ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া আসি। গোপালের নাম স্মরণমাত্র দরোয়ানের কথা আমার মনে পড়িল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, মাকে দুই দিন সুস্থ দেখিয়া আমি একবার দেশে যাইব।

মা গাড়ী হইতে নামিয়া চৌকাটে পা দিবামাত্র আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইবামাত্র মা অপ্রতিভের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমাইতেছিলে দেখিয়া, আমি তোমাকে তুলিতে ইচ্ছা করিলাম না। আজ ষষ্ঠী, মা দুর্গার বোধনের দিন, সংসারের কল্যাণের জন্য গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম।"

আমি আর কি উত্তর করিব! কেবলমাত্র বলিলাম—"ভালই করিয়াছ।" অতি কষ্টে দমিত আনন্দোচ্ছ্বাস উষ্ণ উগ্রমূর্ত্তিতে আমার অন্তর্হৃদয় প্লাবিত করিতে লাগিল। আমি আর কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। রাঁধুনি ও এক ঝি মায়ের সঙ্গে গিয়াছিল। চাকরও গিয়াছিল। সে বাজার করিতে পথে নামিয়াছে।

সকলে গৃহমধ্যে চলিয়া গেলে, আমি সেই গাড়ী করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটী চলিয়া গেলাম।

তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি ব্যস্ততার সহিত আমার গাড়ীর সমীপে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কেমন গোপীনাথ?"

আমি বলিলাম—"আপনি আসুন।" বলিতে বলিতে আমার এতক্ষণের অতিকষ্টে আবদ্ধ হৃদয়াবেগের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি এমন কাঁদিলাম যে, আমার মুখ হইতে একটী কথা বাহির করিতে তাঁহার শত সাগ্রহ প্রশ্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি তখন আমার গাড়ীতে উঠিয়াই, নিজের কোচম্যানকে আমাদের বাড়ীতে তাঁহার গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

পথে আর কোনও কথা হইল না। আমার বোধ হয় ডাক্তার বাবু আমাকে প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ দিয়াছিলেন। বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া যখন আমরা উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন তিনি অতি ধীরে আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! এইবার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার মুখে হাসি আসিল। আমার মুখে হাসি দেখিয়া ডাক্তার বাবু বুঝি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি একটু

আত্মহারার ন্যায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কি ভাল আছেন গোপীনাথ?"

আমি বলিলাম—"আপনার ব্যবস্থার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোপাল মাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।"

ডাক্তার বাবুর গণ্ড, দেখিতে, দেখিতে, গলদশ্রু-সিক্ত হইল। তিনি ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন—"গোপাল আসিয়াছে?"

আমি বলিলাম—"সে কথা আপনাকে পরে বলিব। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করি, আমার সমক্ষে মায়ের কাছে ভুলেও গোপালের নাম করিবেন না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"কেন?"

আমি উত্তর দিলাম "সমস্ত কথা পরে বলিব।"

আমরা যখন ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তখন মা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইয়াছেন। ডাক্তারবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আপনি কেমন আছেন?"

মা ডাক্তার বাবুকে দেখিবামাত্র অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া উত্তর করিলেন—"ভাল আছি।" এই বলিয়াই তিনি ডাক্তার বাবুর পরিবারবর্গের সমাচার লইতে আরম্ভ করিলেন।

ডাক্তার বাবু এবারে নিজেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন। মায়ের শারীরিক সংবাদ লইয়া, তিনি কোথায় একটা বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন, না নিজেই নিজের শারীরিক সংবাদ দিতে মায়ের সম্মুখে যেন রোগীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাই হ'ক অনেকক্ষণের পর তিনি মাকে দুই এক কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন।

ডাক্তার। আপনি আজ আর পরিশ্রম করিবেন না।

মা। কেন আমার কি হইয়াছে?

ডাক্তার। হইবার কি আছে। তবে আপনাকে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল দেখিতেছি।

মা। কই আমিত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ডাক্তার। তা না বুঝেন ভালই, তবে আজ সকাল সকাল কিছু আহার করিবেন।

মা। সেকি ডাক্তার বাবু আজ আহার করিব কি! আজ যে বোধন-ষষ্ঠী। এই নাস্তিকগুলার সঙ্গে পড়িয়া আপনারও কি মাথা গুলাইয়া গিয়াছে?

ডাক্তার বাবু একেবারে নিরুত্তর। মা বলিতে লাগিলেন "আপনি কি বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখেন না? পুত্রবতী কেহই আজ, দিবসে আহার করিবেনা"। ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"আজ যে ষষ্ঠী, মা, ইহা আমার মনেই ছিল না।"

মা বলিলেন—"নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, আপনাদের স্মরণ না থাকিবারই কথা। কিন্তু জননীকে পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তই স্মরণ রাখিতে হয়।

অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার বাবু মাকে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া তিনি প্রথমেই আমাকে বলিলেন—"যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে অনুমান হইতেছে মায়ের পূর্ব্বাবস্থার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। সুতরাং সে স্মৃতি জোর করিয়া জাগাইবারও প্রয়োজন নাই। শরীর যে বিশেষ দুর্ব্বল তাহা বোধ হইল না। আর বোধ হইলেও মাকে দিবাভাগে জল গণ্ডুষ পান করায় এমন সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং মায়ের বিষয়ে আর চিন্তা না করিয়া সমস্ত ঘটনাটী আমাকে শুনাইয়া দাও। কেননা এরূপ

রোগী যে আবার জীবন পাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

দেশ হইতে দরোয়ান ফিরিয়া আমাকে যে যে কথা বলিয়াছিল ও তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ডাক্তার বাবুকে শুনাইলাম।

শুনিয়া প্রথমে তিনি এমনই বিস্মিত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"তাইত হে, বিশ্বাস করিতে যে প্রবৃত্তি হইতেছেনা, অথচ বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। মৃত্যুর মুখ হইতে এরূপ বিচিত্র ভাবে ফিরিয়া আসা, দেখা দূরের কথা, জীবনে কখন শুনি নাই। কোন শক্তির বলে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যাই হ'ক তোমাকে গোপালের অনুসন্ধানে যাইতে হইতেছে।"

আমি। কেমন করিয়া যাইব, মা যে জানিতে পারিবেন।

ডাক্তার। মা যাহাতে জানিতে না পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

আমি। পিতাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই।

ডাক্তার। বেশ, তাহারও ব্যবস্থা করিব।

"সন্ধ্যায় আবার আসিব", বলিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন।

রাঁধুনি, ঝী, চাকর সকলকে অবকাশমত ডাকিয়া মায়ের কাছে তাঁহার মূর্চ্ছার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তাহারা ইতিপূর্ব্বে মাকে তাঁহার অসুখের কথা জানাইয়াছিল কিনা জানিনা, তবু তারা না বলিতে প্রতিশ্রুত হইল। আমি বুঝিলাম, অন্ততঃ আর তারা জননীর বিরক্তির কারণ হইবে না।

আজ ষষ্ঠী—শুধু তাই নয় মহাষষ্ঠী—রাত্রিতে বিল্ববৃক্ষে দুর্গার বোধন

হইবে—আজ সন্ধ্যার পর হইতে বিজয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা কি এক প্রাণসূত্রের আকর্ষণে উল্লাসে নৃত্য করিবে।

আমার জননীরও আজ মহাষষ্ঠী,—তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীদুর্গার সমীপে পূজোপকরণ ও নৈবেদ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের বাড়ীর সমীপে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বাটীতে দেবীর প্রতিমা আসিত। পাড়ার সমস্ত লোকের ষষ্ঠীপূজা সেই বাটীতেই নিষ্পন্ন হইত। আমাদেরও পূজার সমস্ত সামগ্রীসম্ভার সেই বাটীতেই পাঠান হইল। তৎপরে মা আমার আহারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। উড়িয়া ভৃত্য হরিয়া বাজার হইতে বিবিধ সামগ্রী কিনিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিল। মা তাহা হইতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন—রাঁধুনিকে আজ হাঁড়ি ছুঁইতে দিলেন না। নিষেধ করিবে কে!

আবার সেই বিপদ! মা আমাকে কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। আমি আহার করিতেছি, কিন্তু মাথা তুলিতে পারিতেছিনা। চোক ফুটিয়া জল আসিতেছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছি না। একবার মনে করিতেছি, জননী বুঝি সন্তানের প্রতি পূর্ব্বের মমতাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। আর বার মনে হইতেছে, অতি স্নেহের উৎপীড়নে মা আমার গোপালের প্রতি ঈর্ষার প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি মায়ের স্নেহ এখন আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরিত হইতে না পারিলে যেন আমার নিস্তার নাই।

অন্তর্য্যামিনীর ন্যায় মা যেন আমার মনের কথা পাঠ করিলেন। আহারের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—"গোপীনাথ! আমি দেখিতেছি, তোমার শরীর দিন দিন কৃশ হইতেছে। আমার বোধ হয়

সঙ্গীর অভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ। বাড়ীতে একা পড়িয়াছ, বাহিরের সঙ্গীরাও পূজার ছুটীতে যে যার দেশে চলিয়া গিয়াছে। তুমিও কেন দিন কয়েকের জন্য বাহিরে বেড়াইয়া এসনা?

আমি যেন আকাশ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। বলিলাম—"মা! আমারও একান্ত ইচ্ছা দিন কয়েকের জন্য বাহিরে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু তুমি যে একা!"

মা বলিলেন—"তাহাতে কি হইয়াছে! আমার এখানে লোকের অভাব কি? 'তুমি ইচ্ছা করিলেই যাইতে পার।'

বৈকালে ডাক্তার বাবুকে সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভালই হইয়াছে। তুমি তাহা হইলে যাত্রার বিলম্ব করিওনা। তুমি যে কয়দিন না আসিবে, আমি প্রতিদিন দুইবেলা আসিয়া মায়ের খবর লইয়া যাইব।"

দেখিলাম, গোপালকে ফিরাইয়া আনিতে আমা অপেক্ষাও ডাক্তার বাবুর আগ্রহ অধিক।

পাছে পিতা বাটী ফিরিলে আমার যা'বার ব্যাঘাত ঘটে, এইজন্ত হরিয়াকে সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রাতেই গোপালের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [পৌষ, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

স্বপ্নকথা।

মানব জাগ্রদবস্থায় যাহা চিন্তা করে, অথবা শৈশবাবধি যাহা কিছু কখনও (জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে) চিন্তা করিয়াছে, তাহা নিদ্রিতাবস্থায় ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, অতিরঞ্জিত বা পুঞ্জীভূত হইয়া মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব্ব ছবি বা অনুভূতির উদ্রেক করে, তাহাকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ স্বপ্ন বলিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে স্বপ্ন আর কিছুই নহে, পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়ের কাল্পনিক সমাবেশ মাত্র। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্ন এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও, সকল স্বপ্ন এরূপ নহে। মানব মাঝে মাঝে এরূপ স্বপ্ন দেখে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করা অসম্ভব। মনে করুন, এক ব্যক্তি কলিকাতায় থাকিয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, লাহোর নিবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধু অমুক রাস্তার অমুক স্থানে হঠাৎ অশ্ব হইতে পতিত হইলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহুর মধ্যভাগ বিষম আহত হওয়ায় উক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। পরে জানা গেল যে, তাঁহার স্বপ্নটি অবিকল ফলিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার বন্ধু ঠিক সেই দিনে (অথবা ২।১ দিন পূর্ব্বে বা পরে) ঠিক সেই স্থানে সেইভাবে আঘাত-

প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা উক্ত বন্ধুর সম্বন্ধে বহুকাল কোন চিন্তা করেন নাই বা তাঁহার কোন সংবাদই প্রাপ্ত হন নাই। এরূপ স্থলে, স্বপ্ন পূর্ব্বচিন্তার অমূলক পুনরভিনয় মাত্র, ইহা বলা চলে কি? কারণ, এখানে পূর্ব্বচিন্তা কোথায়? এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যখন বর্ণে বর্ণে সফল হইতেছে, তখন উহাকে অমূলকই বা বলি কিরূপে? আমরা ঈদৃশ কতকগুলি সফল স্বপ্নের সত্য ঘটনা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। স্বপ্নতত্ত্ব অতি জটিল, তাহা বারান্তরে অধিকতর বিশদভাবে বিবৃত করিব।

স্বপ্নকথা।

(১)

নৌকাডুবি।

ডেকার (D'Acre) নামে এক যুবক ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নার্থ এডিনবরা নগরে তাঁহার মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন। একদিন বৈকালে বাটী আসিয়া তিনি মাতুল ও মাতুলানীকে বলিলেন "কল্য আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ইঞ্চকিথে মাছ ধরিতে যাইব, ঠিক করিয়াছি"। ইহাতে অবশ্য কেহ কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু সেই রাত্রিতেই মাতুলানী স্বপ্ন দেখিলেন যে, যে নৌকাতে তাহারা মাছ ধরিতে যাইতেছে, তাহা যেন ডুবিয়া যাইতেছে। আতঙ্কে মাতুলানীর শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হায়! হায়! নৌকা ডুবিতেছে! উহাদিগকে রক্ষা কর! উহাদিগকে রক্ষা কর!" এই শব্দে তাঁহার স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি পত্নীকে জাগাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় পূর্ব্বে ঐরূপ ভাবিয়াছিলে। উহা কিছুই নয়। নিদ্রা যাও।" এই বলিয়া উভয়ে পুনরায় নিদ্রিত

হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আবার সেই স্বপ্ন। বার বার তিন বার। শেষবারে দেখিলেন, নৌকা ডুবিয়াছে এবং সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। ইহাতে তিনি এরূপ চিন্তিত ও কাতর হইয়া উঠিলেন যে, তৎক্ষণাৎ (প্রাতঃকালের অপেক্ষা না করিয়া) তিনি ভাগিনেয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। বল, রাখিবে?" ডেকার প্রতিশ্রুত হইলে, মাতুলানী বলিলেন "কল্য তুমি মাছ ধরিতে যাইতে পারিবে না।" ডেকার কালেজের ছাত্র ও নব্য যুবক। এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। যাহা হউক, অনিচ্ছা সত্বে তিনি মাতুলানীর একান্ত জিদে যাওয়া স্থগিত করিলেন। একটা মিথ্যা ওজর করিয়া বন্ধু-দিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যাইতে পারিবেন না। বন্ধুগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিল। তখন আকাশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার—মেঘের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু বেলা প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ একখণ্ড মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল এবং নৌকাখানি আরোহি-গণের সহিত জল-মগ্ন হইল। একটি জীবনও রক্ষা পাইল না।

অধ্যাপক এবারক্রম্বি (Abercrombie) তাঁহার Intellectual powers নামক গ্রন্থে উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। Caledonian Mercury নামক তাৎকালিক এক সংবাদ পত্রেও ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

(২)

পিতৃ-মৃত্যু।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি বহরমপুরে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমার বয়স ২০ বৎসর। আমার পিতৃদেব কলিকাতায় ছিলেন।

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, যে, তিনি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন এমন সময়ে ঐ গৃহে বজ্রাঘাত হইল; চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু পিতৃদেবকে দেখিতে পাইলাম না। এমন সময়ে ভয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাতঃকালেই স্বপ্নের বিষয় লিখিলাম। আমি তখন কোন খ্যাতনামা বন্ধুর বাটীতে অতিথি ছিলাম। তাঁহাকে স্বপ্নের বিষয় সাবশেষ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "অল্প বয়সে, অল্পদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্য মমতা বশতঃ এই স্বপ্ন দেখিয়াছ"। এরূপ বলিয়া তিনি আমাকে উপহাস করিলেন। দুই দিন পরে পত্র পাইলাম, পিতৃদেবের জ্বর ও প্লুরিসি হইয়াছে। আমি আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট দুই দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রথমে অবকাশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বারংবার অনুরোধ করায় আমাকে সামান্য বালক বলিয়া উপহাস করিয়া অবশেষে অবকাশ দিলেন। আমি কলিকাতায় যাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে আমার ভ্রাতা ও আমার ভগিনীপতি আমাকে লিখিলেন যে, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন নাই, পিতাঠাকুর অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, কেবল সামান্য জ্বর মাত্র আছে। আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় হইতেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলাম। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া বলিলেন, শিরোবেদনার জন্য তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। সারাদিন তাঁহার সঙ্গে বহরমপুরের নানা প্রকার গল্প করিলাম। পর দিন কলিকাতার খ্যাতনামা তিনজন চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "শিরোবেদনা ও সামান্য জ্বরের জন্য ভাবনার কোনই কারণ নাই।" সেই দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপাধি বিতরণের দিন। আমারও উপাধি লইবার কথা

ছিল, কিন্তু আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি Convocationএ যাবে না?" আমি বলিলাম, "আপনার অসুখের জন্য যাইবার ইচ্ছা নাই।" তিনি বিরক্তি সহকারে আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া উপাধি লইবার জন্য বেশভূষা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন যদিও আমি নির্গুণ, তথাপি তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে আমিই কেবল উপাধিযোগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমি ক্ষীণদেহ বলিয়াই হউক, কিংবা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম বলিয়াই হউক, তিনি আমাকেই অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, আমি যখন উপাধি লইব, তিনি উপস্থিত থাকিয়া হর্ষানুভব করিবেন। অসুস্থতা বশতঃ তিনি স্বয়ং যাইতে পারিবেন না ও আমিও যাইব না, এই জন্য তিনি দুঃখিত হইলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে গমন করিলাম। উপাধি লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে, ইহা দেখিয়া বারংবার তিনি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অবশেষে আমি যখন প্রত্যাগমন করিলাম, তখন তিনি আমার উপাধিপত্র হস্তে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহার এক ঘণ্টা পরে অকস্মাৎ তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকগণ এই ব্যাধি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রবিবার প্রত্যূষে পিতৃদেব স্বর্গলাভ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, পিতার পাঠাগারে বজ্রাঘাত হইয়াছে ও পিতৃদেব অদৃশ্য হইয়াছেন। সন্ন্যাসরোগরূপী বজ্র তাঁহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেল!

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(৩)

ভগিনী-মৃত্যু।

আমার ৺পিতৃদেবের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের সময় আমি কর্ম্মোপলক্ষে বহরমপুরে ছিলাম। আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী সে সময়ে কলিকাতায় আমার পৈতৃক বাটীতেই ছিলেন। সপিণ্ডীকরণের পর দিন প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই তিনি সকলকে বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বরাত্রিতে এক অমঙ্গল-সূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন ৺পিতৃদেব হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাঁহার শয়নাগারের দরজায় সজোরে আঘাত করিয়া আমাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন, আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। পিতাঠাকুর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার বড় খিদে পেয়েছে, ঘরে যা আছে দে।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কেন তোমার খাওয়া হয় নাই?" তিনি বলিলেন, "না, আমাকে তৃপ্তি করিয়া খাওয়ায় নাই।" ইহার পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।'

সেই দিন কি তাহার পর দিন রাত্রিতে আমি বহরমপুরে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক অল্প আলোকযুক্ত ঘরে, ৺পিতৃদেব ও কলিকাতাস্থ বাগবাজারের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ৺গঙ্গাধর, দুইজনে দুই আসনে বসিয়া আছেন। আমি ঘরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলাম। ৺পিতৃদেব বিমর্ষ-বদনে আমার দিকে হাত তুলিয়া কথা কহিতে নিষেধের সঙ্কেত করিলেন। গম্ভীর ভাবে তিনি আমায় বলিলেন, "শীঘ্রই, বোধ হয় ২।১ দিন মধ্যেই, তোমার স্ত্রীর কি কোন ভগিনীর মৃত্যু হইবে।" আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল, ভয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

প্রাতে উঠিয়াই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বপ্নের বিষয় লিখিয়া সকলের কুশল

সমাচার জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমার ভগিনীর স্বপ্নের কথা আমি তখন কিছুই জানি না।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্রে জানিলাম যে, আমার এক ভাগিনেয়ীর রক্তামাশয় হইয়াছে। আমি ভাবিলাম, "যে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা।" দুইদিন পরে ভ্রাতা লিখিলেন যে, ভাগিনেয়ীর বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার মাতার অকস্মাৎ রক্তামাশয় ও ১০৫ ডিগ্রি জ্বর হইয়াছে। ইনিই সপিণ্ডীকরণের রাত্রিতে ৺পিতৃদেবের বিষয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আমি হতাশ্বাস হইলাম। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও ৩।৪ দিনের মধ্যে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

ভগিনীর মৃত্যুর পর শুনিলাম, তিনি মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট এই স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই আমার পত্রে আমার স্বপ্নের বিষয় জানিয়াছিলেন। এই দুইটি স্বপ্নের ভীষণ ফল চিরদিন মনে থাকিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত জন্মান্তরীণ আত্ম-কাহিনী।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, রামপুর-নবাবের রাজ্য-মধ্যে, লারপুর নামক পল্লিগ্রামে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নাথুরাম নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মহাজন (money lender) বাস করিতেন। তেজরাম নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল। তেজরাম একদিন আহারান্তে তামাকু সেবন করিবার অভিলাষে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। তামাকু সেবন করিবার জন্য যেমন তাহার পিত্তলমণ্ডিত হুক্কাটি গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনই একটা বিষাক্ত সর্প তাহার দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলিতে দংশন

করিল। সে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের সকল যত্ন বিফল হইল। অনন্তর তাহার মৃত দেহ নিকটস্থ একটি তৃণসমাচ্ছন্ন বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

কিছুদিন পরে একদা প্রত্যূষে দেখা গেল যে, তেজরামের বাটীর সন্নিকটে অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর বসিয়া একটা কাক ভয়ানক কলরব করিতেছে। কাশীরাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ কাকের কর্কশ কলরব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে গুল্‌তি দ্বারা বধ করিল।

এই ঘটনার ছয় মাস পরে নিকটস্থ অপর এক গ্রামের জনৈক কুর্মী (কৃষক জাতি-বিশেষ) জাতীয় নিঃস্ব স্ত্রীলোক বস্ত্রধৌত করিবার মানসে উক্ত লারপুর গ্রামে আইসে। বস্ত্রধৌত করিবার পরে পারিশ্রমিক-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে তণ্ডুল অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। যাহা হউক, যখন সে উক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অমনি একটা চড়াই পক্ষী তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু দ্বারা তাহার ললাটে আঘাত করিল। হঠাৎ এইরূপ ঘটনায় স্ত্রীলোকটি ভীত হওয়াতে তাহার অঞ্চল হইতে তণ্ডুল গুলি পড়িয়া গেল। এদিকে উক্ত চড়াই পক্ষীটিও সঙ্গে সঙ্গে মৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। স্পর্শ করিবামাত্র পক্ষীটির মৃত্যু হইল দেখিয়া স্ত্রীলোকটি অতিশয় দুঃখিতা হইল এবং তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল;—সে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবৎ-উদ্দেশে বলিতে লাগিল, "হে ভগবন্! তুমি অন্তর্য্যামী, সমস্তই জান। ঐ পক্ষী আমার চাউল নষ্ট করিবার কারণ হইলেও আমি মনেও উহার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই, তবে আমাকে আঘাত করিয়াই কেন যে মরিয়া গেল, তাহা তুমিই জান। ইহার জন্য আমি কোন প্রকারে অপরাধিনী নহি।"

উপরোক্ত ঘটনার দশ মাস পরে ঐ কুরমী জাতীয় স্ত্রীলোকটি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। ঐ বালকের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর হইল, তখন সে তাহার জাতীয় কোন স্ত্রী অথবা পুরুষ কাহারও সহিত আহার করিতে কোনমতে সম্মত হইত না। সে বলিত যে, সে নীচ কুর্‌মী জাতি নহে, সে ব্রাহ্মণ।

যে গ্রামে তেজরামের পরিবারবর্গ বাস করিত, ঐ কুর্‌মী রমণী কিছু-কাল পরে বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য পুনর্ব্বার সেই গ্রামে আসিল। সেই সঙ্গে এবার সে তাহার পুত্র-সন্তানটিকেও কোলে করিয়া আনিয়া-ছিল। তাহার সেই তিন বৎসরের বালক যেমন তেজরামের বাটী দেখিতে পাইল, অমনি সে তাহার মাতার ক্রোড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার ক্ষুদ্র হস্ত উত্তোলন করিয়া, ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঐ বাটী দেখাইয়া বলিতে লাগিল যে, ঐ বাটী এক সময়ে তাহার ছিল এবং অমুক অমুক তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং ভগিনী ছিল। এই বলিয়া সকলের নাম উল্লেখ করিতে লাগিল। একটি তিন চার বৎসরের শিশুর মুখে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রমে গ্রামের লোক সকল আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল,—সেই স্থান লোকারণ্য হইয়া গেল। অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতকটা তামাসাচ্ছলে ঐ বালককে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালক তাহার ইতিহাস এইরূপ বর্ণনা করিল :—

"আমি এই লারপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ নথুরামের পুত্র তেজরাম। একদা আহারান্তে তামাকু সেবন করিবার অভিপ্রায়ে আমি নিজ শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া হুকাটি লইব, এমন সময়ে একটি বিষাক্ত সর্প আমার অঙ্গুলিতে দংশন করিল।"—(সকলে দেখিল, বালকের অঙ্গুলিতে সর্প দংশন চিহ্ন এখনও রহিয়াছে।) "আমাকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত চেষ্টা বিফল

হওয়াতে, আমার পিতা ও আত্মীয়বর্গ আমাকে যথারীতিক্রমে রামগঙ্গার তীরে দাহ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া, একটা ঘাসের জঙ্গল মধ্যে নিক্ষেপ করে। আমার পিতা এরূপ নীচ প্রকৃতির লোক যে, কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া যথানিয়মে আমার শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সমাধান না করিয়া বিনা-ব্যয়ে শীতল সিংহের দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। দেহ ত্যাগ করিয়াই আমি কাক জন্ম গ্রহণ করিয়া, আমাদের বাটীর নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রত্যহ বসিয়া বাটীর প্রাত্যহিক সমস্ত ঘটনা দর্শন করিতাম। আমার স্ত্রীকে দেখিবার বাসনাই বিশেষরূপে প্রবল ছিল। একদা একটা জলপাত্রে জল রক্ষিত দেখিয়া আমি উহা পান করি। আমার স্ত্রী তাহা দেখিতে পাইয়া, ঐ জল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে থাকে।”—(এই, কথা তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে, একদা যে সে এই কারণে জল নিক্ষেপ করিয়া কাকের প্রতি গালিবর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে।)—“একদা আমি পূর্ব্ব কথিত অশ্বত্থ বৃক্ষে বসিয়া চীৎকার করিতেছিলাম দেখিয়া, কাশীরাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গুল্‌তি দ্বারা নির্দ্দয়রূপে আমার প্রাণবধ করে।” ইহা ব্যতীত তাহার কুর্ম্মী-জাতীয় মাতার সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাও বালক আনু-পূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণনা করিল।

এইরূপ ব্যাপারে সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, এই বালক সম্ভবতঃ ভূত দ্বারা আবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। ঐ বালক বলিল যে, সে একটা সাদা এবং একটা লাল, এই দুইটা মোড়কে তিন শত টাকা তাহার গৃহের দ্বারের নিকট প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই বলিয়াই ঐ বালক ঠিক সেই স্থান দেখাইয়া দিল। অনন্তর উক্ত স্থান সর্ব্ব-সমক্ষে খনন করাতে

ঐ কথিত মুদ্রা বাহির করা হইল। তাহার পর গৃহ-প্রাচীরের এক স্থান হইতে আরও তিন শত টাকা বাহির হইল। এইসমস্ত ব্যাপার দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল,—বালকের কথিত বিষয়ের সত্যতা-সম্বন্ধে আর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। এই লুক্কায়িত অর্থ সম্বন্ধে বাটীর আর কেহই কিছুই অবগত ছিল না।

যাহাই হউক, উক্ত ঘটনার পর ঐ কুর্ম্মী-রমণী পাছে তাহার এক মাত্র পুত্রকে হারায়, এই ভয়ে সে বালককে লইয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর কিছু দিন পরে ঐ কুর্ম্মী-পরিবার নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দূর গ্রামে গিয়া বাস করিল, কারণ ঐ বালক তেজরামের বাটীতে যাইবার জন্য প্রায়ই ক্রন্দন করিত এবং সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িত। তেজরামের (অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বজন্মের) স্ত্রীকে দেখিবার জন্য ঐ বালকের বাসনা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিত। তেজরামের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং তেজরামও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

এই ঘটনাটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ বিলাসপুর নিবাসী কোন ক্ষত্রিয় ভদ্রলোক দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। এই ঘটনাটি তাহার পরিবারস্থ কোন মহিলার সম্মুখে ঘটিয়াছিল। যে গ্রামে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে গ্রামে এই মহিলার পিত্রালয় এবং তাঁহার পিত্রালয় তেজরামের বাটীর অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত। সুতরাং এই বিবৃত ঘটনার সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই কারণ নাই। কারণ যে ভদ্র-লোকের মুখে উহা শুনা গিয়াছে, তিনি ঐ মহিলার অতি নিকট-সম্বন্ধীয় এবং এক বাটীতে বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি বিশেষ চরিত্রবান্ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

"দাদা ম'শায়ের ঝুলি।"

(৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

মানবাত্মার স্বরূপ ও পারলৌকিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে ব্যোমকেশের আগ্রহ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, পাছে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পীড়া তাহাদের সেই আলোচনার পথে অন্তরায় হয়, সেই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া, সে পর দিন প্রত্যূষেই একেবারে বৃদ্ধ দাদা ম'শায়ের বাটীতে আসিয়া হাজির। তাহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আহ্লাদ-সহকারে কাছে ডাকিলেন এবং সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া চিরাভ্যস্ত সরস-বচনে কহিলেন,—"কিরে! রাত্ পোহাতে না পোহাতেই একেবারে এসে হাজির যে? নাত বউ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি? ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি?"

ব্যোমকেশ। আচ্ছা যা' হোক্! আমি বলি, বুড় দাদাটি কেমন আছে, দেখে আসি। তা'রই বুঝি এই প্রতিফল? তবে আমি এই চল্লেম।

ভট্টাচার্য্য। না, না, রাগ করিস্ নি, বোস্। তোর কালকের কথাটার আলোচনা করা যাক্।

ব্যোমকেশ। না দাদা ম'শায়! আপনার এই দুর্ব্বল শরীরে কষ্ট দিয়ে আমি কি শেষটা আপনাকে আরও পীড়িত ক'র্‌বো? আপনি শীঘ্র সুস্থ হ'য়ে উঠুন, এখন আমার এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

ভট্টাচার্য্য। ভাই! আমার জীবনের শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আর ক'দিনইবা বাঁচ্‌বো? যে ক'টা দিন থাকি, যদি তোদের মত পাঁচজন জ্ঞান-পিপাসুর হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণেও প্রাচীন ভারতের সনাতন সত্য গুলির উন্মেষ সাধন করতে পারি, তা হ'লেই আমার বাকি কটা দিন

সুখে কাটুবে। তবে তোর ভয় নেই, তোর বুড়ো দাদা ম'শায় অত সহজে ম'র্‌বে না। এখন তোর প্রশ্নের সমাধান কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্।

ব্যোমকেশ। কেমন ক'রে জীবাত্মার প্রেতাবস্থা থেকে মুক্তি হয়, সেই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার কথা মত "অলৌকিক-রহস্য" আমি পড়েছিলুম। পাপীর ভীষণ যন্ত্রণার কথা যা' সব পড়লুম, তা'তে আমাতে আর আমি নেই। কেমন ক'রে জীবে এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে?

ভট্টাচার্য্য। তোকে কাল যে সমস্ত কথা বুঝিয়েছি, যদি সেগুলো ভাল ক'রে হৃদয়ে ধারণা করতে পেরে থাকিস্, তা' হ'লে এটা স্পষ্টই বুঝতে পার্ব্বি যে, এই প্রেতাবস্থার স্থায়িত্ব কত দিন। সেতারের তারটি যতক্ষণ স্পন্দিত হ'তে থাকে, ততক্ষণ যেমন সুরের রেশটি মরে না, সেইরূপ মৃত মানবের মনোময় কোষটি যতদিন পর্য্যন্ত বিগত পার্থিব জীবনের চিরাভ্যস্ত উৎকট কামনা-প্রসূত বাসনা ও চিন্তারাশির পুনর-ভিনয় কর্ত্তে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা-সম্ভূত জ্বালাময়ী অবস্থার শেষ হয় না। পরে যখন ভোগজনিত পরিপুষ্টির অভাবে মনোময় কোষটির তাদৃশ স্পন্দন-রাজি ক্রমে মন্দীভূত হ'য়ে আসে, তখন যাতনা-দেহের জীর্ণাবস্থা ও বার্দ্ধক্যকাল এসে উপস্থিত হয় এবং স্থূলদেহের ন্যায় সেটিও তখন জীবাত্মা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। এটিকে দ্বিতীয়-মৃত্যু নামে অভিহিত করা যেতে পারে। জীবাত্মা তখন আপনার পাপ-বাসনা-রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রেতলোক পরিত্যাগ ক'রে পিতৃলোকে গমন করে।

এখন বুঝ্‌তে পার্ল্লি যে, উৎকট পাপাচারী ব্যক্তির প্রেতাবস্থা অবশ্যম্ভাবী হ'লেও সে অবস্থা কখনও চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। দুষ্ট

ছেলে বাপ মায়ের কথা না শুনে উৎপাত কল্লে, যেমন তাঁরা তা'কে শিক্ষা দেবার জন্যে অনেক রকম শাস্তি দেন, বিশ্বজননীও সেইরূপ তাঁর অশান্ত ছেলেগুলিকে শিক্ষা দেবার জন্যে এই সমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা ক'রেছেন। বাসনা-তাড়িত জীব কিছুতেই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বগুলি স্বীকার কর্ত্তে চায় না, তা'দের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি সমস্তই ভাসিয়ে দেয়। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না তা'দের জ্ঞানলাভ হয়, ততদিন প্রত্যেক পার্থিব জীবনের অবসানে তা'দিগে একবার বিশ্বপিতার এই Reformatoryতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যবস্থাটা আপাত-দৃষ্টিতে কঠোর ব'লে মনে হ'তে পারে বটে, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও পরিণাম বিবেচনা কল্লে কি এটাকে একটা নিষ্ঠুরতা বা হৃদয়-হীনতার পরিচায়ক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে? যেমন বাগা তেঁতুল না হ'লে বুন' ওল জব্দ হয় না, তেমনি শিশু মানবের সর্ব্বভুক্‌রূপী বাসনার বেগ, অতৃপ্তির অত্যুৎকট জ্বালা ভিন্ন আর কিছুতেই মন্দীভূত হ'তে পারে না।

"কিন্তু এ-ত গেল বিশ্ব রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থা। দয়াময়ের রাজ্যে কি এ ছাড়া বিশেষ ব্যবস্থা আর কিছু নেই? তা' অবশ্যই আছে। পরম কারুণিক ঋষিগণ জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে, যা'তে তারা শীঘ্র শীঘ্র এই প্রেতাবস্থার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ কর্ত্তে পারে, তা'র জন্য এই আর্য্য-ভূমিতে বহুবিধ বিধি ব্যবস্থা রেখে গেছেন। এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটাকে তোরা কি রকম মনে করিস্? এ সম্বন্ধে কখনও বোঝ্‌বার চেষ্টা করিছিস্ কি?

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়! যদি অভয় দান করেন, তা'হ'লে প্রাণ খুলে সত্যি কথাটা ব'লে ফেলি। বর্ত্তমানে যা দেখ্‌তে পাই, তা'তে শ্রাদ্ধ কার্য্যটা একটা বিরাট লুচি সন্দেশের আয়োজন ভিন্ন আর কিছু ব'লে মনে হয় না। অবিশ্যি লুচিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে মন্ত্র তন্ত্র

প্রভৃতি বাকি যে সব দেখ্‌তে পাই, তা'তে আর আমাদের সেকালের বা সেকালের মুনি ঋষির ওপর শ্রদ্ধা অটল রাখা দুষ্কর হ'য়ে পড়ে।

ভট্টাচার্য্য। ভাই! তোদের কি দোষ দিব বল্? কাল-মাহাত্ম্যে জগৎ-হিতৈকব্রত ঋষিগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছেন। জনশ্রুতি এখন ব্যাস ও নারদাদিকে ল'য়ে যাত্রাদলের "বাসদেব" ও "কুঁদুলে-নারদ" তৈয়ির ক'রেছে। পবিত্র বেদমন্ত্র ক্রমে "স বাহে ভ্যান্তরে শুচি"তে দাঁড়িয়েছে। নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে যে যত বড় ছাঁদা বান্ধতে পার্ব্বে, সেই তত ভাল বামুন, এই হ'ল কলি রাজার পচারিত যুগ-ব্যবস্থা। তোরা যে এখনও আমাদের কথা দুদণ্ড কাণ পেতে শুনিস্, এটা আমি অতি বড় বিস্ময়ের কথা ব'লে মনে করি। তোদের কি দোষ ভাই? কাল-ধর্ম্মে দেশ উৎসন্ন গিয়েছে। জ্ঞান-ক্রিয়াময় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এখন কতকগুলা প্রাণহীন বিকৃত অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ, সনাতন ধর্ম্ম ও বেদ রক্ষা করা যাঁ'র কাজ, তিনি এখন শাস্ত্র-চিন্তা, শাস্ত্র-আলোচনা পরিত্যাগ ক'রে ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছেন। পাপস্রোতে দেশ ভেসে যাচ্ছে। বুঝি সেই স্রোতে সব ভেসে যায়! হা ভগবান্! এ দৃশ্য দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! এই কি সেই ঋষিদিগের পদরজ-পূত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ! কালে কালে কি হ'ল?—

কথা বল্‌তে বল্‌তে ভট্টাচার্য্যের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া একটি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে ব্যোমকেশের মুখপানে তাকাইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "এই দুর্দ্দিনে আমি তোদের মত ইংরাজি-শিক্ষিতদের কাছ থেকে অনেক ভরসা করি। দেশের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাটী হ'য়ে গেছে, কিন্তু পরম কারুণিক ঋষিগণ এখনও শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সমাজের সম্মুখ থেকে হরণ ক'রে ল'ননি। ভারত-জননী পরম যত্নে এখনও সেগুলিকে বুকে ক'রে রেখে

দিয়েছেন। তোরা যদি আবার সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে তত্ত্বান্বেষী হ'য়ে প্রবেশ করিস্, তা'হলে বোধ হয়, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশে আবার জ্ঞানের প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্‌তে পারে। তোরা আজ কাল স্বদেশকে ভক্তি কর্ত্তে শিখ্‌ছিস ও স্বদেশী হওয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু ব'লে প্রাণে প্রাণে অনুভব কচ্ছিস; কিন্তু এখনও স্বদেশী ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি। আর্য্যশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে সনাতন ধর্ম্মরূপ অমৃত উদ্ধার ক'রে সেই কার্য্য সাধন কর্। দেখ্‌বি, ভারত-গরিমায় আবার দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে। এখন তোকে শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলি শোন্।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শাই! ব্যাপার ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কতকগুলো মন্ত্র আওড়ান আর আলোচাল, কাঁচকলার ছড়াছড়ি, এতে প্রেতলোকবাসী জীবাত্মার কি উপকার হতে পারে, তাত আমি মোটেই বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। সত্যি সত্যি কি শেষে মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোটা সবই মান্‌তে হবে না কি? আর আপনাদের মন্ত্রের ত ঐ শ্রী! আপনাকে অনেক জ্বালাতন কচ্ছি, কিন্তু প্রাণের কথা চেপে রাখি কি করে?

ভট্টাচার্য্য।—আমি তোকে আগেই ব'লেছি যে, তোদের তাতে বিশেষ কিছু অপরাধ নেই। কালধর্ম্মে সবই লোপ পেয়েছে, প'ড়ে আছে কতকগুলা শব্দ-হীন ও অর্থহীন অনুষ্ঠানের কঙ্কাল। দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুল সেই গুলাকেই প্রকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে অভিষিক্ত ক'রে একটা বিরাট অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টাচারের দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য সাধন ক'র্চ্ছে। এর বিরুদ্ধে একটি কথা ক'বার যো নাই, তা হলেই চারিধার হ'তে পাষণ্ড, নাস্তিক ইত্যাদি সুধা-বৃষ্টি আরম্ভ হবে। ভগবানের বিশেষ কৃপা, তা'ই এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রচলিত হয়েছে। তা'রই ফলে বোধ হয় আবার সেই লুপ্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান-লিপ্সা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসা

জেগে উঠলেও উঠতে পারে। তা'ই ত বল্লাম, তোদের কাছ থেকে অনেক আশা করি। তুই ত বিজ্ঞান চর্চ্চা করিস্, শব্দের স্বরূপ কি বল্ দেখি।

ব্যোমকেশ।—অল্প কথায় বলতে গেলে, শব্দ জিনিষটা বায়ুমণ্ডলের কম্পন হ'তে উদ্ভূত হয়। সেই কম্পন বা Vibrationই এর মূল।

ভট্টাচার্য্য।—বেশ কথা, এই Vibration বা কম্পন যে শক্তির ক্রিয়া মাত্র, তা'ত স্বীকার করিস্? ইউরোপীয় বিজ্ঞান এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হ'য়েছে তা ঠিক বল্‌তে পারি না। কারণ তা যদি পারতুম, তা'হলে এই ঝুলিটি ছেড়ে দিয়ে, তোদের কালেজে গিয়ে দু-পয়সা রোজগার কর্ত্তে পার্ত্তুম, আর ব্রাহ্মণীরও কিঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হ'ত। কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি, তা'তে নাকি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই Vibration বা কম্পনকেই সৃষ্টি-তত্ত্বের মৌল কার্য্য বলে নির্দ্ধারিত কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন। তা'রা যা'ই বলুন, এ বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্র স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দান কচ্ছে। চেষ্টা ক'রে যদি খুঁজিস্ ত অনেক প্রমাণ পেতে পারিস্। ভগবানের ইচ্ছা হয় তা'হলে পরে এবিষয়ে তোকে সাহায্য কর্ব্বার চেষ্টা কর'ব। এখন কথা এই, শব্দরাজি যদি কম্পনেরই ফল হয়, তা'হলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রত্যেক শব্দেরই একটা না একটা, অবশ্যম্ভাবী ফল আছে; কারণ শক্তির ক্রিয়া ফল প্রসব না ক'রে কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে পারে না। এই কথাটী যদি হৃদয়ে ধারণা করিস্, তা'হ'লে মন্ত্র গুলিকে শুধু মুখের কথা ব'লে উড়িয়ে দিতে সাহস পাবি না। তা'হ'লে বুঝ্‌তে পার্ব্বি যে, এই মুখের কথা দ্বারাই একটা প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ সাধন করা, নিতান্ত অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র নয়। কোন্ শব্দের দ্বারা কিরূপ শক্তির খেলা হয়, আধুনিক বিজ্ঞান এখনও ততটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশের ঋষিরা যোগদৃষ্টিদ্বারা সেই সমস্ত শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ কর্ত্তেন। শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম জগতে যে মূর্ত্তির

সৃষ্টি হয়, এটা তাঁদের প্রত্যক্ষ লব্ধ সত্য। এখন মন্ত্রশক্তির কথা বোঝ্। এক একটী মন্ত্রে এরূপ কতকগুলি শব্দ রাজির একত্র বিন্যাস আছে, যে গুলি শুদ্ধাচারী ব্যক্তিদ্বারা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হ'লে সূক্ষ্ম জগতে একটা বিরাট আলোড়ন উপস্থিত করে। সমবেত কম্পনের ফলে যে কিরূপ প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ হয়, তা'র একটা উদাহরণ দিই। সেপাই গোরারা কিরূপ তালে তালে পা ফেলে চলে, দেখিয়াছিস্ ত? কিন্তু যদি এক দল সেপাই কোন নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দিয়া যায়, তা'হ'লে কাপ্তেন্ সাহেব তখনি তা'দের সার ভেঙ্গে তা'দি'কে এলোমেলো করে দেয়; এর মানে কি জানিস্? প্রণালীবদ্ধ একত্র পদ-বিন্যাস, তার তেজ এত বেশী যে, তদ্দ্বারা পোলটী দেহ রক্ষা কর্ত্তে পারে। তাই সব এলোমেলো করে দিয়ে সামঞ্জস্যটী নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়। এবং তদ্দ্বারা তদুত্থিত শক্তিরও খর্ব্বতা হয়। মন্ত্র গুলির মধ্যে এইরূপ সুসম্বদ্ধ শব্দ রাজি র'য়েছে। তবে সে গুলিকে ক্রিয়াশীল কর্ত্তে হলে, নিজে বিশুদ্ধ হ'য়ে, বিশুদ্ধভাবে তাদের উচ্চারণ কর্ত্তে হবে। খোলার বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এসে "স বাহু ভাস্করে" বল্‌লে কিছুই হবে না। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রত্যেক বীজমন্ত্রের সঙ্গে সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার একটা আত্মগত সম্বন্ধ আছে। দেবতা মন্ত্রাত্মক। মন্ত্র বিশুদ্ধ হ'লে, দেবতার সৃষ্টি হয় বা দেবতা তা'তে অধিষ্ঠিত হন্। আর সেই দেবতার শক্তি সেই মন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয়। এ সব গুহ্য কথা অনেকেই ভুলে বসে আছেন, কাজে কাজেই তাঁরা কোন রকমে "স বাহে" ক'রে পূজা আশ্রয় সারেন। অবিশ্যি যথার্থ ভক্তির সহিত এরূপ পূজো করলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন যে সেটা এক বারেই সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন, তা' নয়; কিন্তু তদ্দ্বারা মন্ত্রের বিশেষ ফলটল হয় না। তুমি ছেলের যাতনা দূর করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল

হ'য়ে একটা কাট বিষ অন্যায় রূপে খাইয়ে দেও, তা হ'লে তোমার এই নিঃস্বার্থ পিতৃ-প্রেমের উচ্ছ্বাস তোমার অন্তরাত্মাকে খুব পুষ্টি সাধন কর্‌বে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ কার্য্যের প্রাতরোধ হবে না, ছেলেটা মর্ব্বেই। তোমার প্রেম তোমাকে উঁচুতে তুল্‌বে, কিন্তু তোমার অজ্ঞানতা-প্রসূত ভুলটী হ'তে তোমার ছেলেটীও মারা যাবে। এই তত্ত্ব যদি বুঝ্‌তে পারা যায়, তা' হ'লে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে একটা জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অনর্থক বিরোধ জন্মেছে, সেটা দূর হ'তে পারে। এ সব কর্ম্মতত্ত্বের কথা তোকে সময়ান্তরে বল্‌ব। এখন যে মন্ত্রের কথা হচ্ছিল, তাই শোন্। শ্রাদ্ধের সময় যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়, বিশুদ্ধ হ'লে সেগুলোর ফলে সূক্ষ্ম জগতে একটা ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রেত-লোক-বাসী জীবাত্মার যাতনাদেহটী ভেঙ্গে যাবার সুবিধা হয়। যাতনা-দেহটীর আপনা আপনি ক্ষয় হ'তে যে সময় লাগ্‌ত, এই মন্ত্র-শক্তির ফলে তা'র অনেক পূর্ব্বেই সেটী নষ্ট হ'য়ে যায় এবং সেই জীবাত্মা সেই প্রেতাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে। এই হ'ল সাধারণ ব্যবস্থা। বিশেষ উৎকট পাপের জন্য আবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা :—৺গয়াধামে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দান। অবতার যে সময় লীলা কর্ত্তে আসেন, সে সময় জীবের দুঃখে আকুল হ'য়ে অনেক রকম ব্যবস্থা ক'রে রেখে যান। তা' হতভাগা মানুষ যদি একটাও শোনে! এই গয়ায় শ্রাদ্ধ এইরূপ একটা বিশেষ ব্যবস্থা। এর ভেতরে যুক্তি দিতে আমি অসমর্থ, কিন্তু গয়াধামের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা এর সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয় হ'য়েছেন। আমরা এই প্রেত তত্ত্ব আলোচনা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে এরূপ অনেক গুলি ঘটনার বিষয় জান্‌তে পারব, যা'তে সে বিশ্বাস আমাদের মনে দৃঢ়ীভূত হবে। থাক্, সে পরের কথা। ক্রমশঃ—

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পত্র।

তোমরা জাননা আমি কিরূপ সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেরা আমার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেন। তাহা না জানিলে তোমরা কেমন করিয়া আমার যন্ত্রণার কাহিনী বুঝিতে সক্ষম হইবে? তাই আমার পার্থিব জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছু পরিচয় তোমাদিগকে দিতেছি। তোমরা তাহা পাঠে বুঝিবে, আমি মর্ত্ত্যপুরে কিরূপ জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি; তোমরা জানিবে, আমার প্রকৃত পরিচয় কি?

আমার পিতামাতা উভয়ে পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব-সম্পন্ন। পিতা আমার অকপট, সাদাসিধা ধরণের লোক। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত যে, তিনি সংসারবিরাগী, বিনীত, মাৎসর্য্যহীন, সরল প্রকৃতির মানুষ। প্রসিদ্ধ বাণিজিক যৌথকার্য্যের প্রধান অংশীদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ, তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে একটা বিশাল সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহার যে বিপুল প্রতিপত্তি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। তাঁহার সৌষ্ঠবিহীন সমান্য বেশভূষা দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে জানিত না, তাহারা তাঁহাকে নগন্য সামান্য লোক বলিয়া মনে করিত এবং অবজ্ঞাও করিত। কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন, ধীর, উচ্চ প্রকৃতির লোক। তাঁহার শান্ত স্থিরোজ্জল নয়ন-দৃষ্টিতে তাঁহার মর্ম্মের গভীর ভাব প্রকাশ করিত।

আমার মা'র প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত। তিনিই প্রকৃত গৃহস্বামিনী ছিলেন। লাবণ্যবতী, রূপমাধুরিসমন্বিতা, সুষ্ঠুভব্যতাযুক্তা, সর্ব্ব সাধারণের আদৃতা আমার জননী, নারীসমাজের আদর্শস্থল ছিলেন। জীবসৌন্দর্য্যের প্রধান শত্রু কালও যেন তাঁহার বিষয়ে পক্ষপাতী ছিল;—কাল তাঁহার কমনীয় কান্তির কলঙ্ক উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি যে অটুট চিরসৌন্দর্য্যের আধার ছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি কখনও রাগদ্বেষাদির আতিশয্যে বিচলিত হইতেন না; অথচ তাঁহাকে হৃদয়হীনা ভাবিবার কোনও কারণ ছিল,না,। তাঁহাতে অন্তর্ব্বল, উদ্যম, প্রেম, দয়া, সমস্তই উৎকর্ষ-লাভ করিয়া ছিল; কিন্তু, তাহাদিগের দ্বারা তিনি কখনও উৎক্ষিপ্ত হইতেন না। আবার বহির্ব্যবহারে তিনি অতিশয় কৌশলময়ী ছিলেন। কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া বা কাহারও মর্ম্মে আঘাত না করিয়া, কিরূপে আত্মাভিলাষের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সে দক্ষতা তাঁহার বিশেষ ভাবে ছিল। তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও এই নিপুণতার জন্য প্রকৃত গৃহস্বামিনী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহাতে কেহই বিরক্ত হইতে পারিত না। কাহার সাধ্য যে, তাঁহার মতের বিপরীত আচরণ করিবে! তাঁহার স্নেহের পুতলি, অতি আদরের সামগ্রী, আমিই তাঁহার কোনও ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কখনও সাহসী হই নাই।

সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত; তাঁহাকে কেহ প্রকৃত ভালবাসিত কি না জানি না। তবে এটা সত্য, তিনি আমাকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন; এতদূর ভালবাসা তাঁহার আর কাহারও উপর ছিল না। আমি কি তাঁহাকে তদনুরূপ ভাল বাসিতাম? সত্য কথা বলিতে হইলে আমি তাঁহাকে ঠিক ভালবাসিতাম না। আমি তাঁহার গুণে, আমার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহে মুগ্ধ ছিলাম; আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত পূজা করিতাম, তাঁহার গুণের ভূয়সী

প্রশংসা করিতাম। আমি তাঁহার মত জননীর অতি প্রিয়পুত্র বলিয়া আমার 'মনে একটা অনির্ব্বচনীয় অভিমান ছিল। আমার মনের এই ভাবের বেশ কারণও ছিল। যাহা যাহা থাকিলে সাধারণ মানব চক্ষে নারীর মহত্ত্ব ও উচ্চতা প্রতিপন্ন হয়,তাঁহাতে তাহার একটীরও অভাব ছিলনা। তিনি যেন নারীসৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী। এমনটী আমি আর কোথাও দেখি নাই। সৌন্দর্য্যে তিনি মূর্ত্তিমতী শ্রী। আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে, মহামহিমান্বিত সৌষ্ঠবে, কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। আবার যাহা যাহা আত্মকর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা দোষ-লেশ শূন্যভাবে পালন করিতেন। চরিত্রে অনিন্দনীয়া, ধর্ম্মানুরাগে মানবের আদর্শস্থানীয়া, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে, তাঁহার বহিঃ পরিচ্ছদের মত তাঁহার অন্তর-প্রকৃতিও নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি মানব সমাজে এমন কিছু কার্য্য করেন নাই, বা এমন কিছু বাক্য কথনও প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার আদর্শ-নারী-মাহাত্ম্যে কোনও সন্দেহ আনিয়া দিতে পারিত। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার কনিষ্ঠা-ঙ্গুলির স্পন্দন হইতে তাঁহার পরিপাটী পরিচ্ছদের তুচ্ছ অংশের বিন্যাস পর্য্যন্ত, তাঁহার সমস্ত দেহ, তাঁহার বিশেষত্ব ও প্রকর্ষ সূচনা করিত।

তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে যাইয়া এখন তাঁহার, তাঁহার কেন অতীতের সমস্ত চিত্রাবলীর পরিচয় পাইয়াছি। এখন এ একরূপ অভিনব দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতেছি। বাহ্য আবরণ অন্তর্ম্মলিনতা আর গোপন করিতে সক্ষম নয়। এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে, জনসাধারণের তুষ্টিই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার উপাস্য দেবতাদ্বয়। তবে তিনি যে সৎপদার্থ ও সৌন্দর্য্যের একেবারে সাধনা করিতেন না, তাহা নয়। তাঁহার স্বধর্ম্মপালনে আস্থা ছিল।

তিনি যেইরূপ দেব সেবায় আগ্রহ ও গুরুব্রাহ্মণে ভক্তি দেখাইতেন, সেরূপ অতি অল্পলোকেই করিয়া থাকে। তাঁহার সহবাসে ও বাক্যালাপে কত লোকের যে প্রাণে শান্তি আসিয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না।

আমাদিগের বৃহৎ প্রাসাদ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এক অংশের অধিষ্ঠাত্রী আমার জননী; অপর অংশে আমার পিতা থাকিতেন। আমি মাতার বিভাগেই বাস করিতাম। পিতার সম্মুখীন হইতে, আমার সাহস হইত না। তাঁহার স্থির নির্ম্মল দৃষ্টি আমাকে যেন সঙ্কুচিত করিত। কি জানি কেন আমি তাঁহার নয়নে নয়ন সংস্থাপিত করিতে পারিতাম না। তিনি যে ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইতেন, তাহা আমার মনে হইত না। তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন জানিয়াছি, তিনি আমাকে অন্তরে অন্তরে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রেমের গভীরতা বুঝিতে আমার শক্তি কোথায়!

চিরানন্দময়ী মা আমার যাহার নিকটে যাইতেন, অমনি সেখানে আনন্দের উৎস ছুটিত। পিতা আমার গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁহার নিজের মণ্ডলেই থাকিতেন; তিনি কদাচিৎ আমার জননীর আনন্দ লহরীতে যোগদান করিতেন। যদিও কখন আসিতেন, মূর্খ আমি তাঁহার নিকটে যাইতে আমার লজ্জাবোধ হইত,—তাঁহার আড়ম্বর-হীন বেশ ভূষায় এবং অতি সরল ব্যবহারে তিনি যে এই বিপুল সম্পত্তির অধিষ্ঠাতা, এ কথা ভাবিতেও যেন আমি সঙ্কুচিত হইতাম।

আমাদিগের পরিবারে আর একজন রমণী ছিলেন;—তিনি আমার পিতার বিধবা প্রৌঢ়া ভগিনী। আমার বালবিধবা পিতৃস্বসার বেশ-বিন্যাসের কোনও পারিপাট্য ছিল না। লোকে তাঁহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী বলিত। বস্তুতঃ পরমুহূর্ত্তে তিনি যে কি করিবেন, তাহা কেহই ভাবিয়া পূর্ব্বে নিরূপণ করিতে পারিত না। তিনি আমার মাতার

মত নারীসৌন্দর্য্যভূষিতা ছিলেন না, তবে আবশ্যক হইলে তিনিও যে আমার মার মত মহিমান্বিতা হইতে পারিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার ব্যবহারে, বাক্যবিন্যাসে কৃত্রিমতা আদৌ ছিল না। শৈলগহ্বরে আবদ্ধ স্রোতস্বিনীর মত তাঁহার চিত্তে ভাবরাশি ক্রীড়া করিত। তাঁহার অতি সরল কুটিলতাশূন্য বচনাবলীতে একটা মনোরম মাধুর্য্য ছিল; তাই তিনি অতি স্পষ্টবাদিনী হইলেও তাহাতে কাহারও প্রাণে আঘাত লাগিত না। মা আমার, তাঁহাকে অদ্ভুত প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতেন। যদি কেহ কখনও আমার পিতার গভীরচিত্তে আনন্দ তরঙ্গ তুলিতে পারিত, তাহা আমার সেই পিতৃস্বসা। তিনিই দৃষ্টতঃ ভাবহীন আমার জনকের অধরওষ্ঠকে স্মিতকম্পিত করিতে পারিতেন। আমার পিতাকে আনন্দে উৎফুল্ল করাই যেন তাঁহার জীবনের একটী ব্রত ছিল। প্রাণপূর্ণ ভালবাসা লইয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। অপরকে সুখী করিতে পারিলেই যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত। ভগবানে বিশ্বাস, তাঁহাতে অচলা ভক্তি, সেটা যেন তাঁহার প্রাণের সহজভাব। বিমল সুখ বা তীব্র দুঃখ তাঁহার জীবনে অনেকবারই আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা কখনও তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে নাই। জানিনা, হৃদয়মধ্যে তিনি কি দেব প্রতিষ্ঠাই করিয়াছিলেন, প্রাণের ভিতরে কি শান্তি-মন্দাকিনী ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে বিষম বিপদে বা মহাসম্পদে তিনি কখনও আত্মবিস্মৃত হইতেন না! অতিশয় যন্ত্রণায় পড়িয়াও তাঁহার উচ্ছলিত প্রেম-উৎস রুদ্ধবেগ হয় নাই।

পিতা আমার ভগীনীগতপ্রাণ ছিলেন বলিয়া, পিতৃ-স্বসা সকলের নিকট গৃহকর্ত্রীর আদর ও সম্মান পাইতেন। কিন্তু তিনি নিজে সেবাব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন। মা আমার তুচ্ছগৃহকার্য্য লইয়া থাকিতে পারিতেন না। আমার পিতৃস্বসার নিকট কোনও কার্য্য তুচ্ছ বা উচ্চ ছিল না।

তিনি সমস্তই সমান যত্নে নির্ব্বাহ করিতেন। সকলের সমস্ত ত্রুটি বা দোষ নিজ স্কন্ধে লইয়া সকলেরই উদ্বেগ দূর করিতেন। সামান্য পরিচারিকা হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত সকলেরই দোষ তিনি আত্মস্কন্ধে আরোপ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে অনেক সময়ে তীব্র যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কেহই তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। বুঝিতে পারি নাই, মহামতি পিতৃস্বসা পরহিতার্থে আত্মবেদনা সহ্য করিয়া কি সুখ পাইতেন। আমার মনে হয়, তিনি যদ্যপি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের পরিবারের মধ্যে এরূপ শান্তির উৎস বহিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা-মাতার প্রকৃতিগত পার্থক্য কতদূর। পিতৃস্বসাই তাঁহাদিগের উভয় চিত্তের সজীব বন্ধনী। তাঁহারই চেষ্টায় মা আমার পিতার ঔদাসীন্য ভুলিতে পারিয়াছিলেন, পিতা আনন্দের আস্বাদ পাইতেন। তবে কি আমার পিতার প্রাণে কোনও যাতনা ছিল? হয় ত ছিল,— তিনি বোধ হয় তাঁহার পত্নীর হৃদয়ের ভিতরে, তাঁহার প্রিয় পুত্রের প্রাণের মাঝে কি একটা খুঁজিতেন, কিন্তু তাহা পাইতেন না। সেই অভাব-যাতনাই তাঁহার মর্ম্মে একটা মরুভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে জলসিঞ্চন করাই, আমার পিতৃস্বসা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তিনি আমারও অল্প উপকার করেন নাই। আমার প্রাণে যাহা-কিছু ধর্ম্মভাব আসিয়াছিল, সেটা তাঁহারই যত্নে। তিনিই গল্পচ্ছলে পুরাণের অনেক কাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতেন। তাঁহার মনোরম নীতিকথা এবং নিজ উৎসর্গ ও ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত আমার প্রাণে ধর্ম্মভাব জড়িত করিয়াছিল। যথার্থ সুখ বা শান্তি, বলিতে হইলে, আমার জীবনের সেই কালেই ছিল। আমি যে এখন এখানে

এই ভীষণ যাতনার মধ্যেও মাঝে মাঝে শান্তির ছায়া দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় সেই সময়ের অতি ক্ষীণ স্মৃতি হইতে আসে।

তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে আমার প্রাণে যে ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল, তাহার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি যে পবিত্রবীজ আমার হৃদয়ে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় যে বীজ অঙ্কুরিতও হইয়াছিল, কেন হায় তাহা আমি পুষ্ট করি নাই! তাহা হইলে কি আমাকে এখন এ যাতনা সহ্য করিতে হইত! তিনি আমার অদৃষ্টের দোষে অকালে পার্থিব ধাম ত্যাগ করিলেন। স্বর্গের পুষ্প পাপপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে বেশীদিন ফুটিয়া থাকিতে পারিল না। প্রকৃতিরাণী কৃত্রিমতার উষ্ণ নিশ্বাসে দুদিনেই শুকাইয়া গেল। দেবসরিৎ কিছুদিন মাত্র পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীকে শীতল করিয়া আবার নিজধামে প্রতিগমন করিল। আর আমি? যেমন কিশোরের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিলাম, অমনই ধীরে ধীরে পূর্ব্ব পদাঙ্ক হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলাম। ধর্ম্মের পবিত্র আসনে ইন্দ্রিয়গণকে স্থান দিলাম। পূর্ব্বে ছিলাম অনেকটা প্রকৃতির বালক, এখন জগতের কৃত্রিমতা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি পিতার কুঠিতেই কার্য্য করিতে বাহির হইলাম। ইহাতে আমার মাতার অভিমত ছিল না। মাতার অমানুষী সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি এবং পিতার বিপুল অর্থের উত্তরাধিকারী আমি যে সামান্য ব্যবসা করিব, এটা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

আমার লোকরঞ্জন করিবার একটা অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। এ শক্তিটী আমি আমার মার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম। চঞ্চলস্বভাব আমি, এই ক্ষমতাই আমার কাল হইল। যেখানেই যাইতাম, যাহাকেই দেখিতাম, সেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হইত। জগৎ যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতে সদাই বাহুপ্রসারণ করিয়া থাকিত। সকলেই

আমাকে লাভ করিয়া যেন অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিত। আমিও লোক বা স্থানের বিচার না করিয়া সকলের প্রণয়ের প্রতিদান করিতাম। ইহাতে অজিতেন্দ্রিয়, উচ্ছ্বসিত-ভাবপরায়ণ আমার যাহা হইবার তাহা হইল। যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই আমার পদস্খলন হইল। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রীপুরুষের অভাব ছিল না। তাহার যে ফল, শীঘ্রই তাহা ফলিল। প্রথম প্রথম অপরের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার সুখ উপভোগ করিতে অভ্যস্থ হইলাম; পরে কত নিরীহ নরনারীকে সেই পথে আকর্ষণ করিয়া আনিলাম।

পিতা এই পঙ্কিল পল্বল হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কখন উপদেশ অনুযোগ, কখন তিরস্কার শাসন, তিনি কিছুরই ক্রটী করেন নাই। কিন্তু, কিছুতেই কোনও ফল হইল না। আমি কৌশলে তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব পরিহার করিতাম। মাতাও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমার চরিত্র সংশোধনে অনেকটা সক্ষমও হইয়াছিলেন। তিনি আদৌ বিরক্তির ভাব দেখাইতেন না, বরঞ্চ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি আমার প্রতি স্নেহাধিক্য দেখাইতেন। তিনি দেখাইতেন, আমি তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে কত যাতনা দিতেছি। তিনি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেন যে, আমার মত উত্তম পুত্রের জননী বলিয়া তাঁহার যে একটা অভিমান ছিল, এখন সেই অভিমান ভাঙ্গিতে হইতেছে বলিয়া যে তাঁহার এই যাতনা, তাহা নহে। এ যাতনা আমার পরিণাম চিন্তা করিয়া;—আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবন আমাকে ব্যাধিযুক্ত করিবে, আমার অকালমৃত্যু আনিবে, ইহাতে আমি লোক সমাজে নিন্দনীয় হইব। মা'র এইরূপ ব্যবহারে আমি বুঝিলাম, আমার জননীর স্নেহের গভীরতা কি! আমি চরিত্র সংস্কার করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

আমি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলেও, আমার সংযম শক্তি যে আদৌ ছিল

না, তাহা নহে। মা যে বলিয়াছিলেন, আমার ব্যবহারে জগৎ কি ভাবিবে, এই কথা আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। আমি একটু সংযতভাবে, লোক-চক্ষুর অগোচরে আমার পাপ-ইচ্ছার পূরণ করিতাম।

এইরূপে কিছু দিন কাটিল। যখন আমার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর, তখন পিতা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। আমার পিতৃস্বসার মৃত্যুর পর পিতার অধরে আর কেহ হাসি দেখে নাই। মা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃহে থাকিয়াই, প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর মত জীবন অতিবাহিত করিতেন। আমি পিতার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। আমি শীঘ্রই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলাম। এইবার আমার জীবনের অন্ধতম কাল। আমার সমস্ত পাপকাহিনী জীবন পট হইতে ধৌত করিতে পারিলেও এইটা সমান উজ্জ্বল রহিয়া যাইবে। সে কি ভীষণ কথা! আমার স্মৃতিতে আসিবা মাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। এতদিন যাতনা ভোগ করিতেছি তবুও কি তাহার উপশম নাই! সে স্মৃতির কি নাশ নাই!

ভিষকদিগের আদেশমত সমুদ্রতীরবর্ত্তী শৈলবেষ্টিত এক মনোরম স্থানে আমি বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যাইলাম। তথায় আমার পিতা পূর্ব্বে একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু আমাদিগের কখনও সেখানে যাওয়া হয় নাই। আমার এক অতি দূরাত্মীয়া বিধবা তাঁহার যুবতী কন্যার সহিত তথায় বাস করিতেন। আমরা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার আত্মীয়ার সামান্য সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তাঁহাদিগের অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পিতা অনুগ্রহ করিয়া তথায় তাঁহাদিগকে বাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। বিধবার কন্যা হৈমবতী সম্পর্কে আমার ভগিনী হইত। হৈমবতী অতিশয় হতভাগিনী ছিল। তাহার বয়স যখন সপ্তম বৎসর, সেই সময় তাহার বিবাহ হয়।

বিবাহের পরেই তাহার বৈধব্য হইল। এখন তাহার বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর। নিকটেই অরণ্য, চতুর্দ্দিকে শৈলমালা, সম্মুখে, নীল সমুদ্রের অন্তহীন, জলরাশি, এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে অতি লাবণ্যময়ী হৈমবতী প্রকৃতির রাণীর মত রাজত্ব করিত। নিকটে ও দূরে দশ পঁচিশ ঘর কৃষীজীবী অতি গরীব গোয়ালা বাস করিত। তাহারা সকলেই আমাদিগের প্রজা। তাহারা সকলেই হৈমবতী ও তাহার মাতাকে দেবীর মত ভক্তি করিত।

আমি তথায় বাস করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি সুস্থ ও সবল হইলাম। প্রকৃতির মনোরম নানা রূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত থাকিলেও, আমার সে স্থান আদৌ ভাল লাগিত না। সেই একরূপ লোক, প্রকৃতির সেই একখানা চিত্র, শীঘ্রই আমার সেই স্থানে অবস্থান করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমার প্রাণ সহরের বৈচিত্র্যময় আমোদ উপভোগ করিতে লালায়িত হইল। অথচ মাতার আদেশ এখানে আমাকে আরও কিছুদিন থাকিতে হইবে। কি করি,তাই কোনরূপে সময় কাটাইতে, একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম,—হৈমবতীকে আমার প্রতি আসক্ত করিতে যত্ন করিতে লাগিলাম। একেত সে অতি রূপবতী,তাহার উপর তাহার ছিল সাংসিদ্ধিক বেশভূষা, তাহার অকপট মন, তাহার প্রাকৃতিক আনন্দ-উৎফুল্ল বদন,—আমি ভাবিলাম, এরূপ রমণীর প্রণয়পাত্র হইতে পারার একটা স্নিগ্ধ সুখ আছে। সেই পল্লীবাসিনী সরলস্বভাবা রমণী সংসারের দুষ্ট চতুরতা জানিত না। মানব-সংস্পর্শহীন, গিরিকন্দরের পক্ষিণীর মত স্বাধীন ও ভীতিশূন্য, শ্যামল শষ্পে নিপতিত শিশিরবিন্দুর মত নির্ম্মল ও পবিত্র, সেই অশিক্ষিত, সহরের কৃত্রিমতা-শূন্য, প্রকৃতি-কন্যা আমার প্রণয় ক্রীড়ার উপযুক্ত পাত্রী হইবে ভাবিলাম। আমরা দুজনে অনেক সময় নির্জ্জনে একত্র থাকিতাম; নির্জনে একত্র সাগর-তটে শ্বেত-কিরীটী

সাগর তরঙ্গের নৃত্য দেখিতাম, নির্জ্জনে গিরিসঙ্কটে বেড়াইতে বেড়াইতে বিহঙ্গ বিহঙ্গীর কেলি দেখিতাম। সে যুবতী হইয়াও বালিকা-স্বভাবান্বিতা। হৈমবতীর মাতা আমাদিগের এই নির্জ্জন-বিহারে কিছুই আপত্তিকর দেখিতেন না।

প্রথম প্রথম আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইত। চিরপ্রসন্নতাময়ী হৈমবতী এই দূরে, এই অন্তিকে, আমার চারিপার্শ্বে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, এই আমার নিকট বসিয়া আমাকে সেবা করিতেছে, আমার প্রবাসের অপ্রসন্নতা দূর করিতে কতই চেষ্টা করিতেছে, আবার সন্দিগ্ধ মনে পরক্ষণে কোথায় পলাইয়া যাইতেছে। আমি কিছুতেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিতাম না। সে কি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল! তাহা নহে। সে যে আমার মনের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া সাবধান হইত, তাহা নহে। সেটা প্রাণের স্বাভাবিক শঙ্কা। প্রকৃতি ইহাদ্বারাই তাঁহার পালিত কন্যাগণকে আসন্ন বিপদ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করেন। বিহঙ্গ দূর বৃক্ষের শাখায় বসিয়া তোমাকে সঙ্গীত শুনায়, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিতে যাও, সে কিএক অদৃশ্যশক্তি-চালিত হইয়া তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। হৈমবতীর গভীর প্রণয় ছিল, কিন্তু তোমরা যাহাকে প্রেম বল, তাহার স্থান তাহার হৃদয়ে ছিল না, —সুনীল আকাশের মত তাহার হৃদয় পবিত্র।

স্বার্থপূর্ণ আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, "সন্দিগ্ধা রমণী, আমি তোমায় আবদ্ধ করিবই করিব।" অবশেষে আমি তাহা করিলাম, যুবতীর স্বভাবের শোচনীয় পরিবর্ত্তন করিলাম। অমলিনা, কলঙ্কহীনা নলিনীর আর এখন সে রমণীয়া শোভা নাই; স্বাধীন বিহঙ্গের হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে। এখন কোথায় সে আর্জ্জব, কোথায় সে বিমল আনন্দরাশি! তাহার হৃদয়ে সরলতার পরিবর্ত্তে কুটিলতা আসিয়াছে, আনন্দের পরিবর্ত্তে

নয়নে বারিকণা দেখা দিয়াছে! অধিক আর কি বলিব, ইহার পর, তাহার ইহকাল, পরকাল, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আর অধিক বিলম্ব হইল না।

আমার প্রাণে তীব্র যাতনা, তীব্র অনুতাপ আসিল। তখনও আমার প্রাণ তত কঠিন হয় নাই। তাহার সরলতা, তাহার আনুগত্য আমার মর্ম্মে তুষানল জ্বালিল। আমি মানব-দেবীর পবিত্রতা নষ্ট করিলাম। হৈমবতীর মাতা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; মা আমার সমস্ত শুনিলেন। আমাকে পত্র দিলেন, আমি যেন তদ্দণ্ডেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। তীব্র অনুতাপবিদ্ধ, লজ্জিত আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম; স্থির করিলাম, ওই বিধবাকে বিবাহ করিবার ভিক্ষা মাতার নিকট যাচ্ঞা করিব।

কিন্তু তাহা হইল না। মা বুঝাইলেন, এই বিবাহ হিন্দুসমাজ অনুমোদন করিবে না; আমাদিগের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা ইহাতে একেবারে নষ্ট হইবে। তিনি তাঁহার এক কুটুম্বিনীর পরমা সুন্দরী দুহিতাকে আশ্রয় দিয়াছেন। বুঝাইলেন, এই কুমারীই আমার উপযুক্তা পাত্রী হইবে। তিনি এরূপভাবে তাহার গুণের কথা, তাহার অসামান্য রূপের কথা আমার নিকটে বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, আমার অতিশীঘ্রই প্রতীতি হইল, মাতার পালিতা নলিনীর মত কুমারী জগতে বিরল। হৈমবতীর কথা সমস্তই ভুলিলাম। কোথায় সে অনুতাপ! কোথায় আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! তখন বুঝি নাই, এখন এই নরকের অতি নির্ম্মম দহনে বুঝিতেছি—আমি কি করিয়াছিলাম!

চতুর্থ পত্র সমাপ্ত।

ক্রমশঃ—

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

মৃত ব্যক্তিকে দর্শন।

আমি একজন পৌরাণিক। পুরাণ কথা কহিবার নিমিত্ত কোন স্থানে গমন করিয়া ছিলাম। তথায় নিত্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমৎভাগবৎ কথা কীর্ত্তন করিতাম। তথায় বহুলোকের সমাগম হইত। কথান্তে স্বায়ং-সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিভোজনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতাম। বলিয়া রাখি—তখন আমি দুই বেলা অন্ন ভোজন করিতাম। স্বহস্তেই রন্ধন কার্য্য সমাধা করিতাম। আমি অপর কাহারও হস্তে আহার করিতাম না। আমার সঙ্গে একটী চাকর ছিল সেই পরিচর্য্যাদি করিত। এবং যাহাদের বাটীতে ছিলাম তাঁহারা অতি যত্ন সহকারে আমার পরিচর্য্যা করিতেন। আমি যাঁহার বাটীতে ছিলাম তিনি একজন বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহারি বৈটকখানা ঘরে থাকিতাম। এবং তাঁহার কর্ম্মচারিরা সেই ঘরে থাকিতেন এবং আমরা সকলে একত্রে সেই ঘরে সুখে শয়ন করিতাম। একদিন রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় নিত্য যে প্রকার কথা শেষ করিয়া সন্ধ্যা কার্য্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক রন্ধন করি সেইরূপ করিতেছি এবং বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ উক্ত ধনাঢ্য ব্যাক্তির কর্ম্মচারী ও গৃহস্বামির সহিত নানা বাক্যালাপ করিতেছি। অবশ্য এখানে পরিচয় দেওয়া উচিত,—রন্ধন গৃহখানি বৈঠকখানা ঘরের উত্তর দিকে। উক্ত রন্ধন গৃহের ও বৈটকখানার মধ্যে একটী সরু গলি রাস্তা আছে। আমি সেই রন্ধন-গৃহ মধ্যে একখানি চৌকিতে বসিয়া রন্ধন করিতেছি, আর বৈঠক-খানার রকে বসিয়া তাঁহারা আমার সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বলিলেন, "মহাশয়, আমরা বাটী হইতে আহার করিয়া আসি।"—কর্ত্তা বলিলেন "তোমরা যাও আমি এখানে রহিলাম।" সেই সময়ে আমার চাকরটীকে কএকবার ডাকিলাম। জানিলাম যে সে

গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রা যাইতেছে। চাকরটীর নাম গোবৰ্দ্ধন ছিল। আমি গোবরা বলিয়া ডাকিতাম। যখন ডাকিয়া উত্তর পাইলাম না তখন গৃহস্বামী বলিলেন, "আমি কি ডাকিয়া দিব?" আমি বলিলাম, "না।" এমন সময় বাটীর মধ্য হইতে একটী দাসী আসিয়া কর্ত্তাকে বলিল, "আপনার জলখাবার প্রস্তুত হইয়াছে আপনি আসুন।" কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "যাচ্চি, যাও।" আমি বলিলাম, "আপনি যান না, জল খাইয়া আসুন; আমার এখন রন্ধন শেষ হয় নাই।" কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি একা থাকিবেন? আমার কর্ম্মচারিগণ খাইয়া আসুক, আমি পরে যাইব।" আমি বলিলাম, "আমি একা থাকিব, তাহাতে কি হইল? আমার কোন ভয় নাই।" তিনি বলিলেন, "তবে যাই। গোবরাকে ডাকিয়া দিয়া যাই"। এই বলিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় দাসী আসিয়া তাঁহাকে জলখাবার জন্য যাইতে বলিল। তিনি তবুও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম তাঁহার মনে কোন মতলব আছে, তজ্জন্যই তিনি যাইতেছেন না। আমি বলিলাম, "যদিও এখানে বাঘের ভয় আছে, কিন্তু আমি ঘরের মধ্যে আছি এবং ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে সুতরাং আমার কোন ভয় নাই। আমার ডাল তৈয়ার হইয়াছে, ভাত ও টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। আপনি জলখাইয়া আসিবার মধ্যে আমার সমস্ত রসুই হইয়া যাইবে। পরে পুনরায় আপনি আসিলে আমি অন্ন আহার করিব।" আমার বাক্যানুসারে তিনি আমাকে বলিলেন "আমি যাইব আর আসিব।" এই বলিয়া তিনি খড়ম পায়ে দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি তখন আপনার মনে গুণ গুণ করিয়া গান করিতে লাগিলাম এবং পাকস্থালীর দিকে মুখ ফিরাইয়া দক্ষিণ করে দর্ব্বী ধারণ পূর্ব্বক অন্ন গুলিকে আলোড়িত বিলোড়িত করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার দ্বারা দেখিলাম যে অন্নগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে।

তখন আস্তে আস্তে দর্ব্বীখানি রাখিয়া বেড়ী ধরিয়া অন্নগুলি পাকস্থালীর ভূমিতে অবতরণ করিলাম, পরে ধীরে ধীরে অন্নের মণ্ডপ গড়াইলাম। পরে অন্নগুলি একখানি কদলি পত্রে ঢালিলাম। অন্নগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একত্র করিতেছি এমন সময়ে—আমার নাসিকাতে কেমন একটা ভাপসো গন্ধ লাগিতে লাগিল। এমন কি অন্নের সুরুচি ঘ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া আমার নাসাকে আকুল করিতে লাগিল। তখন দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ আপনার গাত্রের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, কারণ কথা কহিবার সময় পরিশ্রম নিবন্ধন গাত্রে ঘর্ম্ম হয়। ইহা কি তাই? দেখিলাম তাহা নহে। গৃহাভ্যন্তরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম সেরূপ গন্ধের কোন কারণ নাই। গন্ধটী ঠিক যেমন ঘর্ম্মসিক্ত বস্ত্রাদির দুর্গন্ধ সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন হস্ত দুই খানি ধুইয়া নিজের বস্ত্রের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলাম দেখিলাম তাহাতেও সেরূপ গন্ধ নাই। তখন আবার পূর্ব্বমত দক্ষিণ মুখ হইয়া বসিলাম। বসিয়া যেমন বাহিরে চাহিয়াছি দেখি, সেই গলির মধ্যে একটী আলুলায়িতাকেশা, দীর্ঘদশনা, একখানি জীর্ণ, মলিন কন্থা গাত্রে, এক পাগলিনী দাঁড়াইয়া আছে। তখন মনে হইল ইহারই কন্থার দুর্গন্ধ আমার নাকে আসিয়াছিল। দীপালোক তাহার সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইয়াছে। তখন আমি তাহাকে পাগলিনী বলিয়া সম্বোধন করিব এরূপ মনস্থ করিতেছি, এমন সময় বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলাম সে রমনী পরিচিতা। তখন আর তাহাকে পাগলিনী বলিয়া ডাকিলাম না, তাহার নাম করিয়া ডাকিলাম। এমন সময়ে মনে হইল যে, এ ত আজ বৎসরাধিক হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছে! এরূপ মনে হওয়াতে আমার ভয় সঞ্চার না হইয়া তাহার অবস্থা জানিবার জন্ম কৌতূহল উপস্থিত হইল। তখন আমি বলিলাম "কি এখনও ভুলিতে পার নাই?" আমি দেখিলাম একথায় সে আমার দিকে চাহিল না, বা আমাকে কোন উত্তর

দিল না। আমি স্থির-দৃষ্টিতে তাহার চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার দৃষ্টি আমার অন্নগুলির প্রতি রহিয়াছে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই। তথাপি আমি বারম্বার তাহাকে বলিলাম "এখনও ভুলিতে পার নাই ?" কেন না পূর্ব্বে যখন আমি আমার গুরুর সহিত সেই স্থানে কথকতা শিক্ষা করিবার জন্য আসিতাম, তখন এ রমণী আমাদিগের পরিচর্য্যা করিত : এই কারণেই আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "কি এখনও ভুলিতে পার নাই ?" যখন দেখিলাম, সে কোন কথা কহিল না এক ভাবেই দাঁড়াইয়া র'হল, তখন আমি গৃহস্বামীকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলাম। তখন গৃহস্বামী বাটীর মধ্য হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি যাই, মুখুয্যে মহাশয়।" উত্তর দিবার পরেই তাহার খড়মের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। খড়মের শব্দে বুঝিলাম যে,সে ব্যক্তি অতি দ্রুত আগমন করিতেছে। তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকার ধ্বনি যেমন ঐ রমণীও শুনিতে পাইল। অমনি সে দ্রুতবেগে গলির মধ্যে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। এখানে বলিয়া রাখি যে,আমার রসুই ঘরের পশ্চিমে আর একখানি চালা ঘর ছিল। সেই-খানে তাহার বাসগৃহ ছিল এবং ঐ চালা রসুই ঘরখানি তাহারই রন্ধন গৃহ। ভাবে বুঝিলাম যে, সে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল, কেন না তাহার বাসগৃহখানি যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ন্যায় শব্দ হইল। এমন সময় গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হইয়াছে ? আপনি কি কিছু ভয় পাইয়াছেন ?" আমি বলি-লাম,"ভয় পাই নাই, তবে বড়ই একটা আশ্চর্য্য দেখিলাম। বাবু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি অসন্তুষ্ট হইও না। তোমার আত্মীয়ার কি কোন শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিছুই হয় নাই ? তোমার মামীর ত কিছু টাকা ছিল তাহাত তুমি পাইয়াছ এবং তুমি ধনাঢ্য তবে কেন ইহার গতি বিষয়ে কোন কার্য্য কর নাই ? আমি দেখিলাম তোমার মামী আমার সম্মুখে

দাঁড়াইয়াছিল।” আমার কথা শুনিয়া তিনি অতি ক্রোধপূর্ণস্বরে বলিলেন, “সে হারামজাদী এখানেও আসিয়াছে। মুখুয্যে মহাশয়! মামীর জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। রাত্রিকালে দরোজা খুলিয়া বাহিরে যাইব, দেখি মামী দ্বারে বসিয়া আছে; কোন দিন দেখি অঙ্গনে বিচরণ করিতেছে; কোন দিন দেখি ছাতে আলিসার উপরে পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে বড়ই ভয় হইত এখন আর আমরা ভয় করি না। আমি যে কি করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মামী কি করিতেছিল, আপনি আমাকে বলুন।” আমি বলিলাম, “আমার সহিত কোন কথা কহে নাই, কেবল মাত্র আমার অন্নগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল।” তখন তিনি বলিলেন, “অপনি ঐ অন্ন ভোজন করিবেন না।” আমি বলিলাম, “এত কষ্টে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি উহা কি ত্যাগ করিতে পারি?” তিনি বলিলেন, “দোহাই আপনার, এই অন্ন আপনি ভোজন করিবেন না, আমি আপনার খাদ্যের জন্য চিপিটক ও দুগ্ধ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।”

আমি তাঁহার কোন কথা শুনিলাম না, কেবল বলিলাম, “তোমার মামীর গয়ার কার্য্য করিও।” এই বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ভোজনে সে ব্যক্তি অতীব চিন্তিত ও দুঃখিত হইল। আমি ভোজন করিলাম বটে, কিন্তু ঐ অন্নের স্বাদ পাইলাম না। পরে ভোজনান্তে উঠিয়া আচমনাদি করিয়া রকে বসিয়া পান তামাক খাইবার চেষ্টা করিতেছি, আমার গাত্র বমন করিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই বমি করিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কম্পের সহিত জ্বর হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করিলাম। তাহার পর সমস্ত রাত্রি অজ্ঞান হইয়া ছিলাম, জানিনা কি হইয়াছিল। তৎপর দিবস চৈতন্য হইলে দেখিলাম যে একজন ডাক্তার আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

আমার চৈতন্য দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি হইয়াছে।" আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"ভাতগুলি খাইয়া আপনি ভাল করেন নাই। বমি হইয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে।" তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আরোগ্য হইব। আমি কিন্তু তথায় রহিলাম না বাটী চলিয়া আসিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী এই সকল কথা শুনিয়া নানা জল পড়া ঝাড়াণ ইত্যাদি করাইলেন। এই জ্বর আমি সপ্তদশ দিবস ভোগ করিয়া ভগবৎ কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলাম। পরে তথায় পুনরায় যাইয়া কথকতা কার্য্য শেষ করিলাম। আমি গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে কি না গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "কতবার তাঁহার গয়া কার্য্য করাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি স্বয়ং যাইয়া গয়া কার্য্য করিয়াছ?" তিনি বলিলেন "না।" আমি বলিলাম, "তুমি এবার স্বয়ং যাইয়া গয়া কার্য্য করিও, তাহাতে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে।"

চূড়ামন্যুপাধিক
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"পুনরাগমন।"

(২১)

তখন কি সহর কি পল্লী সর্ব্বত্রই দুর্গাপূজার মহাধূম। আমাদের পাড়ায় শুধু আমাদের বাড়ী ছাড়া আর প্রায় সকল বর্দ্ধিষ্ণুলোকের গৃহে প্রতিমা আসিয়াছে। ঢাকের শব্দে পল্লীটা পরিপূর্ণ হইয়াছে। মহামায়ার সেই কঠোর আবাহনের বিরাম-মধুরতার উপভোগে বঞ্চিত হইয়া আমি যেন বিরক্তির সহিত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

আমার গন্তব্যস্থান কেহ জানে এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই-জন্য দরোয়ানকে সঙ্গে না লইয়া উড়িয়া ভৃত্য হরিয়াকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া শালিকায় যখন পাল্কী ভাড়া করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম, দরোয়ান আমার সঙ্গে যাইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এরূপভাবে আসিবার কারণ জানিতে সে বলিল, "মা তাহাকে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছে।" তাহার কথা শুনিবামাত্র আমার মনে হইল, ডাক্তারবাবু হয় ত আমার অসাক্ষাতে আমার গন্তব্যস্থান মায়ের কাছে বলিয়াছেন। এইটী অনুমান করিয়া আমি তাহার আগমনে আপত্তি করিলাম না। আটজন বেহারা ভৃত্য হরিয়া ও দরোয়ান এই দশজন আমার সহযাত্রী হইল।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইতেনা হইতে আমি দশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছি। এখান হইতে আর ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমাদের গ্রাম। কলিকাতা হইতে আমাদের গ্রামে যাতায়াতের দুই টীমাত্র উপায় আছে। যে পথে চলিয়াছি, পদব্রজে, গোযানে অথবা পাল্‌কীতে করিয়া এই স্থল পথ; অথবা উলুবেড়িয়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত দামোদরের পথ।

তখনও উলুবেড়িয়ার খাল কাটা হয় নাই। ভবিষ্যতে এই খালকাটার ভার যে আমার উপর পড়িবে,তাহা তখনও স্বপ্নেও আমি জানিতে পারি নাই। দামোদর দিয়া যাইলে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে তিন দিনের অধিক সময় লাগে। একদিনেই উপস্থিত হইবার আশায় আমি এই স্থলপথই অবলম্বন করিয়াছি। বর্ষাকালে এ পথ অতি দুর্গম। মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে পথটুকু আসিলাম, ইহাতে বিশেষ পথক্লেশ অনুভব করিলাম না। রাস্তা পাকা না হইলেও বাঁধা, সুতরাং উভয় পার্শ্বস্থ মাঠের জল ইহাতে উঠিতে পারে নাই বলিয়া এই পথ শুষ্ক হইয়াছিল।

এইবারে আমাকে পল্লীপথে চলিতে হইবে। কোথাও মাঠের উপর দিয়া, কোথাও দুই পার্শ্বের জঙ্গলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পথরেখা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা ছাড়া দুই একস্থানে জল ভাঙ্গিবার, দুই একস্থানে ক্ষুদ্র কেদার-বাহিনী পয়ঃপ্রণালীর উপর বাঁশের সাঁকো পার হইবার সম্ভাবনা।

এক উদ্যমে আটক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বেহারারা এক চটির সম্মুখে বৃক্ষতলে পাল্‌কী নামাইল। যে স্থানে চটি সে স্থানটী আমাদের দেশের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে সপ্তাহে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে হাট হইত। হাটে বহুলোকের সমাগম হইত; অনেক টাকার বেচাকেনা হইত। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের অত্যাচারে ও দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনে সঙ্গে সঙ্গে সে হাট অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে হাট হয়, কিন্তু আর সেরূপ জনতা হয় না।

আমি যেদিন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে দিন হাটের বার ছিল না। তাহার উপর সে দিন মহা-সপ্তমী—যে যেখানে বিদেশে ছিল, প্রায় সকলেই দুই চারিদিন পূর্ব্বে নিজ নিজ গৃহে উপ-

স্থিত হইয়াছে। সুতরাং স্থানটী সেদিন একরূপ জনতাশূন্য পরিত্যক্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

তথাপি কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের সকলেরই বিশ্রাম লইবার প্রয়োজন। সঙ্গে যে দরোয়ানকে আনিয়াছিলাম, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, ভোজপুরী, অতিশয় বলিষ্ঠ। নাম তুলাপতি সিং। বলের অনুযায়ী তাহার ভোজনও ছিল। আমার জন্য যত না হউক, নিজের জন্যই সে আমাকে বলিল, "হুজুর! এই চটিতে আহারাদি সমাপন না করিলে, আপনাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।" আহারাদি করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, প্রাতঃকালেই আমি একরূপ দিবসের আহারের কার্য্য সারিয়া আসিয়াছিলাম। যে কোন উপায়ে হউক সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌছান আমার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল, একবারে গ্রামে পৌছিয়াই বিশ্রাম করিব। বহুকাল জন্মভূমি দেখি নাই, সেখানে এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও আমার জানা ছিল না। বিশেষতঃ দরোয়ানের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহা হইলে, একটু রোদ থাকিতে গ্রামে না পৌছিলে হয় ত আশ্রয়ই মিলিবে না। তাহার উপর এটা ঠেঙ্গাড়ের দেশ, পথের মধ্যে রাত্রি হইলে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই চটি হইতে এক ক্রোশ পরে একটী তিন ক্রোশী মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে একটী বিশাল দিঘী আছে। সেই দিঘীর পাহাড় ঘন সন্নিবিষ্ট তালকুঞ্জে আবৃত হইয়া বহুদূর হইতে পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত। অনেক ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় এখানে ঠেঙ্গাড়ের লাঠীতে প্রাণ দিয়াছে। বাল্যে সরকার গৃহিণীর কাছে শুনিয়াছি, কত লোকের মাথা যে ঐ দীঘীতে পোতা আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

আমি তাহাদিগকে শুধু জলযোগ করিতে ও সেই সঙ্গে একটা ন্যায্য সময়ের মত বিশ্রাম লইতে অনুমতি দিলাম। সহরে বহুকাল বাস করায়

অভিমানটা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, চটি ওয়ালার নিরীহ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

আমার আদেশ শুনিয়া তুলা সিং যেন বিশেষ দুঃখিত বোধ হইল। আমি তাহাকে সমস্ত মনের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ ঠেঙাড়ের কথা শুনিয়া সে উচ্চহাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। বাঙ্গালীর শক্তি ও সাহসকে যথেষ্ট টিটকারি দিয়া সে আমাকে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিল; চটি ওয়ালাও আমার পাল্কীর সমীপে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে আহ্বান করিল। চারিদিক্ হইতে দুই চারিজন লোকও আমার পাল্কীর কাছে সমবেত হইল। তাহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল,—"এখনকার কালে রায়দিঘীতে ভয় করিবার কিছুই নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহ-রের সময়ও তাহার পার্শ্ব দিয়া এখন নিঃশঙ্কচিত্তে লোক চলাচল করিয়া থাকে।" বিশেষতঃ সকলেই একবাক্যে আশ্বাস দিল, এক প্রহর বেলা থাকিতে সে স্থান হইতে যাত্রা করিলে, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারিব।

চারিদিক্ হইতে অনুরোধের ভারে আমার গতিরুদ্ধ হইল। আমি বেহারাদিগকে ও দরোয়ানকে স্নান ও আহারাদি করিতে আদেশ দিলাম এবং চটি-ওয়ালা ব্রাহ্মণকে বলিলাম, যাহাতে শীঘ্র আহারাদি নিষ্পন্ন হয়, এরূপভাবে যেন সে খাদ্যের আয়োজন করে।

তখন সমস্ত আহার্য্যই একরূপ সুপ্রাপ্য ছিল। আলু ও কপি ব্যতীত গ্রাম্য হাটে তখন প্রায় কোনও সামগ্রীর অভাব হইত না। গ্রামের অল্প লোকই তখন আলুর ব্যবহার করিত, অনেকে তখনও কপির নাম পর্য্যন্তও শুনে নাই। হিন্দু বিধবা তখন এ সকল সামগ্রী বিলাতী বলিয়া স্পর্শ করিতেন না, দেবতার ভোগেও প্রদত্ত হইত না। গ্রামে

আলু ও কপি মিলিবেনা জানিয়া আমি আগে হইতেই উভয়েরই কিছু সংগ্রহ করিয়া, সঙ্গে আনিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণকে তাহা হইতে কিছু দিয়া একটু যত্নের সহিত পাক করিতে বলিয়া দিলাম। বলিয়া দিলাম ভাল রাঁধিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।

আহারের কথা লইয়া এতটা সময় নষ্ট করিলাম, ইহাতে কাহারও কাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। উদর ও বাক্‌সর্ব্বস্ব আমাদিগের জীবনে এত অধিক বলিবার আর কিছু না থাকিলেও এক্ষেত্রে কথাটা অনেকেরই পক্ষে অবান্তর বোধ হইতে পারে। চলিয়াছি গোপাল কৃষ্ণের সন্ধানে, গন্তব্য পথে এত আহারের কথা লইয়া বিলম্বের প্রয়োজন কি?

আমি আমার চির সহিষ্ণু শ্রোতৃবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ওই আহারের—বিশেষতঃ ওই আলু ও কপির সহিত ভবিষ্যৎ ঘটনার বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই তুচ্ছ নীরস বিষয়টা লইয়া আপনাদের এত অধিক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে।

আমার যতটা স্মরণ হয়, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের দেশে হুগলী জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম আলুর আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং আলুটা চটিওয়ালার অপরিচিত না হইলেও, ফুলকপিটা সে বোধ হয় জীবনে প্রথম দেখিল। এই জন্য সে প্রথমে তাহা স্পর্শ করিতে ইতস্ততঃ করিল। কপির মর্ম্ম বুঝাইয়া তাহা স্পর্শ করাইতে আমার অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

যে সময় তাহাকে কপির মর্ম্ম ও তাহার দুর্ম্মূল্যতা বুঝাইতে ছিলাম, সেই সময় একজন কৃষ্ণকায় পুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল সে জাতীতে বাগদী, অথবা ডোম। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আকারে ঈষৎ খর্ব্ব, বয়স পঞ্চাশের অধিক বলিয়া অনুমিত হইল। সে ব্যক্তি কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছিল।

আমার পাল্কী, সঙ্গে লোকজন—বিশেষতঃ হাতের কপি লইতে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া কৌতূহল বশে যেন সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ নীরবে কপি সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনিল, আমার হাতের সেই বিস্ময়কর খাদ্য-পুষ্প বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিল। কপির জন্মকথা বুঝাইতে, আমাকে আলু ও তামাকের জন্মকথার অবতারণা করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলু ও তামাকের আবিষ্কারক র‍্যালে সাহেবের ইতিহাসেরও একটু আভাস দিতে হইয়াছিল। আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ ও কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত হইয়া যে সময় ব্রাহ্মণ কপিতে হস্তক্ষেপ করিল, সেই সময় লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

অসভ্যটার কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি ক্রোধটা কোনও রকমে সংযত করিয়া, ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলাম—"কলিকাতা।"

"এ দিকে কোথায় যাইতেছ?"

আর ধৈর্য্য রহিল না। জাতির নীচতায় যে আমার চাকরও হইবার যোগ্য নয়, সে আমার সঙ্গে "তুমি" বলিয়া কথা কয়! ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম—"তোর সে কথা জানিবার দরকার কি?"

"জানিলে কি তোমার জাত যাবে! না বলিতে চাও, নাই বলিলে—অমন চোক রাঙাও কেন ঠাকুর?"

অত্যন্ত ক্রোধে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"কি বল্লি বেয়াদব।" আমার কথার ঝঙ্কার শেষ হইতে না হইতে তুলা সিং পশ্চাৎ হইতে তাহার গণ্ডে একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। প্রহার ভরে লোকটা ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভূমি হইতে উঠিয়া সে অবনত মস্তকে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া লইল।

দাঁড়াইয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে দরোয়ানের মুখ পানে চাহিল। আমি পাল্কীতে বসিয়াই তাহার সেই ক্রোধ-রঞ্জিত দৃষ্টির তীব্রতা দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র আমার অজ্ঞাতসারে একটা বিষম লজ্জা আমার হৃদয়টাকে অধিকার করিল। তৎসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে লোকটা স্থান ত্যাগ করিয়া, যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই ফিরিয়া গেল।

সে লোকটার দুরবস্থা দেখিয়া, চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ ফুলকাপ হাতে করিতে আর কোনও আপত্তি করিল না। আমার অন্ন প্রস্তুত করিতে সে চটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ড।

আজ প্রায় পনের দিন অতীত হইল, কলিকাতা বহুবাজারে কাপালী-টোলায় এক খ্রীষ্টীয় পরিবারের * নং বাটীতে এক অতি অদ্ভুত চাক্ষুস ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। সেই বাটীর কর্ত্তার আপত্তি থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া বাটীর নম্বর এবং নামের উল্লেখ করিলাম না। যদি কেহ এই সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অন্য পাঠক-পাঠিকাগণ সকাশে বাটীর নামাদি অপ্রকাশ রাখিয়া প্রকৃত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। * নম্বর বাটীতে পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক একটি স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক একটি যুবতী কন্যা আছে। ঐ বাটীর সম্মুখ ভাগে অপর একটি গৃহস্থের বাটী। তাহাদের সঙ্গে ইহাদের সৌহৃদ্য এবং ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা এই শেষোক্ত বাটীর গৃহকর্ত্রী ঐ কন্যাটিকে

ডাকিয়া বলিলেন, "মনোরমা! আমাদের বাটীতে একবার আয়তো"। তাহাতে ঐ যুবতী কন্যাটি তৎক্ষণাৎ সেই বাটীতে চলিয়া গেল। কিয়ৎকাল এইরূপে অতীত হইলে যুবতী মনোরমা একটি পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ ইলিস মৎস্যের ব্যঞ্জন লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, ইত্যবসরে তাহার যেন বোধ হইল, এক বিকটাকার মূর্ত্তি হাত বাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত মৎস্য পাত্র ছুঁইতে আসিতেছে। মনোরমা নিতান্ত বালিকা নহে, এবং সাহসীও বটে, সুতরাং সে কোন প্রকার ভয় না করিয়া দ্রুতবেগে আপনাদের সদর দরোজায় প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে তাহার মাতার নিকটে সেই মৎস্যের ব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া বলিল, "মা, সুষমাদের বাটী হইতে ব্যঞ্জন লইয়া আসিবার সময় এক কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য তাহার সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারণ করিয়া আমার ব্যঞ্জন কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল। হঠাৎ পাত্রের উপর তাহার হস্ত পতিত দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি আমাদের বাটীর মধ্যে ছুটিয়া আসিয়াছি। এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।" সেই কথা শুনিয়া তাহার মা বলিল, "কর্ত্তব্য আর কি? বাটীর আর কেহ এই ব্যঞ্জন না খায়, আমি একাই উহা খাইব।"

এই ঘটনা পরিবারস্থ সকলেই জানিতে পারিল এবং ঐ ব্যঞ্জন কেহই আহার করিবে না স্থির হইয়া গেল; কিন্তু মনোরমার মা কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনটুকু নিজেই খাইয়া ফেলিল। খাইতে না খাইতে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। তাহার পেটে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। উদরের কোন কোন স্থান ভয়ঙ্কর শক্ত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটি তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেক ঔষধ প্রদান করা হইল কিন্তু কিছুতেই বেদনার নিবৃত্তি হইল না। "ওঝা" আসিয়া কত "জলপড়া" দিল; 'ঝাড়ন-পড়ন' করিল কিন্তু তাহাতে কোনই ফলোদয় হইল না। পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে

লাগিল। অবশেষে রোগিণী প্রলাপ বকিতে লাগিল। পাঠক পাঠিকা-গণের অবগতির জন্য প্রলাপের কিঞ্চিৎ সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল. "আমাকে ভূত ভাবিয়া ওঝা আনিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিস্? তোরা কখনই পারবিনে। আমি কে জানিস্? আমি বর্ম্মই কুঙ্গী। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্ম্মাদেশ হইতে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমার কঠিন পীড়া হওয়ায় কলিকাতাস্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার কতিপয় ভিক্ষু আমাকে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের হাস্পাতালে রাখিয়া আসেন। আমার তথায় মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমি উদ্ধার চেষ্টায় ফিরিতেছি। কোথায়ও কোন সুবিধা না পাইয়া আজ এই স্ত্রীলোকের উপর আবিষ্ট হইয়াছি। যদি তোরা ভাল চাস তবে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু ডাকিয়া আমাকে নাম (বুদ্ধ নাম) শুনা; এবং তাঁহাদ্বারা জল পড়াইয়া আমাকে খাইতে দে। আরক কি, যাহাতে আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় এমত উপায় বিধান কর্। আমার এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করা নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া একজন প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষু খুঁজিয়া লইয়া আসা হইল, কিন্তু তিনি নিতান্ত বার্দ্ধক্যবশতঃ তথাগতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার হইতে "জল পড়িয়া" আনা হইল এবং তাহা রোগিণীকে খাইতে দিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। পেটের বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইল মাত্র। কিন্তু মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা ও প্রলাপ বচনের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া গৃহকর্ত্তা ৫নং ললিতমোহন দাসের গলিস্থিত ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে যাইয়া যথাবৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণনা করিয়া একজন ভিক্ষুকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাত্রি এগারটা কি সাড়ে এগারটা। অধিক রাত্রি হওয়ায়

তাঁহারা যাইতে অসম্মত হইতেছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন, স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাঁহারা না গেলে কোন মতেই চলিতেছে না, তখন অগত্যা একজন শ্রমণ তথায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই বাটীতে পৌঁছিতে বারটা বাজিয়া গেল। তখনও মেয়েটি পূর্ব্বোক্ত ভাবেই প্রলাপ বকিতেছে। তাহার বেশ নগ্নপ্রায়। শ্রমণ তথায় যাইতে যেন ভুতের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্ব কথিত শ্রমণ কাল বিলম্ব না করিয়া রোগীর সম্মুখীন হইলেন। মেয়েটি তখন বলিতে আরম্ভ করিল, "আমাকে জল পড়িয়া দিন্। তাহাতে আমি ভাল হইব। বুদ্ধদেবের পূজার আয়োজন করা হউক এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের মন্ত্রোচ্চারণ করা হউক।"

তখনই পূজোপকরণের আয়োজন করা হইল এবং যথা বিহিত অর্চ্চনা শেষ করিয়া তারস্বরে সূত্র পাঠ আরম্ভ হইল। তখন মেয়েটি অনেক সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু প্রলাপ বকুনীর বিরাম নাই। মন্ত্রোচ্চারিত "জল পড়া" খাইতে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে পেটের ব্যথার উপশম হইল বটে, কিন্তু একস্থান হইতে স্থানান্তরে বেদনা অনুভূত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। মেয়েটি অমনি বলিয়া উঠিল, "তোমরা মনে করিতেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়া তাড়াইবে। আমি কিছুতেই যাইব না। আমি জীবদ্দশায় বৃথায় সময় কাটাইয়াছি। এখন তাহার ভোগ ভুগিতেছি। যদি আমায় ভাল করিতে চাও, তবে আমার এমতাবস্থায় বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী পাঠ করিয়া শুনাইয়া দাও।" অতঃপর উক্ত শ্রমণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া "দীর্ঘ নীকায়ের" দ্বিতীয় অধ্যায়ে "আটানাটীয় সূত্র" তারস্বরে পাঠ আরম্ভ করিলেন। রোগিণী কোনক্রমেই "আটানাটীয় সূত্র" উচ্চারণ করিবে না। বহুকষ্টে তাহার মুখ দিয়া এই দুরূহ মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি তখন বলিল, "আমি বাঁচিলাম। আমি মুক্ত হইলাম।"

ক্রমে ক্রমে সমগ্র সূত্র গুলি উচ্চারিত হইলে, রোগিণী ব্যাধিমুক্ত হইল এবং তাড়াতাড়ি রমণী-জনসুলভ লজ্জায় গাত্রাদি বস্ত্রাবৃত করিল। তখন তাহার কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া দেখা দিল। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল "তুমি এতক্ষণ কি করিতে ছিলে?" সে বলিল "কেন? ঘুমাইতে ছিলাম।" সে যেন কিছুই জানে না, কেবল তাহার সমস্ত গায়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিল।

তদবধি সেই বাড়ীর যে কোন ব্যক্তির কোন পীড়া হইলে, ধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে "জল পড়া," ও পূজার নির্ম্মাল্য আনিয়া সেবন করিতেছে। তাহারা কোন ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করে না। সেই খৃষ্টীয় পরিবারের এই ঘটনার পর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইতি

শ্রীগণপতি রায়।
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [মাঘ, ১৩১৬।

প্রেতাত্মার ঋণ পরিশোধ।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাপাসে গ্রামে জনৈক মুসলমান বাস করিত। উক্ত পরগণার নাটাগোড় গ্রামে, আমাদিগের বসতবাড়ী নির্ম্মাণ কালে উল্লিখিত মুসলমানটী, রাজমিস্ত্রীদিগকে ইট, চুণ, স্বরকী ইত্যাদি যোগাইবার জন্য, যোগাড়ের বা মজুরের কার্য্য করিত। বাড়ী প্রস্তুত করিতে ৩।৪ মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ইত্যবসারে প্রায় প্রত্যেক লোকের অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী ও মজুরের সহিত আমাদের পিতামহীর, পিতার ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। নির্ম্মাণকারীগণ পিতামহীকে ধর্ম্ম-মা আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন, এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে তাঁহার সম্পর্কানুসারে সম্বোধন করিত; ও তাঁহাদিগকে আপনার মা, ভাই প্রভৃতিদিগকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও মান্য করিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা, মান্য ও ভক্তি করিত। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, একদা ঐ মজুর মুসলমান, তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ, মদীয় পিতামহীর নিকট হইতে দশটি টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। আমাদের বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে পর, নাটাগোড় হইতে কাপাসে গ্রামের দূরাধিক্য বশতঃই হউক, আর স্নেহাধিক্য বশতঃই হউক, আমাদের পিতামহী বা জ্যেষ্ঠতাত, প্রাপ্য টাকার কোনও তাগাদা বা কোনও কথার উল্লেখও

করিতেন না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়া যাওয়াতে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলেও সেই শ্রমজীবীরা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিত এবং পিতামহী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ, ও তাঁহাদিগের যত্নে আপ্যায়িত হইয়া ভোজনাদি কার্য্যও সমাধা করিয়া যাইত।

কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। নদীর প্রবাহের ন্যায় অবিরাম গতিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। জগৎপাতা জগদীশ্বরের এই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে বাঁধা। নিয়মে পালন ও নিয়মে সৃজন তাঁহার অস্তিত্বের একমাত্র পরাকাষ্ঠা। ক্রমে বিশ্বধ্বংশকারী কালের নিয়মে, ঐ মিস্ত্রী ও মজুরেরা একে একে কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এক এক করিয়া সেই সংবাদ আমার পিতামহীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। শ্রমজীবীদিগের সকলেরই জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে পর সুতরাং তাহাদের আসা যাওয়া বা সাক্ষাৎ আদি করা একেবারে বন্ধ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ মদীয় পিতামহীও কালের অপরিহার্য্য নিয়ম পালন করিবার জন্য চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ইনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার পিতাকে তাঁহার দেনা পাওনার বিষয় বলিয়া যাইবার প্রসঙ্গে পূর্ব্বকথিত মু.লমান মজুরের টাকা দশটীর কথাও উল্লেখ করিয়া যান। কিছুকাল পরে পিতামহাশয় ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ও, কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া, কালের কঠিন অঙ্কে শায়িত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মৃত্যুর পূর্ব্বে (বোধ হয় স্মৃতিপথের বহির্ভূত হওয়ায়) এ কথার আভাস মাত্র কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তবে একদা আমার জননী, কথা প্রসঙ্গে পিতার নিকট হইতে একবার মাত্র উল্লিখিত বিষয়, অর্থাৎ আমাদের গৃহ নির্ম্মাণ কালে মিস্ত্রী ও মজুরদিগের সহিত এরূপ আত্মীয়তা ও ঋণ প্রভৃতির বিষয় শুনিয়াছিলেন।

আজ বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। (প্রায় ৪০।৪৫ বৎসরেরও অধিক হইবে।) হঠাৎ—অনুমানিক ৪০ বৎসর বয়স্ক—এক মুসলমান আমদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। যেন কত পরিচিতের ন্যায় একবারে গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান। তখন আমাদের বাড়ীর পুরুষদিগের মধ্যে কেহই বাড়ীতে ছিলেন না। আগন্তুককে এরূপ ভাবে আসিতে দেখিয়া পুরবাসিনীরা প্রথমে বড়ই ভয়বিহ্বলা হইয়াছিলেন। মা তাহার এরূপ আচরণে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে গা, কোথা থেকে এসেছ, ভদ্রলোকের বাড়ী কি এরূপভাবে ঢুকতে আছে ?" ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিতে সে একেবারে গণ্ডপ্লাবিত করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—'আমার বাবা আপনাদের বাড়ী তৈয়ারী করবার সময় আপনার শাশুড়ীর নিকট দশ টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি এ সম্বন্ধে আমায় কিছুমাত্র বলিয়া যান নাই। আজ প্রায় ৩।৪ বছর হইতে তিনি ক্রমাগত আমাকে স্বপ্নে তাঁহার ঋণ পরিশোধের কথা, এবং এই ঋণ শোধ না হইলে তিনি উদ্ধার হইতেছেন না ও দুর্বিসহ পীড়নে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, এই সব কথা, প্রায় প্রত্যহ বলেন। আমি যখন তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে—"আমি ত তাঁহাদের বাড়ী চিনিনা, এবং তাঁহাদেরও চিনি না, তবে কি রকমে তাঁহাদের অনুসন্ধান পাইব ?" উত্তরে তিনি আপনাদের গ্রামের নাম, আপনাদের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ধারে যে তেঁতুল গাছ আছে তাহা, এবং আপনি বর্ত্তমান আছেন ও এ বিষয় শুনিয়াছেন, এই সকল বলিয়াছিলেন। প্রথমে এই স্বপ্ন আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু যখন প্রায় প্রত্যহই এরূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম এবং তিনি যখন ভয়ানক কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার ও তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাতের কথা বলিতে লাগিলেন, আমি আপনাদের সন্ধানে বাহির হই।

প্রথম দিনে কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, আমাকে নিতান্ত ভগ্ন মনে ফিরিতে হইয়াছিল। পরে আবার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া আপনাদের আজ সন্ধান পাইলাম। অতএব, দয়া করিয়া আমার পিতার উদ্ধারের জন্য, আমি যখন যাহা দিতে পারিব, তাহাই লইতে হইবে।' এই বলিয়াই ২॥০ টাকা মার নিকট মাটিতে রাখিয়া তাঁহার পদতল স্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ হইল। মা স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং মুসলমান স্পর্শ করিলে পুনরায় স্নান করিতে হইবে বলিয়া, পশ্চাৎপদে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের প্রতি স্থির নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি মনে করিলেন, হয়ত কোন জুয়াচোর বা বদমায়েস, কোন কু-অভিসন্ধি বশতঃ এরূপ করিতেছে। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসাদি করিয়া অবগত হইলেন যে, তাহার পিতা আমাদের গৃহ-নির্ম্মাণ কালে মজুর বা যোগাড়ের কার্য্য করিত, ও সেই সময় ৩০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল,—ইহাও তাহার পিতা তাহাকে স্বপ্নে বলিয়াছে,—তখন তাঁহার মনে সেই পুরাতন কথা,—যাহা তিনি পিতার নিকট হইতে কথা প্রসঙ্গে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তাহা—ক্রমশঃ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। তখন তাঁহার ভয় বিদূরিত হইল, এবং তিনি যে এ বিষয় শুনিয়াছিলেন তাহাও তাহাকে বলিলেন।

আমরা এই সকল কথা প্রথমে মার নিকট হইতে শুনিয়া তাহাকে জুয়াচোর, বদমায়েস্, নেশাখোর ও তন্দ্রাবেশে সে খেয়াল দেখিয়াছে ইত্যাদি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যখন মা——উক্ত ব্যাপার সংক্রান্ত পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সমূহ আমাদের জ্ঞাপন করিলেন, তখন আমাদের আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না; বরং বিস্ময়াভিভূত হইলাম। অধিকন্তু,

আমরা একজন নিরীহ লোককে অযথা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলাম।

প্রায় দুই মাস কাল অতীত হইল, পুনরায় সেই মুসলমান তাহার পিতার ঋণ পরিশোধের জন্য ২॥০ টাকা দিতে আসিয়াছিল। মাতার নিকট অনেক কান্নাকাটি করিয়া তাহাকে অবশিষ্টের জন্য অব্যাহতি দিতে বলিয়াছিল এবং "আমি আর টাকা চাহিনা, তোমাকে সন্তুষ্ট চিত্তে অব্যাহতি দিলাম ও তোমার পিতা আজ আমাদের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হইল" প্রভৃতি কথা, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, মার মুখ হইতে বলাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—প্রেতাত্মা ও পরলোক বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং এতদ্ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ কিছুতেই হইতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের ন্যায় এ ঘটনা নিঃসংশয়িত ভাবে সত্য।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রত্যাদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১। মার্কিন মহিলার আত্ম-বৃত্তান্ত।

হাড্‌সেল (Hadselle) নামে এক মার্কিন রমণী তাঁহার জীবনে দুইবার প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। উহার বিবরণ তিনি মনস্তত্ত্ব-অনুসন্ধান সমিতির (Psychical Research Societyর) নিকট এই-রূপে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

প্রথম ঘটনা।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে একদিন বৈকালে আমরা কয়েকজন মিলিয়া এক বন্ধুর বাটিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাই। আমাদের বাটী হইতে বন্ধুর বাটী ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। রাত্রিতে আহারের পর গান বাজনা হইবে এইরূপ কথা থাকায় আমি পরদিন বাটী ফিরিব এইপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদে যোগ দিলাম। আমাদের মধ্যে নানারূপ হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, আনন্দের ফোয়ারা উঠিল। পঁহুছিবার কিছু পরেই বন্ধু আমাদের জন্য চা আনিলেন। কিন্তু একি! হঠাৎ আমার এক বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল! তৎক্ষণাৎ বাটী যাইবার জন্য আমার একটা প্রবল দুর্দ্দমনীয় বাসনা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল যেন কিছু একটা অমঙ্গল ঘটিয়াছে বা ঘটিবে। কিন্তু কি অমঙ্গল তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমার বাটীর এক অংশ, এক ভদ্র পরিবারকে ভাড়া দিয়াছিলাম। তাঁহারা বহুকাল থাকায়, তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা এক পরিবারের ন্যায়ই ছিলাম। আমার এডি নামে দশ বৎসরের একমাত্র পুত্র ছিল। যখনই কোন কার্য্যানুরোধে আমাকে ২।১ দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইত, আমি তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ভাড়াটিয়াদিগের নিকট, রাখিয়া যাইতাম, কারণ তাহারা তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ যত্ন করিত। এবারেও তাহাই করিয়াছিলাম। সুতরাং এডির যে কোন বিপদ ঘটিবে, যুক্তি ও বিচারে তাহা পাইলাম না, অথচ তাহারই কোন অমঙ্গল হইয়াছে এইরূপ একটী আশঙ্কা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

আমি বাটী যাইবার জন্য উঠিলাম। ইহাতে সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত,

ও অবাক্ হইল। আমার মনের অবস্থা সব বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "উহা কিছুই নয়, একটা কল্পনামাত্র, গান শুনিলেই সব সারিয়া যাইবে? কিছু খান্"। এই বলিয়া তাঁহারা চা এবং কিছু খাদ্য আমাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার হাত কাঁপিতেছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। ইহা দেখিয়া আমার বন্ধু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "শীঘ্র গাড়ী আনিতে বল। আমি ইহাঁকে এখনই লইয়া যাইব। নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে।" অবিলম্বে গাড়ী আসিল। বন্ধু ও আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী তীর-বেগে ছুটিল।

গাড়ী পৌছিবামাত্র আমরা ছুটিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং ভাড়াটিয়াকে বলিলাম "এডি কোথায়? এডি?" তিনি আমাদের ব্যস্ততা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "এই যে এডি এইমাত্র ছিল, চা ও খাবার খাইয়া বোধ হয় ঐ দিকে গিয়াছে।" তাঁহার নির্দ্দেশিত দিকে বন্ধু ছুটিলেন, কিন্তু এডি সেখানে নাই। কোথায় গেল? উন্মত্তের ন্যায় আমরা এডির ঘরের দিকে ছুটিলাম। দেখি যে, ঘরের দরজা বন্ধ। ইহার কারণ কি? তবে কি এডি ঘরের মধ্যেই আছে? "এডি, এডি!" কোনও উত্তর নাই। বন্ধু তাড়াতাড়ি ঐ ঘরের একটি জানালার নিকট গেলেন। ঐ জানালাটি ভাঙ্গা ছিল, সুতরাং বাহির হইতে খোলা যাইত এবং রেলিং না থাকায় তদ্বারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা যাইত। বন্ধু ঘরের মধ্যে এক বার ঢুকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধোঁয়ায় উহা এরূপ পূর্ণ ছিল যে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় তিনি স্বীয় জীবন উপেক্ষা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনেক কষ্টে হাতড়াইয়া মূর্চ্ছিত বালককে বাহিরে আনিলেন। শীতল জলের ছিটা দিয়া

তাহার চৈতন্য সম্পাদন করা হইল। বালক বলিল "সন্ধ্যার পর আহার করিয়া একবার ঘরে আসিলাম। ঘরে অগ্নি থাকায় ঘরটি বেশ গরম বোধ হইল। পরদিনের জন্য যে কাষ্ঠগুলি আনিয়াছিলাম তাহা ভিজা থাকায় উনানের ধারে সে গুলিকে শুষ্ক করিতে দিয়া শয্যায় একটু শয়ন করিলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছে কিছুই জানিনা।" অবশ্য পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বুঝা কঠিন নহে। বালক শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কাঠগুলি শুকাইতে দিয়াছিল তাহাতে কোনরূপে আগুন লাগিয়া যায়; কিন্তু ভিজা বলিয়া সেগুলি জ্বলে নাই, ক্রমাগত ধূম ত্যাগ করে। নিদ্রিত বালক নিশ্বাসের সহিত এই ধূম টানিতে টানিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যখন তাহাকে বাহিরে তুলিয়া আনা হইল তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে আর ৩।৪ মিনিট সেই অবস্থায় থাকিলে তাহার প্রাণবিয়োগ হইত।*

দ্বিতীয় ঘটনা।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে একদিন আমি নিউইয়র্ক হইতে উইলিয়ামস্ টাউনে যাইতেছিলাম। টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে বসিয়াছি, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, বোধ হয় কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। এমন সময়ে কে যেন আমার মনের মধ্যে বলিতে লাগিল "শীঘ্র টিকিট পরিবর্ত্তন কর এবং এলিজাবেথের নিকট যাও, টিকিট পরিবর্ত্তন কর এবং এলিজাবেথের নিকট যাও"—বারবার এই আদেশ এত জোরে—এত তেজে হইতে লাগিল যে আমি

* ইহাকে ঠিক প্রত্যাদেশ না বলিয়া ভীষণ চিত্তবিকার বলা যাইতে পারে। কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। মাতার Ego বা জীবাত্মা (অথবা কোন দেবতা বা মহাপুরুষ) পুত্রের আসন্ন বিপদ বুঝিয়া তাহার জীবনরক্ষার্থ মাতার মনে এই ভাবান্তর আনিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তিনি ঠিক কে তাহা বলা কঠিন। সম্পাদক

কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। আমার এই ভাব দেখিয়া সমীপস্থ এক ভদ্রলোক চমকিত হইয়া বলিলেন "আপনি কোন জিনিষ ভুলিয়া আসিয়াছেন কি?" আমি বলিলাম "মহাশয় ট্রেন আর কতক্ষণ থাকিবে, বলিতে পারেন? আমি টিকিট পরিবর্ত্তন করিবার সময় পাইব কিনা?" এই বলিতে বলিতে আমি যেন একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্লাটফর্ম্মের উপর লাফাইয়া পড়িলাম এবং তাড়াতাড়ি টিকিট ঘরের দিকে ছুটিলাম।

২।১ মিনিটের মধ্যেই টিকিট বদ্‌লাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভাবিতে লাগিলাম, "একি হইল? আমি কোথায় যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম এবং কোথায় বা যাইতেছি? কেন এরূপ হইল?" এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এলিজাবেথ নামে আমার এক বন্ধু তৎকালে বহুশত মাইল দূরে বাস করিতেছিলেন। অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভগিনীর অসুখের কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অসুখ অতি সামান্য, সুতরাং সে কথা আমার মনেই ছিল না এবং এলিজাবেথের কথাও আমি বহুদিবস ভাবি নাই। সে যাহা হউক পরদিন প্রাতে তাঁহাদের বাটী পঁহুছিলাম। এলিজাবেথ আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল "তুমি এসেছ? তোমাকে যে কত ডেকেছি তা আর কি বলিব? তোমার ঠিকানা জানিতাম না, কাজেই দুদিন ধ'রে সর্ব্বদা ভাবিয়াছি, 'আহা তুমি যদি এখন একবার আসিতে'। আমার ভগিনীর শেষ অবস্থা।" এই বলিয়া সে আমাকে ভগিনীর নিকট লইয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ফুরাইল—ভগিনী ইহধাম ত্যাগ করিল।

২। সহস্রাধিক ট্রেনযাত্রীর জীবন রক্ষা।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমেরিকায় এই ঘটনাটি ঘটে।

সহস্র সহস্র যাত্রীপূর্ণ একখানি রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে সিকাগো নগরের দিকে ছুটিতেছিল। যখন রাত্রি প্রায় সাড়ে চারিটা তখন উহা একটি লবণ হ্রদের নিকটবর্ত্তী হইল। হ্রদের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত দীর্ঘ সেতু এবং সেতুর উপর দিয়া রেলরাস্তা গিয়াছিল। গাড়ীখানি সেতুর নিকটে আসিবামাত্র ইঞ্জিন-চালক মোসেসের বোধ হইল যেন কি একটা অব্যক্ত শক্তি গাড়ীখানা থামাইতে তাহাকে বাধ্য করিতেছে। তিনি গাড়ী থামাইলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারী তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সন্তোষজনক. কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল এই বলিলেন, "কে যেন আমাকে থামাইতে বলিল।" অতঃপর তিনি ২।১ জনকে সঙ্গে লইয়া সেতুটি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর গিয়াই যাহা দেখিলেন তাহাতে চক্ষু স্থির হইল। দেখিলেন আগুন লাগিয়া সেতুর কাঠগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, স্থানে স্থানে তখনও অগ্নি জ্বলিতেছে এবং রেলের লোহাগুলি শূন্যে ঝুলিতেছে। ইঞ্জিন-চালক মোসেস্ স্বয়ং লিখিতেছেন "গাড়ী থামাইতে আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলাম। যদি এই প্রত্যাদেশ না মানিতাম তাঁহা হইলে যে কি ভীষণ দুর্ঘটনা হইত বলা যায় না, হয়ত ট্রেনখানি চূর্ণ হইয়া যাইত এবং সহস্র জীবন বিনষ্ট হইত। আমি প্রেতবাদী (Spiritualist) নহি, তথাপি মৃত আত্মীয়গণ যে কখনো কখনো আসিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা ও সতর্কতা দান করেন ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

৩। অগ্নি হইতে রক্ষা।

এক ইংরাজমহিলা লিখিয়াছেন ঃ—নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। শীতের ছুটিতে বাটী আসিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমার একটি ছুঁচ খুঁজিতে

উপরতালায় গেলাম। উহা না পাইয়া, কোথায় রাখিলাম ভাবিতেছি, এমন সময় বোধ হইল যেন একটা অনিবার্য্য শক্তি আমাকে নীচের তালার দিকে টানিতেছে এবং ঠিক সেই সময়ে একটা অগ্নিশিখা যেন সম্মুখে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে বোধ হইল। "একি! আমার মস্তিষ্কের কোন বিকার হইল কি?" ইহা ভাবিতেছি এমন সময় সেই অগ্নিশিখা আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু নীচে আসিবার প্রবৃত্তি পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিল। সেই অব্যক্ত শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া আমি রান্নাঘরে আসিলাম। তখন একটু চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলাম এখানে আসিলাম কেন? তখন আবার সেই অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম, এবং রান্নাঘরের পার্শ্বের ঘরে আকৃষ্ট হইলাম। ঐ ঘরে ময়লা কাপড় চোপড় থাকিত। সে যাহা হউক দরজা খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে দীপাধারটি কতকগুলি কাপড়ের উপর পড়াতে কাপড়গুলো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি আগুন নিবাইয়া ফেলিলাম এবং বাটীর সকলকে ডাকিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিলাম। বোধ হয় আমার আসিতে আর ২।১ মিনিট বিলম্ব হইলে ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি ধরিয়া গিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উৎপাদন করিত।

৪। অদ্ভুত জীবন রক্ষা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর তারিখে ওয়েট সাহেব সিকাগো নগর হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল একদিন রাত্রিকালে আমি জাহাজ হইতে "ষ্টীল ওয়াটার" (Still Water) নামক ডকে অবতরণ করি। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যায় না। সে যাহা হউক আমি ডকের কাষ্ঠের

সেতুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তাহার উপর দিয়া পূর্ব্বে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। সুতরাং রাস্তাটি কতক পরিমাণে পরিচিত ছিল। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে কে যেন তারস্বরে আমাকে বলিয়া দিল, "আর অগ্রসর হইও না, ফের।" আমি স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম এ রাস্তায় ত বহুবার গিয়াছি, কখন ত বিপদ আপদ ঘটে নাই। তবে আজ হঠাৎ এরূপ মনে হইল কেন। সে যাহা হউক সে পথে আর অগ্রসর না হইরা অন্য রাস্তা দিয়া বাসায় যাইলাম। ইহাতে আমাকে প্রায় এক মাইল অধিক ঘুরিতে হইল। পরদিন প্রাতে কোন কার্য্যোপলক্ষে ডকে আসিতে হইল। কৌতূহল হওয়াতে যে স্থান হইতে পূর্ব্ব-রাত্রে ফিরিয়াছিলাম সেই স্থানটি পরীক্ষা করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে চিত্ত, ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইল। দেখি সেই স্থানে সেতুর প্রায় ৮।১০ হাত ব্যবধান কাঠ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। জাহাজ হইতে গুদাম ঘরে মাল তুলিবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছিল। আমি যদি আর ২।৪ পদ অগ্রসর হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই গভীর রজনীতে নদীতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতাম। কিন্তু সেই অদ্ভুত প্রত্যাদেশই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

৫। ডাক্তারের বিপত্তি।

ডাক্তার পারসনস্ এম্ ডি, ১৭৯১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন :—

চারি বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রে আহারের পর একবার ডাক্তারখানায় যাইবার প্রয়োজন হইল। পুস্তকাদি দেখিয়া একটি রোগীকে ব্যবস্থা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। একাকী না গিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে

লইলাম। কিন্তু যেমন ঐ বাড়ীর দরজায় নিকট আসিয়াছি, কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে আর এক পদও অগ্রসর হইতে দিল না, আমার যেন চোখে ধাঁধাঁ লাগিল, বোধ হইল হাত পা যেন বাঁধা, আর অগ্রসর হইবার যো নাই। কিছুক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া ভাইপোকে বলিলাম "জন, তুই ঘরের মধ্যে গিয়া অমুক অমুক পুস্তকগুলি পড়িয়া (Consult করিয়া) আইস, আমি যাইতে পারিতেছি না।" সে ঘরে ঢুকিল, আলো জ্বালিল, টুপিটি খুলিয়া রাখিল; তৎপরে যেমন হাত বাড়াইয়া একখানি বই পাড়িতেছিল, অমনি একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং বোঁ করিয়া গুলি ঠিক তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার চেয়ে কিছু লম্বা, সুতরাং আমি যদি তাহার স্থানে থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ গুলি আমার মস্তক ভেদ করিয়া যাইত। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এক ব্যক্তির সহিত আমার শত্রুতা ছিল এবং সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী বাটিতে লুক্কায়িত ছিল। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে কোন দৈবশক্তি সেদিন আমাকে বাঁচাইয়াছে।

৬। অদৃশ্য হস্ত।

ইলিয়ট্ নাম্নী এক রমণী লিখিয়াছেন, "প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি কতকগুলি পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হই। উহাদের একখানির মধ্যে ১৫ পাউণ্ডের (২২৫ টাকার) নোট ছিল। পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমি কোন কার্য্যানুরোধে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলাম। তখন ঐ পত্রাদি আমার হাতেই ছিল। পত্রগুলি দক্ষিণ হস্তে এবং নোটগুলি বামহস্তে ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল—ঠিক বিপরীত, ভাবিয়াছিলাম বামহস্তে পত্র এবং দক্ষিণ হস্তে নোট আছে। পাঠান্তে পত্রগুলির প্রয়োজন না থাকায় আমি উহাদিগকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিবার সংকল্প করিলাম। এই অভি-

প্রায়ে বাম হস্তটি উনানের নিকট লইয়া গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার স্পষ্ট বোধ হইল যেন একখানি অদৃশ্য হস্ত আমার বাম হস্তকে ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে টানিতেছে,—কিছুতেই উহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না। তখন আমার কাগজগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িল—দেখিলাম যাহাকে আমি নিষ্প্রয়োজনীয় চিঠি ভাবিয়া আগুনে ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা চিঠি নহে,—মূল্যবান্ নোট।"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা দর্শন।

ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী বঙ্গদেশের মধ্যে একটী সুপরিচিত গ্রাম। সদাচার শাস্ত্ররত ঋষিকল্প ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গ্রামকে বরাবর সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পার্শ্ব দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথী কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে। বিদেশী ভাবে বিভোর, বিদেশীয় আচারে কলুষিত বঙ্গদেশের অধিকাংশ জনপদের মধ্যে ভট্টপল্লী নিজ পুণ্যবলে এখনও পুরাতন পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের স্মৃতি কিয়দংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সে আজ ১১ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই গ্রামে কাশীপতি ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি অল্প বয়সেই সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবও যেমন নম্র ও ধীর ছিল, শাস্ত্রবুদ্ধিও তেমনি প্রখরা ছিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সেই ব্রাহ্মণ যুবকের অঙ্গে কি যেন এক দিব্যভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার বয়স ২২ কি ২৩ বৎসর। সবে মাত্র এক বৎসর হইল, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ঐ

ভাটপাড়াতেই তাঁহার শ্বশুরালয়। শ্বশুর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরুলিয়ায় চাকুরী করিতেন, কালে ভদ্রে ভাটপাড়ার বাড়ীতে আগমন করিতেন; তবে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই ভাটপাড়ায় থাকিতেন। তাঁহাদের গোষ্ঠীবর্গ একত্র ভাটপাড়ার যে অংশে বাস করিতেন তাহা উদ্যানময় ছিল বলিয়া, "বাগানে বাড়ী" নামে আখ্যাত ছিল।

ঐ বাগানে বাড়ীতে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে ৺রক্ষাকালী পূজা হইত। ঐ পূজা উপলক্ষে এক মহাধূম পড়িয়া যাইত। নিকটেই কয়েক ঘর গোয়ালা ও বাগ্দী বাস করিত, তাহারাও উল্লাসে ৺মাতৃপূজায় যোগদান করিত এবং নানাপ্রকার আমোদে সেরাত্রি অতিবাহিত করিত।

রেল কোম্পানির অনুগ্রহে পল্লীর সে অংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাগানে বাড়ীর গোষ্ঠী গ্রামের এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্বপরিচায়ক-স্বরূপ নামেমাত্র পর্য্যবসিত "বাগানে বাড়ী" আখ্যাটী এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। আর যে গোয়ালা ও বাগ্দীদিগের বসতি ছিল, তাহাও নিষাদতাড়িত বিহগশ্রেণীর মত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

তখন অবশ্য "বাগানে বাড়ী"র উপর রেল কোম্পানির কুনজর পড়ে নাই। অগ্রহায়ণ মাস, অমাবস্যা তিথি। নিবিড় অন্ধকার, শীতও অল্প নহে। বাগানে বাড়ীতে ধূমধামের সহিত ৺রক্ষাকালী পূজা হইতেছে। নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঢক্কার কর্ণভেদী ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। মাতৃ-প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণের আনন্দকোলাহলে পল্লীর অংশটী সম্যক মুখরিত। ভাটপাড়ার অন্য পল্লীতে "বাগানে বাড়ী"র গোষ্ঠীর যে সকল কুটুম্ব ছিলেন, তাঁহাদের আজ নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জামাতা কাশীপতিরও নিমন্ত্রণ বাদ যায় নাই। তিনিও নিমন্ত্রণরক্ষার্থ আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ

নহে, ১০।১২ দিন জ্বর ভোগের পর দুদিন অন্নপথ্য করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যখন শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তখন কিছু মিষ্টমুখ না করিয়া গেলে ত ছাড়ান নাই? তাই সকাল সকাল কিছু আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

৺মায়ের ভোগের অপেক্ষা করিতে গেলে অনেক রাত্রি হইয়া পড়ে। এত রাত্রি করিলে রুগ্নদেহে বিলক্ষণ কুপথ্যের সম্ভাবনা। সেই জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এইটী সার বুঝিয়া, আর বিশ্বজননীর অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া কাশীপতি মায়ের ভোগের আগেই ভোজন করিতে চাহিলেন। শ্বশ্রূমণ্ডল জামাতার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। জামাতা আহারান্তে বাটী ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু সন্তানের এ অপরাধ বুঝি ৺মায়ের সহ্য হইল না। বাটীতে আসিয়াই কাশীপতির ভেদবমি হইল। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই নাড়ী ছাড়িয়া গেল। বুঝি হতভাগ্য আর বাঁচিল না। ডাক্তার ডাকা হইল। যাহাকে কালে টানিয়াছে, ডাক্তারে তাহার কি করিতে পারে? অশ্রুসিক্ত নয়নে জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি যাতনা তোমার?"

অতিক্ষীণ অস্ফুটস্বরে মৃত্যুশয্যায় শয়ান সন্তান মায়ের হাত ধরিয়া বলিল,—"মা, চরণধূলা দাও, আমি আর বাঁচিব না। কিন্তু যাহার সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেছি সেই হতভাগিনীকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাই।"

হায়! হতভাগিনী তখন কোথায়? সেই সুদূর জনকের কর্ম্মস্থানে কি বিপদ ঘটিতেছে তাহা স্বপ্নেও না ভাবিয়া নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িতা। আর মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির কাশীপতিও উৎকট কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিল না যে বহুক্রোশব্যবধানে যে প্রাণের পুতলী রহিয়াছে, তাহার সহিত সেই মুহূর্ত্তে দেখা হওয়া অসম্ভব, বুঝিল না তাহার যবনিকাপাতের পূর্ব্বে পত্নীসহ মিলন বিধিনির্ব্বন্ধ নহে।

জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাছা, অমন কথা মুখে আনিস্‌নে, মা তোকে রক্ষা করিবেন।"

"না মা, আমি"—বলিতে বলিতে সন্তানের চক্ষু, ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, দেহ অসাড় হইল। সন্তান স্নেহময় জনকজননীর মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, চলিয়া গেল। যে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া পূজাক্ষেত্রে আনন্দকোলাহল উঠিয়াছিল, সেই নৈশ গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কাতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ৺মায়ের ইচ্ছা, ৺মাই জানেন!

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহা অবশ্য সুদূর কর্ম্মস্থান-স্থিত কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারের চিন্তারও অতীত। কিন্তু সেই অমাবস্যা রাত্রের শেষভাগে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নী কোনও প্রয়োজনে গৃহের বাহির হইতে যাইয়া দেখিলেন,—শুভ্রোপবীতধারী তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ জামাতা দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহাদের গৃহ পানে চাহিয়া আছেন। তিনি ভীতিবিহ্বলা হইয়া নিঃশব্দে স্বামীর নিকট আগমন করতঃ ব্যাপারটী জ্ঞাপিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই তখন দ্বারদেশের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, দূরে সুস্পষ্ট জামাতৃমূর্ত্তি! দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা ভয়ে, বিস্ময়ে, কোনও আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া অনিদ্রায় রাত্রিপাত করিলেন। প্রাতঃকালেই ভাটপাড়া হইতে টেলিগ্রাম গেল,—কাশীপতি আর নাই!

কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী রাত্রিকালে যে মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহা মৃত কাশীপতিরই প্রেতাত্মা। তিনি মৃত্যুকালে যে উৎকট পত্নীদর্শনকামনা পোষণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহার প্রেতাত্মা সে কামনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছিল।

শ্রীভবভূতি ভট্টাচার্য্য
ভাটপাড়া।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মৃত ব্যক্তির পরকায় প্রবেশ।

স্বামীজী লিখিতেছেন ;—

"একদিন পরম শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব, জগন্নাথ দাস বাবাজীর মুমূর্ষু সময়ের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহার ভজন কুটীরে যাই। দেখিলাম, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন। লোকে ডাকিলেও উত্তর দেন না, অথচ বেশ কৃষ্ণনাম করিতেছেন। আমি যাইয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তাঁহার শিষ্যগণ "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ,—হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধে গোবিন্দ", এই নাম পুনঃ পুনঃ শুনাইতেছেন। আমি চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলাম,—দেখিলাম, গৌরবর্ণ একটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি ক্রোড়ে।

সেদিন একটি ব্রাহ্মণের বাটীতে আমার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ থাকায়, বেলা অধিক হওয়া বশতঃ পাছে তাঁহারা সপরিবারে আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হন এই আশঙ্কায় আমাকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে হইল। বস্তুতঃ যাইয়া দেখিলাম, তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আহার করিয়া জ্ঞান ও সত্য নামক দুইটি পরিচিত বালককে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ভজন কুটীরে যাইয়া দেখি, তাঁহাকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। শ্মশানে যাইয়া তাঁহার চিতা প্রদক্ষিণ করিলাম, জনৈক শিষ্য তাঁহার দেহাবশেষ গঙ্গায় দিতে গেলেন, আমিও সঙ্গে যাই, ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল।

বাবাজীকে যখন ভজন কুটীরে দর্শন করি তখন প্রাণে প্রাণে কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি যেন বলিতেছেন "আমি তোমার শরীরে প্রবেশ করিব।" সেই রাত্রে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছি এমন সময়ে দেখিলাম একখণ্ড মেঘ সম্মুখে আসিল, তাহার ভিতর জগন্নাথ দাস বাবাজীর মনুষ্যরূপ! উক্তরূপ অকস্মাৎ আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও আমাতে লীন হইয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে বাবাজীর একটি শিষ্যের প্রমুখাৎ শুনিলাম, বাবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি-শ্রীবাস ও গদাধরের আঙ্গিনায় অর্দ্ধেক অংশে থাকিবেন ও অর্দ্ধাংশে অনঙ্গমঞ্জরীর শরীরে মিশাইবেন।"

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, স্বামীজীর মধুর ভাবে ভগবদারাধনা করা কালের নাম "অনঙ্গমঞ্জরী।" অর্থাৎ এই ভাব পাইয়াই তিনি মধুরভাবে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি অদ্ভুত মৃত্যু ঘটনা।

কমলমণি তিন বৎসরের শিশু কন্যা। কন্যাটি একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ বাতায়নের জানালার উপর উপবেশন করিয়া আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে। প্রকোষ্ঠটীর উত্তর দক্ষিণে বায়ু গতায়াতের পথ উন্মুক্ত। উত্তর দিকে দুইটি দ্বার ও দক্ষিণ দিকে দুইটি জানালা। প্রকোষ্ঠটীর দ্বারদ্বয় ও জানালাদ্বয় সমস্তই উন্মুক্ত ছিল। গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যার কিছু প্রাক্কাল, বেলা তখন ছয় ঘটিকা।

গৃহাভ্যন্তরে অপর একটি তিন বৎসর বয়স্ক রুগ্ন শিশু কন্যা শয়ন করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করিতেছে; কন্যাটির নাম হিরণকুমারী।

গৃহমধ্যস্থ সকলেই হিরণ কুমারীর মুখ প্রতি স্থির সজলনেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছে; যেন সকলেই বালিকার সেই ক্ষুদ্র প্রাণটির আশা পরিত্যাগ করতঃ তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে একটু একটু জল তাহার মুখমধ্যে সিঞ্চন করিতেছে। এমন সময় কমলমণি তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া জানালার বহির্ভাগের অনতিদুরের একটি নিম্ব-বৃক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তস্থিত অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আধ আধ স্বরে বলিয়া উঠিল। "মা! দেখ, দেখ, ঐ গাছের উপল, হিলণ পা ডুলিয়ে বসে লয়েচে, হিলণ আঙা কাপল পলেচে।"

কমলমণি এই অভাবনীয় দৃশ্যটি অত্যাশ্চর্য্য ভাবে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে কমলমণির মাতা জানালার সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া, দর্শন করিলেন যে, সত্যই হিরণ একখানি লোহিতবর্ণের কাপড় পরিধান পূর্ব্বক নিম্ববৃক্ষের উপর উপবেশন করিয়া, পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

অনতিবিলম্বেই হিরণের প্রাণবায়ু স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, শব দেহ পড়িয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যস্থ সকলেই উচ্চৈস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠিল, বাটীর সকলেই ক্রন্দনের রোল তুলিল।

এ ঘটনাটি আজ প্রায় ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কমলমণির এক্ষণে সন্তানবতী ও শশুরালয়ে অবস্থান করিতেছে। তাহার মাতা প্রায় তিন বৎসর গত হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উক্ত ঘটনাটি আমাদের বাটিতেই ঘটিয়াছিল; আমরা এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া জানি। তজ্জন্য অলৌকিক রহস্যে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভূতাবেশ।

পরম প্রেমাস্পদ,

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক,

মহাশয় সমীপেষু।—

সবিনয় নিবেদনমেতৎ

আপনারা সকলেই ভূতপ্রেত লইয়া খেলা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমিও একটী ভূতাবেশের কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি, সেজন্য আমার চাঞ্চল্য ক্ষমা করিবেন। এই ঘটনাটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, আমার বয়স যখন ৬।৭ বৎসর সেই সময় আমার একজন আত্মীয়া পিতামহী-সম্পর্কের স্ত্রীলোকের নিকট শ্রবণ করিয়া ছিলাম। এতদিনের কথা মনে থাকিবার না হইলেও, ঘটনাটি সম্পূর্ণ অলৌকিক এবং তিনি তৎকালে যে ভাবে এই গল্পটীর উপন্যাস করিয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সত্য ঘটনারই উল্লেখ করিতেছেন, এবং উহা তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা, এইরূপ ভাবেই বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বর্ণিত বিবরণটী অদ্যাপি মনের মধ্যে ঠিক ঠিক অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমার ঐ পিতামহী ঠাকুরাণী অবীরা ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ছিল, কাজেই তাঁহার নিজেই ঐ সকল শিষ্যের বাড়ী ভ্রমণ করিতে হইত। ঘটনাটী যশোহর জেলায় কোনও পল্লীগ্রামে ঘটিয়াছিল। গ্রামের নাম আমার ঠিক মনে নাই। ঐ গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশে পার্ব্বতী নামক একমাত্র ২০।২২ বৎসরের বালক, বংশধররূপে বিদ্যমান ছিল, আর কতকগুলি বিধবা স্ত্রীলোক বর্ত্তমান ছিল; তবে নিকটবর্ত্তী আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেকেই ছিল। পার্ব্বতীর অল্প

বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। তাহার সহধর্ম্মিণীরও তৎকালে পূর্ণযৌবন হইয়াছিল। এই সময়ে পার্ব্বতী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। প্রায় দুই বৎসর কালের অধিক ভুগিতে থাকে, পেটের মধ্যে প্লীহা, যকৃতি প্রভৃতি যতপ্রকার রোগ হইবার, তাহা হইয়াছিল; কাজেই জ্বরপ্রভাবে হাত পা কঞ্চির মত সরু হইয়া গেলেও পেটটী বিলক্ষণ মোটা হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে গ্রামস্থ বৈদ্যের ঔষধ ও পল্লীগ্রামে প্রচলিত টোট্‌কা টাট্‌কী সেবন করিবার পর, কোনও মতে পীড়ার শান্তি না হওয়ায়,সাপর্দ্দীর মালা, ৺ তারকেশ্বরের দ্রাড়ি ধারণ প্রভৃতি, কিছুরই ক্রটী করা হয় নাই। তবে সে সময় "ডিঃ গুপ্ত", "সুধাসিন্ধু" প্রভৃতির আবির্ভাব না হওয়ায় উহা-দিগের পরীক্ষা করার সুযোগ হয় নাই। এই রকমে সময় কাটাইতে কাটাইতে পার্ব্বতী, একদিন সহসা বন্ধুবান্ধবকে অকুল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, ইহলোক ত্যাগ করিল। পার্ব্বতীর আত্মীয়গণ আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া, হিন্দুর গৃহে মৃতব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রীতির পাত্র থাকিলেও, তাহার শবদেহত সেরূপ প্রীতির পাত্র হয় না, বরং উহার সদ্গতিই সমুদয় পরিবারবর্গের প্রার্থনীয় হয়, এইজন্য অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া যথা-সময়ে গঙ্গাতীরে দাহ এবং অস্থিক্ষেপ করিবার জন্য উহা তৎপরদিন অতি প্রত্যূষেই রওনা করিয়া দিলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণ ঐ শবদেহ বহন করিয়া আনিতে আনিতে, অপরাহ্নে পথশ্রান্তে ক্লান্তিবোধ করিয়া, উহাকে পথিপার্শ্বস্থিত একটী অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় স্থাপন করিয়া আপনারা তামাকু সেবন ও পরস্পর গল্পগাছা করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইল। প্রায় দুইঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর, সন্ধ্যার অন্ধকারে পথঘাট সম্পূর্ণরূপ আবৃত হইলে, তাহারা রীতিমত আলোক জ্বালিয়া আবার শবদেহের বহন করিবার অভিপ্রায়ে উহার নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা একেবারে বিস্ময় ও আনন্দে

অভিভূত হইয়া পড়িল। দেখিল পার্ব্বতীর মুদ্রিত চক্ষু মিট্ মিট্ করিতেছে, হাত পা একটু নড়িতেছে, এবং পিপাসাসূচক মুখব্যাদানও হইতেছে। তাহারা বিলম্ব না করিয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে এক ঘটী জল আনিয়া ক্রমে ক্রমে পার্ব্বতীর মুখে দিতে দিতে পার্ব্বতী সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ করিল, এবং মৃদুস্বরে দুই একটী কথাও বলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে মনে তর্ক হইতে লাগিল, পূর্ব্বদিন রাত্রে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎপরদিন সন্ধ্যার সময় সেই ব্যক্তির জীবন লাভ করা একটী সম্পূর্ণ অলৌকিক ঘটনা, এ জগতে এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শুনে নাই। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পরে অনেকে জীবন লাভ করিয়াছে, তাহা একপ্রকার স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে গণ্য। কিন্তু একি! এরূপ বিষম দৃশ্য আমরাত কখনও দেখি নাই। এইরূপ পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিবার পর অনেকের মনে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়াই স্থির হইল। এবং তাহারা ভয়ে ভয়ে, পার্ব্বতীর নিকট হইতে দূরে দূরেই অবস্থান করিতে লাগিল। যাহারা পার্ব্বতীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্ব্বতীর জীবন প্রাপ্তিতে তাহাদের মনে অসীম আনন্দের উদয় হওয়ায়, পার্ব্বতীই যে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে, এই জ্ঞানই তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইল।

শববাহী দলের মধ্যে এইপ্রকার মতদ্বৈধ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পার্ব্বতী জানিতে পারিল। সে তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া অতি মৃদুবাক্যে বলিতে লাগিল,—"আমি মরি নাই, রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত আমার শরীরে একটা মূর্চ্ছারোগ প্রবেশ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বাড়ীতে আমি অনেকবার মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূর্চ্ছা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই বলিয়া বাড়ীর বাহিরের লোকে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। কিন্তু অদ্যকার মূর্চ্ছা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং পূর্ব্বমূর্চ্ছা অপেক্ষা অনেক বলবৎ, এইজন্য আপনারা আমার মৃত্যু সম্ভাবনা করিয়া

গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বশতঃ এই বৃহৎ অশ্বত্থতলে আমার শবদেহ রক্ষা করায় এইস্থানে মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণে আমার সেই মূর্চ্ছার অপনোদন হইয়াছে। এক্ষণে আমি যে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না। আমি যে পূর্ব্বের পার্ব্বতী তাহা জানাইবার জন্য এই দেখুন আমি আপনাদিগের নাম এবং যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া ডাকিতেছি।" এই কথা বলিয়া যখন উহার মধ্যে দুই একজনের নাম এবং সম্বন্ধ ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে যে পূর্ব্বের পার্ব্বতী, ইহা মনে করিতে কাহারও আর দ্বিধা রহিল না ; সকলে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া,—"জয় জগদীশ" শব্দে দিগন্ত আচ্ছাদিত করিল। তখন সকলে স্থির করিল আমরা সকলে সমস্ত দিন অনাহারী, আজ রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অতএব এই রাস্তার ধারে, অনতিদূরে পান্থদিগের থাকিবার জন্য একটী চটি আছে, আমরা অদ্য তাহাতেই আশ্রয় লইয়া ইচ্ছামত আহারাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, সমস্তদিনের ক্লান্তি নিবারণ করি, তাহার পর কাল প্রাতঃকালে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া অবিলম্বে তাহারা শবদেহের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল, এবং ধীরে ধীরে পার্ব্বতীকে বসাইয়া নিকটবর্ত্তী চটী হইতে কিছু দুগ্ধ আনাইয়া খাওয়াইল।

তাহার পর হাতে ধরাধরি করিয়া, ধীরে ধীরে ঐ চটীতে লইয়া গেল। অপরেও অন্যান্য সামগ্রী-পত্র লইয়া সেই চটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাহারা ইচ্ছামত ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিল। পাছে লোকের মনে অন্য প্রকার সন্দেহ হয়, ইহা মনে করিয়া পার্ব্বতী সে রাত্রে একটু দুধ খাইয়াই তৃপ্ত হইয়া রহিল। প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে সব যাত্রীরা, একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহার উপর পার্ব্বতীকে বসাইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে স্বগ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

উহার মধ্যে একজন অত্যন্ত দ্রুতগামীকে অগ্রে পৌঁছিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিবার জন্যও পাঠাইল। তাহার মুখে এই শুভসংবাদ শুনিয়া বাড়ীর লোকের যে কি প্রকার আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া জানাইবার নহে।

ক্রমে পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে সকলে বেলা ৩টা নাগাইদ পার্ব্বতীর বাড়ী পৌঁছিল। পার্ব্বতীকে গরুর গাড়ীর উপর, বসিয়া আসিতে দেখিয়া, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইল। তাহাদের আনন্দ শব্দে, শঙ্খ ধ্বনিতে, হুলু হুলু ধ্বনিতে আকাশ ও দিঙ্‌মণ্ডল একেবারে বিদীর্ণ হইল। প্রতিবেশী লোকেরাত দলে দলে আসিতেই আরম্ভ করিল, তদ্ভিন্ন নিকটস্থ অপর গ্রামবাসীরাও এই আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে অবিশ্বাস করিবার আর কোনও কথা রহিল না। পার্ব্বতী ঘরের দাবায় পিড়ে ঠ্যাসান দিয়া বসিয়া হাস্যমুখে, আত্মীয় স্বজনের নিকট আত্মবিবরণ প্রকাশ করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া সমাগত দর্শক বৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের মহিমাগান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। পার্ব্বতীর আত্মীয় স্বজনগণ গ্রাম্য দেবতাগণের পূজা, ৺রক্ষাকালী পূজা, এমন কি চাকদহে আসিয়া মহাসমারোহে গঙ্গা পূজা অবধি প্রদান করিয়া গিয়া, মহাসমারোহে কতিপয় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এইরূপে পার্ব্বতী বাঁচিয়া উঠিল বটে, তাহার শরীরে আর রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইল না বটে, সে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে ভোজন করিতে লাগিলও বটে, কিন্তু তাহার শরীরের আর পুষ্টিলাভ হইল না। সে হাত নলু নলু, পা সরু সরু, পেট গজনদার, মুখ ফুলা এক ভাবেই রহিয়া গেল। তাহাতে তাহার আত্মীয়স্বজন দিনকতক জরান্তক লৌহ, মকরধ্বজ প্রভৃতি যথাসাধ্য পুষ্টিকর ঔষধের সেবন করাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে গুড়ূচ্যাদি, মধ্যম নারায়ণ প্রভৃতি, পাকতৈলের ব্যবহার করাইতেও ত্রুটী করিল,

না; কিন্তু কিছুতেই কিছু উপকার হইল না। পরিশেষে তাহারা ভাবিল, শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে হারাধন পার্ব্বতীকে ফিরাইয়া পাইয়াছি, ইহাই আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা, সে পুষ্টি না হয়, নাই হইল। পার্ব্বতীও পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব লইয়া সহজের মত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। তবে এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক, সকলের আনন্দ হইল বটে, কিন্তু পার্ব্বতীর সহধর্ম্মিনীর মুখের মলিনতা আর কিছুতেই দূর হইল না, বরং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার গূঢ় রহস্য পরিবারের মধ্যে কেহই উদ্ভেদ করিতে পারিল না। প্রথমে নানাবিধ মিষ্ট কথা বলিয়া, নানারূপ সান্ত্বনা প্রয়োগ করিয়া লোকে তাহার মলিন ভাবের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া ছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই।

এইরূপে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিকালে বাড়ীর অন্যান্য পরিবার, আপনার আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতে লাগিল। কেবল পার্ব্বতীর পত্নী স্বামীর জন্য আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত করিয়া, শয়ন ঘরে উহা স্থাপনপূর্ব্বক, বাহির হইতে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি ১টার সময় পার্ব্বতী খেলাধূলা করিয়া বাটিতে ফিরিল। আহার করিতে বসিয়া জানিতে পারিল, অন্নের সহিত কাসুন্দি দেওয়া হয় নাই। সে সময় নূতন কাসুন্দি উঠিয়াছে, সুতরাং খাইবার লোভ অতি প্রবল হইল। প্রথমে স্ত্রীকে অনেক প্রকার মিষ্টবাক্যে একটু কাসুন্দি আনিবার কথা বলিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সম্মত হইতে না দেখিয়া, বলিল,—"তবে দেখ্, আমি কাসুন্দি আনিতেছি, কিন্তু এ কথা তুইমাত্র যা জানিতে পারিলি, খবরদার এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিস্ নি; যেদিন প্রকাশ করিবি, সেই দণ্ডেই তোর ঘাড় ভাঙ্গিব, জানিবি।" এই কথা পার্ব্বতীর মুখ হইতে যেমন নির্গত হওয়া, অমনি তাহার দক্ষিণ হস্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাহার নিরীহ পত্নী হাতের ঐরূপ বৃদ্ধি যতক্ষণ চাঁদাড়ের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সহিষ্ণুতা সহকারে নীরবেই হাঁ করিয়া বসিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু হাত চাঁদড়ের বাহির হইবার পর আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না। ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া ঘরের বাহিরে দাবায় আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার সেই ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারে বাড়ীর অন্যান্য পরিবার সব জাগিয়া উঠিয়া দেখিল একখানি হাত পার্ব্বতীর ঘর হইতে বাহির হইয়া ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিতেছে। ঘরের দাবায় আসিয়া দেখিল, পার্ব্বতীর পত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যেরূপ সময় পাইয়া ছিল, তাহাতে পার্ব্বতী অনায়াসে সেদিন সামলাইতে পারিত, কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় কালযাপন করা তাহার আর ভাল লাগিতে ছিল না, এই জন্য কাসুন্দি আনিবার ছলে সেই রাত্রেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিল।

বাড়ীর পরিবারবর্গ দাওয়াতে শ্রীমতী বধূমাতাকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই তাহাদের একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। তাহারা দেখিল পার্ব্বতীর সেই লম্বমান হস্ত কাসুন্দি লইয়া ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে হইতে আসিতেছে, এবং ঘরের মধ্যে আসিয়াই স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত, হতজ্ঞান পরিবারবর্গকে ডাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমি যে কে, এবং আপনাদের পার্ব্বতী নই, ইহা আপনারা আজ ভালরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন, আমি একটী অমানুষিক শক্তিযুক্ত আত্মা, সাধারণ মনুষ্য নহি। যাহা হউক, আগামী কল্য দিবাভাগে আমি আপনাদের সমুদয় প্রতিবেশী ও আত্মীয় কুটুম্বদিগের সম্মুখে নিজের পরিচয় দিয়া এই দেহত্যাগ করিয়া যাইব, অদ্য আপনারা আপনাদিগের বধূকে লইয়া যান। আমি কালও বলিব, আজও আপনাদের নিকট বলিতেছি, উহার সতীত্বধর্ম্মের কোনও প্রকার হানি করি নাই, এবং

তাহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই বলিয়াই, এতদিন পর্য্যন্ত আপনারা তাহাকে তথবিধ মলিন মুখেই দেখিয়াছেন।" এইরূপ মিষ্ট কথায় পরিবারবর্গকে বিদায় দিয়া পার্ব্বতীসে রাত্রে একাকী শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিবেশীগণ এবং স্বজনমণ্ডলী সমবেত হইলে, পার্ব্বতী আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সে বলিল, "আমি জাতিতে শূদ্র, কর্ম্মদোষে এইরূপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নিবাসস্থান এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী অপর একটী গ্রামে। আমার কেহ না থাকায়, নিজের উদ্ধারের উপায় হইবে ভাবিয়া ঐ গঙ্গাযাত্রার পথ পার্শ্বস্থিত অশ্বথ-বৃক্ষে কিছুদিন অবধি আশ্রয় করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই পথ দিয়াই ত গঙ্গাতীরে শবদেহ সকল দাহ করিতে যায়। আমি একটী এইরূপ বিশিষ্ট লোকের শবদেহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ ক্রিয়া দেখাইব, যাহাতে আমার গয়াঁর পিণ্ডদানের উপায় হয়। এইরূপ ভাবিয়া ঐ বৃক্ষের শাখা আশ্রয়পূর্ব্বক বাস করিতেছি, এমন সময় আপনারা পার্ব্বতীর শবদেহ লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, উহাতে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। আমি জীবিত অবস্থাতেই পার্ব্বতী এবং পার্ব্বতীর অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলাম। এরূপ লোকের দেহে প্রবেশ করিলে অচিরে যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, এই ভাবিয়া সে দিবস আমি উহার দেহে প্রবেশ করিলাম। যে জন্য প্রবেশ করিলাম, তাহার সিদ্ধির প্রতি নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আপনাদের সকলের সদ্ব্যবহারে, পরিবার-বর্গের স্নেহে, এবং বহুবিধ সুখৈশ্বর্য্য উপভোগে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, যে আমার নিজের উদ্দেশ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম। এত দীর্ঘকাল ঐ শরীরে বাসের পর গতকল্য আমার মনে সহসা উদয় হইল, যে আমি যে উদ্দেশে ব্রাহ্মণের শবদেহ এতকাল দূষিত করিতেছি, বিষয়রসে বিমুগ্ধ হইয়া সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। একে ত পূর্ব্বজন্মের

কর্ম্মফলে এই অধোগতি হইয়াছে, তাহার উপর ব্রাহ্মণের শবদেহ দূষিত করা প্রভৃতি পাপে আমার আরও যে কি অধোগতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আজ আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আজই আপনাকে প্রকট করি। এই ভাবিয়া পরিবারবর্গের নিকট গতকল্য নিজের স্বরূপ প্রকট করিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, আপনারা যদি অবিলম্বে আমার ৺ গয়ায় পিণ্ডদানের উপায় করিয়া দিবেন বলিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি এক্ষণেই আপনাদের সম্মুখেই পার্ব্বতীর দেহ ছাড়িয়া যাই।"

ইহা শুনিয়া পার্ব্বতীর পরিবারবর্গ ভূত লইয়া ঘরকন্না করা পদে পদে বিপদের কারণ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে উহার ৺ গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। তদনন্তর সে বলিল, "আমি যাইবার পূর্ব্বে আর একটী কথা আপনাদিগকে জানাইতেছি, পার্ব্বতীর বধূর সতীত্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। আমি তাহার সহিত এযাবতকাল মাতৃভাবেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। ইহার নিদর্শন, আর কিছু বলিবার নাই, তাহার মলিন ভাবই আমার কথার সত্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ দিতেছে।" ইহার পর আবার ৺ গয়ায় পিণ্ডদান বিষয়ে সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করাইয়া পার্ব্বতীর দেহ ছাড়িয়া প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইল। সে অন্তর্হিত হইবামাত্র পার্ব্বতীর দেহে কতকগুলি কীট ও অস্থি ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইল না।

এই পার্ব্বতীভূতের গল্প তৎকালে যশোহর অঞ্চলে খুবই প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কারণ আমি কেবল সেই পিতামহী ঠাকুরাণীর মুখে নয়, ঐ দেশ হইতে আগত আরও দুই একজন বিজ্ঞব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতেও ঐ গল্পটি অবিকল এই ভাবেই শুনিয়াছি। ইতি।

ভাটপাড়া ১৫ কার্ত্তিক, ১৩১৬। শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী।

শিশুর প্রতি প্রেতের আক্রোশ।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বহুভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গাজিপুর নিবাসী, এক আত্মীয়ের বাটীতে প্রেত-লীলার যে এক অলৌকিক ঘটনা কিছুদিন ধরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ "অলৌকিক রহস্যে"র পাঠক পাঠিকাদিগকে আজ উপহার দিলাম :—

অমূল্যবাবুর ভগ্নিপতি, গাজিপুর মাচ্ছারহাটা নিবাসী ৺ ভোলানাথ মিত্র মহাশয়ের বাটী, এই লীলার সংযোগস্থল হইয়াছিল। তিনি Opium Department এর তৎকালীন Head Inspector ছিলেন। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে কোন উৎপাতের সূচনা বা অনুষ্ঠান হইত না; কিন্তু ঠিক ১২টা বাজিলেই ছাদের ছোট ছোট আলিসার উপর বামনা-কৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেকে লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতে, দেখা যাইত। বাড়ীতে নিত্য এই ঘটনা ঘটিত। 'অলৌকিক' উৎপাত বলিয়া কেহ ও বিষয়ে তেমন একটা বিশেষ লক্ষ করিত না। নিত্যকার এই ঘটনার সহিত আর একটা উপসর্গিক ঘটনার আবির্ভাবে সময়ে সময়ে সেই গৃহস্থিত নব-প্রসূতির প্রসূত সন্তানের জীবন নাশ ঘটিত। প্রসবের পর, প্রসূতির আঁতুড় ঘরের নিকট উক্ত দ্বিপ্রহর সময়ে এক বিকট প্রেত-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রসূতির নিকট হইতে সন্তান চাহিত। ভয়ে প্রসূতি ছেলেকে কোলে টানিয়া লইতেন; চক্ষু মুদিত করিয়া সেই বিকটমূর্ত্তির বিকট অঙ্গভঙ্গী দেখিতে ভয়ে বিরত থাকিতেন; তথাপিও সেই মূর্ত্তি ছাড়িত না। নানারূপ অনৈসর্গিক ভয় প্রদর্শন ও নানা বিকটমূর্ত্তি পরি-

গ্রহণ করিয়া প্রসূতির নিকট হইতে ছেলে লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত।

অমূল্যবাবুর ভগিনীর কোন আত্মীয়ার প্রতি, প্রসব গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। একদিন উক্ত প্রেতযোনির ভীতি প্রদর্শনে একবার আত্ম-হারা হইয়া সদ্য-প্রসূত সন্তানকে সাবধানে রাখিতে গেলে, হঠাৎ সে সন্তান ক্রোড়চ্যুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষাকর্ত্রী ভয়বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হন। ক্রোড়চ্যুত হওয়াতেই সেই সদ্য-প্রসূত সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হয়। তৎপরে প্রেতমূর্ত্তিও কিছুদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে সেই বাটীর কোন প্রসূতিরই সন্তানের জীবন-রক্ষা হইত না। যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে নিম্নলিখিত ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত বাটীর কর্ত্রী ৺ ভোলানাথ বাবুর পত্নী একজন সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণা রমণী। এক সময় তাঁহার কন্যা, সন্তান প্রসব করিলেন। প্রসূতির প্রসব গৃহে সন্তানের রক্ষা কল্পে নবপ্রসূতির সহিত তিনি রাত্রি-যাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সারারাত্রি তিনি সদ্যজাত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকিলেন। ঠিক দ্বিপ্রহরে, যখন সেই পূর্ব্বকথিত প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল এবং যখন সে ছেলে লইবার জন্য, নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন তিনি অতীব ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে সেই প্রেতমূর্ত্তির সহিত কথা কহিতে ও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেতের ভয় প্রদর্শনোপযোগী বিকট প্রেতলীলা তাঁহাকে সামান্যমাত্র ভীত বা বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। এইরূপে ২।৩টী রাত্রি প্রেতমূর্ত্তির সহিত বিবাদ করিবার সময় বলিলেন, "যদি পুনর্ব্বার তুই আমার সম্মুখে আসিস্ বা শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া না যাস্, তবে এখনই তোকে ঝাঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়াব।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ সম্মার্জ্জনী উত্তোলন পূর্ব্বক প্রেতমূর্ত্তি লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর হইতে আর সে প্রেতমূর্ত্তি

দেখা যাইত না। আর কখনও সে বাটীতে সেই প্রতিমূর্ত্তি সদ্য-প্রসূত শিশু চাহিতে আসিত না।*

কলিকাতা,
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩১৬।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
'জাহ্নবী'-কার্য্যালয়
৬৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।

ভৌতিক কাণ্ড।

আজ কাল পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে অনেকেই প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা শুনিতে বা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কেহ কেহ আবার মৃত পিতামাতার অস্তিত্ব স্বীকারেও কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন। "এহেন "প্রমাণের যুগে" আমি ভূতের কথা কহিতে বসিয়াছি, ইহা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা বলিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি যে ঘটনা বিবৃত করিব তাহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহার কণামাত্রও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। এই ঘটনাটি নিতান্ত আধুনিক বলিয়া এবং বৈষয়িক ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝিয়া এই ঘটনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা গোপন করিতে বাধ্য হইলাম। যাহা শুনিয়াছি এবং বিশেষ প্রমাণে যাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিব।

আমি যে বাটীর বিষয় বিবৃত করিতেছি সে বাটীখানি কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী খিদিরপুরে অবস্থিত। শুনা যায় যে বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্বে ঐ বাটীতে আর কখনও ভূতের উপদ্রব ছিল না। যে বাটীতে এ ঘটনা

---

* বলা বাহুল্য অমূল্যবাবু এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। লেখক

হয় সেই বাটীখানি দ্বিতল এবং বহু পুরাতন। বাটীর একদিকে রাস্তা এবং দুইদিক ফাঁকা, কেবল পূর্ব্বদিকে একখানি বসতবাটী আছে। আমার জনৈক বন্ধু সেই বাটীতে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার স্ত্রী নাকি একদিন তাঁহার ভগ্নীর নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে,কে যেন তাঁহাকে বলিয়াছে যে, "তুই এ বাটী হইতে চলিয়া যা, নতুবা তোকে মারিয়া ফেলিব।" আমার বন্ধু তখন একথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই, তাঁহার স্ত্রী কঠিন রোগাক্রান্তা হন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিত্রালয় যাইবার এক মাসের মধ্যেই তাঁহার তিন বৎসরের ছেলেটী দুই দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত খিদিরপুরস্থ বাটীতে সকলেই ভূতের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত।

বন্ধু আরও বলিয়াছেন, তিনি নাকি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাদের উপর পায়চারি করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে ছোট ছোট ইট পড়িতে লাগিল। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার গরুর হাড় ও নানাপ্রকার ময়লামাখান নেকড়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাঁড়ার ঘরের হলুদ ও সুপারি প্রভৃতিও পড়িতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে ইহা ভৌতিক কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিসে এই উপদ্রবের শান্তি হয়, এই ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। তৎপরে বালীগঞ্জের দুঃখে মোল্লা নামক একজন ভূতের রোজাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া, ও বহু পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া,তাহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া আসিলেন। রোজা আসিয়া বলিল, "কাণ্ডটা জিনের দ্বারা হইতেছে, আমি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিব না।" এই বলিয়া রোজা স্বগৃহে প্রস্থান

করিল। তৎপরে তাহার বড় মাতুল মহাশয় আসরে নামিলেন, কিন্তু উপদ্রবের প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না। উপদ্রবের আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীর সেমিজ ও কাপড় একঘর হইতে অন্যঘরে আপনা আপনি যাইতে লাগিল; খাবার জিনিসপত্র অপহৃত হইতে লাগিল; শয়নকক্ষে মল মূত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া বাটীতে হরিসংকীর্ত্তন ও তুলসী দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর তুলসী দিয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই একটা অজানিত শক্তিবলে পূজার ঘণ্টা আপনি বাজিয়া উঠিল এবং দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত হইল।* কিছুতেই কিছু হইলনা দেখিয়া, ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ গণৎকার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন,—"মৃজাপুর ষ্ট্রীটে একজন ব্রাহ্মণসন্তান আত্মহত্যা করিয়া একজন নীচ জাতীয়ের বাটীতে ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল,গৃহস্বামী প্রতিকার করায় ভূত মহাশয় মৃজাপুর হইতে সোণাই যাইতেছিল,পথে অপনাদের বাটীতে বিশ্রামার্থ বসিয়াছিল,আপনার স্ত্রী সেই সময় ছাদের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, কাপড়ের আঁচলটা ভূতবাবাজীর গাত্রস্পর্শ করিয়াছিল: সে সেই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ উপদ্রব করিতেছে। ভয় নাই, 'উড়োভূত' শীঘ্রই চলিয়া যাইবে; তবে শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে কয়েকটা ঘোড়ার খুর আনিয়া প্রত্যেক ঘরের দরজায় পুতিয়া দিতে হইবে এবং আপনার স্ত্রীকে একটা 'রামকবচ' ধারণ করিতে হইবে।" প্রিয়নাথবাবুর কথা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল, কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না।

তৎপরে তিনি প্রসিদ্ধ ভূতের রোজা ৺গঙ্গাময়রার পৌত্র, বহুবাজারস্থ বিনোদচন্দ্র মোদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে ৪৲ টাকা ভিজিট

---

* এই ঘটনাটী আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া খিদিরপুরে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া বাটীর সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া বলিলেন,—"ভূত তাড়াইতে হইলে একটা ক্রিয়া করিতে হইবে" বলিয়া, ১৪৲।১৫৲ টাকার একখানি লম্বা ফর্দ্দ দিলেন; এবং তদনুসারে কার্য্যও হইল কিন্তু তাঁহাতেও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ভূতের উপদ্রব একেবারে নিবারিত হইল না বটে, কিন্তু ইহার পর মাঝে মাঝে কেবলমাত্র দুই একটা ইট পড়া ব্যতীত আর কোন উপদ্রব পরিলক্ষিত হইত না।

প্রায় দুই মাস পরে তাঁহার স্ত্রীকে আবার খিদিরপুরে আনা হইল। ইহার পর ২।১ দিনমাত্র নিরাপদে কাটিল। পরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ যে তারিখে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আততায়ীর গুলিতে হত হন, সেইদিন রাত্রি দুইটার সময় হঠাৎ উপর হইতে একটি টাকা পড়িল। সেই টাকার শব্দে তাঁহাদের উভয়েরই ঘুম ভাঙ্গিল; উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখেন যে বাক্স খোলা, বাক্সে যে টাকা ছিল গণিয়া দেখেন যে তাহা হইতে মাত্র একটি টাকা কম হইল। ইহার পর দুই একদিন ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। আর একদিন শয়নকক্ষ হইতে তাঁহার মেয়ের একটি জামা এবং চারিটা টাকা অপহৃত হইল; অথচ শয়নকক্ষের অর্গল সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। পরদিন রাত্রিতে আবার তাঁহার স্ত্রীর কাণ হইতে ইয়ারিং অপহৃত হইল, অনেক অনুসন্ধানেও খুজিয়া পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখেন আগেকার অপহৃত জামা, চারিটী টাকা ও ইয়ারিং একসঙ্গে পুঁটুলী বাঁধা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ ঘটনার দুই তিন দিন পরে রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীর সমস্ত গাত্রে বিষ্ঠা লেপন করিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার পরেও আবার অনেক রোজা ডাকা ও নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূতবাবাজীর

অতুল প্রতাপ কিছুতেই খর্ব্ব করা গেল না। আর একটু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাটীর নিম্নতলের ভাড়াটীয়াদের উপর এযাবত কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ভূতের যত আক্রোশ কেবল তাঁহার স্ত্রীর উপর। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু, শান্ত, শিষ্ট ও তাঁহাতে চঞ্চলতা একেবারেই নাই। যাহা হউক এই প্রবন্ধবর্ণিত ঘটনার কণামাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। আজও সে বাটীতে ভূতের উপদ্রব চলিতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন তবে প্রপীড়িত পরিবার বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং গ্রহণেচ্ছু হইলে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু।
১১নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আলু ও কপি আমার কাল হইল! চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ এসকল সামগ্রী দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতে সেরূপ অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং রাঁধিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব ঘটিল। আহারাদি সমাপন করিয়া চটি পরিত্যাগ করিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিনক্রোশী মাঠ পার হইতেই হইবে। আমি বেহারাদিগকে একটু দ্রুত চলিতে আদেশ দিলাম।

সমস্ত দিন আকাশ নির্ম্মল ছিল। প্রকৃতির অবস্থায় আমাদের শঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। এইজন্য আমার সহচরবর্গ উল্লাসে আমার

পালকীর সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। মাঠের ধারে যখন উপস্থিত হইয়াছি, তখন দেখা গেল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, আকাশপ্রান্তে একটু মেঘের সঞ্চার হইয়াছে।

মেঘ দেখিয়াই হরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবু! দক্ষিণপশ্চিম কোণে একখানা মেঘ দেখা দিয়াছে।"

আমি পালকী হইতে মুখ বাহির করিয়া মেঘের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম। দেখিয়া মেঘের অবস্থা যদিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি দর্শন-মাত্রেই অন্তরে অকস্মাৎ কেমন একটা ভয় জাগিয়া উঠিল।

হরিয়া বলিল—"মেঘখানার চেহারা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

আমি বলিলাম—"তাহ'লে কি করিব?"

হরিয়া উত্তর করিল—"একটু অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। কেননা বৃষ্টি আসিলে মাঠে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে।"

আমিও সেটা বুঝিলাম। যদিও শরৎকালের মেঘ, বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই, তবু এক পশলা বৃষ্টি হইলে দাঁড়াইব কোথায়? মাঠে মাথা ঢাকিবার স্থান নাই। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করিতে গেলে যদি রাত্রি হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে সে মাঠ অতিক্রম করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বৃষ্টির পর কর্দ্দমাক্ত পথে চলিতে নানা অসুবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দরোয়ান আমার আদেশের উপর নির্ভর করিল।

অনেক বিচার বিতর্কের পর আমরা সকলেই মাঠ পার হইতে সঙ্কল্প করিলাম।

মেঘ দেখিতে দেখিতে পশ্চিম আকাশস্থ প্রান্তগামী সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল।

হরিয়া তুলাসিংকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দরোয়ানজী! কি দেখিতেছ?"

তুলাসিং বলিল—"কুচ ডর নেই—চলো!"

বেহারারা প্রাণপণে আমাকে লইয়া ছুটিয়াছে। আমি অসময়ে আহারের ফলস্বরূপ, অতর্কিতভাবে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছি। সহসা ভীষণ বজ্রপতন শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। তন্দ্রাভঙ্গে বুঝিলাম, আমার হৃদয় প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছে।

সেই অবস্থাতেই দরোয়ানকে ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। তখন দেখিলাম পালকী ভূমিতে রক্ষিত। আবার পালকী হইতে মুখবাহির করিলাম। দেখিলাম, দরোয়ান, চক্ষু দুইহস্তে ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত বেহারারা আমার পালকীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই।

আমি তাহাদিগকে পাল্‌কী উঠাইবার আদেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় আর এক বজ্র শব্দ। সেরূপ ভীষণ শব্দ বুঝি জীবনে কখনও শুনি নাই। শব্দ ও তীব্র আলোক পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, একটা বিকট হাস্যের উপর অন্তরটাকে যেন ভাসাইয়া তুলিল। আমি মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

চোখ মেলিয়া দেখি, একটা বেহারা ও তুলাসিং ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পাল্‌কী হইতে বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র হরিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু! আর ভয় নাই—বাজ গাছে পড়িয়াছে।" ফিরিয়া দেখি সম্মুখেই রায় দিঘী। তাহারই পাড়ের একটা সুবৃহৎ তালগাছের উপর বাজ পড়িয়াছে। গাছটার মাথা জ্বলিতেছে।

সামান্য শুশ্রূষায় দরোয়ান ও বেহারার জ্ঞান ফিরিল। আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

রায়দিঘীর সমীপে আসিতে না আসিতেই মূষলধারে বৃষ্টি আসিল। প্রকৃতির বিকটহাসির অনুরূপ অশ্রুজল—করিশুণ্ড ধারা!

কোথায় যাই, কি করি ভাবিয়া আকুল হইলাম। পালকীর ছাদ ভেদ করিয়া গায়ে জল পড়িতে লাগিল। জলধারা মাথা হইতে চোখে পড়িয়া বেহারাদের প্রতিপাদক্ষেপে দৃষ্টিরোধ করিতে লাগিল। প্রতিপদে পতনের আশঙ্কা বিপচ্চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বাহিরে কি হইতেছে, আমার সঙ্গিগণের মধ্যে কে কি করিতেছে, জানিতে সাহস হইল না।

আমি পালকীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বহুকাল পরে ঈশ্বর স্মরণ করিতেছি, এমন সময় একজন বেহারা দ্বার ঈষদুন্মুক্ত করিয়া বলিল—"হুজুর! দিঘীর ধারে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের আশ্রয় পাইয়াছি। হুকুম করেন, তাহার তলায় বসি। এরূপ অবস্থায় চলিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা।"

আমি বলিলাম—"কেন, ধীরে ধীরেও কি চলিতে পারিবে না?" বেহারারা উত্তর করিল—"চলিতে পারিলে, হুজুরকে জানাইব কেন? চোখে জল পড়িতেছে। সুমুখে মাঠের উপর দিয়া পথ—চিনিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম—"দিন শেষ হইতেছে—মেঘের অন্তরালে সপ্তমীর চাঁদ কোনও আলোক সাহায্য করিবে না। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না ছাড়ে, তা' হইলে কি করিবে?"

আমার এ যুক্তিযুক্ত কথায় বেহারা কোনও উত্তর করিতে পারিল না। সে সঙ্গীদিগকে বলিল—"যেমন করিয়া পারিস, পথ দেখিয়া চলিয়া চল।"

(২৩)

বৃষ্টি থামিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধকার অল্পে অল্পে সেই বিশাল প্রান্তরকে আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এখনও রায়দিঘীকে অতিক্রম করিয়া অধিক দূর যাইতে পারি নাই।

দিঘীর পাড়ের তালগাছটা হইতে তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প ধূমনিঃসৃত হইতেছিল। ভয়ে ভয়ে আমি এক একবার দিঘীটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলাম। প্রতিবারেই ধূমোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে দিঘীর সেই অন্ধকারাবৃত মধ্যভাগ প্রবর্দ্ধমান জীবদেহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন এক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস একস্থানে বসিয়া, আমাদিগকে উদরস্থ করিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে।

সকলেরই প্রাণে বুঝি এই ভয় জাগিয়াছে! ইহার কিছু পূর্ব্বে আমার সঙ্গীরা পরস্পরে তফাৎ হইয়া আসিতেছিল। আমি একবার মুখ বাহির করিয়া দেখিয়াছি, বদলি বেহারারা পালকীর অনেক দূরে পড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে হরিয়া—সকলের পশ্চাতে তুলাসিং। মূর্চ্ছিত হইবার পর হইতে দুর্ব্বলতার জন্যই হউক, অথবা অপর কারণেই হউক, তুলাসিং আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারিতেছিল না। এখন দেখি সকলেই আমার পালকীর নিকটে সমবেত হইয়াছে। বিশেষতঃ তুলাসিং একেবারেই পালকীর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়াই সে বাহকদিগকে একটু দ্রুত চলিতে আদেশ করিল।

কিন্তু বাহকরা চলিবে কি! মাঠ জলপূর্ণ হইয়াছে, মাঠের মধ্যের পথচিহ্ন জলে ডুবিয়াছে। তাহারা বারংবার বিপথে চলিতেছিল। যেখানে যেখানে পথ দেখা যাইতেছিল, ঘুরিয়া বেড়িয়া তাহারা আবার সেই পথ অবলম্বন করিতেছিল।

তুলাসিং একবারমাত্র এপথে আসিয়াছে, আমি বহুদিন পরে দেশে

ফিরিতেছি। মাঠের পথ পথিকের পদচিহ্নে প্রস্তুত হয়—বৎসর বৎসর তাহার পরিবর্ত্তন, আমরা কেহই পথ সম্বন্ধে সম্যক বিদিত নই। বাহকদিগের ব্যবসায়গত বুদ্ধির উপর নির্ভরতা ভিন্ন আমাদের আর উপায় রহিল না।

চলিতে চলিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সপ্তমীর চন্দ্র মেঘের আবরণ ছিন্ন করিতে দুই একবার চেষ্টা করিলেন—মেঘের উপর মেঘ পড়িয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমরা পথ হারাইলাম।

আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু বৃষ্টির আর সে জোর নাই। হরিয়া বলিল—"বাবু! এ দেশের পথ ঘাট যে ভালরূপ জানে এমন একজন লোক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।" বিপদের উপর বিপদ আমাকে অনেকটা সাহসী করিয়াছে। বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস আছে মাঠ পার হইতে পারিলে একটা না একটা গ্রামে উপস্থিত হইব। বৃষ্টির ভাবেও বোধ হইল, শীঘ্র ইহার নিবৃত্তি হইবে। চাঁদ না দেখা দিলেও অন্ধকারের গাঢ়তা অনেকটা নষ্ট করিতে পারিবে।

সেই সাহসে হরিয়াকে বলিলাম—"ভয় কি! তোরা একটা গ্রামকে লক্ষ্য কর্—আমাকে সেই দিকে লইয়া চল্।"

হরিয়া বলিল—"আপনি সোনার কলিকাতা ছাড়িয়া এ কোন্ দেশে চলিয়াছেন, আর কি সুখের জন্যই বা চলিয়াছেন?"

হরিয়ার কথায় বিপদের উপরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—"হরিয়া! সুখের প্রত্যাশা না থাকিলে এদেশে আসিব কেন?"

হরিয়া বলিল—"কি সুখ আপনি জানেন; কিন্তু আমি যদি আগে জানিতে পারিতাম, আপনি এরূপ দেশে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কখনই আপনাকে আসিতে দিতাম না।"

আমি বলিলাম—"আমি আমার জন্মভূমিতে চলিয়াছি। কলিকাতা সোনার হইতে পারে, কিন্তু হরিয়া জন্মভূমি হইতে কি তার মূল্য বেশি?"

জন্মভূমির মর্য্যাদা কখনও রাখি নাই। লোকলজ্জায় কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধুর কাছে তাহার নাম পর্য্যন্ত কখন উচ্চারণ করি নাই। আজও যে তাহার মর্য্যাদা অনুভব করিতেছি তাহা নহে। শুধু হরিয়াকে নিরুত্তর করিবার জন্য কথাটা বলিলাম।

বাস্তবিক হরিয়া আমার উত্তর শুনিয়া নিরুত্তর হইল। কিয়ৎক্ষণ সে আমার পালকীর দোর ধরিয়া নীরবে চলিল, তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"জগবন্ধু! মনিবকে আমার মানে মানে ঘরে পৌঁছিয়ে দাও।"

আমি বলিলাম—"ভয় কি হরিয়া!"

হরিয়া বলিল—"বাবু! তা' হইলে বলি; যাহাকে আপনার দরোয়ান চড় মারিয়াছিল, সেই ঝাঁকড়াচুলো মানুষটাকে দিঘীর ধারে জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

সে লোকটার কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম; হরিয়ার কথা শুনিবামাত্র সমস্ত বিভীষিকা লইয়া সেই যমদূতের মূর্ত্তিটা আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। জাগরণের সঙ্গে বিষম ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সহস্র চেষ্টাতেও হৃৎকম্প রোধ করিতে পারিলাম না। তবু আমি হরিয়াকে সাহস দেখাইবার জন্য বলিলাম—"তোমারা কুড়িটা হাতে যদি আমাকে মানে মানে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে না পার, বুলো জগবন্ধু কি করিবে?"

হরিয়া একবারমাত্র বলিল—"ছি বাবু! অমন পাপকথা মুখে আনিবেন না।" আর কোনও কথা সে কহিল না।

দূরে একখানা গ্রামে সপ্তমীর সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিবামাত্র আমি বেয়ারাদের বলিলাম—"ওই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চল্। শব্দ শেষ হইতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগিবে। সে সময়ের মধ্যে আমরা অন্ততঃ গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিব।"

বাহকরা শব্দ লক্ষ্যে চলিল। আমি ইংরাজী ভজনার ভাবে চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে একবার ঈশ্বরের স্তব করিয়া লইলাম—"হে পরম কারুণিক! হে সর্ব্বশক্তিমান্! হে জগৎপালক! আমি বিপন্ন হইয়াছি। এ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর!"

স্তব করিলাম বটে, কিন্তু স্তবে সেরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ ঈশ্বর নির্ভরতা আমার আসিল কই? ঈশ্বর সম্বন্ধে এতকাল কেবল সন্দেহই করিয়া আসিয়াছি। কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাঁহার অস্তিত্বে একেবারে অবিশ্বাস করিতে সাহসী হই নাই। সুতরাং ভগবানে আমার সেরূপ একাগ্রতা আসিল না। আমি স্তবের নামে আত্মপ্রতারণা করিতে লাগিলাম।

স্তবের সঙ্গে সঙ্গে আমার সহচরদের শক্তি সামর্থ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। হিসাবের একটা পড়তা করিয়া সেই আগন্তুক ডোমটা হইতে আমার বল অনেক অধিক এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে যাইতেছি, এমন সময় বাজনা থামিল। শব্দ বন্ধ হইল দেখিয়া আমি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গ্রাম আর কতদূর?"

প্রথমে কাহারও কাছে কোনও উত্তর পাইলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন বলিল—"ঠিক বুঝা যাইতেছে না।"

"এখনও বুঝা যাইতেছে না! তবে তোরা এতক্ষণ চলিয়া কি করিলি!"

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। সেই বিদ্যুতের সাহায্যে আমি নিজে একবার দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় আসিয়াছি! গ্রাম কই?

হরিয়া বলিল—"বাবু! আমাদের দিশা লাগিয়াছে। আমরা আবার সেই রায়দিঘীর ধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। সকলেই বুঝি প্রাণে মরিলাম!"

হরিয়ার কথা শেষ হইতে না হইতে, তালবনের অন্ধকার ভেদ করিয়া এক বিষম কর্কশ ইঙ্গিতশব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমীরণে একটা বিষম স্পন্দনশব্দ উত্থিত হইল। তুলাসিং অমনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম আমরা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। পরক্ষণেই হরিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

বাহকরা পালকী ভূমিতে রাখিয়া পলায়ন করিল। আমার কে সহচর রহিল আমি জানিতে পারিলাম না। চারিদিক নিস্তব্ধ—বোধ হইল সেই প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে আমি একাকী।

মুহুর্ম্মুহুঃ বিজলী স্পন্দিত হইতেছিল, কিন্তু পালকী হইতে মুখ বাড়াইয়া অবস্থা জানিতে আমার সাহস হইল না। আমি ভিতরে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

সেই পূর্ব্বপরিচিত স্বর; কিন্তু কি কঠোর! সে স্বর সমস্ত প্রান্তরটা যেন উন্মত্তের ন্যায় একবার পরিভ্রমণ করিয়া লইল। আবার যেন সেইমত তীব্রতায় আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল।

দস্যু অতি তীব্র ভাষায় আমাকে গালি দিয়া বলিল—"বাহিরে আয়। দশ দশ জন সঙ্গীর সাহসে উন্মত্ত হইয়া, আমাকে একা দেখিয়া বিনা অপরাধে অপমান করিয়াছিস্। এখন একবার বাহিরে আসিয়া দেখ—তোর কে আছে। তোর কোন বাবা এখন আসিয়া তোকে রক্ষা করে।"

বাস্তবিক এখন আমার কে আছে? কে আমার শক্তিমান

পরমাত্মীয় আছ, এই জিঘাংসু দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার? কি জানি কেমন করিয়া আমাদের সেই পিতৃপিতামহ কর্ত্তৃক অর্চিত সেই শিলাখণ্ড আমার স্মরণ পথে উদিত হইল। মৃত্যুভয়ে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। সেই শিলাখণ্ড স্মৃতিতে আসিবামাত্র, আমার হৃদয়ের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমি করযোড়ে বলিয়া উঠিলাম—"দামোদর! আমাকে রক্ষা কর।"

"কেন খোঁচা খাইয়া মরিবি—বাহিরে আয়।" এই বলিয়াই দস্যু পালকীর মাথায় যষ্টির আঘাত করিল। পালকীর মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম, অতি দূর হইতে কে যেন বলিতেছে—"ভয় নাই।" আমি মূর্চ্ছিত হইলাম।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম—"অতি মধুর স্বরে কে আমাকে ডাকিতেছে—"গোপীনাথ!" ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিলাম। আমার রক্ষাকর্ত্তার মুখ দেখিলাম।" সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তে যেন স্বপ্নময় বোধ হইল। অবসাদে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। সেই অবস্থায় আবার শুনিলাম—"উঠ গোপীনাথ! উঠ ভাই! দামোদর তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এবারে নিশ্চয় বুঝিলাম, স্বপ্ন নয়, আমি খুল্লপিতামহের কোলে আশ্রয় পাইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পত্র।

আমি যেন এখানে স্বগৃহাগত, ক্রমে ক্রমে, এই ভাব আমার মনে আসিতে লাগিল। স্বগৃহাগত? স্বগৃহ! নিজ আবাস স্থান! তোমার সহিত কত মধুর প্রতিধ্বনি জড়িত আছে! কত স্নিগ্ধ, কত শান্তিময় স্মৃতি, তোমার নামের সহিত গ্রথিত! তোমার কথা মনে আসিলেই, পৃথিবীতে কত নিরাশহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়! কত নির্জ্জীব চিত্তে প্রবল শক্তির ক্রীড়া করায়! আর এখানে? তোমার চিন্তা কি তীব্র! অতোষণীয় বাসনাসমূহ জড়িত থাকায় তোমার স্মৃতি কি মনঃপীড়াদায়ক! নরকবাসে অভ্যাস হইলে যে যন্ত্রণার লাঘব হয়, তাহা নয়। যে বিচিত্র বহিঃশক্তি পূর্ব্বে নরকবাসের প্রথম অবস্থায়,আমাদিগকে ঘুরাইত ফিরাইত, আমাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানাকার্য্যে ও চিন্তায় জড়িত করিত, এখনও তাহাই আমাকে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে বাধ্য করিতেছিল। আমরা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে বাধ্য হই—এ কথা অতীব সত্য। তোমরা বুঝিলে ত—ইহাই আমাদিগের এখনকার প্রকৃত অবস্থা!

অন্তর্শক্তি কিংবা বহির্শক্তি জানি না, সেই অনিরোধ্য বেগ, সেই অপ্রতিবিধেয় আবেগ বা উত্তেজনা আমাদিগের পার্থিব জীবনের কার্য্য-কলাপে আবার আমাদিগকে প্রবৃত্ত করায়। অপ্রকৃত অবস্থায় অসত্যবস্তুর মিথ্যা কল্পনাই এখানকার দৈনন্দিন আহার্য্য বস্তু! দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, —তাহারাত দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি, আছে কেবল বাসনাসমষ্টি। চক্ষু নাই,

দেখিতেছি,—ভাবিতেছি চক্ষু আছে। কর্ণ নাই, শুনিতেছি,—ভাবিতেছি কর্ণ আছে। সেইরূপ হস্ত নাই, পদ নাই, ত্বক্ জিহ্বা কিছুই নাই,—অথচ ভাবিতেছি সবই আছে। কেবলই কি ভাবিতেছি—ইন্দ্রিয়াদি নাই,—আর কিছু না? চক্ষু যাহা দেখিত, এখানেও তাহা দেখিতেছে; শ্রবণ যাহা শুনিত, এখানেও তাহা শুনিতে পাইতেছে। তবে পৃথিবীতে দেখা, সেখানে শুনা, সেখানকার ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য হইতে এখানকার অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে দর্শন শ্রবণাদির দ্বারা আমার যে তৃপ্তি হইত এখানে তাহা হয় না! তথায় অনুভূত বস্তুর সহিত আত্মচৈতন্য কিরূপভাবে যে জড়িত হইয়া যাইত! তথায় অনুভবটা যেন নিজ চৈতন্যের অংশ বলিয়া মনে হইত! আর এখানে কিছুই যেন আত্মচৈতন্যগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। অনুভবনীয় পদার্থ ও আত্মচৈতন্য, উভয়ের মধ্যে যেন কোনও সম্বন্ধ নাই, উভয়ের মধ্যে যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্যনীয় বিরাম স্থান। আমি শত চেষ্টায়ও অনুভবনীয় বিষয়কে আত্মচৈতন্যাংশ করিতে পারি না। অনুভবনীয় অনুভূত হইতেছে না বলিয়াই আমার যাতনা। একদিকে অব্যাহত জীবন্ত বাসনারাশি, অপরদিকে লোভনীয় অনন্ত সামগ্রী। আমি জীবন্ত বাসনাসমষ্টি লইয়া প্রলোভন সাগরে নিমজ্জিত! অতি তৃষাতুর আমি, তাহার কণিকাও উপভোগ করিয়া লইব, সে শক্তি আমার নাই! তোমরা ট্যানটলাস (ক) (Tantalus), সিসাই ফাসের

(ক) ট্যানটালাস (Tantalus)—এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তীব্র বাসনাভিভূত ট্যানটালাসকে নরকে আবদ্ধ করা হয়। সেখানে অদম্য তৃষ্ণায় কাতর, তাহাকে আচিবুক জলে, নদীগর্ভে রক্ষিত করা হয়। সে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যতবার জলপান করিবার চেষ্টা করিত, বারিরাশিও ততবার তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িত। Darwin অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার এই যাতনার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

(খ) (Sisyphus) মর্ম্মযাতনার কথা পাঠ করিয়াছ। তাহাদিগের তীব্রযন্ত্রণা পাঠে আমর এ অবস্থার কথা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সমস্তই এখানে কাল্পনিক,—আমি যে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের কথা বলিয়াছি, সেটাও আমার নিজের কল্পনার ভয়ঙ্কর সৃষ্টি। কিন্তু, আমার মনে হইতেছে তাহা প্রকৃত! আমি কল্পিত অগ্নিকুণ্ডে প্রকৃত দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! (ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

"So bends tormented Tantalus to drink,
While from his lips the refluent waters shrink;
Again the rising stream his bosom laves,
And thirst consumes him, mid circumfluent waves."

(খ) সিসাইফাস (Sisyphus) একজন অতি শঠতাপূর্ণ, প্রবঞ্চক, অর্থলোলুপ কোরিন্থের (Corinth) ভূপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর, নরকে তাঁহাকে এক দুর্ব্বহ প্রস্তর খণ্ডকে পর্ব্বতশিখরে উত্তোলন করিয়া, তথায় স্থাপন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি যতবারই সেই প্রস্তরখণ্ডকে পর্ব্বতশিখরে অতিকষ্টে তুলিয়া তথায় রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শিলাখণ্ডও ততবার শৈলশির স্পর্শ করিয়াই আবার ভূমিতলে পতিত হইয়াছে।

তীব্র অদম্য বাসনা উদ্ভূত নরকের যাতনারাশি গল্পছলে নানাদেশে নানারূপে বর্ণিত আছে। ক্যানেডার (canada) সীমান্তে মরুময়দেশবাসী চিপৌয়ান্স (chipouyans) জাতির মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুর পরক্ষণেই মানব আত্মাকে এক প্রস্তর নির্ম্মিত তরণীতে রক্ষিত করা হয়। তাহার পর বিধির বিচারে পাপী প্রমাণিত হইলে, তরণী জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়, মানব জীবাত্মা আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া ট্যানটলাসের মত অনির্ব্বচনীয় তৃষ্ণা অনুভব করিতে থাকে। Alexander Mackenzie.—Voyages in the Interior of America.

কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও
৪৭।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী দ্বারা প্রকাশিত।

অলৌকিক রহস্য।

১১শ সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [ফাল্গুন, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

—:*:—

মৃত্যুর পর-পারে।

মৃত্যুসম্বন্ধে ভ্রম বিশ্বাস।

মৃত্যু কথাটিই রহস্যময়। মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হওয়া মানব মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক দিন যে মরিতে হইবে, ইহা প্রত্যেক মানবের ভবিষ্য জীবন-ইতিহাসের অনিবার্য্য ও সুনিশ্চিত ঘটনা। বোধ হয় কেবল সুকুমার মতি শিশু ব্যতীত এমন আর কেহ নাই, যাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে কোন না কোন প্রিয়জন চির দিনের জন্য অপসারিত হয় নাই। এই বিষয়টি সর্ব্বজন সাধারণের এতাধিক আবশ্যকীয় হইলেও, বোধ হয় মানবের সংশ্লিষ্ট এরূপ আর কোন বিষয়ই নাই যাহার সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যের মনে এতাধিক কুসংস্কার এবং এরূপ গুরুতর ভুল বিশ্বাস আছে। অধিকাংশ মানবই এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বশতঃ কি পরিমাণে বৃথা দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করে এবং শোক, তাপ ও ত্রাস পাইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু, ভূত কালে এই সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রম বিশ্বাস বশতঃ কতই যে আমাদের

অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও করিতেছে তাহার গণনা করা যায় না। এই কুসংস্কার গুলি মানব হৃদয় হইতে যদ্যপি উন্মূলিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে যে অসীম শুভপ্রদ হইবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

এক্ষণে এই সকল কুসংস্কার কেন যে আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এইরূপ হইবার বিশেষ বা মূল কারণ পাশ্চাত্য জড়বাদ এবং এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিরহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী। এক সময়ে ভগবৎ কৃপায় য়ুরোপীয় জাতিনিচয়ের অধ্যাত্ম উন্নতি কল্পে উক্ত মহাদেশের বিভিন্ন জাতিগত মানবদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য মহাত্মা খৃষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে উক্ত জাতি নিচয়ের উপযোগী ঐ মহামতি-প্রচারিত প্রেমপূর্ণ শিক্ষা এবং ধর্ম্মমতের প্রভা কালসহকারে মলিন হওয়াতে, জড়বাদের স্রোতে দাম্ভিক য়ুরোপীয় জাতিনিচয় উহার করুণধারা হইতে বঞ্চিত, ও বিচ্যুত ভ্রষ্ট হইয়া ঐ ধর্ম্মের সার জিনিস গুলিকে বাদ দিয়া সেই পবিত্র ধর্ম্মকে কতকগুলি কুসংস্কারের জালে পরিণত করিয়াছে। কেবলমাত্র ইহজগতের সুখ স্বচ্ছন্দ ও ধন ঐশ্বর্য্যের বলে বলীয়ান হইবার লালসায় আসল রত্ন হারাইয়া য়ুরোপীয় জাতিনিচয় ক্রমে স্থূল জড় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বর-বিরহিত বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পূর্ণ জড়বাদে নিমজ্জিত হয়। পরলোক এবং পরকালে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বশতঃ মানবের এই জগতেই আরম্ভ এবং এই জগতেই শেষ এই বিশ্বাস অধিকাংশ লোকের মনে বেশ বদ্ধমূল হইয়া গেল সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধেও কতকগুলি ভুল বিশ্বাস এবং কুসংস্কারও জন্মাইল।

জাতীয়তা হারাইয়া এবং সনাতন ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভা মলিনাক্ত

হওয়ায় য়ুরোপীয় জড়বাদের স্রোতে ভারতবাসীও সমস্ত ধর্ম্ম ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল। সুতরাং ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অজ্ঞতা বশতঃ মৃত্যু সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কতকগুলা কুসংস্কারে মস্তিষ্ক পূর্ণ হইল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ঐরূপ বিশ্বাস আরও অধিক জড়তা প্রাপ্ত হইল। পাশ্চত্য জড়বাদের স্রোতে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যে বহুল পরিমাণে নাস্তিকতা বশতঃ কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে মৃত্যুর পর সমস্তই ফুরাইয়া যায় সুতরাং উক্ত বিষয়ে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মৃত্যু সম্বন্ধে মানবের ভুল বিশ্বাস থাকিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁহারা বলেন যে, মরিলে মানুষ নিজে মৃত্যু সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানিতে পারিবে। এবং যদ্যপি বর্ত্তমান বিশ্বাসের সহিত তাহার সামঞ্জস্য না হয় তাহা হইলে সেই সময়ে মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পর-পারে সেই ভুল বিশ্বাস সংশোধন করিয়া লইবে। অতএব জীবিত অবস্থায় ওসকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বৃথা মস্তিষ্কের আলোড়ন করা নিস্প্রয়োজন। উক্ত মতটিতে ঈশ্বর-শূন্য জড়বাদ ব্যতীত আর কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটী মতই ভ্রমপ্রদ। কত শত সহস্র মানবের মধ্যে অজ্ঞতা বশতঃ মৃত্যুর যে একটা ভীষণ বিভীষিকা থাকা প্রযুক্ত তাহাদের চিত্ত অশান্তির ছায়ায় সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে এবং পরলোকগত ব্যক্তিদিগের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়বর্গের মধ্যেও বৃথা একটা দুঃখ এবং চিত্তোদ্বেগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; এই সকল বিষয় তাঁহারা একবারও মনে ভাবেন না। ইহা ব্যতীত তাঁহারা অবগত নহেন যে, অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহার পূর্ব্বের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে অসমর্থ। এবং তাহাদের এই অসমর্থতা হেতু মৃতব্যক্তি অনেক সময়ে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর ভয়ের আর একটী বিশেষ কারণ আছে। মৃত্যুর পরপারের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকা প্রযুক্ত অনেকেই জানেন না যে তাঁহারা কোথায় যাইবেন এবং তাঁহাদের অবস্থাই বা কি প্রকার হইবে। ইহা ব্যতীত স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এবং ছাড়িয়া যাইলে তাহাদেরই বা কি অবস্থা হইবে। এই সকল বিষয় মনে হইলে এবং তাহার আলোচনা করিলে স্বভাবতঃ প্রাণ আকুল হইয়া উঠে এবং ভয়ানক একটা বিভীষিকার উদ্রেক হইয়া থাকে। অথচ ধর্ম্মে অনাস্থা এবং শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ কোনই সুমীমাংসা হইয়া উঠে না। সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারায় কেহ কেহ নাস্তিকতায় উপনীত হন, কাহারও বা এ বিষয়ে উদাসীনতা আইসে এবং কেহ বা ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন।

ভারতেও এমন এক সময় ছিল যখন ভারতের সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল—যখন সমগ্র ভারতবাসীর ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশ্বাস অপ্রতিহত ছিল এবং ঐ সকল বিশ্বাস জীবনে ও কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত; তখন মৃত্যু একটা ভয়ানক ভীতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন শাস্ত্রের শিক্ষায় মহান্ ভাব সমষ্টি ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সংসারের অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনের ন্যায় মৃত্যুও ক্ষণ স্থায়িত্বের পরিচায়ক একটা সংসার-ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইত। এই ঘটনাতে বিশেষ ভয়, উদ্বেগ অথবা বিশেষ দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। মনুষ্য জন্মিলে মরে, এবং মরিলে আবার জন্মগ্রহণ করে, এই মত ও বিশ্বাস ভারতে নূতন নহে। প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির হৃদয়ে এই মত ও বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল এবং এখনও ঐ মত ও বিশ্বাস কাহারও কাহারও মন হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই। পরলোকে ও জন্মান্তরে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত আর্য্যসন্তানেরা মৃত্যুকে প্রকৃত পক্ষে

মানবের শুভপ্রদ বই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এই দার্শনিক দেশে মৃত্যু পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের ন্যায় একটা অবস্থার রূপান্তর বলিয়া কল্পিত হইত। গীতায় ভগবানের এই প্রসিদ্ধ বচন অথবা উহার মর্ম্ম সাধারণের অবিদিত ছিল না। যথা :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা ২।২২।

অর্থাৎ মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার দেহী অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ আর এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" গীতা ২।১৩

অর্থাৎ যেমন মনুষ্যদেহ কৌমার, যৌবন এবং জরা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

উপরোক্ত ভগবৎ উক্তি গুলির সার মর্ম্ম যে দেশের লোকে হৃদয়ে বদ্ধমূল সে দেশের মানব কেন মৃত্যুর ভয় করিবে?

কিন্তু হায়! কাল প্রভাবে, ভারতের দুর্দ্দশার দিনে দুর্ভাগ্য বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের সমস্ত প্রকাশক নির্ম্মল এবং প্রশান্ত জ্যোতিঃ আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইয়া তমসাচ্ছন্নে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজ আমরা সনাতন ধর্ম্মের, শাস্ত্রের এবং আপ্ত বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম ও তথ্য ভুলিয়া গিয়াছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শিক্ষার উপকারিতা ভুলিয়া গিয়াছি এবং জীবনী শক্তিও হারাইয়াছি।

কিন্তু ভগবৎ কৃপায় এবং ঋষিদিগের চরণ কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে—পুনরায় বোধ হইতেছে যেন বিদ্যার বিমল-জ্যোতিকণার আভাস পূর্ব্বাকাশে একটু একটু দেখা দিতেছে। ফলে, ইদানিন্তন ব্রহ্ম বা পরাবিদ্যার শিক্ষা ও উপদেশ বিবিধ সূত্র হইতে বিভিন্ন আকারে পুনর্ব্বার প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দর্শন ও শাস্ত্রাদির আলোচনা ও অনুশীলনহেতু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ আজ কাল কেহ কেহ ঐ সকল শিক্ষার উপকারিতার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন এবং আশা করা যায় যে ভগবৎ কৃপায় উহার প্রভাব জনসাধারণের জন্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এই শিক্ষার বিমল ও উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রভাবে মৃত্যুরূপ ভয়ঙ্কর ভীতি-মেঘ মানব-হৃদয়াকাশ হইতে অচিরাৎ অপসারিত হইবে। এবং ইহার দ্বারা আমরা মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য ও স্বরূপ কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিব এবং সাধারণ মানবের ক্রমোন্নতি চক্রের রহস্যও কিছু পরিমাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইব।

অদ্ভুত বিবাহ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মেসিডোনিয়ায় ক্রিপাস নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। বৃদ্ধ জ্ঞানী মানী ও বুদ্ধিমান। পৃথিবীর যশের ভাগ তাঁহার ভাগ্যে পড়িলেও কষ্টের ভাগ তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তিনি টিটাসের মহাকাব্য পড়িতেন, আপনি আমোদ করিতেন, হাসিতেন, গান করিতেন। যখন ক্ষুধার জ্বালা হইত, তিনি টিটাস ছাড়িয়া উঠিতেন, স্ত্রীকে ডাকিতেন আর

খাবার চাহিতেন। পণ্ডিতের ঘরে দুর্ভিক্ষের হাঁক যেমন হয়, এস্থলেও তাহার বৈপরীত্য ছিল না।

ঘরণী বিডাস বড়ই প্রেমিকা, বড় স্নেহশীলা। স্বামীর বার্দ্ধক্যে তিনি বড় দুঃখিতা ছিলেন না। বার্দ্ধক্যের জড়তায় স্বামীর রোজগার পত্র ছিল না বলিয়া তিনি কঠোরতা অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। বৃদ্ধ স্বামী খাবার চাহিলে নিজ কন্যার হাতের খাবার পাঠাইতেন, ক্রিপাস তাহা খাইয়া বড়ই সুখী হইতেন। বলিয়া রাখা ভাল ক্রিপাস তাঁহার স্ত্রীর পরিবেশন বস্তু খাইতেন না। কারণ তিনিই জানিতেন।

ক্রিপাস তখন বড় পণ্ডিত, জগৎজোড়া তাঁহার নাম। সুনামের মোহিনী শক্তিতে অনেক বন্ধুর আবির্ভাব হয়—ক্রিপাসেরও তখন বন্ধুর অন্ত ছিল না। প্রায়ই তখন বন্ধুগণের সমাগম হইত, তাহাদের জন্যও ক্রিপাসের ব্যয়ভার বর্দ্ধিত হইত। কিন্তু ক্রিপাস দুহিতার কারুণ্যে কোন বস্তুর অভাব হইত না।

ক্রমে দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও বাড়ে। গৃহিণী বিডাস এক তরকারী মাত্র রাঁধেন, তাহাতেই সকলের চলে। কিন্তু ক্রিপাস যখন খাইতে চাহেন তখন কন্যা পৈসি তাঁহার খাদ্য আনিয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখিয়া যায়, আর ক্রিপাস মহা আনন্দে খাইয়া ঢেকুর তুলিয়া থাকেন। পৈসির হাত বড় মধুর; তাহাতে বুঝি সোণা ফলে, মণিমাণিক্য ঝোলে। বিডাস রাঁধিল এক, পৈসির দয়ায় হয় তাহা পাঁচ।

কষ্টে দিন যায়, আধ পেটা খাওয়া তাহাতে ঢেকুর হয় কিসে? এক দিন বিডাস স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রিপাস, খাওয়া চলে না, প্রায় আমাদের উপবাস, ঢেকুর হয় কিসে? আর বুঝি চলে না!"

ক্রিপাস কবি! তিনি উত্তর করিলেন, "কেন আমিতো রোজ খুব

খাই, আমারতো খুব পেট ভরে! তোমাদের উপবাস হয় কেন? তোমার মত গৃহিণী থাকিতে আমার উপবাস অসম্ভব। আজ যে চারি পাঁচটা তরকারী হইয়াছে! ভাবনা করিও না, ইহা হইতেও উত্তম অবস্থা হইবে।”

গৃহিণী বুঝিলেন, স্বামী রসিকতা করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক স্বামীর কথার রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। রসিকতার অতিরঞ্জন ভাবিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আজ রবিবার—ক্রিপাস ক্রোটনের সঙ্কলিত বাইবেল পড়িতেছেন, গৃহিণী বিডাস ঘরে গিয়া স্বামীকে বলিলেন, ‘ক্রিপাস, পৈসির বিবাহের কি হইবে? সে যে পূর্ণ-যৌবনা। এখন সে স্বামীসোহাগিনী হইবার উপযুক্তা।’

“হাঁ, আমি তাহাই পড়িতে ছিলাম। ক্রীট দ্বীপের ভার্গোর সহিত তাহার বিবাহ ঠিক হইয়াছে। কেমন, পৈসি কি ভার্গোকে পছন্দ করিবে না?”

“কি বলিলে, ভার্গোর সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছে? ভার্গো, আমার মেয়ে বিবাহ করিবে কেন? সে বীর, সে বড় লোক, সে মণ্টিকোর ডিউক। সে কি আমাদের মেয়ে বিবাহ করিতে আসিবে? রাজার সহিত গরীবের ঠেক খায় না। তুমি কি পাগল হইয়াছ?”

“হাঁ, আসিবে। ভার্গো এমন কি যে সে পৈসিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে? আমার পৈসিও সুলতানা হইতে পারে, ডচেস্ হইতে পারে।’ ভার্গো পৈসিকে বিবাহ করিবে, ঠিক হইয়াছে। যদি না হয়, আমায় পাগল বলিও। অদৃষ্টে আছে, তোমার ভাবনার কারণ নাই।”

“কবে ঠিক হইল? আমি তো আজ মাত্র কথা পাড়িলাম। মেয়ে

বিবাহ লইয়াও হাসি তামাসায় থাকার সময় অসময় নাই? না, বল, বল, কবে ঠিক হইল?"

"সে অনেক দিন। গত ত্রিগণ্ডার দিন (মাইকেল মাসে) ঠিক হইয়াছে। আগামী পরশ্ব বিবাহ হইবে। ভার্গো পৈসিকে পছন্দ করিয়াছে, সে তাহাকে সুখ-দুঃখ ভাগিনী করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

"আমাদের কোন যোগাড় নাই, টাকা কড়ি নাই, বিবাহ সজ্জা নাই, বিবাহ হইবে কিপ্রকারে? আর এই বিবাহের প্রস্তাব কে করিল? এ যে অবাক সৃষ্টি। লাখ কথা পূর্ণ হইলে বিবাহ হয়, এই বিবাহে কি কথা হইবে না?"

"এই বিবাহে তোমার কিছুই করিতে হইবে না। ভার্গো নিজে সব করিবেন। তাঁহার দাস দাসী আসিবে, সেনাদল আসিবে, জয় ডঙ্কা ঢাক ঢক্কা আসিবে। বরযাত্রী খাওয়াইতেও তোমার ব্যয় হইবে না। আয়োজনের ভাবনা তোমায় করিতে হইবে না, তুমি পৈসিকে গির্জ্জায় যাইতে বল।"

গৃহিণী এবার বুঝিলেন, স্বামী পাগল হইয়াছেন। তিনি বড়ই বিষণ্ণা হইলেন, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই অস্থির হইলেন। একে বয়স্থা কন্যা ঘরে সম্বল নাই, সহায় নাই, এখন উপায় কি?

বিডাস বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। মেঘের তাড়িত মেঘেই লয় পাইতে লাগিল। তিনি সাত পাঁচ ভাবিয়া স্বামীর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ঘর কন্নার আয়োজনে যেমন যাইবেন দেখিলেন বাইবেল হাতে অনিন্দ্য-সুন্দরী পৈসি বিকসিতা সৌরভময়ী গোলাপ রাণীর মত, হাসিতে হাসিতে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে। দুহিতা দেখিয়া জননী স্নেহে আর্দ্র হইলেন, নিকটস্থ হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। যুবতী সহাস্যে মরাল গমনে পৃথিবী চমকিত করিয়া কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

জননী দুহিতার বেশ ভূষা অঙ্গরাগ দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পৈসি এই সাজ পোষাক কোথায় পাইল? আজ আবার তাহার এত প্রফুল্লতা কেন? আজ যেন সরলতায় সে আত্মহারা, আজ যেন কোন অবক্তব্য অবোধ্য অজানা ভাবান্তর আসিয়া দুহিতাকে কিরণ-মালিনী করিয়াছে। জননী সস্নেহে দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৈসম আজ তোমার ভাব দেখিয়া,আমাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করি। তোমার আনন্দে, মধুময় সরলতায় আজ যেন আমরা মৃতপ্রাণে নবজীবন লাভ করিলাম। এ বেশ ভূষা, এ অঙ্গরাগ কে দিল?" জননী সন্দেহ-সাগরে ডুবিলেন।

কন্যা হাসিয়া বলিলেন 'মা একি বলিতেছ! আমি যে তোমার কথায় গির্জ্জায় গিয়াছিলাম আজ পেক্রাসর বিবাহ হইল। পেক্রাস আমাকে অভিন্নভাবিয়া বিবাহের পর এই সাজ পরাইয়া দিল। এই সাজটি কি ভাল হয় নাই, মা? পেক্রাস গির্জ্জায় স্বামী পাইয়া বড় সুখী হইয়াছে, দুই দিন পরে স্বামীর বাড়ী যাইবে। আমাকে সঙ্গে যাইতে বলে, আমি যাইব?

পেক্রাস অতি সুন্দরী, পৈসার বন্ধু, ক্রিপাসের বন্ধু দুহিতা। পেক্রাসের পিতা মুকরস, বড় লোক, রাজার তুল্য।

যে আশঙ্কা সে আশঙ্কাই বুঝি ফলিল। স্বামী ক্ষিপ্ত, কন্যা বুঝি ক্ষিপ্ত না হইয়া যায় না! শূন্যপ্রাণে চাহিয়া জননী বলিলেন, "পৈসি আমি কখন তোমায় গির্জ্জায় যাইতে বলিলাম? তোমার বাবা তোমাকে গির্জ্জায় যাইবার জন্য আমার নিকট বলিয়াছিলেন। আমি তো সেই কথা তোমায় বলি নাই? তুমি কি সে কথা শুনিয়াছিলে? আজ রবিবার নয়, আজ কেন গির্জ্জায় গেলে?" জননী মহা ভাবিতা হইলেন।

পৈসি জননীর কথায় একটু বেজার হইল। সে বুঝিল জননী সত্যের অপলাপ করিতেছে ও তাহার এই সাজসজ্জা দেখিয়া তাঁর হিংসা হইয়াছে। পৈসা একটু রাগত স্বরে কহিল।

'মা, তুমিই গির্জ্জায় যাইতে বলিলে, আর তুমিই আমাকে সত্যের অপলাপে অভিযুক্ত করিতেছ? ভালই, তোমার কথায় আর কোথাও যাইব না।' দুহিতা বেজার হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিল পেক্রাস কত সুখী!

প্রায় সন্ধ্যা, বেশ একটু কাল আঁধার পৃথিবীর মুখ ঢাকিয়া চাপিয়া বসিল। মুখ আঁধারে ক্রিপাস হেলিয়া দুলিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। বাড়ীর কুটকে তিনি কাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে স্বর গৃহিণীর কাণে গেল, তিনি অবাক হইলেন, চমকিয়া শুনিতে লাগিলেন। আবার স্বর, সেই স্বর—সেই কথা—

"বিবাহ হইয়াছে?" এ যে বড় অত্যাচার। কোথায় বিবাহ হইল? কাহার নিকট হইল? পৈসার কি সত্যই বিবাহ হইয়াছে?"

"কেন? এই বিবাহ মহাসমারোহে হইয়াছে। সহরের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিল। তুমিও নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলে। তোমার গৃহিণী যান নাই, সে তাহার নিজের দোষে। এত বড় সাধের কন্যার বিবাহ দেখিতে যান নাই, এ দোষ কাহার? তুমি শুনিয়া সুখী হইয়াছ, বোধ হয়? তুমি তোমার গৃহিণীকে বুঝাইয়া বলিও। পৈসার সুখ পরম সুখ। পৃথিবীতে এসুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?"

কথাবার্ত্তা শুনিয়া গৃহিণীর মাথায় আকাশ ঘুরিল, পরে পৃথিবী ঘুরিল। তিনি অসাড় হইয়া নিশ্চল রহিলেন। ক্রিপাস ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন গৃহিণী স্থাণুর মত দণ্ডায়মানা। তিনি বলিলেন, 'প্রাণাধিকে, এ ভাবে

কেন? আজ বড় ভাবনাযুক্ত দেখিতেছি যে? হর্ষিত হও, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"

গৃহিণী কথা কহিবেন কি, তিনি একবারে বিস্ময়ে ডুবিয়া আছেন। তিনি পাগলের প্রশ্নের উত্তর দিবেন না, মনে করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় বাক্য আপনিই সরে। গৃহিণী কম্পিত স্বরে কহিলেন।

'তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তুমি পড়িতেছিলে, এর মধ্যে আবার বাহিরে গেলে কখন? ফটকে কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? কিসে হর্ষিত হইব? কিসে মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইয়াছে?

স্বামী কথা না কহিয়া চলিতে লাগিলেন। উত্তর না পাইয়া গৃহিণী ষোলকলায় চটিলেন। রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে স্বামীর আগে আগে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন ক্রিপাস আগের মত নিরুদ্বেগে বই পড়িতেছেন। গৃহিণীকে দেখিয়া ক্রিপাস বলিলেন, "এতক্ষণ এখানে এস নাই কেন? আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।" গৃহিণী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন পশ্চাতে লোক নাই।

"সে কি? তুমি যে উঠানে আমার পশ্চাতে কথা কহিতেছিলে? পৈসির বিবাহের কথা কাহার সহিত কহিলে? আমার আগে আগে এখানে আসিলে কি করিয়া?"

গৃহিণী একবারে ভাবনায় মরিয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন, হয় তিনি নিজে পাগল, না হয় তাহার স্বামী পাগল। দুইজন পাগল হইলেও হইতে পারে। মেয়েটীকেও জননী পাগল ভাবিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি তাহাই?

পরশ্ব আসিল। সূর্য্য উঠিল, কালমুখে গৃহিণী শয্যাত্যাগ করিলেন। তিনি স্বামীর কাছে শুনিয়াছিলেন আজ পৈসির বিবাহ। সত্যই কি বিবাহ হইবে? একি স্বপনের কথা, না মায়াজাল?

কাজকর্ম্ম সারিয়া গৃহিণী স্বামীর কক্ষে গিয়াছেন। স্বামী তখনও পাঠে নিরত—তাঁহার যেন শ্বাস প্রশ্বাস নাই। এবার গৃহিণী স্বামীকে ডাকিলেন। স্বামী বই ছাড়িয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন।

বড়ই ঢাকঢক্কা বাজিতেছে, বড় মোহন গান হইতেছে। পৈসির বিবাহ হইবে আজ। পৈসিকে গির্জ্জায় যাইতে বলিও। ভার্গো পৈসির সঙ্গ লাভে বড়ই কৃতার্থ হইবে মনে করিতেছে। আর সময় নাই, আমি যাই।

পাগলের কথা, গৃহিণী বিশ্বাস করিলেন না। অকস্মাৎ মহা গণ্ডগোল হইতে লাগিল। পাড়ায় হুলস্থূল পড়িল। বাস্তবিক এক মহারাজ লোক লস্কর লইয়া বিবাহ করিতে গির্জ্জায় চলিয়াছেন। রাজপথে লোক ধরে না, অজস্র দান চলিয়াছে, খাওয়া দাওয়া মহাধূম। আজ যেন পৃথিবীর শোক দুঃখ নাই।

বরযাত্রের দল মহা সজ্জায় বাদ্যভাণ্ড, লোক লস্কর লইয়া গির্জ্জার দিকে চলিল। স্বয়ং ভার্গো মহারাজ আসিয়া ক্রিপাসের বাড়ী ঢুকিলেন। তিনি ডাকিতে লাগিলেন, 'প্রাণের পৈসি, সময় আসিয়াছে, তোমার দান গ্রহণ করিব। বিলম্বে আমার প্রাণত্যাগ হইবে।"

গৃহিণী এবার বড় পুলকে গলিয়া গেলেন, এক লম্ফে স্বামীর গৃহে যাইয়া স্বামীকে বলিলেন, 'ভার্গো আসিয়াছেন, আমার পৈসির নিকট দান চাহিতেছেন। উঠ, গির্জ্জায় চল, বিবাহ দেখিব।'

ক্রিপাস বহি ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'প্রিয়তমে, তুমি যাও, আমি আর একটু পরে যাইব।'

যে বাদ্যভাণ্ড, যে সমারোহ, বিডাস তাহা না দেখিয়া পারেন না। তিনি স্বামীকে দেখিয়াই দৌড়াইয়া গির্জ্জায় ছুটিলেন তাঁহার পৈসির কথা মনে নাই, তাহাকে একবার ডাকিলেন না।' রমণীর আগ্রহ কি উৎকট।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিডাস গির্জ্জায় পৌঁছিলেন। তিনি দেখিলেন, বিবাহ কার্য্য প্রায় শেষ। শত সহস্র লোক বিবাহ দেখিতে দণ্ডায়মান। স্থানাভাবে কতলোক চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে বিডাস গির্জ্জার মঞ্চের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, স্বামী ক্রিপাস বাইবেল হাতে দণ্ডায়মান। ভার্গো উন্মুক্ত তরবারী খুলিয়া বাম হস্তে প্রণয়িনী পৈসির হস্ত ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন।

বিবাহ শেষ হইল, আসর ভাঙ্গিল। লোক সমারোহ বিলীন হইল। বিডাস অতি হর্ষে বাড়ীর দিকে চলিলেন। দুহিতা এত বড় লোকের হাতে পড়িল ভাবিয়া তাঁহার অপার আনন্দ। নিজে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ সভায় যাইতে পারেন নাই বলিয়া বড় খেদ করিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া দেখেন পৈসি শয্যায় শুইয়া আছে। জননী অবাক হইয়া ডাকিলেন, "পৈসা একি মা; এ আবার কি?"

দুহিতা উঠিল, নিজ সাংসারের কাজে ব্যস্ত হইল। এই যাহাকে বিবাহ বাসরে স্বামী সকাশে দেখিলেন তাহাকে আবার এখনই এই অবস্থায় দেখিয়া জননী বিডাস নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন "পৈসা, আমি দেখিলাম কি? তুমি গির্জ্জায় যাও নাই? আজ যে বড় ধূমধামে বিবাহ হইল।"

পৈসি সরল বালিকার মত জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বিবাহ হইল, মা? আমাকে লইয়া গেলে না কেন? বিবাহ দেখিতে আমার বড় সাধ।"

আজ জননী পাগলিনী প্রায়। তিনি দুহিতাকে কোন উত্তর না দিয়া স্বামীর কক্ষে গেলেন। দেখিলেন স্বামী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন! ক্রিপাস তুমি গির্জ্জায় বিবাহ দেখিতে যাও নাই? আবার কখন আসিলে?

"বিবাহ? কখন বিবাহ? বিবাহ যে গত পরশু হইয়া গিয়াছে!

পৈসির বিবাহ কয়বার হইবে? তাহার পরিধানের গাউনের নীচে খুঁজিয়া দেখ ভার্গোর পোষাক রহিয়াছে। তাহার অঙ্গুরীয় তাহার হাতে আছে।' এই কথা বলিয়াই স্বামী অচেতন হইলেন।

গৃহিণী অতি ত্বরায় পৈসির ঘরে ঢুকিয়া তাহার পরিধানের গাউন খুঁজিলেন তিনি দেখিলেন ভার্গোর পোষাক দুহিতার পরিধানে রহিয়াছে, তাহার অঙ্গুরী তাহার হাতে রহিয়াছে।

এই অদ্ভুত কাণ্ডে জননী একবারে অবাক হইলেন। পরক্ষণেই প্রচারিত হইল ভার্গো অগ্ধ পেরেক মহাসমরে বেলা বারটার সময় হত হইয়াছেন।

জননী এই সংবাদ শুনিলেন—তিনি যেই আবার দুহিতার ঘরে ঢুকিলেন, দেখিলেন ঘরে পৈসি নাই। এবার গৃহিণী স্বামীর কক্ষে ঢুকিতে লাগিলেন। সেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন বৃদ্ধ ক্রিপাল দুহিতাকে কোলে লইয়া অচেতন রহিয়াছেন, তাহাদের প্রাণ নাই।

ভূতের প্রেম।

সূচনা।

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.

আমরা অদ্য একটি সত্য ঘটনার বিষয় বিবৃত করিতেছি। নানা কারণে নাম ধাম গোপন রাখিতে বাধ্য হইয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতে হইল।

সত্যব্রত বাবু রাজার দেওয়ান। এই বর্ষীয়ান্ বহুদর্শী পুরুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও, হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কর্ম্ম গুলিকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন নাই। সত্যব্রত বাবু সাহিত্য রসিকও বটেন। তাঁহার এক দুহিতার নাম তারা সুন্দরী। যথা কালে উপযুক্ত পাত্রে তিনি কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। যৌবনোদ্গমে দেবতা-বাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে তারা শোভিতা হইয়া উঠিল। তারা উপযুক্ত রূপগুণোপেত স্বামীর প্রণয় ভাগিনী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এ সংসারে সুখাপেক্ষা দুঃখই অধিক; এই দুঃখ যে কোনছলে আসে তাহা বলা শক্ত। তারা যখন এই প্রেম তন্ময়তার সুখোচ্ছ্বাসে গা ভাসাইয়া দিতেছিল, হায়! তখন কি কোন প্রত্যাখ্যাত দুর্ব্বাসা তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিল!—তখন সেখানে বুঝি কোন অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না! তাই বুঝি সেই অজ্ঞাত অভিশাপ সর্ব্বগুণযুতা তারা সতীর চির দুঃখের কারণ হইয়া রহিল।

তারা পীড়িতা হইল। পাড়ার আক্রমণ সাময়িক, যখন আক্রান্তা হইত তখন তাহার চক্ষুদ্বয় বিহ্বলার ন্যায় হইত,—সে সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িত। ক্ষণেকে চেতন, ক্ষণেকে অচেতন অবস্থায় কিছু সময় অতীত হইলে সে সুস্থ হইত ইহা যে এক প্রকার হিষ্টিরিয়া অন্ততঃ চিকিৎসকগণ এই ব্যাখ্যা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তারা পিতৃগৃহে নীত হইলে, এক দিন তাহার মাতাকে বলিয়া ছিল যে পাড়ার আক্রমণ সময়ে সে দেখিতে পায় যেন এক ভীষণ দর্শন অগ্নিবর্ণ পুরুষ তাহার সম্মুখে। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে তাহার চেতনা অপহরণ করে! চিকিৎসকেরা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহারা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোগের কোন উপশম হইল না।

ক্রমে দেখা গেল তারা একেবারে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িত না।

কিন্তু এক দৃষ্টিতে যেন কাহার পানে চাহিয়া থাকিত—ডাকিলে নিদ্রোত্থিতার মত চকিত হইয়া উত্তর দিত কিন্তু দৃষ্টি ফিরাইতে সমর্থ হইত না। তারা বলিত যে সেই পুরুষ যেন সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, সকল সময় সে দেখিতে পায় না, তবে ইহা অনুভূত হয় কে যেন তাহার পাশে পাশে রহিয়াছে। যখন তাহাকে দেখিতে পায়, তখন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অপস্মারের সূচনা বলিয়া ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। কোন ফল দেখা গেল না। এক দিন তারা তাহার স্বামীকে বলিল "তোমরা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত বলিয়া মনে কর আর যাই মনে কর, আমি আজ সেই বিরাট্ অগ্নিবর্ণ পুরুষের কথা শুনিয়াছি। সে বলিয়াছে যদি আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করি তবে কোন অনিষ্ট করিবে না, নতুবা তাহার বিপদ ঘটাইবে। ইহা নিশ্চয় অপদেবতার খেলা। কবিরাজ ডাক্তারে ঔষধ দিয়া কেবল শরীর নষ্ট করিবে।" তারার স্বামী নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি কথাটা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার পরে দেখা যাইত যে তারা যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছে। কখনও বা ভগবানের দোহাই দিয়া অনুনয় বিনয় করিতেছে, কখনও ক্রোধারক্ত নয়নে কাহাকে তিরস্কার করিতেছে; কখনও বা অসহায় প্রহৃতার ন্যায় রোদন করিতেছে। সকলেই উন্মাদ স্থির করিলেন। কোন ঔষধ তাহার কিছু করিতে পারিল না। তারা তাহার স্বামীকে একদিন বলিল "আর ত আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। সেই পিশাচ আমার গলা টিপিয়া ধরে, প্রহার করে, তাহার দৃষ্টি যেন আমার সর্ব্ব শরীরে জ্বালা দেয়! সে কেবল বলে যে আমার সম্মতি পাইলেই সে তাহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে। যত দিন আমার সম্মতি না পাইবে সে তত দিন আমাকে যাতনা দিবে, আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তোমরা ইহার যে ব্যবস্থা হয় করিও। ইহা

বিকৃত মস্তিষ্কের কথা নহে, আমি পাগল নহি;—ঐ এখনও আমি তাহাকে দেখিতেছি।" এই বলিয়া সে রোদন করিতে লাগিল। তারার স্বামী তারার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি করাইলেন; রোজা আনাইয়া তাহাদের ক্রিয়া করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। সুতরাং সকলেই অপস্মার স্থির করিলেন।

ঠিক এই সময় আর একটি দুর্ঘটনায় তারার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তারার স্বামী ইহ লোক ত্যাগ করিলেন। স্বামি-হীনা অভাগিনী এইবার বুঝিল যে যন্ত্রণা এবং দুঃখ তাহার চিরজীবনের সঙ্গী হইবে। তারার মাতা তারার হৃদয়-ভাব অবগত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন? তারা তাঁহাকে বলিয়াছিল, যে সেই পিশাচই নাকি তাহার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এবং অলক্ষিত থাকিয়া তাহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতেছে।

তারার পিতা তাহাকে লইয়া বহুতীর্থে ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে ৺কাশীধামে বাবা শ্রীবিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। গৃহে, পথে, ঘাটে, এমন কি দেবালয়ে পর্য্যন্ত সেই পিশাচ তাহার অনুসরণ করিত, এবং তাহার সম্মতি পাইবার আশয়ে উৎপীড়ন করিত। খাদ্যে বিষ্ঠাদি মিশ্রিত করিত, প্রহার করিত কিন্তু বল প্রয়োগে তাহার কামেচ্ছা পূরণ করিতে পারিত না। কখনও বা কত প্রকারে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইত।

এই পাপ সঙ্গ হইতে মুক্তি পাইতে তারা বিশ্বনাথের মন্দিরে হত্যা দিল। কিন্তু এই অদ্ভুত পিশাচ, সেই দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, তারার গলা টিপিয়া, প্রহার করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে যেন সূচি-বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রায়োপবেশনের মনঃ সংযম নষ্ট করিয়া দিল। একবার নহে, অনেকবার চেষ্টা করিয়াও অভাগিনী তারা মনঃসংযম করিতে পারিল না।

সেই পাষাণ লিঙ্গের অভ্যন্তরে যে প্রাণ আছে তাহাকে আকর্ষণ করিতে না পারিলে ত পাষাণ দেবতার কৃপা হইবে না। অভাগিনী তারার মনের মধ্যে ভক্তিটুকু রহিয়া গেল, তাহা দেবতার চরণে পৌঁছাইয়া দিবার সুবিধা করিতে পারিল না। দেবতার সর্বলোক সঞ্চারিণী দৃষ্টি কোথায়! সয়তানের উৎপীড়ন, সতীর পাতিব্রত্য নষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার ভক্তি হ্রাস করিতে পারে নাই, সে দিকে কি দেবতার দৃষ্টি পতিত হইবে না। তারার যন্ত্রণা ত অপরকে বুঝাইবার নহে; কে তাহার নিরাকরণ করিবে! প্রকাশ করিবার যো নাই।—পাছে সাধারণে দুশ্চরিত্রার ছল মনে করে! সে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা! তাই হতভাগিনী অন্তরের ভিতর সব যন্ত্রণা লুকাইয়া লুকাইয়া সহ্য করিতে লাগিল।

* * * *

তারার পিতাও সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তারা বাঁচিয়া আছে; পলকে পলকে পিশাচের উৎপীড়ন অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্যের অলক্ষিতে, অব্যক্ত রূপে তাহার সতী-ধর্ম্মের অবিকল নিষ্ঠাটুকু দেবতার চরণে উৎসর্গ করিতেছে।

এমন কত সত্য ঘটনা দেশের মধ্যে রহস্যাবৃত হইয়া আছে। কে তাহা উদ্‌ঘাটন করিবে?

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেতাত্মার মূর্ত্তি দর্শন।

৺ভুলোদাসী।

এই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাঘমারি নামক গ্রামে পূর্ব্বে আমাদের বাসস্থান ছিল। আমাদের বাড়ীর সন্নিকটে এক ঘর কায়স্থের বসতি ছিল। তাহাদের প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে খানিকটা খোলা জমী পড়িয়াছিল এবং উত্তর দিকে একটা পিয়ারা গাছ ছিল। আমাদের পুকুরে যাইতে হইলে ঐ খোলা জমীর নিকট দিয়া যাইতে হইত।

এক রাত্রে কোন কার্য্য বশতঃ আমাকে পুকুরে যাইতে হয়। আমার সঙ্গে আর এক জন লোকও গিয়াছিল। বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি, কোন আলো লইতে হয় নাই। চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেবল মাঝে মাঝে গাছের ও বাড়ীর ছায়া পড়িয়াছে; গ্রীষ্মকাল, বেশ ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। রাস্তা দিয়া কিন্তু একটিও জন প্রাণী চলিতেছে না। তখন রাত্রি আন্দাজ দুইটা বাজিয়াছে, আমরা কিন্তু মনে করিয়াছিলাম বুঝি ভোর হইয়াছে, সেই জন্য আমরা পুকুরে আসিয়াছিলাম, নচেৎ বাড়ীর ভিতরেই কার্য্য সমাধা করিতাম। আমি পুকুরে নামিয়া গেলাম, আর সেই ব্যক্তি উপরে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রীষ্মকাল, সুতরাং পুকুরের খোলে জল নামিয়াছে। উপর হইতে আমাকে নীচে নামিতে হইল। আমি সবে মাত্র জল স্পর্শ করিয়াছি, এমন সময় সেই ব্যক্তি কায়স্থদের পিয়ারা গাছের দিকে চাহিয়া আমাকে শীঘ্র করিয়া উঠিয়া আসিতে বলিল, অনতি বিলম্বে সে সেই দিকে তাকাইয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "কেও ওখানে—কেগা তুমি কে তুমি?" আমার সকল কাজেই দেরী হইত। আমার বিলম্ব দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না, শেষে আমাকে একাকী ফেলিয়া "বাবাগো মাগো" শব্দে

চীৎকার করিয়া এক দৌড় দিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া পুকুরের পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ সেই পিয়ারা গাছের দিকে আমার নজর পড়িল এবং দেখিলাম যেন একটা স্ত্রীলোক শাদা ধপ্‌ধপে কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া হাতের চুড়ির ঝন্‌ঝনানি শব্দ করিতেছে! তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—চিনিতে পারিলাম বলিয়াই এত ভীত হইলাম যে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। দ্বারের নিকট ছুটিয়া গিয়া দেখি যে, সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং বাড়ীর আর আর সকলে তাহার সংজ্ঞা পুনরানয়নের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাহার "দাঁতকপাটি" ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই সব দেখিয়া আমি যেন এক রকম হইয়া গিয়াছিলাম—ভ্যাবা চ্যাকা মেরে গিয়াছিলাম। আমার ভয়টয় যেন কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছিল। আমি এক পার্শ্বে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহার সংজ্ঞানয়নের পর আমাকে অন্বেষণ করিবার অবসর হইল। বেশী কষ্ট করিতে হইল না—আমাকে তাঁহারা অতি নিকটেই দেখিতে পাইলেন।

এই সব গোলমালে পাড়ার লোকেরা আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই কায়স্থদিগের বাড়ী হইতেও দু'একজন ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের পরিবারে একটি বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁহাকে আমরা সকলেই "দত্তদিদি" বলিয়া ডাকিতাম —তাঁহার বয়স প্রায় ৪০।৪৫ হইবে। তিনি আসিয়া আমাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন আমরা এত ভয় পাইয়াছিলাম এবং কোথায় কিছু দেখিতে পাইয়াছিলাম কি না। সেই ব্যক্তি সুস্থ হইলে বলিতে লাগিল যে, ঐ পিয়ারা গাছের তলায় ঠিক্ ভুলোদাসীর মত একটা কাল মেয়ে শাদা ধপ্‌ধপে কাপড় পরে হাত নাড়া দিয়া তাহাকে যেন ডাকিতে

লাগিল। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহাদের (কায়েত-দের) বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক বাহিরে কোন কাজে আসিয়াছে, কিন্তু প্রশ্ন করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল না এবং আকার প্রকারে যখন বুঝিতে পারিল যে তাহাদের বাড়ীতে ও বয়সের ওরকম কোন স্ত্রীলোক নাই, তখনই সে অত্যন্ত ভীত হইল এবং দৌড়িয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিয়া-ছিল। তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করায়, আমি যাহা যাহা দেখিয়া-ছিলাম সব বলিলাম ; আরও বলিলাম যে, সে ভুলোদাসী না হয়ে যেতে পারে না। আমাদের কথা শুনে, রাত তখন কত জানিবার জন্য ঘড়ি দেখা হইল। তখন দুইটা বাজিয়াছে! এই দেখিয়া সকলে আমার মাতা-ঠাকুরাণীকে তিরস্কার করিতে লাগিল—কেন তিনি অত রাত্রিতে আম-দিগকে পুকুরে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার কোন দোষ ছিল না—জ্যোৎস্না বলিয়া রাত ঠাওর করিতে পারেন নাই এবং মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয়, ভোর হইয়াছে, সেই জন্য সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া আমাকে পুকুরে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি জাগিয়া বসিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন ছয় বৎসর হইবে এবং যে সঙ্গে গিয়াছিল, সে আমার অপেক্ষা তিন বৎ-সরের বড়।

আমাদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ঐ "দত্তদিদি" বলিলেন,—"ও ভুলোদাসী, আর কেউ নয়, ও যে এখানে আছে, আমরা কত দিন তাকে দেখেছি। কিন্তু কোন ভয় তো দেখায় না!" এই বলিয়া বৃদ্ধা আমাদিগকে খুব সাহস দিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

এই ভুলোদাসী আমাদের এক প্রতিবেশীর কন্যা। বাল্যকাল হইতে আমরা তাহার সহিত এক সঙ্গে খেলাধূলা করিতাম। পরে এই পাড়া-তেই ঐ কায়স্থদিগের বাড়ীতে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন দিবস পরে, অর্থাৎ হলুদ কাপড় ঘুচিতে না ঘুচিতে, ওলাউঠা রোগে শ্বশুর

বাড়ীতেই তাহার মৃত্যু হয়! তাহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে উপরোক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম। সেই যে একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আর দেখি নাই। বলিতে পারি না, সে এখন প্রেতপুরী হইতে মুক্ত হইয়াছে কি না?

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

ভৌতিক আবেশ।

শ্রীযুক্তা দক্ষবালা-নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের উপর ভৌতিক আবেশ হয় তাহার বৃত্তান্ত।

জিয়াগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়ের বাটীতে এই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দক্ষবালা কালীবাবুর শালার কন্যা। বয়স প্রায় ১৯।২০ বৎসর আট নয় বৎসর হইল বিবাহ হইবার অল্প দিন পরেই বিধবা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকটি অতি নম্র-স্বভাব ও বিধবা হওয়ার পর কোন প্রকার কুৎসা তাহার বিরুদ্ধে শুনা যায় নাই। পূর্ব্বে তাহার উপর নাকি আর ২।১ বার ভর হইয়াছিল। সেইজন্য কোন একজন লোক তাহাকে একটি কবচ দিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বে কখন এখানে আসে নাই। সম্প্রতি কালী মাষ্টারের পুত্র বিয়োগ হওয়ায় তিনি বাড়ী গিয়াছিলেন সেখানে তাহার অমাবস্যার দিন অত্যন্ত ফিট (Feat) হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাসের সহিত কালী বাবুর প্রত্যাগমনের পর দিন

সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সুরেন্দ্রকে সকল কথা বলেন। সুরেন্দ্র আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া ভূতের খেলা সন্দেহ করেন এবং ফিট (Feat) হইলে ডাকিতে বলেন। সেই দিনেই সন্ধ্যা বেলায় সুরেন কালী বাবুর বাড়ীরদিকে যাইতেছিল এবং তাহার সঙ্গে আমি (Surens Friend) ছিলাম। পথি মধ্যে কালীবাবুর ভাই মতিবাবু সুরেনকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া লইয়া যান। আমিও অনুসরণ করি। সেখানে আরও ১২।১৩ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সুরেন ভিতরে রোগীর কাছে দেখিতে যান। দু একজন ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহারাও এটাকে ঠিক Histiria Feat বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সুরেন দেখিয়া এটা ভৌতিক ব্যাপার (ফেনমেনা) বলিয়া স্থির করে। এবং সেই দিন সুরেনের সঙ্গে ভূতের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। সমস্ত গুলি সত্য বলিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রথমত ভূতটা সুরেনকে অনেকপ্রকার ভয়প্রদর্শন করে কিন্তু যখন সুরেন তাহাতে বিচলিত না হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া কার্য্যারম্ভ করে তখন অবশেষে কথার উত্তর দিয়াছিল। ভূতের সঙ্গে যাহা কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল তাহার মোটামুটী ভাবার্থ এই। সে বিনোদ ঘোষের ছেলে জাতি গোয়ালা। যুবাবস্থায় বড় দুষ্ট-প্রবৃত্তি ছিল। এবং তাহারা ২।৩ জন একত্রে দল বাঁধিয়া এই উৎপাত করিতেছে। সহজে ছাড়িয়া যাইবে না। এই স্ত্রীলোকটি নাকি কোন গাছতলায় বাহ্যে করিয়াছিল তাই ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। আর যখন সে এই মেয়েটির উপর ভর হয়, তখন সে এই মেয়েটির অন্য শরীর গুলা তাহাদের জগতে লইয়া যায়, পরে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মেয়েটির স্থূল শরীরে প্রবেশ করাইয়া ঐ খেলা করে। যাহাহউক অনেক তাড়নায় সে ছাড়িয়া যায় বটে কিন্তু আবার আসিবে।

রাত্রে ঐ ভূত (অনুসন্ধানে বিষ্ণু ঘোষ নাম জানা গিয়াছে) সুরেনের

বাড়ীতে আরও ৮ জন সঙ্গে লইয়া দেখা দেয় এবং সুরেনকে নানা প্রকার শাসায় ও সুরেনকে আর যাইতে নিষেধ করে। কিন্তু সুরেন পরোপকার বিবেচনায় ক্ষান্ত হয় নাই। কালীবাবুদেরও বিশেষ আগ্রহ আছে। আর এককথা বিষ্ণু ঘোষ ছাড়িয়া যাওয়ার পর একটী বুড়ি ভূত কালীবাবুকে বেহাই বলিয়া ডাকে এবং ঐ দক্ষার উপর ভর করিয়া আরও কতক পারিবারিক কথা বলে এবং কালী বাবুকে ৫টা শিকড় পেটের ব্যারামের ঔষধ (কালীবাবুর প্রার্থনা মত) দিয়া গিয়াছে। রোগী সুস্থ হইবার পূর্ব্বে দাঁতি লাগে। আর আসার পূর্ব্বে দক্ষবালা তাহার কবচ টা ফেলিয়া দেয়। বুড়ি ভূতটা পুনরায় আসবে বলে। পর দিন রবিবার ২২শে অগ্রহায়ণ ঠিক সেই সময় সন্ধ্যার সময় আবার ভূত আক্রমণ করে। এদিনও সুরেন আবার ভূতটাকে control যে আনিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। এবং ভূতটা পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা কিছু ভীত বলিয়া বোধ হয়। মোট কথা সে এই বলিয়াছে যে পূর্ব্ব জন্মে আমি ও স্ত্রীলোকটি নিম্ন জাতি ছিলাম এবং উভয়ে স্বামী স্ত্রী ছিলাম।

9th December 1907 Monday. অদ্য সন্ধ্যার সময় রোগী দক্ষবালাকে মেসমেরাইজ (mesmerise) করা হয়। যেরূপ প্রশ্ন উত্তর হইয়াছিল নিম্নে লিখিত হইল।

S—(সুরেন), Sp (দক্ষ বালার self)

S—তোমার শরীর কোথায় ?

Sp—শূন্যে।

S—নেমে এস ?

Sp—চল।

S—পূর্ব্বমুখ চল।

Sp—এলাম।

S—কালিবাবুর ডাক্তার খানা দিয়া ভিতরে এস ?

Sp—এলাম।

S—কার শরীর ?

Sp—আমার।

S—কি রং ?

Sp—ফরসা।

S—হলদে আছে কি ?

Sp—হলদে নাই; কমলানেবুর রং আছে।

S—তোমার শরীর বড় কি যে শরীরটা পড়ে আছে সেটা বড়।

Sp—যেটা পড়ে আছে তার চেয়ে আমার শরীর বড়।

S—দক্ষকে দেখতে পাচ্চ ?

Sp—চিনতে পারছিনা।

S—দক্ষর কি হয়েছে ?

Sp—অসুখ করেছে।

S—কি অসুখ ?

Sp—ভয়খায় কিন্তু মনে থাকে না (not concious of ভয়)।

S—দক্ষর গায়ে ওটা কি মাদুলি ?

Sp—রাম কবচ।

S—ঐ কবচটী কে ফেলেদেয় ?

Sp—দক্ষ ফেলেদেয় কিন্তু কোথায় ফেলে মনে থাকে না।

Sp—পূর্ব্ব জন্মের কোন কথা (result) বলতে পারি না।

S—দক্ষর কি ব্যারাম ? না আর কিছু।

Sp—ভূত-দৃষ্টি।

S—কিসে ভাল হবে ?

Sp—গতি করলেই ছেড়ে যাবে।

Sp—গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে।

S—কে পিণ্ডি দিতে যাবে ?

Sp—যে কেও গেলেই হতে পারে।

S—দক্ষ গেলে হবে ?

Sp—হতে পারে কিন্তু ভূত ধরলে দক্ষ পারবে না।

S—দক্ষ গোয়ালকে দেখেছে ?

Sp—না—সে মরেছে।

S—তুমি কে ?

Sp—আমি আমি।

S—দক্ষ কেমন ?

Sp—ভাল।

Sp—দীক্ষা হয় নি।

S—গুরু বংশ আছে কি ?

Sp—বাপের আছে, স্বামীর গুরু বংশ আছে তাঁকে পাব কোথায়।

S—গুরু বংশ হতে গুরু করতে হয় কি অন্য ভাল লোক হলে চলে ?

Sp—ভাল লোক হলে পাপ নাই।

Sp—কালীবাবুর গুরু বংশ মন্ত্র দিলে হবে।

S—আচ্ছা আমার সঙ্গে চল।

Sp—কলিকাতায় এলাম ?

S—Harrison Road Amherst Street,

মেছবাজার, বড় বাড়ি, ঝামাপুকুর—বাড়ি দেখ।

Sp—দেখলাম।

S—ভিতরে আমার গুরুদেব বসে আছেন দেখ।

Sp—হাঁ।

S—কি কর্‌ছেন?

Sp—আহ্নিক কর্‌ছেন।

S—তাঁর সাম্‌নে একটী বাক্স খোলা আছে দেখতে পাচ্চ?

Sp—বাক্স দেখতে পাচ্চি না।

S—ইনি কেমন লোক?

Sp—ভাল লোক।

Sp—ইহার কাছে মন্ত্র নিলে হ'তে পারে?

S—ব্যারামটা কত দিনে ভাল হবে?

Sp—বল্‌তে পারব না।

Sp—ভাল হবে কিন্তু কত দিনে বলতে পারি না।
গয়ায় পিণ্ডি ও দীক্ষা দিলে সারবে।

S—বুড়ি ভূতটা কে?

Sp—দক্ষর মাই ভূত হয়েছে।

S—ভূত কেন ধরেছে?

Sp—বাহ্যে করার জন্য।

Sp—ষষ্ঠী গাছতলায় উলঙ্গ হয়ে তিন চার দিন বাহ্যে করেছিল।

Sp—ভয় দেখানতেও শুনেনি।

S—আজ গোয়াল ধরতে পারবে না।

Sp—ওর সঙ্গে জোর করে পারি না।

S—তার উপর রাগ কর না।

Sp—কাল আমি ঠাণ্ডা হয়ে থাকব, গোলমাল করব না।

S—কাল মাদুলি গায়ে রাখবে।

Sp—রাখব ।

S—বল, হে ভগবান্ আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি কাল মাদুলি রাখতে পারি ।

Sp—হে ভগবান্ ... পারি ।

S—যদি কাল নেহাৎ আসে তবে পূর্ব্বে দুর্গাকে (কালীবাবুর কন্যা) বলবে আর আমাকে ডাকতে বলবে ।

Sp—দুর্গাকে বলব ও আপনাকে ডাকতে বলব ।

S—তোমার কোন্ মূর্ত্তি ভাল লাগে ?

Sp—কালী মূর্ত্তি, আজ শোয়ার সময় কালীমাকে ভেবে শোব । পরে সুস্থ অবস্থা হলে যে কয়টি Gugentens (thought) দেওয়া হইল । তাহা মনে ছিল ।

এই ঘটনার পর মেয়েটি কয়েক দিন ভাল ছিল । কিন্তু আবার ২।১ বার উৎপাত হয় । পরে একটি ওঝা দ্বারা ঝাড়ান হয়, তাহাতেও তত বেশী ফল হয় নাই ।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস কিন্তু তাহার জন্য কিছু দিন প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং Good thought দিয়াছিল । পরিশেষে দীক্ষা দেওয়ার পর মেয়েটি ভাল আছে । ব্যাপারটি আশ্চর্য্য বটে, আমাদের মনে হয় পূর্ব্ব জন্মে তাহাদের কোন একটী এমন কারণ আছে, যে জন্য এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে । বাহ্যে করা একটী নিমিত্ত কারণ ।

নেহালিয়া পোঃ
জীয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ ।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ।

ভূতের চণ্ডীপাঠ।

(উপসংহার)

হেমের বিবাহের গোলমাল সব মিটিয়া গিয়াছে। পাকস্পর্শের এক দিন পরে অভ্যাগত কুটুম্বগণকে বিদায় করিয়া সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কয়েক বন্ধুতে গল্প করা যাইতেছে। পরদিন হইতে গুড ফ্রাইডের ছুটী। সুতরাং শেষরাত্রে উঠিয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। অনেক রাত্রি অবধি গল্প চলিতে লাগিল। গল্পের বিষয় হেমের শ্বশুরবাড়ীর ভৌতিক ব্যাপার! ও সার্ব্বভৌমমহাশয়-কথিত ভূতের অধ্যাপকতা।

উভয় বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ অবধি আলোচনা হইল। অবশেষে আমি বলিলাম "হেহ এ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মতামত শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে আমরা প্রতিশ্রুত আছি। চল না, ছুটীর মধ্যে একদিন যাই।" সকলেই এক মত হইয়া স্থির করিলেন যে, রবিবার প্রাতঃকালে আহারাদির পর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাটীতে যাওয়া যাইবে। সার্ব্বভৌম মহাশয়কেও এই মর্ম্মে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

রবিবার প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করিয়া বেলা এগারটার ট্রেণে পাঁচ বন্ধু মিলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শেয়ালদহে পৌঁছিয়া ট্রাম আরোহণে সিমলায় সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সার্ব্বভৌম মহাশয় কলিকাতায় একজন জানিত লোক সুতরাং তাঁহার বাটী খুঁজিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

বাটী খানি দক্ষিণদ্বারী সদর দরজার দুইধারে দুইটী বৈঠকখানা। তার পর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার উত্তরে পূজার দালান ও তাহার পর

অন্দর মহল। অন্দর মহলের চারিদিকেই ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ। বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ। দুই চারি বার দ্বারের কড়া নাড়া দিতে একজন উড়িষ্যাদেশীয় ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ ভৃত্যটী নূতন আমদানী। কারণ আমাদের ৫।৬ জনকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "সার্ব্বভৌম মহাশয় বাড়ীতে আছেন?" সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল আমার অধামুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমরা কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা তাড়াতাড়ি উড়িষ্যাবাসীকে গালি দিতে দিতে সরাইয়া আমাদের সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনারা ভিতরে আসিয়া বসুন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহার করিতেছেন। আহার শেষ হইলেই আপনাদের নিকটে আসিবেন।" আমরা বলিলাম, "তাঁহাকে তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ করিবে। আহারের পর রীতিমত বিশ্রাম করিয়া যেন তিনি আসেন। আমাদের জন্য তাড়াতাড়ি করিলে আমরা বড়ই দুঃখিত হইব। ততক্ষণ আমরাও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ও তামাক টামাক খাই।" বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তামাক দিতে বলিল, ইতিমধ্যে আন্দাজ চতুর্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক একটি যুবক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে গৃহে প্রবেশ করিল। যুবকের আকৃতি অতি সুন্দর। বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর বাহুদ্বয় সুগোল ও বলিষ্ঠ, বিশাল বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নয়নদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত ও জ্ঞান জ্যোতি-প্রচারক, ওষ্ঠের উপরে অল্প অল্প গোঁপের রেখা। মস্তকে কৃষ্ণ কেশ মধ্যস্থলে দুই দেশে বিভক্ত ও পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম শিখা। পরিধানে কেবল একখানি পরিষ্কার শিমলার কালাপেড়ে ধুতি। পরিচয়ে জানিলাম যুবক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র।

সংস্কৃত কলেজের এমে পাশ করিয়া রাজ-সরকারে কোন উচ্চ পদের

প্রার্থী। যুবক আসিয়াই সাহাস্য বদনে অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনাদের রৌদ্রে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আপনাদের পত্র পাইয়া মনে করিলাম যে প্রাতঃকালে আসিয়া এই স্থানেই আহারাদি করিতে অনুরোধ করি, কিন্তু দাদা মহাশয় বলিলেন যে তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত আমাদের বাটীতে অন্ন আহার করিতে আপত্তি করিতে পারেন।

আমি। সেকি ! সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাটীতে খাইব সেতো আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহাতে আপত্তি করিব এমন কুলাঙ্গার আমরা নই। তবে প্রাতঃকালে কিছু সাংসারিক কার্য্য আমাদের সকলেরই ছিল আর একেবারে ৫।৬ জন অতিথি হইয়া আপনাদের ব্যতিব্যস্ত করা যুক্তি-যুক্ত মনে হয় নাই।

যুবক। আমরা পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের সেবা করা আমরা পুণ্য বলিয়া মনে করি। সে যাহা হউক বিবাহ দিতে গিয়া আপনারা যে ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছেন তাহার বিবরণ দাদা মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। আর পূর্ব্বস্থলীর ঘটনাও অনেকবার তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। ঘটনা দুইটিই অতি আশ্চর্য্য। এ সকল ঘটনা শুনিয়া প্রেত-লোক অবিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু এ সকল রহস্য উদ্ভেদ করিতেও আমরা অক্ষম। এ বিষয়ে থাকা মহাশয়ের কিরূপ মতামত তাহা শুনিতে আমাদের বড় কৌতুহল হইয়াছে।

ইতি মধ্যে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল কর্ত্তা আসিতেছেন তাঁহার খড়মের শব্দও শুনা যাইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি হুঁকা দূরে রাখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিনি গৃহ প্রবেশ করিলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি সহাস্যমুখে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ সকলকে উপবেশন করিতে বলিলেন। আপনিও

বলিলেন। ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, সেই ভৌতিক তত্ত্ব জানিবার জন্য এই রৌদ্রে কষ্ট করিয়া আসা হইয়াছে ?

আমি। তাও বটে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করাও উদ্দেশ্য বটে।

সার্ব্বভৌম। আমাদের সেকালের মত, তোমাদের মতন শিক্ষিত যুবকদের সন্তুষ্ট করিতে পারিবে কি না বলিতে পারি না। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহাই তোমাদের বলিতে পারিব। আজ কাল ইউরোপে বড় বড় পণ্ডিতগণ অনেকানেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। সে সকল আলোচনা করি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমাদের সেকালে লোকের বিশ্বাস যে পুরাতন মুনি ঋষিগণ চিরজীবন গভীর চিন্তা ও ধ্যানে যাহা বুঝিয়াছেন তাহার উপর আর কেহ কিছু নূতন কথা বুঝাইতে পারিবে না। সে কথা থাক্। এখন উপস্থিত বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে আত্মা অবিনাশী যে সম্বন্ধে তোমা-দের কাহারও কিছু সন্দেহ আছে কিনা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, "বাল্যকাল হইতে পরলোক বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি ; কাযেই সেই বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তাহা বোধ হয় দিতে পারিব না।

সার্ব্বভৌম। প্রত্যক্ষ প্রমাণই অকাট্য হইতে পারে। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের প্রমাণ।

যিনি গীতা ও বেদাদিকে মনুষ্যোক্তি মনে করেন, তাঁহার নিকট অবশ্য ইহা অভ্রান্ত প্রমাণ নয়। কারণ মনুষ্য মাত্রই ভ্রমের অধীন।

মনুষ্যের উক্তি কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না। এক ঈশ্বরই ভ্রম প্রমাদাদি শূন্য। গীতা ও বেদাদিকে যদি ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর অন্য প্রমাণ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক কি? হিন্দু সন্তান আমরা, বেদ বাক্যে আমাদের অটল বিশ্বাস; সেই জন্য অন্য কোন প্রমাণ অনুসন্ধান করি না।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। যেমন বাল্যকালান্তে কৌমার আসে, কৌমারান্তে যৌবন ও যৌবনান্তে জরা উপস্থিত হয়, তেমন এ দেহান্তে নূতন দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়।

"পুনরাগমন।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদিও আমি আহত হই নাই, তথাপি মৃত্যুভয়ে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতবৎ হইয়াছিল। সমস্তরাত্রি যেন আমার নেশার ঘোরে কাটিয়া গেল। সে ভীষণ প্রান্তর হইতে কখন মুক্তিলাভ করিলাম, কোথায় গেলাম, আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাহার কি হইল, কে রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। যখন ঘোর ছাড়িল, তখন দেখি আমি সেই পূর্ব্বোক্ত চটিতেই আশ্রয় পাইয়াছি।

তখন অরুণোদয়। চারিদিকের গাছগুলা পক্ষীর কলরবে পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন আমি কোথায় আছি বুঝিতে পারিলাম না। এক বাতায়ন-বিহীন অন্ধকারময় অপরিসর কুটীর মধ্যে আমি কেমন করিয়া আসিলাম। আমার মনে হইতেছিল, সারারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কে যেন আমার শুশ্রূষা করিয়াছে। কিন্তু জাগিয়া চারিদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। জাগরণ আমার পক্ষে স্বপ্ন-প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শয্যার দিকে চাহিলাম—কি অপরিচ্ছন্ন! ঘৃণায় আমি উঠিয়া বসিলাম—আমার নেশা টুটিল।

তখন অল্পে অল্পে রাত্রির ঘটনা আমার মনে জাগিতে লাগিল। খুল্ল-পিতামহের সেই আশ্বাস-বাণী আমার কর্ণে দ্বিতীয় বার যেন ধ্বনিত হইল। "গোপীনাথ! ভাই, উঠ। দামোদর তোমাকে রক্ষা করিয়ছেন।"

আমি চারিদিক চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন ঈষদুচ্চ স্বরে ডাকিলাম --"এখানে কে আছ?"

আমার কথা শুনিবামাত্র পূর্ব্বদিনের পরিচিত সেই চটিয়াওয়ালা ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবু! সুস্থ হইয়াছ?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আমি কোথায় রহিয়াছি?"

"কেন বাবু! কাল ত তুমি একবেলা এখানে কাটাইয়া গিয়াছ।"

"এখানে আমাকে কে আনিল?"

"তিনি বাহিরে বসিয়া আছেন।"

"আমাকে তাঁর কাছে লইয়া চল।"

"উঠিতে পারিবে?"

"কেন পারিব না—আমার কি হইয়াছে!"

বলিলাম বটে, কিন্তু উঠিতে গিয়া দেখি, শরীরে এক কড়ারও সামর্থ্য নাই। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল—বুঝিয়াই সাহায্য করিতে আমার হাত ধরিল। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"বাবু! তোমার বড়ই পুণ্যের জোর, বড়ই পরমায়ু, তাই রায়দিঘীর ধার হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছ।"

তাহার কথায় বুঝিলাম, রাত্রের দুর্দ্দশার কথা সে জানিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াও কোন উত্তর করিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে গেলাম।

বাহিরে উপস্থিত হইয়া একি—এ কি দেখিলাম!—"গোপাল! গোপাল! তুমি!"

গোপাল একটী মোড়ার উপরে বসিয়াছিল। বসিয়া একদৃষ্টে চটির সম্মুখস্থ পথের পানে চাহিয়াছিল; যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমার কথা শুনিবামাত্র চমকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"ভাই! সুস্থ হইয়াছ?"

মনে করিলাম, দুই বাহু দিয়া গোপালকে সবলে জড়াইয়া ধরি। কিন্তু, আত্মাপরাধী যেমন হৃদয়কে অন্বেষণ করিতে যাইয়া মর্ম্মপীড়ায় কাতর হয়, হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে সর্ব্ব শরীর যেমন তাহার অবসন্ন হইয়া আসে, আমারও তাহাই হইল। আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিল, গোপালের কাছে উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

গোপাল যেন তাহা বুঝিতে পারিল। সে ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল—"পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাও। এখন সুস্থ হইয়াছ কিনা বল।" এই বলিয়া সে আমাকে মোড়ায় বসিতে অনুরোধ করিল। আমি বসিলাম না। চটিওয়ালা বুঝিতে পারিয়া

আর একটা মোড়া আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে এক সময়ে উপবিষ্ট হইলাম।

গোপাল একবার মাথা নামাইল। আমার বোধ হইল, গোপাল স্মৃতি উদ্দীপিত মমতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এই অবকাশে আমি একবার গোপালের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।

আজ সাত বৎসর, পরে চক্ষের এক নিমেষে গোপালকে দেখিয়া লইলাম। এক মুহূর্ত্তের দর্শন! মনে হইল যেন এই সাত বৎসরে যৌবনের প্রথমোন্মেষে অরুণের সপ্তরাগধারার একত্র সম্মিলনে ঘনাবর্ত্ত ক্ষীর সঞ্চয়ের ন্যায় গোপাল স্নিগ্ধ রবিজ্যোতি নিজের দেহযষ্টি খানিতে আবদ্ধ করিয়াছে!

কিন্তু গোপালের এ দীন বেশ কেন? পায়ে জুতা নাই, গায়ে একটী জামা নাই—একখানি অর্দ্ধমলিন অপরিসর বস্ত্র, অর্দ্ধমলিন উত্তরীয়ে দেহ আচ্ছাদিত! এ দীন বেশে গোপাল এমন সুন্দর কেমন করিয়া হইল। গ্রাম্যশ্রীকে যদি কেহ কখন প্রীতির নয়নে দেখিয়া থাক—শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র লইয়া, শ্যামারুণ পত্র শোভিত তরুরাজি লইয়া, হংস কারণ্ডব শোভিত, কমল-কহ্লার-প্রফুল্ল দিঘী সরোবর লইয়া, ভ্রমর নিষেবিত বিচিত্র কুসুমমণ্ডিত, আরণ্য লতাকুঞ্জ লইয়া যদি কেহ কল্পনায় একটী নবনীত লোল দেহ রচিতে সমর্থ হও, তবেই গোপালের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অনুভবে আনিতে পারিবে।

গোপালের শ্রী দেখিয়া সেই মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যেই আমার মনে ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল। অনুপল সময়ের মধ্যে একবার ভাবিয়া লইলাম, আমিও গোপালের ন্যায় দীন হইলাম না কেন? একবার মনে হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে দেহ সাজাইতে, আমাদিগের চিরন্তন সহজ সৌন্দর্য্যকে সমাধিস্থ করিয়াছি। এখন স্রোতে গা ভাসাইয়াছি, আর সে সৌন্দর্য্য

ফিরিয়া পাইব না। মুহূর্ত্তের চিন্তাকথা অগাধ চিন্তা সমুদ্রে বিলীন করিয়া আমি প্রথমেই কথা কহিলাম। বলিলাম—"গোপাল! ভাই, তোমার এ দীন বেশ কেন?"

গোপাল বলিল,—"ভাই! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল প্রশ্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"ভাল, দাদা মহাশয় কোথায় জানিতে পারি কি?"

"তিনি তোমার সঙ্গীদের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন।"

"রাত্রে আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিয়াছ কি তুমি?"

"সুশ্রূষা করিতে হয় নাই বসিয়াছিলাম মাত্র।"

"আমি কলিকাতায় ফিরিব কেন?"

"বাবা বলিয়াছেন, বড় অশুভক্ষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ। এ যাত্রা তোমাকে ফিরিতে হইবে।"

"আমি যে তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

"কি করিব ভাই, পিতার অনুমতি ভিন্ন ত যাইতে পারিব না।"

"আমি দাদা মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া অনুমতি লইব।"

"বোধহয় – বোধহয় কেন—আমার বিশ্বাস, তিনি অনুমতি দিবেন না।"

"অবশ্য অনেক অমর্য্যাদা করিয়াছি—"

"অমর্য্যাদা কিছুই কর নাই।"

"তবে যাইবে না কেন?"

গোপাল নিরুত্তর রহিল। আমিও ভাবিলাম, একথা গোপালের কাছে কহিয়াই লাভ কি! ছোট্ ঠাকুরদা আসিলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া গোপালকে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিব। তবে গোপালের মনটা

জানিবার ইচ্ছা হইল। তাহার নিজের কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে কিনা! কিন্তু পাছে মনোভাব জানিয়া গোপাল কথায় উত্তর না দেয়, এইজন্য একটু ঘুরাইয়া, নানা কথা প্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিলাম। প্রথমেই তার পড়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম— "পড়াশুনা কি ছাড়িয়া দিয়াছ?"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িয়াছি। তবে একজন সাধুর কাছে কিছুদিন শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি। তাও সামান্য—উল্লেখের অযোগ্য।"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িলে কেন?"

"পড়িবার সুযোগ কোথায়?"

"পড়িবার ইচ্ছা আছে?"

"আগে ছিল, এখন আর নাই।"

"যদি ইচ্ছা থাকে, আমি এখনও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি তোমার যে বুদ্ধি, তাঁহাতে অল্প দিনেই তুমি ইংরাজীতে পারদর্শী হইতে পার।"

"তাহাতে লাভ কি?"

"কেন, আমি ইন্‌জিনিয়ার হইয়াছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমার আড়াইশত টাকা বেতনের চাকরী হইবে। একটু চেষ্টা করিলে তুমিও ইন্‌জিনিয়ার অথবা উকীল হইতে পার।"

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"তা হইয়াই বা লাভ কি?"

"লাভ কি! গোপাল! একি বুদ্ধিমানের যোগ্য কথা বলিলে?"

গোপাল উত্তর করিল না। আমি বলিতে লাগিলাম—"আমার উপর অভিমান করিয়া তোমার পড়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই।"

"অভিমানে তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আমিত এবেশে সাজিবার আর কোনও কারণ দেখিতে পাইনা।"

"দামোদর আমাকে এই বেশে সাজাইয়াছেন।"

"দামোদরের কথা তুলিয়া আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিওনা। আমি বুঝিতেছি অভিমান।"

"বুঝিলে আমি কি করিব।"

"অভিমানে তুমি এই সাত বৎসর আমাদের কোনও সংবাদ লও নাই। মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছ।"

"গোপীনাথ! সে স্নেহ ভুলিবার নয়!"

কথা বলিতে বলিতে গোপালের মুখ কেমন এক অপূর্ব্বভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা দেখিয়া নীরব থাকিবার আমার সময় নয়। আমি গোপালকে লইতে আসিয়াছি। আমি বলিতে লাগিলাম, "তবে মায়ের তত্ত্ব লও নাই কেন?"

"মায়ের তত্ত্ব লইনা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"যদি ভূত প্রেতের সাহায্যে লইয়া থাক ত বলিতে পারি না। নতুবা তত্ত্ব লইবার কোন নিদর্শন ত অদ্যাবধি দেখিতে পাই নাই। আমি তোমাকে মায়ের কথা জানাইয়া কত পত্র দিয়াছি, তুমি একটীরও উত্তর দাও নাই।"

"আমি পত্র পাই নাই।"

"সেকি! একখানিও পাও নাই। এমনত হইতে পারে না।"

"পত্র কি তুমি নিজ হাতে ডাকে ফেলিয়াছ?"

"না, আমার মনে হয়, সমস্তই আমি শ্যামের হাত দিয়া ডাকে দিয়াছি।"

"আমি পাই নাই।"

পাই নাই! শুনিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর দিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ বহ্নি ছুটিয়া গেল! তবে কি পিতা মাসে মাসে শ্যামের হাত দিয়া

গোপালের নামে যে টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহাও কি গোপাল পায় নাই! ধীর গম্ভীর ভাবে আমি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপাল! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তার উত্তর দিবে?"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা করিবে বুঝিয়াছি।"

"পল্লীগ্রামে দুইজনের পক্ষে মাসে ত্রিশ টাকা যথেষ্ট; কেমন নয়?"

"যথেষ্ট।"

"গোপাল! পিতা প্রতি মাসে তোমার নামে এই ত্রিশ টাকা পাঠাইয়াছেন—আজিও পাঠাইতেছেন। তুমি কি তাহা পাও নাই?"

"প্রতিজ্ঞা কর দাদাকে একথা বলিবে না।"

"সে কথা বলিতে পারি না। তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি পাও নাই।" গোপাল মস্তক অবনত করিল আমার কথার উত্তর দিল না। আমি গোপালের হাত ধরিলাম। "ভাই গোপাল, উত্তর দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

"প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা দাদাকে জানাইবেনা!"

"ভাল জানাইব না।"

"এখানে আসিবার পর অদ্যাবধি এক কপর্দ্দকও দাদার কাছ হইতে সাহায্য পাই নাই।"

আগে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখন সমস্তই বুঝিলাম। বুঝিলাম শ্যাম আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। আর তাই বা কেন, অহঙ্কৃতের অনিচ্ছার দান এরূপ পরমাত্মীয়ের কাছে পঁহুছিতে পারে নাই। ছোট ঠাকুরদা পিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।

মর্ম্মপীড়ায় আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। লজ্জায় কিয়ৎক্ষণ আমি গোপালের মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না।

গোপাল আমাকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিল, বলিল—

"ইহাতে লজ্জার কিছু নাই গোপীনাথ!" "আমাদের যাহা ভাগ্যে নাই, মানুষের সাধ্য কি চেষ্টা করিয়া তাহা আমাদের দেওয়াইতে পারে।"

"তাহ'লে শুধু জমীর উপস্বত্বের উপরই তোমাদের নির্ভর করিতে হইয়াছে?"

"তাও নাই। শুনিয়াছি তোমার পিতা শ্যামকে সে জমী জমা করিয়া দিয়াছেন। শ্যাম তাহা হইতে আমাদিগকে বেদখল করিয়াছে।" এতক্ষণ পরে গোপালের বেশের মর্ম্ম বুঝিয়াছি। বুঝিলাম ভিখারীর সহিত এতক্ষণ কথা কহিতেছি। গোপালের কি করিয়া দিন চলিতেছে, আর জানিতে সাহস হইল না। ভিক্ষা ভিন্ন পিতা পুত্রের আর কি উপজীবিকা হইতে পারে!

এতদিনের পরে একটা মনের কথা বলি। বহুদিন হইতে গোপালের কোনও সংবাদ না পাইয়া দুই একবার আমার মনে সন্দেহ উঠিয়াছিল, বুঝি গোপাল ইহজগতে নাই। আমাদের বাটীর সম্মুখের কোম্পানীর বাগানে একবার গোপালের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সেটা কেমন করিয়া হইয়াছিল, আজিও পর্য্যন্ত চিন্তায় মীমাংসা করিতে পারি নাই। মায়ের কাছে গোপালের কথা তুলিতে গিয়া তাঁহাকে যে অবস্থায় ফেলিয়াছিলাম, তাহাতেই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তথাপি শ্যামের হাত দিয়া মাসে মাসে গোপালের জন্য টাকা পাঠাইতেছি। শ্যাম একটী দিনের জন্যও গোপালের কথা আমাদের জানায় নাই। টাকাটার কি হয় জানিবার জন্যই তুলাসিংকে গোপালের সংবাদ লইতে আমাদের গ্রামে পাঠাইয়াছিলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, আমাদের বাস্তুভিটা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তাহার ভিতরে একটা ঘরের চিহ্ন মাত্র আছে, কিন্তু ঘর নাই, প্রতিবেশীদের কাছে জানিতে গিয়া সে গোপাল কিম্বা তাহার পিতার কোনও সংবাদ পায় নাই। ইহাতে

আমি বুঝিয়াছিলাম গোপাল নাই ; শ্যাম তাহার অনস্তিত্বের কথা গোপন করিয়া এতদিন ধরিয়া টাকাটা আত্মসাৎ করিতেছে। জীবিত গোপালকে যে সে এতদিন ধরিয়া বঞ্চনা করিয়া আসিতেছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কল্পনাতেও আনিতেও পারি নাই যে, মানুষ এতদূর নীচ স্বার্থপর হইতে পারে!

যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা ঐশ্বর্য্যময়ী জননীর প্রিয়পুত্র সাত বৎসর ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে! আমরা অবহেলায় গোপালের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। বুঝিলাম সে ভীষণ স্বপ্ন আংশিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্যাম আমাকে অতলস্পর্শ গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে ; কিন্তু গোপাল আমাকে রক্ষা করিতে উদ্ধারের হস্ত প্রসারণ করে নাই। আমি মনুষ্যত্বহীনতার সর্ব্বনিম্নস্তরে পতিত হইয়াছি। দুঃখ লেশ শূন্য, অসূয়া শূন্য, আকাঙ্ক্ষা শূন্য, ভিখারী গোপাল! এখন আমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও কি অতদূরে তোমার হাত যাইবে!

গোপালের সহিত কথা কওয়া আমার শেষ হইয়াছে। সম্পর্কও বুঝি ইহজন্মের মত টুটিয়াছে। আমি ধনী, গোপাল ভিক্ষাজীবী ; আমি নানা বিদ্যায় পারদর্শী, গোপাল বাল্যের সেই বুদ্ধিহীন নির্ব্বাক রোদনশীল মূর্খ ত ; আমার ভবিষ্যতের আশা অনন্ত, ভবিষ্যৎ নিরাশার চিহ্ন এখনই গোপালের মুখে অঙ্কিত হইয়াছে। আমিও গোপাল উভয়েই দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছি ;— আমি অর্থ ও মানের কোমল আকর্ষণে, গোপাল ক্ষুধার তীব্র তাড়নে বিপরীত পথগামী। এ দুই পথিকের পুনর্মিলন কেমন করিয়া ঘটিবে!

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি

(৪০৩ পৃষ্ঠার পর)

ভট্টাচার্য্যের কথা শেষ হইলে ব্যোমকেশ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্রীতি-পূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে রোগ-শয্যা-শায়ী বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "দাদা ম'শায় আমি কি বল্‌ব, ভেবে স্থির করতে পারছি না। যতই আপনার কথা শুনছি ততই আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'চ্চে। কিন্তু এসব রহস্য বড়ই জটিল দেখছি। আমার পূর্ব্বে ধারনাতেই আসত না যে শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারের মধ্যে এত তত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে। মৃত্যুর পরেও যে লীলা খেলা এত দূর গড়ায় এ কথা সহজে কে বিশ্বাস করবে? বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শন বা বিজ্ঞানের মধ্যে এ সব কথার আভাস পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের কাছে এ গুলো একটা বিরাট হেঁয়ালী বলে প্রতীয়মান হয়।"

ভট্টাচার্য্য :—তোর কথায় আমি কিছু মাত্র আশ্চর্য্য বোধ করছি না। তোর মতন ইংরেজী নবীশ ছেলেগুলোর মানসিক অবস্থাটা প্রায় ঐ রকমই দেখতে পাই। ওটা হ'চ্চে তাদের একদেশ-দর্শী শিক্ষার ফল। দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষা প্রচলিত হ'য়েছে তাতে মানসিক দৃষ্টিটা কিছু অধিক মাত্রায় বহির্মুখী ক'রে দেয়। কাজে কাজেই স্থূল দৃশ্যের অন্তরালে যে সমস্ত জাগতিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত ক্রীড়া করছে সে গুলির প্রতি লক্ষ্য করবার চেষ্টা ও শক্তি ক্রমশঃই মন্দীভূত হ'য়ে আসছে। আর্য্যভূমিতে চিরপ্রচলিত যে সমস্ত তত্ত্বরাজি আর্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে ছ'ড়িয়ে র'য়েছে সে গুলির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হ'বার চেষ্টা এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শক্তি-

ভোগতৃষ্ণার পর্য্যবসান হয় তত দিন বার বার পর্য্যায়ক্রমে এই তিন তত্ত্বের যে সামান্য আলোচনা ক'রেছে তাহার অতিরিক্ত সমস্ত কথাই হেঁয়ালী বলে মনে হয়।

ব্যোমকেশ :—তবে কি আপনার মতে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কোনই মূল্য নাই ? ইহা আপনার নেহাৎ অসঙ্গত কথা। যে শিক্ষার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় এত সব বড় বড় পণ্ডিত জন্মালেন সেটা কি এতই হেয় ?

ভট্টাচার্য্য :—তোদের কেমন বয়েসের দোষ, একেবারে ঝাঁক'রে চ'টে উঠিস ! আমি কি সেই কথা বল্লুম ? একটু বুঝে দেখ একবারে খাপ্পা হ'সনে। আমি ইতি পূর্ব্বেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশংসা তোর কাছে করেছি এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যে উহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথারও উল্লেখ ক'রেছি। কেন, তা বুঝিয়ে বলি শোন। এদেশের লোকের মানসিক দৃষ্টি স্বভাবতঃই অন্তর্মুখীন। সেটা হ'চ্চে দেশের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক আব হাওয়ার ফল। তাতে এই দোষ হ'য়েছে যে বহির্দৃষ্টিরও যে একটা দরকার এবং সার্থকতা আছে সে কথাটা অনেকেই ভুলে গেছে। ফলে দেশে একটা "মর্কট-বৈরাগ্যের" প্রাবল্য হ'য়েছে, এবং রজঃ শক্তির সম্যক অনুশীলন না হওয়াতে দুইয়ে মিলে একটা বিশাল তামসিকতা সৃষ্টি ক'রে দেশ কে একবারে অভিভূত করে ফেলেছে। কাজেই জাতি হিসাবে আমরা এখন কপট ঔদাসীন্যের দাস, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট এবং সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে প'ড়েছি। দেশের যদি প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে হয় তা হ'লে ভিতরে বাহিরে আবার একবার সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করতে হবে। কারণ এ দুইয়ের মধ্যে লোকে যে বিরোধ কল্পনা করে সেটা ভ্রান্তিপ্রসূত। দুইই এক জিনিষ ; একই পরম তত্ত্বের দুই ভাব,

অতএব বিরোধ কোথায়? ঠিক যেন একখানি কাচ, যার এক দিকটা তোরা বলিস concave আর একটা দিক convex, যদিও ইংরাজী-শিক্ষার ফলে তোদের মধ্যে এখন একটা দারুণ বহির্মুখী ভাব এসে প'ড়েছে তথাপি কালে ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন সেই প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হবে তখন আর্য্য সন্তানের দৃষ্টি পুনরায় অধ্যাত্ম রাজ্যে আকৃষ্ট হ'য়ে ভিতরে বাহিরে একটা উদার সাম্য দেশমধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। দেশ মধ্যে আবার প্রকৃত সত্ত্বগুণ ফুটে উঠ্‌বে। কারণ সাম্যেই সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। তখন দেশ আবার উন্নত হ'য়ে উঠবে, আমাদের এই ধূল্যবলুণ্ঠিতা চির দুঃখিনী ভারতজননী আবার রত্নোজ্জ্বল মুকুটে বিভূষিত হ'য়ে আপনার মহিমাচ্ছটায় আবার জগৎ আলোকিত করিবে। হায়, ভাই, সে দিন কি আসিবে? যে শিক্ষার নিকট আমি এতটা প্রত্যাশা করি তাহা যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন আমি তাকে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারি না।

ব্যোমকেশ:—খুড়ো ম'শায় আমাকে মাপ করুন। আমি অতটা তলিয়ে না বুঝেই আপনার উপর কটাক্ষ করেছিলুম। সে কথা যাক, আসুন আমরা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার করি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার মূল কথা গুলোর পুনরাবৃত্তি করলে ভাল হয় না কি?

ভট্টাচার্য্য:—ভালকথা, আমি তোকে এতদিন ধ'রে যা বুঝিয়ে এলুম তাহ'তে সার সংগ্রহ কল্লে এইটে দাঁড়ায় যে, মানুষ বলতে আমরা যাকে বুঝি সেটী বাস্তবিক স্বরূপতঃ ঈশ্বরের অংশ মাত্র। সূর্য্যের সহিত সূর্য্যের কিরণের যে সম্বন্ধ, স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত ঠিক সেই সম্বন্ধ। জীবাত্মার প্রকৃতি ভোগের জন্য বিবিধ উপাধির প্রয়োজন হয়। এই উপাধি ভিন্ন তাঁর প্রকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডে সাতটী লোক আছে। ভোগাসক্ত জীব তার মধ্যে নিম্নস্থ লোকত্রয় অর্থাৎ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটী লোক আশ্রয় ক'রে থাকে। যত দিন না

লোক ভোগ হ'তে থাকে। মানুষ যখন মরে, তখন তাহার অন্য কিছু পরিবর্ত্তনই হয় না, কেবল জীবাত্মা যে উপাধির আশ্রয়ে এত দিন পর্য্যন্ত ভূর্লোক ভোগ কচ্ছিলেন সেই উপাধিটী নষ্ট হ'য়ে যায়। তখন জীবাত্মা সূক্ষ্ম উপাধি অবলম্বন করে প্রথমে ভুবর্লোক পরে স্বর্লোক বা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন। কিন্তু স্থূল দেহের পতনের পর সকলেরই ঠিক এক অবস্থা প্রাপ্তি হয় না। বিগত পার্থিব জীবন, যাঁরা সুধু কাম-ক্রোধাদি রিপু চরিতার্থতার জন্য নষ্ট করেছেন, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে বাসকালে তাঁদের একটা ভয়ানক কষ্টের অবস্থা উপস্থিত হয়। যত দিন এই অবস্থা থাকে ততদিন তাকে "প্রেত" বলা হয়। যাকে লোকে "ভূত" বলে অভিহিত করে, সে জিনিষটা আর কিছুই নয় এই শ্রেণীর জীব। এখন বল্ দেখি আমি যে এতদিন ধরে মাথা বকালাম, সেটা কি শুধু পণ্ডশ্রম-মাত্র হ'ল, না তুই কিছু বুঝলি? এখনও কি মনে হয় যে ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করতে পারে তার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখনও তোরা যাকে science বলিস্ তার পাড়া দিয়েও চলেনি?

ব্যোমকেশ। দাদামশায়, খুব এক চোট্ বলে নিলেন দেখছি। কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও মনের মধ্যে কিছু খট্কা থেকে গেল। 'ভূত' যদি সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্টই হ'ল তবে তাকে দেখা যায় কি করে?

ভট্টাচার্য্য। সাধারণ দৃষ্টিতে ভূতকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভুবর্লৌকিক প্রকৃতি জড়ের (Etheric) আকাশিক অবস্থা হতেও সূক্ষ্ম। কিন্তু কখন কখনও প্রেতাত্মা পার্থিব মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করতে অভিলাষী হয়ে থাকে; সেই আত্মপ্রকাশ চেষ্টার ফলে তাহার দেহ ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। এবং সেই সময় সে সাধারণ লোকের অক্ষি গোচর হয়ে থাকে।

ব্যোমকেশ। তবে কি ইউরোপীয় প্রেততত্ত্ববাদীরা spiritualists-

যে materialisation বা পরলোকবাসী জীবের ঘনীভূত জড়দেহ ধারণ ব্যাপারের উল্লেখ করে থাকেন সেটা নেহাৎ আজগুবি কথা নয়?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ তাঁদের কথা শুনেছি বটে। যতদূর জেনেছি তাতে মনে হয় তাঁরা নিজেদের আলোচনার ফলে মৃত্যুর পর জীবের যে অস্তিত্ব থাকে এ কথাটা অনেকটা নিশ্চয় রূপে বুঝাতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁদের spirit কথা অনেকটা খিঁচুড়ী গোছের হ'য়ে র'য়েছে! পরলোকে যে জীবাত্মার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে তাঁরা এখনও বিশেষ কিছু তথ্য নির্ণয় করতে পারেন নি। আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যেও "ভৌতিক" এই শব্দটা ভূবর্লোক সংক্রান্ত অনেকবিধ ব্যাপারের জ্ঞাপক হয়ে আছে। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত ভুলৌকিক ব্যাপারের পরলোকবাসী উর্দ্ধগামী জীবাত্মার অতি অল্প সংস্রবই থাকে। অতএব মৃত্যুর পর হ'তে আরম্ভ করে প্রেতদেহের বিনাশ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ব্যাপার ঘটতে পারে এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপার "ভৌতিক কাণ্ড" বা কোন মৃত মানুষের প্রেতাত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্য বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস সেই সমস্তের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। তাহালে তুই বুঝতে পারবি যে ঠিক ভৌতিক কাণ্ড কোন গুলো।

ব্যোমকেশ। ভাল মুস্কিলেই পড়লুম। তবে ক্রমশঃই নূতন নূতন ফাঁকড়া বেরুচ্ছে দেখিছি। কোথায় ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসবে না গণ্ডগোল বেড়ে চ'লেছে।

ভট্টাচার্য্য। কি করব ভায়া একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যত সহজ তার মীমাংসা করা তত সহজ নয়। আচ্ছা তোর আজকে বিরক্তি বোধ হয় কাল পুনরায় আরম্ভ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

অলৌকিক রহস্য।

১২শ সংখ্যা।] প্রথম ভাগ। [চৈত্র, ১৩১৬।

শ্রীযুক্ত অলৌকিক রহস্যের

সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহোদয়,

এবারেও একটী প্রকৃত ঘটনা পাঠাইলাম। আশা করি এটীর উপরেও আপনার কৃপাবারি সিঞ্চিত হইবে। * * * * * * * * * * * * * ইতি

২৮ শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ } বশংবদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রেতাত্মার অনুতাপ

দুই বৎসরের পর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় এবার কালী পূজার সময় আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় আমাদের দেশের স্বনাম প্রসিদ্ধ একজন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি অন্তঃসার শূন্য পাণ্ডিত্যের অভিমানে উচ্চ মস্তকধারী। তাঁহার শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ত আছেই, অধিকন্তু, সুরসিক, সুবক্তা এবং আজকাল যাহাকে মজলিস জমকাল বলে তিনি তাহাই।

কালী পূজার রাত্রি—অমাবস্যা—তাহার উপর ভীষণ অন্ধকারে চারি

দিক সমাচ্ছন্ন, কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, ভোজনান্তে সকলে চূড়ামণি মহাশয়কে ঘিরিয়া বৈঠকখানাতে নানারূপ গল্প করিতেছে। চূড়ামণি মহাশয়ও সকল কথার উত্তর দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনার সহাস্য-মুখ-নিঃসৃত-বাক্যে উপবিষ্ট লোক সমূহকে হাসাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পার্শ্বস্থিত ঢেঁকিশাল হইতে ভুম ভুম করিয়া ঢেঁকির শব্দ হইল। সকলেই নিবিষ্ট মনে চূড়ামণি মহাশয়ের গল্প শুনিতেছিল, সহসা এত রাত্রে ঢেঁকির শব্দ শুনিয়া, কেন যে এরূপ হইল ইহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারে কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত ৭।৮ জনে মিলিয়া বাহিরে আসিল। যদিও মজলিসের মধ্যে অনেকে সাহসী ছিল, তথাপি কেহই একাকী যাইতে অগ্রসর হইল না,—কি জানি যদি ভূত হয়?

ঢেঁকিশালের নিকটে আসিয়া প্রথমে কেহই প্রবেশ করিতে চাহিল না। নানা কথা কাটা কাটীর পরে সকলে এক সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা উচিত ইহা স্থির করিল এবং দ্বারের শিকলি খুলিয়া যেমন আলোক হস্তে প্রবেশ করিল অমনি একটা বিকট চীৎকার করিয়া একজন স্ত্রীলোক ঢেঁকির উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটীকে প্রথমে দেখিয়া সকলেরই চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু অনুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে একজনের উৎসাহ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া যখন অপরাপর সকলে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল তখন দেখিল যে, সেই স্ত্রীলোকটী পাড়ার গোয়ালাদের উন্মাদ রোগাক্রান্তা 'ক্ষেন্তি'। বোধ হয়, প্রসাদ খাইবার আশায় ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, কিন্তু কাহারও সমক্ষে পড়ে নাই; অবশেষে বাড়ীর দাসী কর্ত্তৃক এইরূপে আবদ্ধ হইয়াছিল। বাহির হইবার উপায় না দেখিয়া নিজের বুদ্ধির প্রভাবে উপস্থিত জনসমূহ কর্ত্তৃক মুক্ত হইল। এবং চীৎকার করিতে করিতে অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেল।

সকলে ভাবিয়াছিল এক, হইল—আর এক, ইহা লইয়া মস্ত সমালোচনা করিতে করিতে চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বিবৃত করিল এবং "ভূত কি আছে" "ভূত নাই" ইত্যাদি মহা আড়ম্বরযুক্ত কথার আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহাদের কথা সমাপ্তির পর চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"বাবু, তোমরা ভূত বা প্রেতাত্মা বিশ্বাস কর না, অথচ ভয়টুকুও ছাড়িতে পার না। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। আমার এমন একদিন গিয়াছে যে দিন প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছি।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"সে কিরূপ?" চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"তোমরা বিশ্বাস করিবে না, কারণ, আধুনিক পাশ্চাত্য আলোকে তোমাদের হৃদয় আলোকিত, আমাদের পুরাতন ব্যক্তির কথা কি সেখানে স্থান পাইবে?"

সকলে বলিল—"আপনার কথা আমরা বেদবাক্যের ন্যায় ভাবিয়া থাকি।"

চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন—"যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ঘটনার সমস্ত কথাই বলিতেছি শ্রবণ কর।—

"রামচন্দ্র শিরোমণি নামে আমার এক জাঠতুত ভাই ছিলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার মত সুদক্ষ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—বিশেষতঃ মামলা বিষয়ে। তিনি আইন এত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন যে বড় বড় আইনজীবীও তাঁহার মত বুঝিতে পারিত না। কিন্তু হায়, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও অতিশয় স্বার্থপরতা হেতু তিনি একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিলেন।

"দশ বৎসর বয়সের সময় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। রামচন্দ্র দাদার বয়স তখন সতর বৎসর। পিতার জীবিতাবস্থায় আমরা সকলে একান্ন-

বর্ত্তী ছিলাম ; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র দাদাই সংসারের কর্ত্তা হইলেন। অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হওয়াতে, পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং আমিও নাবালক বলিয়া আমাদের বিদেশস্থিত জমি জায়গা, কোথায় কত ধান্য পাওয়া যায়, কে কত টাকা ধারে প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন ও তৎসম্বন্ধীয় দলীল পত্র, হাণ্ডনোট ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার হস্তে দিয়া গিয়াছিলেন।

"পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর দশ, বার বৎসর আমাদের সংসারে তিনি কর্ত্তারূপে বিরাজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রজাদিগকে এত বাধ্য করিয়াছিলেন যে একবার আদেশ করিলে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিত। আমাদের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। তাঁহারা ধর্ম্মভীরু এবং চিরকৃতজ্ঞ জাতি। আপদে বিপদে রক্ষা করিলে চিরকালই তাহারা উপকার মনে রাখে, সুতরাং আদেশ রক্ষা করিলে যে তাহারা রামচন্দ্র দাদার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

"অধিক দিন আমরা একান্নে থাকিতে পারিলাম না। কারণ, আমি সাবালক হইয়াছি, বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং নিজের বিষয় নিজে দেখিলেই ভাল হয়—এই 'হিতোপদেশটী' আমি আত্মীয় স্বজনের নিকটে শিক্ষা করিলাম, এবং ইহাও শুনিলাম যে পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর আমাদের সংসারের সমস্ত খরচ কুলাইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তৎসমস্তই রামচন্দ্র দাদা নিজের নামে পোষ্ট আফিসে জমা রাখেন। আমি তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া অবধি আমার পৃথক হইবার বাসনা বলবতী হয় এবং এক মাসের মধ্যেই তাহা কার্য্যে পরিণত করি। আমি নিজে তাঁহার মুখের উপর কিছুই বলিতে সাহস করি নাই, আমার শ্বশুরই ইহার প্রধান উদ্‌যোগী হইয়া একরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।

"পৃথক হইবার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত আমি বুঝিতে পারি নাই—জিতিলাম কি ঠকিলাম। কারণ আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রামচন্দ্র দাদা আমাকে কখনই ঠকাইবেন না। কিন্তু সে বিশ্বাস শীঘ্রই দূর হইল এবং বুঝিতে পারিলাম যে, দূরবর্ত্তী স্থানে যে সকল জমি আছে তাহার অধিকাংশই রামচন্দ্র দাদার দখলে। তিনি বৎসরান্তে সেখানে যাইয়া যাহা কিছু পান তৎসমুদয় বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন। শুধু ইহাই নয়, সম্বৎসরের কাষ্ঠের যোগাড় হইতে পারে এমন একটি জঙ্গল হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এই সব শুনিয়া প্রথমে আমার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু যখন বুঝিলাম যে তাঁহার সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইবে, তখন আর মকদ্দমা করা বিধেয় নহে, এইরূপ স্থির করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। কিন্তু হায়, ভবিতব্যতার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পায় না। মানুষের কি সাধ্য অদৃষ্ট-লিখিত দুঃখের বোঝা ফেলিয়া দিয়া সুখতরুর শান্তি ভরা ছায়ায় চিরকালই সমাসীন থাকে। আমার অদৃষ্টে কষ্ট আছে, আমি নিরস্ত থাকিলে কি হইবে? ভবিতব্য ছাড়িল না—সে নিজের কার্য্য করিল,—তিলে তাল হইল—সামান্য খুটি নাটী লইয়া ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইল,—তাহার ফলে মকদ্দমা বাধিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামচন্দ্রদাদার মত আইন বুঝিতে অতি অল্প লোকই পারিত। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল, তিনি মকদ্দমা এরূপ ভাবে দাঁড় করাইলেন যে তাহাতে আমিই দোষী সাব্যস্ত হইলাম। আমাকে সে বারে হারিতে হইল।

"নিম্ন কোর্টে হারিবার পর, উপর আদালতে আপীল করিলাম। তাহার ফলে, আমি যে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলাম তাহা হইতে নিস্তার পাইলাম এবং পরে যে এই মকদ্দমাতে জয়ী হইতে পারিব তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

"একাদিক্রমে দুই বৎসর ধরিয়া মকদ্দমা চলিল। যখন রায় বাহির হইল তখন শুনিলাম যে আমিই জিতিয়াছি। আদালত হইতে মঞ্জুর হইয়াছে যে, দূরবর্ত্তী জমি সমূহের ও জঙ্গলের অর্দ্ধাংশের মালিক আমি। যে সময় আমি জয়ী হইলাম—তখন অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইয়া আসিয়াছে, ধান্য কাটিবার সময় হইয়াছে। এই সময়ে দখল করাই শ্রেয়স্কর এই ভাবিয়া লোক লস্কর লইয়া ৫।৬ দিনের মধ্যে রওনা হইলাম। কিন্তু, হিতে বিপরীত হইল, মস্ত দাঙ্গা বাঁধিল,—আমার দলের তিন জন ভীষণ রূপে আহত হইল এবং আমি যদি সে সময় গোপনে বাড়ী পলাইয়া না আসিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আর ইহ জন্মে গৃহে ফিরিতে হইত না।

"বাড়ীতে আসিয়াই মেদিনীপুর যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং ঠাকুরাণীর অনেক নিষেধ সত্ত্বেও সেই দিন সন্ধ্যার সময় রওনা হইলাম।

* * * * * *

"মেদিনীপুরে সমস্ত কার্য্য সারা হইয়াছে। তখন এদিকে রেল হয় নাই, অগত্যা গরুর গাড়ী ভিন্ন উপায় ছিল না। রাত্রি নয়টার পর গাড়ী ছাড়িবে, খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, গাড়োয়ান কেবল সঙ্গিগণের অপেক্ষাতেই দেরী করিতেছে। তাহারাও জুটিল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার মনে হইল, কে যেন আমায় ঠেলিয়া দিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়োয়ান তখন লণ্ঠনটী গাড়ীর নীচে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, আমি তখনই তাহার হস্ত হইতে লণ্ঠনটী কাড়িয়া লইলাম ও গাড়ীর মধ্যে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রান্তি অপনোদন পূর্ব্বক পুনরায় তাহা ফিরাইয়া দিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল,—এরূপ

করিলেন কেন ? আমি বলিলাম,—কিছু না। গাড়োয়ান আর কিছু না বলিয়া গাড়ী ছাড়িয়াদিল। সে রাত্রি ও তাহার পর দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গাড়ীতে রহিলাম।

"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিলেই আমাদের গ্রামে পৌঁছিব। পূর্ব্বরাত্রি হইতে আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমান ভাবে গাড়ীতে রহিয়াছি; কিন্তু কেন যে সহসা নামিবার ইচ্ছা হইল বলিতে পারি না, কোথা হইতে কে যেন আমাকে আকর্ষণ করিল—আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং গাড়োয়ানকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম যদি পাকা রাস্তা ছাড়িয়া নদীর তীরে তীরে যাই তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিব; কিন্তু একাকী যাইতে সাহস হইল না। আর যদি কেহ সঙ্গী হইত। এই কয়টী কথা ভাবিতেছি এমন সময় সম্মুখে কিয়দ্দূরবর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে কে যেন অতি ক্ষীণকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিল,—'গিরিশ, এস—আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।'

"পরিচিত লোক ভাবিয়া অতি সত্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে একটু দূরে আহ্বানকারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে চিনিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে ?" উত্তর হইল—"আমি"। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার নাম কি ?' ক্ষীণ কণ্ঠে পুনরায় উত্তর হইল—"রামচন্দ্র।"

"রামচন্দ্র দাদার নাম শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; কারণ, যিনি আমার প্রধান শত্রু, যাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ, তিনি এরূপ ভাবে আহ্বান করিতেছেন কেন ? তবে কি কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে ? এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম,—

'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?' কাতর কণ্ঠে উত্তর হইল—'নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিতেছি। তোমার সঙ্গে বিশেষ আবশ্যক আছে।'—এই বাক্যগুলি শুনিয়া ভয়ে আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি মনে মনে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে শত শত গালাগালি দিলাম; কারণ, যদি গাড়ীতে থাকিতাম তাহা হইলে গাড়োয়ান ত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমার সাহায্য করিতে পারিত। যখন শত্রুর কবলে পড়িয়াছি তখন আর উপায় নাই,—এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম,—'কি আবশ্যক?' জড়িত কণ্ঠে উত্তর হইল,—'ভাই, আমার সবই শেষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব, পার ত' পূরণ করিও।'—স্বর শুনিয়া বোধ হইল যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন।

"আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সে কথা এক্ষণে বলিবেন কি?'

'না,—চল, রাস্তাতে বলিব,'—এই বলিয়া যেন তিনি অগ্রসর হইলেন। কতক বিস্ময়ে—কতক ভয়ে—কতক আবেগে জড়িত হইয়া আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ক্রমে নদী, মাঠ পার হইলাম, তথাপি কোন কথা বলিলেন না।

"বাটীর সম্মুখস্থিত আম্রকাননে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় তিনি বলিলেন,—'দাঁড়াও আমার বক্তব্য শেষ করি,'—এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তর পাইবার অগ্রেই অতি ক্ষীণ ও কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—'গিরিশ, না বুঝিয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি। যেমন করিয়াছিলাম, তাহার ফলও যথাযথ পাইয়াছি। এক্ষণে আমার অনুরোধ—পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য আমায় ক্ষমা কর। তুমি অতি সরলচিত্তে আমায় বিশ্বাস করিয়াছিলে, কিন্তু, আমি তার খুব প্রতিদান দিয়াছি!'

"আমি তখনও বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—'সে সব আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ত আর উপায় নাই!'

তিনি বলিলেন—'সেই জন্য তোমার নিকট অনুতাপ করিতেছি। এক্ষণে তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিলে, নতুবা কিছুতেই আমার শান্তি পাইবার আশা নাই। অনেক পাপের জন্য আমার এই অবস্থা হইয়াছে!'

"আমি বাধা দিয়া বলিলাম—'আমি কে, যে আপনাকে ক্ষমা করিব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার কি এমন অবস্থা হইয়াছে যে এত অনুতাপ করিতেছেন?'

'তিনি আমার কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—'গিরিশ, আমার যে কি কষ্ট তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমি মরিয়াও শান্তি পাইতেছি না। জীবিতাবস্থায় তবুও সুখে ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে মনে হয় যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে সদাসর্ব্বদা আমি দগ্ধ হইতেছি। তাহার যে কি যন্ত্রণা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে! ভাই, আমার শেষ অনুরোধ,—উভয় সম্পত্তির মালিক এক্ষণে তুমি, কিন্তু দেখিও যেন সেই 'হতভাগিনী' অনাহারে মৃত্যু মুখে না পতিত হয়'— এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেলেন!

"আমি তখন সমস্ত বুঝিলাম এবং উন্মাদের ন্যায় বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি আমাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে একটু সান্ত্বনা করিবার পর শুনিলাম,—যে রাত্রে আমি মেদিনীপুর হইতে রওনা হই, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কলেরা রোগে রামচন্দ্র দাদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হায়! যদিও তিনি আমায় শত্রু হইয়াছিলেন, তথাপি

তাঁহার মৃত্যুতে আমার বক্ষঃস্থল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!"—এই কথা গুলি বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে কোন প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে সে রাত্রের জন্য বিদায় হইলাম।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সফল-স্বপ্ন।

—:(*):—

বঙ্গীয় ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জীবনের প্রথম প্রেয়সীর বিয়োগ নিতান্তই মর্ম্মান্তিক শোকাবহ; আমার পক্ষে আবার একটু বিশেষত্বও ছিল। যখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। আমি কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতাম, গ্রীষ্মের ছুটির পরে বাড়ী হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রে আমাদের মধ্যে সামান্য বাদানুবাদ হইয়া সেই কলহ হঠাৎ মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়ে। ঝগড়াতে আমি এত উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে আমার হৃদয়ে মৃত্যু কামনা পর্য্যন্ত উদিত হয়। ক্রোধ-পরবশ হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলি 'ভগবান যেন এই করেন, এযাত্রা যেন আমায় আর ফিরিয়া আসিতে না হয়; আর যেন তোমার সহিত আমার দেখা না হয়।'—প্রত্যুত্তরে আমার স্ত্রী বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিয়া যেন আমাকে আর না দেখ, ভগবান যেন তাহাই করেন।" অন্তর্য্যামি যেন তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। আমি বাড়ী যাইয়া আর তাহাকে

দেখিতে পাইনাই। ওলাউঠা রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। ইতঃপূর্ব্বে আমার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহার বয়স তখন আড়াই মাস। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর তিন চারিদিন পরে সেই ছেলেটীও মারা যায়। আমার ও আমার স্ত্রীর শেষ বিদায় এইরূপ মর্ম্মান্তিক হওয়াতে পত্নী বিয়োগে আমি বিশেষ রূপে কাতর হইয়া পড়ি।

আমা[illegible] মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পরে, একদিন আমি তাহাকে স্বপ্নে দে[illegible]হার পূর্ব্বে কি পরে আর কখনও তাহাকে স্বপ্নে দেখি নাই। স্বপ্ন [illegible]তি আশ্চর্য্য। এই স্বপ্নটীর একটি বিশেষত্ব এই যে, যে সময়ে যেভাবে শুইয়াছিলাম স্বপ্নেও দেখিতে পাইলাম আমি সেই ঘরে, সেই বিছানায় সেই ভাবে শুইয়া আছি। স্বপ্ন দেখার সময় এবং স্বপ্নদৃষ্ট সময়ও এক। স্বপ্নে দেখিলাম আমি শয়ন করিয়া আছি, আমার বাম পার্শ্বে আমার মৃত পত্নী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপাধানে বাহু ন্যস্ত করিয়া অবস্থিত; আমি তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছি; আমার বর্ত্তমান স্ত্রী, (তখন পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিবাহ বা বিবাহের কথাও হয় নাই এবং তাহার পূর্ব্বে তাহাকে কখন দেখিও নাই,) তখন অল্প বয়স্কা বালিকা, অপর পার্শ্বে অর্থাৎ আমার পশ্চাতে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের গল্প চলিতেছিল। কথায় কথায় আমার স্ত্রী বলিল "তুমি কেবল আমার সঙ্গেই গল্প কর, আর ওর দিকে ফিরেও চাওনা কেন?" এই কথা শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম "ও কে? কোথাকার এক খুদে বালিকা, তার সঙ্গে আবার কি কথা বলিব? আর ওকেত চিন্‌তে পাচ্ছিনা; ও এখানে কেমন করে এল?" এই বলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া তাহার চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার স্ত্রী বলিল "ওই

আমি। এইযে আমাকে দেখিতেছ এই আমি'ত ম'রে গেছি। ওই তোমার আসল স্ত্রী। আমিই ও।"

আমি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিলাম 'তুমি'ত বেশ লেক্চার (lecture) দিতে শিখেছ! তোমার এই "থিয়লজিকেল লেকচারটা (Theological lecture) ধর্ম্ম সমাজের জন্য রেখে দিলে বেশ ভাল হয়। তোমার কিন্তু বাহাদুরী খুব, মরে গিয়ে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বলছ—"ঐ তুমি।" তুমি যেন সতীদেহ ত্যাগ ক'রে গিরিরাজ-কন্যা উমা হ'য়ে এসেছ। ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ "বুঝি শীঘ্রই পড়া হয়েছে? তোমার কথায় বোধ হচ্ছে ওটি আমারই স্ত্রী; ওকে বিয়ে করার কথা'ত আমার মনে পড়ে না।

সে বলিল "তোমার মনে পড়ুক বা না পড়ুক, যখন জাগবে তখ-নই ~~সত্য~~ বুঝতে পারবে। এখন তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমি সত্য সত্যই ম'রে গেছি। আমার সদ্য চিতাটা দেখেও কি তোমার বিশ্বাস হয়না যে, আমি ম'রে গেছি?

আমি বলিলাম, 'এমন চিতা আমিও হাজার হাজার সাজা'য়ে রাখতে পারি। যা'ক এই রকম আলাপ আমার ভাল লাগেনা; এই ক'রে বুঝি তুমি আমার মন বুঝতে চাও যে তুমি ম'রলে আমি আবার বিয়ে করব কি না? তাই নাকি? কৌশলটি কিন্তু বেস!

সে বলিল, ছি, তা'কেন? আমি'ত ম'রে গেছিই। তোমাকে আমি অনুরোধ করি তুমি বিয়ে কর। আর ঐযে দেখ তোমার স্ত্রী ঐ আমিই," ইহা ঠিক জানবে। যতক্ষণ তুমি আমার এই চেহারা দেখতে পাচ্ছ, ততক্ষণ আমার কোন কথাই তোমার বিশ্বাস হবে না, স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই সত্য টের পাবে।'

আমি বলিলাম, 'মহাশয়; ক্ষমা করুণ আমার এমন স্বপ্ন ভাঙ্গা-

রও দরকার নাই, সত্য বুঝারও দরকার নাই। যে লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলাপ করিছি সে ম'রে গেছে এমন ধ্রুব সত্য কথাটা যে কি অপরাধে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে বুঝিনা। এখনও এতটা 'উনপঞ্চাশের' ঝোক আমার ঘাড়ে চাপে নাই।"

স্ত্রী। সবই বিশ্বাস করবে। কিন্তু এখন তোমার বিশ্বাস হবেনা। যা'হোক আমার কথা গুলি ঠিক মনে রেখ। ভোর হয়েছে, আমি চ'ললাম।" এই বলিয়া সে অন্তর্হিতা হইল। আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নভঙ্গে স্তম্ভিত হইয়া বিছানার উপর কিছুকাল বসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার বিষয় ও স্বপ্ন দৃষ্টা ভবিষ্যৎ স্ত্রীর চেহারাটা মনে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। চেহারাটাও মনে রহিল। দুই এক মাস পরে স্বপ্নের কথা ভুলিয়া গেলাম। স্বপ্ন বিবরণটী দুই একজন বিশেষ বন্ধু ভিন্ন আর কাহাকেও বলি নাই। তাহারা আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় ৮ মাস পরে আমার দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। বিবাহ রাত্রে আমি এবং আমার নব পরিণীতা পত্নী কিছু-কালের জন্য নির্জ্জনে এক ঘরে থাকি। এই সময়ের মধ্যে তাহার সহিত সামান্য দুই একটি কথাও হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঘুমা-ইয়া পড়ে। আমি ১০।১৫ মিনিটকাল উন্মনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছিলাম। নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্রই আমার সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নদৃষ্ট চেহারার কথা মনে পড়িল, আমি চমকিয়া উঠিলাম। বিস্মিত নেত্রে দেখিলাম আট মাস পূর্ব্বে যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আজ সে সত্য একটা মানুষ হইয়া আমার স্ত্রী হইয়াছে!

ইতি—

শ্রী—

প্রেতাত্মার মূর্ত্তি-দর্শন।

ঘোষেদের বৌ।

বঙ্গাব্দ ১২৯৯ সালে আমরা এই কাঁকুড়গাছিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করি। আমাদের বাগানের ফটকের নিকট এক ঘর গোয়ালা বাস করে। তাহারা জাত ব্যবসা করেনা, তাহাদের ফুল-গাছের ব্যবসায় আছে। এই গোপ পরিবারের মধ্যে, তখন গোয়ালা নিজে, তাহার স্ত্রী, দুইটী পুত্র, আর একটি কন্যা ছিল—এখন তাহাদের জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রথম প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সহরবাসী ও তন্নিকটস্থ পল্লীবাসিগণ তখন ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। সেই সময় এই ঘোষেরাও ফরেশডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। তাহাদের বাড়ীর চাবি ও কতকগুলি তৈজসপত্র আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল। পাড়ার আরও কতকগুলি লোক ঐরূপ অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল—পাড়াটা এক প্রকার ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল। কেবল আমরা ও আর দু'চার ঘর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এখানে রহিলাম।

সেই সময় একদিন অফিস হইতে বাড়ী আসিতে আমার অনেক রাত হয়—প্রায় ১০টা বাজিয়াছিল। আমাদের বাগানের কাছাকাছি আসিয়াছি, এমন সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, যেন একজন স্ত্রীলোক রাস্তার অপর পার্শ্বের নর্দ্দামা দিয়া বরাবর চলিয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না থাকায় দেখিতে পাইলাম, তাহার পরিধানে একখানি ময়লা কাপড়।

দূর হইতে বুঝিতে পারিলাম না, উহা থান কাপড়, কি পাড়ওয়ালা। দেখিলাম, সে বরাবর নর্দ্দামা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে করিলাম, বোধ হয়, আমাদের "মাইতীর ঝী" প্রকৃতির কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে তথায় আগমন করিয়াছে এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় একটু দূরে যাইতেছে।

উপরোল্লিখিত "মাইতীর ঝী" আমাদের পাড়াতে বাস করিত; তিন কুলে তাহার কেহ ছিল না, কেবল তাহার এক ভগিনী ছিল। উভয়ের অবস্থাই বড় শোচনীয়, সুতরাং উভয়েই পরস্পরের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব শ্রমার্জ্জিত অর্থে অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মাইতীর ঝীর নিজের কোন ঘর দ্বার না থাকায় ঘোষেদের বাড়ীর একটা দাওয়াতে রাঁধ্‌তো বাড়্‌তো আর শুতো। সে প্রায়ই ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিত। আর আমাদের এখানে তখন অনেকের পাকা পায়খানা ছিল না কিংবা প্রকৃতির কার্য্য সাধনের একটা কোথাও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না—সুতরাং অনেককেই পথে ঘাটে মাঠে ঐ কাজ শেষ করিতে হইত। সেই জন্য আমি অনুমান করিলাম যে, নর্দ্দামা দিয়া যে স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিতেছি, সে বোধ হয় "মাইতীর ঝী" হইবে। পাড়ার অন্য কোন স্ত্রীলোক এতদূরে কখন আসিবে না।

তারপর আমি গৃহে আসিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ পুষ্করিণীর দিকে গেলাম। পুকুরে নামিতে গিয়া দেখিলাম, যেন একজন স্ত্রীলোক ঘোম্‌টা দিয়া ঘোষেদের ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। জ্যোছ্‌নার আলোকে বেশ দেখিতে পাইলাম, তাহার পরণে লালপেড়ে শাড়ী, কিন্তু পাছা নাই এবং পাড়টিও সরু। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। কারণ, যখন বাড়ী আসি তখন ঘোষেদের বাড়ী অন্ধকার ছিল, আর যদি তাহারা ফিরিয়া থাকে,

তাহা হইলে আগে আমাদের বাটী আসিবে, কেন না আমাদের বাড়ীতে তাহাদের সব প্রায় জিনিসপত্র রহিয়াছে। আর একটা সন্দেহ, আমাকে দেখিয়া অতখানি ঘোম্‌টা দিবার লোক তাহাদের পরিবারের মধ্যে কেহ ছিল না। এই সব নানাকারণে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় ঘরে আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘোষেরা ফিরিয়া আসিয়াছে কি না। তাহাতে তিনি বলিলেন, "কৈ না! ফিরে এলে তো আমাদের বাড়ী আগে আসিবে? কেন, কাহাকেও তুমি দেখিতে পাইলে না কি?" তার পর আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলাম। শেষে তাঁহাতে আমাতে প্রদীপ লইয়া ঘোষেদের বাড়ীর দিকে দেখিতে গেলাম, উহারা আসিয়াছে কি না। কেহ কোথাও নাই, যেই অন্ধকার, সেই অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সাড়া শব্দ নাই! অবশেষে আমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। আমি কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলাম না; কেন না, আমার যে দৃষ্টির ভ্রম হয় নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

যাহা হউক, শেষোক্ত ঘটনাটা যেন দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া সকলে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হইল। যদিও তৎসম্বন্ধে আমি এক প্রকার অনুমান করিয়াছিলাম, তথাপি আর আর সকলের মন্তব্য জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। এতদভিপ্রায়ে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাইতীর ঝী এখন কোথায় থাকে?" তিনি বলিলেন;—"সে তা'র বোনের কাছে থাকে। ঘোষেরা চলিয়া যাইবার পর হইতে, সে এখানে একলা থাকিতে পারিবে না বলিয়া তা'র বোন তা'কে লইয়া গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। পাছে পুনরায় হাস্যাস্পদ হই এই ভয়ে নর্দামায় চলা স্ত্রীলোক

সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নর্দ্দামা দিয়া যাইতে যে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছিলাম, সে কখন মাইতির ঝি হইতে পারে না। কারণ, সে অতরাত্রে যে এখানে প্রকৃতির কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে আসিবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাহার ভগিনীর বাড়ীর নিকট এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে এই কাজ শেষ হইতে পারে। আমাদের বাগান হইতে প্রায় পোয়াখানেক দূরে মান্নাপাড়া নামক পল্লীতে তাহার ভগিনীর বাড়ী; সেখান হইতে সে অত রাত্রে এখানেই বা কেন আসিবে? আর যদি অন্য কোন দরকারে আসিবে, তাহা হইলে নর্দ্দামা দিয়া চলিবে কেন? চলিবার রাস্তা যথেষ্ট রহিয়াছে। যাহা হউক, এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলাম না, একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

উক্ত ঘটনার প্রায় মাসাধিক পরে ঘোষেরা ফরেশডাঙ্গা হইতে পুনরাগমন করিল। ঘর খুলিয়া দেখিল, কোন জিনিসপত্র নড়চড় হয় নাই, যেখানের যেটি, সব রহিয়াছে।

তার পর এক বছর পরে ৺শ্রীপঞ্চমী পূজার দিনে আর একটা অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিলাম। সেদিন খাওয়া দাওয়া করিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রে হাত পা ধুইবার জল ফুরাইয়া যাওয়াতে বাড়ীর মেয়েরা পুকুরে জল আনিতে গেলেন, মাতাঠাকুরাণী কেবল বাড়ীতে রহিলেন। পুরুষেরা সকলেই শুইয়াছে এবং আমি তখন শুইবার উদ্যোগ করিতেছি। এমন সময় বাহিরে মেয়েদের উচ্চ কলরব শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ উঠানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পুকুর হইতে মেয়েরা দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিতেছে। ভীত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, তাহারা ঘোষেদের ঘাটে একটা স্ত্রীলোককে অনেকখানি ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়াছিল; কতবার

জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' কিন্তু কোন উত্তর পাইল না, পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তাহাতে তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া, আমি উহাদের সহিত ঘাটে গিয়া দেখিলাম, সেই স্ত্রীলোকটি যেন আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঘাট হইতে উঠিয়া পুকুরের পাড়ে যে একটা আমগাছ আছে, তাহার দিকে চলিয়া গেল! আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইলাম। এ স্ত্রীলোকটা কে এবং আমগাছের দিকেই বা গেল কেন? তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

আমার সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে আর এক রাত্রে আমি যে একটি স্ত্রীলোককে ঐরূপ ঘোমটা দিয়া ওদের ঘাট হইতে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম এবং যে দৃশ্যকে আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া সকলে উড়াইয়া দিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটিও ঠিক সেই রকম! ঠিক সেই রকম শাদা ধপ্ ধপে কাপড় পরা, ঠিক্ সেইরকম লজ্জাসহকারে ধীরে ধীরে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। স্ত্রীলোকটাকে কেহই ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না।

পর দিবস প্রাতে উক্ত ব্যাপার ঘোষেদের কাণে পৌঁছিল। তখন গোপগৃহিণী বলিতে লাগিল যে, "ও আমার বড় বৌ; অনেক বার আমরা ওকে দেখেছি; কিন্তু বাপু আমাদের কোন ভয় টয় হয় না। হায়! অভাগিনী এখনও মায়া ছাড়িতে পারে নাই। তা' তোমরা কোন ভয় করিও না।"

তার পর আমরা শুনিলাম যে, ঐ গোয়ালাদের বড় বৌ একটি কন্যা প্রসবান্তে সূতিকাগারেই ইহলীলা সম্বরণ করে; কিছু দিন পরে সেই কন্যাটিও জননীর অনুগামী হইল। পুনরায় তাহারা বড়ছেলের বিবাহ দিল।

আর এক দিন আমরা শুনিলাম যে, উহাদের নব বধূমাতা সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে আসিবার কালীন পূর্ব্বোল্লিখিত আমগাছের তলায় এক

জন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে দেখিবামাত্র ভয়ে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়াছিল! সেই হইতে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, উনি তাহার দিদি (সতীন) এবং যখনই নজরে পড়িবে, তখনই তাহাকে প্রণাম করিবে।

এতদিনে আমার সন্দেহ অপনোদন হইল। এইবার আমি বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বে যা'যা' দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সে সব এই ঘোষেদের বৌয়ের কাজ।

শেষোক্ত ঘটনাটি সন ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। ইহার পর আর কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই।

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

---

(২৫)

পুনরাগমন।

দুই জনে মুখামুখি বসিয়া আছি, এমন সময়ে চটিওয়ালা সংবাদ দিল, আমার লোক জন ফিরিতেছে। বাস্তবিকই চাহিয়া দেখিলাম, দাদা মহাশয় তুলাসিং হরিয়া ও বেহারাদের লইয়া আসিতেছেন। বেহারারা একটা পাল্কীও লইয়া আসিতেছে। কিন্তু পিতামহ এখনও বহুদূরে প্রান্তর পারে।

গোপালও তাঁহাকে দেখিল, দেখিয়াই উঠিল। বলিল, "ভাই! এই বারে আমি আসি!" আমি 'হাঁ' কি 'না' কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না। গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মুখ ফিরাইল। যখন দেখি সে একান্তই চলিয়া যায়, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর কি দেখা হইবে না?"

গোপাল ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কি যেন

চিন্তা করিল। মুহূর্ত্তের নিমীলিত পলকে ভবিষ্যৎটা যেন একবার দেখিয়া লইল। তার পর বলিল—"হইবে।"

বলিয়াই গোপাল চলিয়া গেল। আমার পানে আর ফিরিল না। তাহার পিতা আসিতেছিল, সে দিকেও চাহিল না—অন্য পথ অবলম্বনে গোপাল দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল!

প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব আঁখিদ্বার দিয়া বুঝি তাহার কিঞ্চিৎ ক্রিয়া দেখাইয়াছে! নহিলে পূর্ব্বদিনে আমার ব্যবহারে ভীত ব্রাহ্মণ আজ আমার প্রতি সহসা আকৃষ্ট হইল কেন! ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ বাবু! ও লোকেটীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

আমি সম্বন্ধ গোপন ছলে কৌশলে উত্তর দিলাম—"আমার জীবনদাতা এই সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না বাবু, আরও সম্বন্ধ আছে।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"আপনার চক্ষের জল দেখিয়াই বুঝিয়াছি?"

"যে প্রাণ রক্ষা করিল, তাহার জন্য চক্ষে জল পড়িবে না!"

"কই ও ব্রাহ্মণত তোমাকে রক্ষা করেনি। ও ব্যক্তি কখন আসিয়াছে তা জানিনা।"

"কেন, তুমিই ত বলিলে!"

"আমার ভ্রম হইয়াছিল। যিনি রক্ষা কর্ত্তা, এখন দেখিতেছি সেই ঠাকুর আসিতেছেন।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম! গোপাল কি তবে সকলের অজ্ঞাত সারে আসিয়া আমার সেবা করিয়া গেল! ছোট্ ঠাকুর দাদাও কি তার আগমনবার্ত্তা জানেন না!

ব্রাহ্মণকে বলিলাম—"আমি রাত্রে ঠাওর করিতে পারি নাই।

ভাবিয়াছিলাম ওই ব্যক্তিই আমার রক্ষা কর্ত্তা। সেই জন্যই তার বিদায়ের সময় চোখে এক ফোঁটা জল আসিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ এ উত্তরে তুষ্ট হইল না; বলিল—"না বাবু তুমি আমাকে গোপন করিতেছ।"

আমি বলিলাম—"তুমি কি উহাকে কখন দেখিয়াছ?"

ব্রাহ্মণ বলিল—"দেখিয়াছি কি না মনে হয় না। এ চটিতে তোমাদের পাঁচ জনের কৃপায় কত লোক আসে। কত বড় বড় কোম্পানীর চাকর বাড়ী ফিরিবার সময় এখানে পায়ের ধূলা দিয়া যায় আমি কত লোককে স্মরণে রাখিব!"

এই বলিয়া সে কমলালেবু হইতে আরম্ভ করিয়া ভূগোল বৃত্তান্তের সমস্ত রসটা আমার কর্ণে ঢালিয়া দিল। বুঝিলাম দামোদর নদের পশ্চিম উপকূলের প্রায় শতাধিক গ্রামের অধিবাসী কলিকাতায় যাইবার ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে অন্ততঃ পোনেরো মিনিট কালের জন্যও বিশ্রাম লইয়া যায়।

ছোট দাদা এতক্ষণ মাঠের মাঝে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওই ব্রাহ্মণটীকে আর কখন দেখিয়াছ?"

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ আবেগ মিশ্রিত ভাবে উত্তর করিল—"দেখিয়াছি! উহাকে নিত্য দেখি। যে দিন না দেখি, যদি কোন দিন এ সেবকের কুটীরে উহার পায়ের ধূলা না পড়ে সে দিন আমার বৃথা যায়।

একবার মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কাছে, নিজের পরিচয় প্রকাশ করি, কিন্তু কি একটা অন্তরের দুর্ব্বলতা আসিয়া আমাকে সে কার্য্যে বাধা দিল। আমি অন্তরের কথা অন্তরেই নিহিত রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলাম,—"এই যুবকের সহিত আমার যে সম্বন্ধ আছে, এটা কি শুধু আমার চোখের জল দেখিয়াই তোমার বোধ হইল ?"

"না বাবু, আমার মনে হইল যেন তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে।"

"এমনটা হঠাৎ মনে হইল কেন ?"

"তা কেমন করিয়া বলিব। তোমার চোখের জল দেখিয়া, আমার সে ধারণা পাকা হইয়া গেল।" দেখিয়া মনে হইল, সম্বন্ধ যেমন তেমন নয়—ঘনিষ্ঠ।

"তা কেমন করিয়া হইতে পারে, আমি ধনী, সে ব্যক্তি দরিদ্র।"

"তাহাতে কি হইয়াছে। কোম্পানীর রাজত্বে যুগ উল্টাইয়া গিয়াছে। কত বড় মানুষের বাপ দুঃখী। ছেলে হাকিম, বাপ পূজারী হইয়া দিন কাটায়।"

"চক্ষে কি দেখিয়াছ ঠাকুর, না, শুনিয়া বলিতেছ।"

"এই আমিই বাবু তার উদাহরণ। আমি একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। রাঁধুনী বৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই দিয়া তাহাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাই। সে এখন উকীল হইয়াছে। ওকালতী করিয়া তালুক পর্য্যন্ত করিয়াছে। বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছে। আর আমি এখানে সেই রাঁধুনী বৃত্তিতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এ কথা শুনিয়া আর ব্রাহ্মণকে তুমি বলিতে সাহস হইল না। বলিলাম—"সে ব্যক্তি কি আর আপনার খোঁজ লয় না ?"

কি মনের আবেগে জানিনা, ব্রাহ্মণ একবার এই অপরিচিতের কাছে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। আবার কি বুঝিয়া পরক্ষণেই সাবধান হইল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিলাম, আর ব্রাহ্মণ উত্তর করিল না। কেবল

বলিল—"বাবু, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। পাছে লোকে জানে বলিয়া দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অন্যমনস্কে তোমাকে যতটুকু বলিয়াছি, তাই যথেষ্ট।"

"আপনার সন্তানাদি কি ?"

"কিছু নাই।"

"স্ত্রী ?"

"ছিল—মরিয়া গিয়াছে।"

"মর্ম্মবেদনায় বুঝি ?"

"আবার জেরা কর কেন বাবু ?"

"পুত্র থাকিলে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে রাঁধুনি গিরি করিতে হইত না।"

"তা কেমন করিয়া বলিব! রাঁধুনি বামুনের ছেলে মূর্খ হইলে রাঁধুনিই হইত। ইংরাজী পড়িলে বাবু হইত—আমারি দুঃখ ঘুচিত কি ?" একটা পিণ্ডের জন্য মাঝে মাঝে সন্তানের অভাব বোধ করিতাম, কিন্তু ঐ ঠাকুর আমাকে বুঝাইয়াছেন, 'যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে লক্ষপতি সন্তান পাইতে পার, কিন্তু পিণ্ডদাতা সন্তান পাওয়া দুর্ঘট।' ওই মহাপুরুষের উপদেশে আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে নিরস্ত হইয়াছি।"

কথা কতক বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না। এটা বেশ বুঝিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতা আর কিছু করুক আর নাই করুক, হিন্দুর সংসারে পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে। সাহেব ঘেঁসা পায়জামা কোট পরা বাবু নগ্নপদ, নগ্নদেহ, মলিন বসন পরিধায়ী অন্য আত্মীয়ের কথা দূরে থাক্, পূর্ব্বের আরাধ্য গুরুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেও কুণ্ঠিত। শুনিয়াছি এক জেলার হাকিম মফস্বল পরিদর্শনে যাইয়া এক ডেপুটী হাকিমের মাতুলের মাথায় মোট চাপাইয়া দিয়াছিল। মামা

বেচারীর প্রথম অপরাধ সে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া মাঠে মাঠে শস্তে জল সেচন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহার দ্বিতীয় ও গুরুতর অপরাধ, তাহার ভাগিনেয়ের হাকিমী পদ প্রাপ্তির পরমুহূর্ত্তেই সে আফিম খাইয়া অথবা গলায় দড়ি দিয়া সেই নগ্ন সুতরাং হাকিমের দৃষ্টিতে কুলিদেহের অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণ্য-আত্মাটাকে বৈতরণীর পরপারে পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজেদের সম্বন্ধেও তাহা অনেকটা বুঝিয়াছি। আমরাই বা পরমাত্মীয় খুল্ল পিতামহের প্রতি কি পশুযোগ্য আচরণই না দেখাইয়াছি!

কিন্তু লক্ষপতি সন্তান হইতে পিণ্ডদাতা সন্তানের গৌরবটা কেমন করিয়া বেশি হইল, সেইটাই কেবল বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে পারিলাম না, সর্ব্বদেশের সকল মানুষের চিরাকাঙ্ক্ষিত অর্থ হইতে একটা সিদ্ধ আতপের ডেলা হিন্দুর চক্ষে কেমন করিয়া অধিকতর মূল্যবান হইল। অথচ স্মরণাতীত যুগ হইতে এই বর্ব্বরগুলা এই কুসংস্কারটা মাথায় করিয়া আসিতেছে। এই এক মুষ্টি পিণ্ডদান কার্য্যে হিন্দু যত অর্থ অপব্যয় করিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর সামরিক ব্যাপারেও বুঝি তত অর্থ অপব্যয়িত হয় নাই।

পিণ্ড ভাবিতে ভাবিতে দামোদর আসিয়া পড়িলেন। পিণ্ড-সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত তাঁহার সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শিলা গোলক, আর তাঁহার সেই পিপীলিকাশ্রয় গর্ত্তটী মাথার ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার মাথাটা গুলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির কথাটা স্মরণ হইল। সুতরাং তাঁহার সেই গর্ত্তের ভিতরের হাত পা ও সেই হস্ত পদ সাহায্যে আমার রক্ষা কার্য্যে তাঁহার ব্যগ্রতা যদিও আমার মনে কিঞ্চিৎ হাস্য রসের উদ্রেক করিল, তথাপি নুড়িঠাকুরকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে সাহস করিলাম না। ভাবিলাম এখনও ডাকাতের দেশে রহিয়াছি, নুড়ি ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিয়া আবার কি বিপদে পড়িব!

গত রাত্রের রক্ষার ধন্যবাদ দামোদরকে দিব কি ছোট ঠাকুর দাদাকে দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দাদা মহাশয় সদল বলে চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সমীপে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমিও দেখা দেখি তদ্বৎপ্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, দাদা হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলেন, ভূমিষ্ঠ হইতে দিলেন না। বলিলেন—"থাক্, আর ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে না।"

আমি বলিলাম—"আপনি আমার জীবনদাতা।"

দাদা বলিলেন—"আমি কে ভাই, জীবন দাতা দামোদর।"

আমি বলিলাম—"আপনিই দামোদর।"

একথা শুনিবামাত্র দাদা জিব কাটিয়া বলিলেন—"ছি ভাই। ওকথা বলিয়োনা। আমি তাঁর দাসানুদাস।"

দূরছাই! দামোদরের কথা লইয়া কি মস্তিষ্কের বিকার ঘটাইব! আমি চুপ করিলাম। দাদা বলিতে লাগিলেন—"বড়ই অশুভক্ষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ। তোমাকে এ যাত্রা গৃহে ফিরিতে হইবে। তোমার সঙ্গীদের কাহারও শরীরে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। অল্প শুশ্রূষায় তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে।"

"এখনি কি যাইতে হইবে?"

"এখনি। এখন রওনা হইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে বাড়ী পৌছিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে কাহারও যাইবার প্রয়োজন না হইলেও মা আমার ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন ভাবিয়া বেচুকে তোমার সঙ্গে পাঠাইতেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বেচু! সে কি বাঁচিয়া আছে?"

"আছি বই কি দাদা বাবু!" বলিতে বলিতে বেচু একটা ছোট হুঁকার উপরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত

হইল। ছোট ঠাকুরদার হাতে হুঁকাটা দিয়া আবার বলিল—"মরি নাই। ব্রাহ্মণ একটা মোড়া আনিয়া দাদা মহাশয়কে বসিতে দিয়া বলিল— "খানিকটা দুধ ও ভাল চিঁড়া আনাইয়া রাখিয়াছি।"

দাদা মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—"ভালই করিয়াছ। পথে প্রয়োজনে লাগিবে। কিন্তু একজনের যোগ্য আহারে কি হইবে, সঙ্গে যে অনেক লোক রহিয়াছে!"

"তাহাদের জন্য জল পানের ব্যবস্থা করি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ-মধ্যে প্রবৃষ্ট হইল। দাদা বলিলেন—"কি ভাই! পথে ফলারের কিছু জোগাড় করিয়া দিই?"

আমি তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া বলিলাম—"আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

বেচু এই সময়, আমার সহায়তা করিল,—বলিল—"দাদা ঠাকুর! চলুননা, গঙ্গা স্নান করিয়া আসি।"

দাদা মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর বলিলেন—"বেশ, চল।"

উল্লাসে আমার চক্ষে জল আসিল। ছোট ঠাকুরদা তাহা দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—"ভাই! দেখিতেছি মা এত দিন পরে আমাকে আক-র্ষণ করিয়াছেন। নতুবা সাত বৎসর পরে তোমার দেশে আসিবার মতি হইল কেন?"

আমি বলিলাম—"সত্যই আমি আপনাদের দেখিবার জন্য দেশে চলিয়াছিলাম। শুধু তাই নয়—" গোপালের কথা তুলিতে যাইতেছিলাম। কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। ভাবিলাম, দেখি ছোট ঠাকুরদার মুখ হইতে গোপালের নাম বাহির হয় কি না!

ছোটঠাকুর দাদা বলিলেন—"ভালই হইয়াছে। পথের মধ্যেই দামোদর

আমাদের মিলন সংঘটন করিয়া দিয়াছেন। তবে চল, আমার মা জননীকে একবার দেখিয়া আসি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

আমার সহচরবর্গ পথের বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল। বোধ হয় খুল্লপিতামহ তাহাদিগকে চটিতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহাদের কেহই আমার সংবাদ লইতে আসিল না কেন?

আমার নিকটে বেচু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আমি এই অবকাশে বেচুর সহিত কথা আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম—"বেচু! তুমি আমাদের কি অপরাধে ত্যাগ করিলে?"

বেচু হাসিয়া বলিল—"আর বাবু, চিরকালই কি চাকুরী করিয়া মরিব। ছেলেপুলে সব ডাগর হইয়াছে। তাহারা যে যার নিজের পথ চিনিয়া লইয়াছে। এ সময় যদি ভগবানের নাম না লই, ত আর কবে লইব।"

"কেন আমাদের ঘরে থাকিলে কি ভগবানের নাম লওয়া চলিত না?"

"চলিলে চলিয়া আসিব কেন?"

"কেন আমাদের কি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই?"

"নাই তা কেমন করিয়া বলিব। যখন মা আছেন তখন আছে বই কি?"

"মা না থাকিলে কি আর ধর্ম্ম থাকিত না?"

"কেন দাদা বাবু, আর ওসব কথা তুলিতেছ। তোমাদের বড় ভাল বাসি, এখনও মায়া কাটাইতে পারি নাই। ও কথা তুলিয়া আর মনোকষ্ট দিয়োনা।"

"না বেচু, তোমাকে আমাদের বাড়ী থাকিতে হইবে।"

"কেন আর বাবু, গরীবের জাতি মারিতে চাও। একবার ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, আর কতবার করিব।"

"আমাদের বাড়ী ছিলে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল!"

"হিঁদুর ছেলে মুরগীর ঝোল হাতে করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করিব না।"

পিতার সেই অসুখ ও সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবুর সেই ব্যবস্থার কথাটা মনে পড়িল। আমি বলিলাম—"সে যে মুরগী একথা তোমাকে কে বলিল?"

"যিনি তোমাদের ধর্ম্মের ঘরের চাবি হাতে করিয়া আছেন, তিনিই বলিয়াছেন। বাবু, তোমাদের পবিত্র বংশ। তাই তোমরা ধর্ম্ম ছাড়িলেও ধর্ম্ম এখনও তোমাদের ত্যাগ করিতে পারেন নাই।"

"কে তিনি বেচু?"

"তিনি তোমার মা।" তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, হিঁদুর ছেলে, সামান্য দু' পয়সার জন্য অমূল্য ধর্ম্ম হারাইবে কেন। বেচু, আমি ইহাদের ভাবগতিক ভাল বুঝিতেছিনা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

"এ কথায় তুমি মুরগী বুঝিলে কিসে?"

"জিনিষটা হাতে করিবার সময় মনটা কেমন করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, আমি যেন কি একটা অস্পৃশ্য হাতে করিতেছি। মায়ের কথায় সন্দেহটা বাড়িয়া গেল। আমি ডাক্তারখানায় ফিরিয়া চুপি চুপি সন্ধান লইলাম। সন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।" আমি তখনই গঙ্গায় যাইয়া যত পারিলাম ডুব দিলাম। তাহার পর মাকে প্রণাম করিয়া দেশে পলাইয়া আসিলাম। এখানে দাদা ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয়।

আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী ছিলেন। কোরাণের বয়েদগুলি এত সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন যে, আমরা অনেকানেক মৌলবীর নিকট শুনিয়া ওরূপ মুগ্ধ হই নাই। তদ্ব্যতীত সমস্ত কোরাণটী যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। নানা কারণে আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মনে করি। তিনি যেন আমাদের এক নেশার বস্তু ছিলেন; সময় পাইলেই আমরা তাঁহার কাছে কাছে থাকিতাম এবং একরূপ আনন্দে কাল কাটিয়া যাইত। তা ছাড়া তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে প্রায় খাওয়াইতেন। এ প্রলোভনটাও আমাদের যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিত। নানা কারণে সাধারণতঃ যেমন ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মত একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকিয়া যায়, আমাদের মধ্যে সেরূপ ছিল না।

আমাদের গ্রাম মুসলমান-প্রধান। কিন্তু এখন যেমন হিন্দু মুসলমানে একটু তফাৎ ভাব দেখা যাইতেছে, আমাদের বাল্যকালে তাহা ছিল না। ধর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য যতটুকু ভেদ থাকা অপরিহার্য্য, ততটুকু ভিন্ন সকল প্রকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দুর ছেলেরা মহরমে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিত, আমরাও দুর্গা-পূজা শ্যামা-পূজা প্রভৃতিতে নূতন কাপড়, জামা পরিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতাম। বাঙ্গলাই আমাদের মাতৃভাষা ছিল, শিশুবোধক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিতাম। হিন্দুর ছেলেরাও ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত। কিন্তু এখন যেন পল্লীজীবনের

মধ্যে একটু ভেদ-ভাবের কার্য্য হইতেছে। হিন্দুরা যেরূপ "গোঁড়া" হইয়া আর্য্য হইতেছেন, আমরাও তেমনি "পাতি" হইয়া আরবীয় হইতেছি। এই সকল কারণে হিন্দু পণ্ডিতটীর উপর আমাদের ভক্তি বা শ্রদ্ধার কোন অভাবই ছিলনা।

পণ্ডিত মহাশয় আকারে ঈষৎ স্থূলকায় ও নাতি দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু বর্ণটী কুচকুচে কাল, একবারে মসী-নিন্দিত; কেবল চক্ষু ছুটী সাধুর ন্যায় হরনেত্র বৃহৎ ও উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার স্ত্রীও তদ্রূপ কৃষ্ণকায়া।

পণ্ডিত মহাশয় কখনও নিজের ক্ষমতা দেখাইতে চাহিতেন না। তথাপি দুই একটী ঘটনায় তিনি যে সাধক ছিলেন, সিদ্ধি-লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইয়াছিল। এই জন্য লোকে তাঁহাকে ভয়-মিশ্রিত ভক্তি বা ভক্তি-মিশ্রিত ভয় করিত। লোকে তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন জানিয়া নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তির জন্য আসিত; কিন্তু তিনি বিনীতভাবে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বলিতেন "বাপু! আমি সামান্য লোক, আমি কি করিতে পারি? যথারীতি চিকিৎসা করাও ও ভগবানে বিশ্বাস রাখ, অবশ্য সারিয়া যাইবে।" কিন্তু পীড়াপীড় করিয়া ধরিলে রোগীর গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতেন "যদি ভগবানের কৃপা হয়, তবে এ অবশ্যই সারিয়া যাইবে।" ইহাতেই কিন্তু রোগ সারিয়া যাইত।

এই সকল কারণে অনেকে তাঁহাকে বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্য করিতেন, কিন্তু কখন সে অর্থ তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেন না, গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন বা আমাদের খাওয়াইতেন। তিনি অত্যন্ত পর-দুঃখ-কাতর ছিলেন এবং যদিও ২০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পাইতেন, তাহা সত্ত্বেও শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা

প্রাণপণে লোকের উপকার করিতেন ও কষ্টে সৃষ্টে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

তিনি মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুক করিতেন। অনেককে বলিতেন "আজ তোমার সহিত দেখা করিব।" কিন্তু লোকেরা তাঁহার পরিবর্ত্তে গৃহ মধ্যে হয়ত প্রকাণ্ড বাঘ, বা বৃহৎকায়ের বিড়াল বা ভীষণ সাপ দেখিত। তাহার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "কেন আমি ত গিয়াছিলাম। কেন তুমি কি একটা বাঘ দেখনি বা ভীষণ আকারের বিড়াল দেখনি?" ইত্যাদি। লোকে অবাক হইয়া যাইত।

তাঁহার স্ত্রীও ঐরূপ ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা করিতেন। কেহ কেহ স্বপ্নে তাঁহাকে যদিও আসিতে দেখিত, কিন্তু সকলে তাহা দেখিত না, কেহবা স্বপ্নে একটা বালক, কেহবা একজন স্ত্রীলোক ইত্যাদি দেখিত। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "কেন ঐরূপ আকারের একটী বালক বা স্ত্রীলোক দেখনি কি?"

একবার পণ্ডিত মহাশয় দুটি ছেলেকে পা টিপিতে বলেন। কিছুক্ষণ পা টেপা হইলে একটি ছেলেকে বলিলেন "যা, তোকে আর টিপিতে হইবে না। তুই পেয়ে গেছিস" সে ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি পেয়েছি, পণ্ডিত মহাশয়?"

পণ্ডিত। কেন তুই কি কিছু জান্‌তে পারিস নি? তোর হাতের ঘ্রাণ নে দেখি।

তখন সে বালক হাতের ঘ্রাণ লইয়া দেখিল, তাহার হাত দিয়া অতি সুন্দর পদ্ম-গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন অপর ছেলেটি বলিল "পণ্ডিত মহাশয়! আমিত পাইনি আমাকে দিন না।"

পণ্ডিত। আহা! ও অনাথা, পিতৃমাতৃহীন। তাই ওকে দিলাম তুই বড় লোকের ছেলে, তোর অভাব কি?

ছেলেটীর হাতের সেই প্রকার গন্ধ প্রায় দুই দিন ছিল।

একবার একটী ঘটনায় পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। একদিন প্রায় দুই তিনটী ছেলেকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে দিন "রোজা" ছিল। পরে সন্ধ্যার সময় এক জন একটীকে মাঠের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে পায়। পরে অনেক লোকে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনে। সে তখন একবারে উন্মাদ, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হইয়াছিল। সম্পূর্ণ-উলঙ্গ, বাহ্য-সংজ্ঞা শূন্য, ও কেবল "লাহ্ ইল্লিলাহ্" বলিয়া চীৎকার করে, কখন দৌড়িয়া যায় বা লাফাইতে থাকে, কখন বা ঘাস ছিঁড়িয়া খায়, অন্য কথা কয়না বা কথার কোন উত্তর দেয় না, কেবল ক্রমাগত মুখে "লাহ্ ইল্লিলাহ্" শব্দ।

বাড়ী আনিয়া যখন কিছুতেই কমিল না, তখন শয়তানের উপদ্রব মনে করিয়া শান্তির জন্য একজন মৌলবীকে কল্মা পড়াইবার জন্য ডাকা হইল। মৌলবীকে দেখিয়া বালকটী রাগিয়া বলিল "বেয়াদব্! হামকো কল্মা বাতলায়নে আয়া তোম কল্মাকে কেয়া জান্তা হ্যায়? কল্মা কুছ্ ছমজা হ্যায়?" এই বলিয়া নানা স্থান হইতে কল্মা উদ্ধৃত করিয়া অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলিয়া যাইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালকটী কোনরূপে তখন আরবী অক্ষর চিনিয়াছে; কিন্তু কল্মা কি কোন আরবী পুস্তক আদৌ পড়ে নাই। বেগতিক দেখিয়া মৌলবী সাহেব করযোড়ে মাফ্ চাহিয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন অনেকে বলিল "ছেলেরা প্রায় পণ্ডিতের কাছে থাকে, হয়ত তিনি কিছু জানেন বা ক'রে থাক্‌বেন।" পণ্ডিত মহাশয় এসে দেখে বল্লেন "আরও দুই দিন ঐ ভাবে থাকুক। কেন না, এখন যেরূপ প্রবল আবেগ, তাহাতে বলপূর্ব্বক থামাইতে হইলে, বালকের অনিষ্টের সম্ভাবনা। সুতরাং এখন ঐ ভাবেই থাকুক। আপনা আপনি কমিয়া আসা

দরকার। তবে আমি অভয় দিতেছি যে, চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই।" অগত্যা তাহাকে চাবিবদ্ধ করিয়া ঐ ভাবে রাখা হইল। তাহাকে দৈবানুগৃহীত মনে করিয়া গ্রাম হইতে বহুলোক দেখিতে আসিল। দুই দিন পরে পণ্ডিত মহাশয় "পানি পড়িয়া" (জল পড়িয়া) চোকে মুখে ছিটা দিতে, বালকটী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে উলঙ্গ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। এই ঘটনাতে সে এত দূর লজ্জিত হইয়াছিল যে, সে দুই তিন দিন ঘরের বাহির হয় নাই। ইহার পরও অনেকে তাহাকে দেখিতে আসিত ও রোগ-শান্তি প্রভৃতির জন্য "পানিফুকা" প্রভৃতি লইতে চাহিত; কিন্তু সে বেচারী জলপড়া বা মন্ত্রতন্ত্রাদি না জানায়, কিছুই দিতে চাহিত না। তবু অনেকে বলপূর্ব্বক লইত; কিন্তু বিশ্বাসের বলেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, প্রায়ই উপকার হইত।

সংজ্ঞা পাইলে সে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় সেদিন বলিলেন, 'আজ রোজার দিন, খুব ভাল দিন। তোদের এক মজা দেখাইব। এই বলিয়া আমাদের ভ্রূমধ্য ও চক্ষুদ্বয়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মাঠে গিয়া খুব নির্জ্জনে পবিত্র-চিত্তে ও সংযমের সহিত "লাহ্ ইল্লিলাহ্" ধ্যান করগে যা।"

আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া সম্মুখে যেন মায়াবলে এক গাছ হইয়াছে দেখিলাম। সুন্দর কামিনী গাছ! ক্রমে সুন্দর ফুল ফুটিয়া গাছটাকে ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে যেন বিদ্যুৎ গাছটাকে বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। পরে দেখি, প্রত্যেক ফুলের প্রত্যেক পাপড়ীতে বিদ্যুতের অক্ষরে লেখা—"লাহ্ ইলাহিল্লাহ্" (একমেবাদ্বিতীয়ম্)। পরে শুধু ফুল কেন, প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক ডাল, প্রত্যেক স্থানে লেখা "লাহ্ ইলাহিল্লাহ"। যে দিকে চাই—আকাশে, প্রান্তরে, তরুমূলে, তৃণদলে,

জলাশয়ে, সর্ব্বত্রই অগ্নিময় অক্ষরে লেখা "লাহ্ ইলাহিল্লাহ্"। প্রত্যেক জীব জন্তুতে, আমাদের সর্ব্বাঙ্গে, প্রত্যেক লোমকূপে "লাহ্ ইলাহিল্লাহ্" আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে আগুনে জ্বালা ছিল না, যেন এক অমৃতময়ী স্নিগ্ধ-শান্তি। যে দিকে চাহিয়া দেখি "লাহ্ ইলাহিল্লাহ্"। পদতলে ঐরূপ দেখিয়া, "লাহ্ ইলাহিল্লাহ্"র উপরে কিরূপে পা দিব ভাবিয়া লাফাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। যতক্ষণ এইভাবে ছিলাম, ততক্ষণ এক পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম।"

অন্যান্য বালকগুলিরও এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ন্যায় এত স্থায়ী ও পূর্ণভাবে হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় এই বালকটীকে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ধনী পিতা মাতা এক মাত্র পুত্রকে ফকীরী করিতে দিতে সম্মত হয়েন নাই। এই কথা লইয়া অনেক গোঁড়া মুসলমান ও মৌলবী বলিলেন, "ও কাফের, ও আবার "লাহ্ ইলাহিল্লাহ্" শিখাইবার কে? এ সমস্ত কি জানে?" ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষমতা আছে জানিয়া কেহই একথা বেশী ভরসা করিয়া বলিতে পারে নাই। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান। সব দেশে ভাল মন্দ লোক আছে, ভাল লোকেরা তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমাদের ত কথাই নয়, কিন্তু তিনি আর মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না, সম্ভবত কাশী গিয়া থাকিবেন। অনেকে তাঁহাকে আসুরিক সম্প্রদায়ের (Black Art) বামমার্গীয় যোগী বলিতেন। আমাদের মধ্যে সীবনি নামে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারাও অনেকটা সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন। কেহ কেহ সন্দেহ করিতেন যে, তিনিও সীবনী সম্প্রদায়ের লোক। আমাদের কিন্তু

তাহা বোধ হয় না। কেন না, তিনি নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সংযমী, সদালাপী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা ও দানশক্তি অসীম ছিল, নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন অন্য কোন কথা কহিতেন না, বা অন্য কোথাও যাইতেন না, তিনি অতিশয় নির্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। তিনি অনেক সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন; কিন্তু কখনও কোনরূপ ক্রিয়া তাঁহাকে করিতে দেখি নাই, অবশ্য রাত্রিতে করিতেন কিনা জানি না। এ সকল দেখিয়া তাঁহাকে আসুরিক সম্প্রদায়ের যোগী বলিয়াও বোধ হয় না। আর ঐরূপ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই একটু ছোট খাট দলের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরে বেশ একটা সর্ব্বজনীন উদারতা ছিল। একবার কুচবিহার রাজ্যের এক তহসিলদারি অনেক অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া অনুনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন; তিনি কিন্তু কোন অভাব নাই জানাইয়া তাঁহার অর্থ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলেন যে, তিনি সেখানে বেশ আছেন, যদি থাকিতে হয়তো সেখানে থাকিবেন, না হয় ৺কাশীবাস করিবেন। অন্যত্র যাইবার আস্থা নাই।

শ্রীঅরুণ চাঁদ।

ভূতের চণ্ডী-পাঠ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি। বেদান্তের মত কি?

সার্ব্বভৌম। বেদান্তের মতে আত্মা ঈশ্বরের অংশ মায়াবশতঃ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম্মফলে পাপে নিমগ্ন হইয়া,

ক্রমাগত নূতন নূতন দেহে পরিভ্রমণ করে। ক্রমে, যখন শাস্ত্র-প্রদর্শিত সৎক্রিয়া, ভক্তি ও যোগ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পাপ-বিমুক্ত হয়, তখন পুনর্ব্বার ঈশ্বরে বিলীন হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরক্ষণেই আত্মা দেহান্তর-প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবিতাবস্থায় কেহ কেহ মায়ার অত্যন্ত বশীভূত হয়। ভোগ-বাসনা তৃপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা বিষয়বিভব অথবা আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুর পরও পার্থিব লীলাস্থলে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন কখন স্থূল অথবা ছায়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে দেখা দেয়, ইচ্ছা যে, তাহাদের সহিত পূর্ব্বমত মিলিয়া মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া ভোগ-লালসা তৃপ্তি করে, কিন্তু তখন তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। আত্মীয়-স্বজনও তাহাদের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া, কথা কহা দূরে থাক্ ভয়ে পলাইয়া যায়। সুতরাং তাহারা অতিকষ্টে কাল যাপন করে। মায়ার পরিমাণ মত ন্যূনাধিক কাল এইরূপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের থাকিতে হয়। পরে যখন মায়ার বন্ধন খণ্ডন করিতে পারে, তখন দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল প্রেত-শ্রাদ্ধের বিধি আছে।

অনেকক্ষণ পরে আমার কথা বাহির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "একবৎসর নির্দ্ধারিত আছে কেন?"

সার্ব্বভৌম। কাহার আত্মা কত কাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, সেই জন্য আন্দাজি একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আমি। লোকে বলে ভূত প্রেত ভয় দেখায়, মারে ও নানা রকম অত্যাচার করে, সে সকল কি অলীক কথা?

সার্ব্বভৌম। অলীক কথা হইবে কেন? যাহারা জীবিত অবস্থায়

নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম ও অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়া সুখ ভোগ করিত, মৃত্যুর পর ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের বাসনা তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না। কাজেই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াও ঐরূপ অত্যাচার করে।

আমি। আচ্ছা! প্রেতত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা মহাশয় আজ্ঞা করিলেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি?

সার্ব্বভৌম। আগেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে। যাহা প্রত্যক্ষ-বিষয় নয়, তাহার প্রত্যক্ষের প্রমাণ থাকিতে পারে না। অনুমান ও স্থির বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই বলিতে পারা যায়। মনে কর, যে প্রেতমূর্ত্তি ও তাহার কার্য্যকলাপ তোমরা বিবাহ দিতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট বাটীতেই ঘটিয়া থাকে, উহার কারণ কি? সম্ভবতঃ জীবিত অবস্থায় ঐ বাটীটি ঐ লোকের লীলাভূমি এবং অত্যন্ত প্রিয়স্থান ছিল, সেই জন্য মৃত্যুর পরও তাহার প্রেতাত্মা ঐ স্থানের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহা ভিন্ন অন্য কি কারণ হইতে পারে?

আমি। আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, মৃত্যুর পর সকলেই অল্পাধিক কাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সকল প্রেতমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?

সার্ব্বভৌম। যাহাদের ভোগ-বাসনা অত্যন্ত প্রবল ও সেই বাসনা কিছুতেই দমন করিতে পারে না, তাহারাই প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়। যাহারা মায়াকে বশীভূত করিতে পারে, তাহাদের দেখা দিবার ইচ্ছা হয় না।

আমি। মৃত্যুর পর আত্মা কতদিন ইচ্ছা-পূর্ব্বক লীলাস্থলে পরিভ্রমণ করিতে পারে?

সার্ব্বভৌম। যত দিন না পূর্ব্ব লীলাস্থানের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া নূতন দেহে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হয়, ততদিন ঐরূপ থাকিতে হয়।

আমি। গয়ার পিণ্ডদান করিলে যে আত্মার মুক্তি হয় বলে, তাহা কি সত্য?

সার্ব্বভৌম। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহার পক্ষে অলীক কথা নয়। গয়ায় পিণ্ডদানের মানে আর কিছুই নয়, কেবল বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করা। ভগবানের দয়া হইলে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব নয়।

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাজিয়া গেল। ৬টার গাড়ীতে আমাদের বাটী যাইতে হইবে, কাজেই আমরা উঠিবার চেষ্টা করিলাম। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন "প্রাতঃ কালে আহারাদি করিয়া আসিয়াছ, অবশ্য ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। যাহা হউক, একটু জলযোগ করিতেই হইবে।" এই বলিয়া তাঁহার পৌত্রকে ইসারা করিলেন। যুবক তাঁড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন এবং আন্দাজ ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে অন্দর মহলে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও সমভিব্যাহারে গেলেন। তথায় গিয়া দেখিলাম, প্রচুর আয়োজন। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিকটে বসিয়া যত্নের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইলেন। আহারাদির পর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমরা বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়।

চাবির গোছা।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমার রায়চৌধুরি আমার সমপাঠী, পরমবন্ধু ও জ্ঞাতি-ভাই। ইনি একজন বেশ কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং বর্ত্তমান একটি সদাগরী আফিসে উচ্চপদে কর্ম্ম করেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইনি বিএ পড়িতেন, তৎকালে কলিকাতার একটি ছাত্রাবাসে (মেসে) বাস করিতেন।

মেসে তাঁহার কতকগুলি বাক্স, পেঁটরা ছিল মাত্র, অধিকাংশ দ্রব্যই বাটীতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্তগুলির চাবি তাঁহার নিকটেই থাকিত, সে গুলি একটি রিংএর মধ্যে রাখিয়া সর্ব্বদা পকেটে রাখিতেন। একদিন বৈকালে তিনি কয়েকটি জিনিষ কিনিবার জন্য বাহির হন। এ রাস্তা, ও রাস্তা—এ গলি সে গলি, এইরূপ অনেক ক্ষণ ঘুরিয়া অভীষ্ট দ্রব্যাদির সহিত, সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটি বাক্স খুলিবার প্রয়োজন হওয়াতে পকেটে হাত দিয়া দেখেন, চাবির গোছা নাই। কি সর্ব্বনাশ! উপায়? একটি আধটি নয়, পনর ষোলটি বাক্স ড্রয়ার প্রভৃতি বন্ধ হইল! তিনি বড়ই বিষণ্ণ ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া ক্লিষ্টমনে শয়ন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি এক রাস্তার ফুটপাথের উপর দণ্ডায়মান। একদিকে মুদীর দোকান, ও বিপরীত দিকে মণিহারীর দোকান। তিনি রাস্তাটি চিনিতে পারিলেন। কিন্তু একি! ফুটপাথের নীচেই রাস্তার উপর তাঁহার চাবির গুচ্ছ পড়িয়া রহিয়াছে! তিনি তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া লইলেন এবং দেখিলেন, ট্রাঙ্কের চাবিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেন গাড়ীর চাকাতে পেষিত হইয়াছে। স্বপ্নটি এরূপ উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, পরদিন প্রাতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। মুদীখানা এবং মণিহারীর দোকান দেখিয়া তিনি স্থানটি চিনিয়া লইলেন এবং রাস্তার উপর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কি খুঁজিতেছেন দেখিয়া, মুদী জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, কিছু হারাইয়াছে কি?" "হাঁ, বাপু একটা চাবির গোছা।" "এই দিকে আসুন" বলিয়া মুদী চাবির গুচ্ছটি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল "আজ ভোরে ঠিক ঐ স্থানে রাস্তার উপর ইহা পাইয়াছি।" মুদীকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ ট্রাঙ্কের চাবিটি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে পেষিত হইয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনাটি ঘটিবার অব্যবহিত পরেই রাধাকুমার আমার নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমার অদ্যাবধি বেশ স্মরণ আছে।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরি।

স্বামীজীর "রাধাবিনোদ" দর্শন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ।

তাঁহার জীবনের কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা।

পাবনা জেলায় "বুড়াশিব" নামে এক জন সিদ্ধ পুরুষ আছেন। তাঁহার আশ্রমে থাকা কালে তিনি আমাকে তড়াশের জমীদার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল রায় নামক ব্যক্তির বাটীস্থিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-নামক বিগ্রহ দেখিতে পাঠাইলেন। আমি সেই স্থানের প্রায় নিকটে আসিয়া দেখিলাম যে, একটি জলা পার হইয়া যাইতে হইবে। মনে ভাবিলাম "হে কৃষ্ণ! এতদূর আসিলাম, আবার এই সম্মুখে জল! পার হইব কি প্রকারে।" এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিলেন" ঠাকুর এই স্থান দিয়া আইস।" আমি বলিলাম "থাম, আগে কোন্ স্থানে কয় জল দেখি, তবে সেই স্থান দিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব।" তিনি বলিলেন "কোন ভাবনা নাই, এস।" আমি তাঁহার সঙ্গে পার হইয়া যাইলাম। লোকটিকে যেন "বুড়োশিবের" মত বোধ হইল। রাত্রে ভাল দেখা গেল না। কিন্তু কথা, চলন সমস্তই উক্ত সিদ্ধ পুরুষের মত। পার হইয়াই ইঁহাকে আর দেখা গেল না। পরে কিয়দ্দূর যাইবার পর

একটি ব্রাহ্মণ ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন "এস আমার সহিত যাইবে।" আমি চলিলাম। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করিলাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণটি ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার চেহারা ঠিক বিগ্রহের অনুরূপ। পশ্চাতে ব্রাহ্মণকে দেখিতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেই মন্দিরের প্রাঙ্গনে ধুনা জ্বালাইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, একটি পট্টবস্ত্র-পরিহিত স্ত্রীলোককে কোলে করিয়া বিগ্রহ রাধাবিনোদ যেন শয়ন করিতেছেন। পরদিন বনওয়ারি বাবুকে উক্ত বিষয় বলায়, তিনি বলিলেন যে, আপনি ঠিক দেখিয়াছেন। বিগ্রহ রাধাবিনোদের পার্শ্বে যে রাজলক্ষ্মীর বিগ্রহমূর্ত্তি আছে, তাঁহার বাহিরের ঘাঘরার নীচে পট্টবস্ত্র পরান আছে। অনেক সময় আমরা বিগ্রহকে শয়ন করাইবার সময় রাজলক্ষ্মীর বাহিরের ঘাঘরা খুলিয়া কেবল পট্টবস্ত্র পরাইয়া দুইটি বিগ্রহকে শয়ন করাই।

এই স্থানে থাকিতে থাকিতে আর একদিন দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী ও রাধাবিনোদ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি মহাব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বলিলাম "আপনারা করেন কি! আমরা গৃহত্যাগী নর মাত্র, আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই, আমরা আপনাদের নমস্য হইতে পারিনা।" রাধাবিনোদ বলিলেন "আমরা গৃহী, আপনি সন্ন্যাসী, আমাদের নমস্য।" এই বলিয়া আমার পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

আজ অনেক দিন হইল, এই ঘটনা হইয়াছিল। বনওয়ারি বাবু এক্ষণে রাধাবিনোদ ও রাজলক্ষ্মী বিগ্রহ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। উক্ত বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ শুনা যায় যে, একদা একটি ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিতে যাইয়া নদীর ভিতর হইতে "আমাকে তুলিয়া লও" এইরূপ শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলেন। পুনঃ পুনঃ

শুনিয়াও সেইদিন ব্রাহ্মণ ভয়ে অনুসন্ধানে সাহস করেন নাই। পরদিন স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি ঠাকুর ভাসিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে তুলিয়া লইয়া আসিলেন ও যথারীতি স্থাপনাদি করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। পরে বাটীর রাজলক্ষ্মী নামে এক কন্যা এই বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইলেই দেখিতেন যে, বিগ্রহটি তাঁহাকে ডাকিতেছেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বলিতেছেন। মেয়েটি বাটীর সকলকে এই কথা প্রায়ই জানাইতেন। পরে অকস্মাৎ একদিন ঠাকুর ঘরের ভিতর মেয়েটিকে মৃতাবস্থায় দেখা গেল। বাটীর সকলে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। রাত্রে স্বপ্ন হইল বিগ্রহ, রাধা-বিনোদ বলিতেছেন "আমি আপনাদের রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছি। আপনারা শোক পরিত্যাগ করিয়া নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা উহার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিন এবং উহাঁর পার্থিব দেহের সৎকার করিয়া ফেলুন।" পরে তদনুরূপই কার্য্য হইল। তদবধি বিগ্রহ রাধাবিনোদের পার্শ্বে রাজ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বসান আছে এবং রাত্রে দুইটিকেই একত্র শয়ান করান হয়।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৫২৪ পৃষ্ঠার পর)

চৈত্র মাস। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য ইহার মধ্যেই যথেষ্ট অনুভূত হইতেছে। দিনের বেলায় ঘরের বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই ব্যোমকেশ সমস্ত দিন কতক্ষণে বেলা পড়িবে এই চিন্তায় কাটাইয়া সায়াহ্নের প্রাক্কালে সাগ্রহ পাদ-বিক্ষেপে ভট্টাচার্য্য-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিল "দাদা ম'শায়, কি যে একটা মৌতাত

জন্মে দিয়েছেন, ৪টা বেজে গেলে আর ঘরে স্থির হতে পারি না। চিরকাল যে ভূতের কথা উপকথা বলে রহস্য করে উড়িয়ে দিয়েছি, সেই ভূত যে সত্যি সত্যি এ রকম ভাবে ঘাড়ে চেপে বস্‌বে, তা কখনও ভাবি নি। গতিক দেখে মনে হচ্চে শেষে বঝি আপনাদের অদৃষ্টবাদেও বিশ্বাস করতে হবে।”

ভট্টাচার্য্য। তা কর্‌লে যে একটা মহাপাত হবে, এরূপ মনে করবার কোন কারণ দেখি না। এখনও কি তোর মনে হয় হিন্দুর চিরদিনের বিশ্বাসগুলোর মধ্যে কোন সত্য নেই; সে গুলা কি নিতান্তই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-বিবর্জ্জিত?

ব্যোমকেশ। দিন কতক পূর্ব্বে হ'লে আপনার কথাটা নিয়ে হয়তো কিছুক্ষণ রঙ্গরস করতুম। কিন্তু এ কয়দিনে আপনি আমার মধ্যে বিলক্ষণ একটা ভাবান্তর জন্মে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে, তার জায়গায় একটা গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা হৃদয়টা অধিকার করবার জোগাড় করেছে। অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগে উঠেছে। আপনাকে একে একে সে সমস্তের সমাধান করতে হবে।

ভট্টাচার্য্য। ভগবান স্বয়ং বলে গিয়েছেন—“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্”। তোর শ্রদ্ধা এসে থাকে জ্ঞানলাভ হবেই হবে। আজকালকার ছোঁড়াদের যে বিশেষ কিছু একটা শিক্ষা হয় না, শ্রদ্ধার অভাবই তার একটা অন্যতম কারণ। তারা মনে করে, তারা যেন সবজান্তা হয়ে পড়েচে। জগতে তাদের আর শোনবার বা শেখবার কিছু বাকী নাই।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় ওটা কি আজকালকার ছোঁড়াগুলোরই দোষ, না তরুণ বয়সের স্বভাবসুলভ প্রগল্‌ভতা? সে যা হোক, আমাদের সময়টা বৃথা নষ্ট হয় কেন, আপনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কথাগুলির উপসংহার করুন।

ভট্টাচার্য্য। কাল তোকে বলছিলুম যে 'ভূত' এই কথাটার সাধারণ প্রয়োগের মধ্যে অতিব্যাপ্ত দোষ এসে পড়েছে। প্রেত জিনিষটা কি, কি করে মানুষের প্রেতাবস্থা প্রাপ্তি হয়, আর কতকালই বা সেই অবস্থা থাকে, এ সমস্ত কথা আমি তোকে কতক পরিমাণে বুঝিয়ে এসেছি।

এই প্রেতাবস্থা-বিশিষ্ট জীব সময়ে সময়ে কেমন করে আমাদের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হয়, তাও আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমাদের অন্তকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ভুবর্লোকের সাধারণ অবস্থা ও অধিবাসিবর্গ। এই আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারবো যে, অনেক অলৌকিক ব্যাপার যা আমরা প্রায়ই ভৌতিক বলে নির্দ্দিষ্ট করি সেগুলি প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত মানবের কার্য্য নয়। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানবশতঃ সবই ভৌতিক বলে নির্দ্ধারিত করে।

ব্যোমকেশ। ভুবর্লোকের আবার স্বতন্ত্র অধিবাসী আছে না কি? কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকে।

ভট্টাচার্য্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তোদিকে যে শিখিয়েছে, সবই জড়ের রাজ্য, কেবল দৈবাৎ কোথাও কোথাও কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ প্রাণশক্তির দেখা দিয়েছে এবং প্রাণিকুলের আবির্ভাব হয়েছে, সেটা আর্য্যবিজ্ঞানের অনুমোদিত কথা নয়। ঋষিরা বলে গিয়েছেন যে, সর্ব্বত্রই প্রাণ আছে। ভগবান প্রাণরূপে সর্ব্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, কাজেই যেখানেই জড় আছে, সেথাই চৈতন্য আছে এবং চৈতন্যবিশিষ্ট জীবশ্রেণী আছে; এ আর বিচিত্র কথা কি।

ব্যোমকেশ। হাঁ, আজকাল আমাদের প্রফেসর বোস্ (Dr. J. C. Bose) ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এমনকি ধাতুগুলাও প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট; তাঁর আবিষ্ক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক জগৎ মোহিত হয়ে উঠেছে!

ভট্টাচার্য্য। তোদের বৈজ্ঞানিক জগৎ স্বচ্ছন্দে মোহিত হতে পারেন, আমাদের কিছুই আপত্তি নেই, কিন্তু হিন্দুর নিকট এটা একটা অতি প্রাচীন তত্ত্ব। তোকে তো আগেই বলেছি, সেকালের সত্য নির্দ্ধারণের পন্থা অন্যবিধ ছিল। ঋষিরা যোগ প্রক্রিয়ার অনুসরণ করে জাগতিক সমস্ত তত্ত্বেরই আবিষ্কার কার্য্য শেষ করে গিয়েছেন। সে সমস্ত তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ আলোকিত করে রয়েছে। বর্ত্তমান কাল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে সে গুলি কিছু পরিমাণে ইউরোপীয় বা দেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে মাত্র। অতএব

ইউরোপ তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হতে পারে বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিশালী হিন্দুর নিকট আশ্চর্য্য হবার বিষয় খুব অল্পই আছে।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় যদি গালাগালি না দেন, তা হলে একটা কথা বলি। যেই কোন একটা নূতন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, অমনি সকলে তারস্বরে বলে উঠেন "ও সব আমাদের শাস্ত্রে আছে," এবং প্রমাণ স্বরূপ অনেক উৎকট শ্লোক হাজির করেন। কিন্তু সেই সমস্ত শ্লোকও ছিল আর দোহাইদাতারাও ছিলেন, কেবল জগতের লোক সেই তত্ত্বটার কথা বড় একটা অবগত ছিল না, এইরূপ দেখ্‌তে পাই। এর রহস্যটা কি, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ভট্টাচার্য্য। ওরে আসল কথাটা তোকে খুলে বলি শোন। যে যোগ-শক্তির বলে ঋষিরা শাস্ত্রীয় সত্যগুলির আবিষ্কার সাধন করে গিয়েছেন, সেই যোগশক্তি বর্ত্তমান সময়ে বড় একটা কাহারও অধিগত নয়, কাজেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে শাস্ত্রীয় তথ্যগুলো অর্থহীন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েচে। পণ্ডিতেরা সেগুলা কণ্ঠস্থ করেন এই পর্য্যন্ত, প্রকৃত তাৎপর্য্যের ধার ধারেন না। কিন্তু যখন অন্য কোনি সূত্র অবলম্বন করে, অপরে সেই সত্যে উপনীত হয়, তখন সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বাক্য সেই নবাধিগত আলোকে যেন পুনর্জীবিত হয়ে উঠে, এবং তন্মধ্যস্থ সত্য যেন লোকমধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। কাজেই চারিদিকে তখন শাস্ত্রের জয়ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে রূপকের বহুল ব্যবহার থাকাতেও অনেকটা এইরূপ দাঁড়িয়েছে।

ব্যোমকেশ। তা হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু সে কথা যাক্, আপনি ভুবর্লোকের কথা কি বলছিলেন, তাই বলুন।

ভট্টাচার্য্য। যেমন আমাদের এই ভূলোকে নানা শ্রেণীর জীব আছে, সেইরূপ ভুবর্লোকেও নানা জাতীয় জীবের বাস আছে। ইহারা সকলেই শরীরী; কারণ তোকে পূর্ব্বেই বুঝিয়েছি যে, শরীর ধারণ ভিন্ন আত্মার প্রকাশ হয় না। আত্মা ও প্রাণ মূলতঃ একই পদার্থ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেই এই আত্মা বহুরূপে বিরাজিত আছেন; এক হ'তে বহু হওয়াই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। "একোহং বহুস্যাম প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি-

বাক্য তাহার সাক্ষী। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেই সেই পরমাত্মা হতে নানাবিধ জীবকুলের উদ্ভব হয়েছে; সকলের মধ্য দিয়ে সেই এক পরমপুরুষ আপনাকে প্রকাশিত কচ্চেন, সুতরাং সকলেই প্রকাশ-স্থলোপযোগী শরীরধারী। ভূলোকস্থ জীব যেরূপ স্থূল জড়দেহধারী, সেই-রূপ ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মলোকবাসী জীব-সমূহ সেই সেই লোকোপযোগী সূক্ষ্মজড়পদার্থ নির্ম্মিত শরীর ধারণ করে। সমস্ত লোকেই জীবকুল বাস করচে; যেমন ভূলোকে, তেমনি অন্তরীক্ষ লোকে, তেমনি স্বর্গলোকে, তেমনি তদূর্দ্ধতন লোকসমূহে।

ব্যোমকেশ। হাঁ দাদা ম'শায়, তা হ'লে আমরা তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত নই কেন? আর এই সমস্ত লোকই বা কোথায়? আমাদের এই ভূলোক হ'তে কতদূরে? কথাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন; আমার এখনও বেশ ধারণা হয়নি।

ভট্টাচার্য্য। তোকে পূর্ব্বে বুঝিয়েছি যে, এই সমস্ত লোক ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তর মাত্র। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত জড়ের দ্বারা গঠিত। কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে যে, এই সমস্ত লোক একই সময়ে একই স্থলে পরস্পর সম্বদ্ধ হয়ে রয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবি। মনে কর্ এই আমাদের ঘরের ভিতরের বায়ুমণ্ডল। এই বায়ু-মণ্ডলটা ঘরের ভিতর ব্যাপ্ত হয়ে আছে, এবং গৃহস্থিত সমস্ত সচ্ছিদ্র দ্রব্যের ভিতরেও প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই বায়ুমণ্ডলকে আশ্রয় করে, যে সমস্ত সূক্ষ্ম কীটাণু বাস করে, তারা যেন বায়ুলোকের জীব, আবার গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্রব্যসমূহে যে সমস্ত পিপীলিকা প্রভৃতি আছে, তারা যেন একটা স্থূল জড় জগতের জীব; তাহাদের আশ্রয়স্থল যে স্থূল জড় জগৎ, এবং কীটাণুগণের আশ্রয়স্থল যে বায়ুমণ্ডল এ দুটা যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ লোক, কারণ এ দু'য়ের ধর্ম্ম ও গুণাবলী পরস্পর হতে অত্যন্ত বিভিন্ন; অথচ ঠিক একই সময়ে একই জায়গায় এই দু'টা বিভিন্ন জগৎ একত্র অবস্থিত রয়েছে। ভুবর্লোক ইত্যাদি সূক্ষ্মলোক সম্বন্ধে ঠিক এই কথা। ভুবর্লৌকিক জড়ের অবস্থা অতি-সূক্ষ্ম, সুতরাং ভুব-র্লোক সহজেই ভূর্লোকের উপাদান স্থূল জড়ের কঠিন, তরল, বায়বীয়

এবং আকাশিক এই অবস্থা চতুষ্টয়ের ভিতর দিয়ে আপনাকে বিস্তৃত করতে পেরেচে। সেইরূপ আবার ভুবর্লোকের সঙ্গে তুলনায় স্বর্লোক আরও অধিক সূক্ষ্ম; কাজে কাজেই সেই অতিসূক্ষ্ম স্বর্গলোক আপনার অধিবাসী-জীবকুল নিয়ে ভুবর্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। এখন বুঝতে পাচ্ছিস, কিরূপে আমাদের এই সম্মুখস্থ দেশে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ইত্যাদি সমস্ত লোক এক সময়ে বর্ত্তমান থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যে, ইহাদের অস্তিত্ব জানতে পারি না, তার কারণ হচ্চে এই, যে, এ সমস্ত লোকের উপাদান যে জড়, সে এত সূক্ষ্ম যে, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি তাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না। তোরা তো বিজ্ঞান চর্চ্চা করিস, সুতরাং এটা তো জানিস যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দু'টা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ক্রিয়া করে?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ; ইংরাজীতে ইহাদিগকে Threshold or liminal intensity এবং height of sensibility এই নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

ভট্টাচার্য্য। কথা দু'টার অর্থ আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল দেখি?

ব্যোমকেশ। এই মনে করুন শব্দজ্ঞান। শব্দায়মান জড় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ যখন আমাদের কর্ণপটহে এসে আঘাত করে, তখনই আমাদের শব্দের জ্ঞান হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই বায়ুমণ্ডলোত্থিত তরঙ্গগুলির সংখ্যা গণনা দ্বারা নির্দ্ধারণ ক'রেছেন। তা হ'তে এইটি স্থির জানা গিয়েছে যে, তরঙ্গগুলির শক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম না করিলে, মোটেই শব্দ জ্ঞান হয় না। সেইরূপ আকাশ(Ether)মণ্ডলে উৎপন্ন তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে৪৫৮০০০০০০০০০০০০ বেশী না হইলে রূপ বা আলোক জ্ঞান হয় না। অতএব এই সংখ্যাকে দৃষ্টিশক্তির নিম্নসীমা বা Liminal intensity বলা যেতে পারে। এই সংখ্যা যতই বেড়ে বেড়ে যায়, ততই আমাদের বিভিন্ন প্রকার আলোকের জ্ঞান হয়। পরে যখন তরঙ্গ সংখ্যা ৬৬৭০০০,০০০,০০০,০০০, (৬৬৭ শঙ্খ) তে পৌঁছায় তখন আমাদের বেগুনে আলো বা Violet রঙের জ্ঞান হয়। কিন্তু এই সংখ্যা অতিক্রম ক'রে গেলে আর মোটে আলোক

জ্ঞান হয় না। অতএব এই সংখ্যাকে (৬৬৭ শঙ্খ) মানব দৃষ্টিশক্তির ঊর্দ্ধসীমা বলা যেতে পারে।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লেই বোঝ, এই নিম্নসীমার নীচে এবং ঊর্দ্ধসীমার উপরে আর মানুষ কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু এরূপ পদার্থ বা জীব থাকতে পারে, যেগুলি হ'তে উৎপন্ন আলোক-তরঙ্গ এই ঊর্দ্ধ সীমার উপরে আছে। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃষ্টির অগোচর। এই সমস্ত লোক বা জীব-জগৎ আমাদের কাছে থেকেও নাই। এখন এই কথাগুলো ভুবর্লোক বা অন্যান্য সূক্ষ্ম লোক সম্বন্ধে খাটিয়ে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবি, সেই সমস্ত বিরাট ব্যাপারের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি জন্য আমরা তাহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হ'য়ে জীবন যাপন কচ্ছি, কিন্তু তোকে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের দৃষ্টিশক্তির সংপ্রসারণ হ'তে পারে। এ'কে আমাদের শাস্ত্রে "হরনেত্র" "শিবনেত্র" বা "তৃতীয় নয়ন" বলা হ'য়েছে। এই দৃষ্টির বিকাশ হ'লে মানুষ ভুবর্লোক বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ক'রতে সমর্থ হয়।

ব্যোমকেশ। দেখুন আমি সে দিন থিয়েটারে "ইন্দিরা" দেখতে গেছলুম। পান্নালাল ব'লে একটা বিটলে বামুন বেচারা ইন্দিরাকে ঠকাবার জন্যে ভণ্ড যোগী সেজে এসে "খোল, খোল, তৃতীয় নয়ন" বলে মহা আড়ম্বর জুড়ে দিয়েছিলো। তখন কিন্তু "তৃতীয় নয়ন" কথাটা কেন বললে ভাল বুঝতে পারি নাই। এখন দেখছি কোন বুজরুকি আর হেসে উড়িয়ে দিতে ভরসা হবে না। সে যা হোক আপনি এখন ভুবর্লোকের কথা যা বলছিলেন, তাই বলুন। আপনার ভূতের তত্ত্ব আবার চাপ প'ড়ে গেল দেখছি।

ভট্টাচার্য্য! ওরে কিছুই চাপা পড়েনি। ভুবর্লোকের অধিবাসী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আবার ভূতের সন্ধান পাবি। কিন্তু আজ আর নয়। বড় রাত হ'য়ে গ্যাছে।

ক্রমশঃ

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।